মতি নন্দীর

গল্পসংগ্রহ

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

সূচীপত্র

মতি নন্দীর গল্পের ভূমিকা—লিখব আমি? অসম্ভব, সে হয়না। এমন ঘটনা কেউ কখনও দেখেছেন নাকি যে, দেওয়ালে ঝোলানো সাবেকী একটা ফটো ঝুঁকে পড়ে পড়ে ঘরের মানুষদের, চলছে ফিরছে যারা তাদের, চিনিয়ে দিচ্ছে? মতি জ্যান্ত, এবং কিকিং—বাংলা কী?—এদিক ওদিক দমাদ্দম লাথি ছুঁড়ছে। গনগনে উনুনটাকে টর্চের আলো ফেলে দেখিয়ে দেওয়ার বোকামি করতে সাধ যাচ্ছে না।

মতি নন্দীর গল্প কেমন; আর কী? যদি জানতে চান, পাঠক! তবে পাতা উলটে যান, সেটা বলে দিতে গল্পগুলোই তো আছে। পরের মুখে ঝাল খাওয়ার অর্থ নাস্তি। আমি বরং অনেক দিন আগে একবার হঠাৎ মুখে ঝাল লেগে কেমন চমকে উঠি, সেই গল্পটা বলি। তখন কলকাতা থেকে অনেক দূরে থাকি। একবার 'দেশ' পত্রিকার একটা লেখা পড়ামাত্র অস্থির হয়ে যাই. জিভে, চোখে, বুকেও; সেই অস্থিরতাকেই ঝাল বলেছি। সেই অস্থিরতার আর এক নাম হয়তো ঈর্ষাও।

গল্পটা একটা গলির। একটি উঠতি বয়সের মেয়েকে ঘিরে ঘুরছে; কিংবা, বলা যায়, মেয়েটাই ঘুরছে পাড়াটার বাড়ি বাড়ি! ছোট মেয়ে, সব দিক থেকেই সে খুব ছোট। এই পর্যন্ত মনে আছে। আর মনে আছে আমার ভিতরে যেটা কাঁটার মতো ফুটছিল, সেই কথাটা: আরে, মেয়েটাকে আমিও তো চিনি, অন্তত চিনতাম এককালে। কিন্তু তার কথা এভাবে তো লিখতে পারিনি?

এর পরে, কিঞ্চিৎ সময়ের ব্যবধানে, তার আরও কয়েকটা গল্প পর পর পড়ে ফেলি। 'পরিচয়' ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায়। লেখকের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ও হয়। আসলে আমিই তাকে ধরে ফেলি, সে নয়। মতির স্বভাবে ধরাধরি বস্তুটা বস্তুতই নেই। বয়সের তুলনায় একটু বয়স্ক সে, একটু গোঁয়ার। যে মেজাজটা মেলে তার লেখাতেও! লেখার সঙ্গে লেখক এদেশে প্রায়ই মেলে না, মতি অন্যতম ব্যতিক্রম। শিবের গীত গাইছি না, ধানই ভানছি। মানুষটা কেমন জানা হয়ে গেলে তার লেখাটেখা বোঝাও সহজ হয়। মতি নন্দীর লেখা পড়াটাই যেমন একটা আবিষ্কার, তেমনই আবিষ্কার মানুষটাও। স্যাঁতসেতে ব্যাপার একদম নেই, সর্বদাই খটখট করছে।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই বোঝা গেছে যে, ভূমিকা এটা আদৌ হচ্ছে না, একজন গল্পলেখককে নিয়ে লিখতে বসেছি একটা গল্প। "বিশ্বসাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান বঙ্গ সাহিত্যের। সে সাহিত্যে আবার ছোট গল্পের স্থান বিশিষ্ট। রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় হইতে তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্র মিত্র—ছোট গল্পের ধারাটি বাঁকের পর বাঁক অতিক্রম করিয়া বহিয়াই চলিয়াছে, কল্লোলোত্তর কাল অধুনা মতি নন্দী প্রভৃতি নবীন নামগুলি কেন্দ্র করিয়া কল্লোলিত"—এইভাবে আরম্ভ করলে বেশ গ্রাম্ভারী, প্রামাণিক জাতের ভূমিকা হত। কিন্তু সেসব আমার আসে না। দ্বিতীয়ত কথাগুলো মিথ্যেও হত। খুব বেশি ছোট গল্প কি লেখা হচ্ছে আজকাল? এখনকার বাজারে বেশির ভাগ যা বেরোচ্ছে তা না ছোট গল্প, না উপন্যাস, মাঝারি সাইজের বড় গল্প। ব্যাঙের মতো পেট ফুলিয়ে যা নিজেকে উপন্যাস বলে জাহির করে, তারই ফরমাস বায়না কদর। যেমন ডিমানড্ তেমনই সাপ্লাই চলছে, ছোট গল্প লিখতে উৎসাহ বোধ করেন ক'জন? একেবারে ঋতু শেষ তার, এই সেদিনও যে ছিল ছোট্ট মেয়েটি। নখাগ্রে মুখের বিম্ব, গালের টোলটি—আমাদের সাহিত্য থেকে এ-সব জিনিস উবে যাচ্ছে।

আপাতত যেখানে শুরু করেছিলাম, সেখানেই ফিরে যাই—মতি নন্দীর গল্পে। যে-কোন পাঠক কিছুটা পড়লেই বুঝতে পারেন, তার গল্প বস্তু বাদ দিয়ে নয়—বস্তুবাদী। তার মানে কি এই, যে, 'ফিক্সনাল ক্রাইসিস্' অধুনা সর্বব্যাপী, গত শতকে ভূমিষ্ঠ কাফ্কা, জর্জ লুই বোরজেস্ ইত্যাদির মধ্যেও যার ইঙ্গিত মেলে। কোরটাজার, নাবোকভ প্রভৃতি পরবর্তীরা তো আছেনই—সেই মহামারী থেকে মুক্ত সে বর্তমান বহাল তবিয়তে? লক্ষ্য করে দেখা যায়, এখনও তার বেশির ভাগ গল্পই 'থার্ড পারসন'—এ, সেই আবহমান রীতি—সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী লেখকেরই জবানী। 'থিওরি অব ইনডিটারমিসেসি'-র আভাস মাত্র তার মধ্যে দেখি না, কোথায় "সাইকেডেলিক" অভিজ্ঞতার ব্যবহার, যা লভ্য মারিহুয়ানার প্রসাদে, ঝাপসা আয়না মনের! প্রতীকী অর্থের প্রয়োজনে ভাষার কাঠামোটাকেও আগাগোড়া ভেঙে-চুরে দিয়ে সব প্রচলিত রীতির বহিষ্কার? মনে হয়, হাল আমলের রাস্তার ধারের সস্তা দোকানে মতি নন্দী সওদা করেনি। অস্তিবাদী মহাবিশ্বে মহাকাশে নিঃসহায় নিঃসঙ্গ মানুষদের টেনে নামানোর জন্যে লম্ফঝম্ফ তার মোটে দেখি না, কেন না সে দিব্যি দণ্ডায়মান তাঁর নিজের শুকনো ডাঙায়, রূঢ় মাটিতে। সেইখানে দাঁড়িয়ে সে একে চড় মারছে, ও-কে চাপড়, কাপড় চোপড়ও খুলে নিচ্ছে কারও কারও, একে খোঁচা, ওকে গাঁট্টা মারছে। মারছে তাদের, যারা রক্তাল্প মানুষ নয়, বরং রক্তাক্ত, যারা বাস করে পাড়ায়, পরিবারে; মেটারনিটি ওয়ার্ড থেকে "ট্যাক্সি"

করে বাড়ি যেতে চায়, কট করে বিস্কুট কামড়ে "খুকির মতন হাসে" (রাস্তা)। যারা অফিসের পিওন লটারিতে টাকা পেলে উত্তেজিত বোধ করে, ক্লান্তিও, যে ক্লান্তি, "ক্রমশ তাকে দীনতার মধ্যে ডোবায়।" এবং পরে "কামনার দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়" (জীবনযাপন প্রণালী)। যারা ধর্মতলাব মোড়ে ব্যস্ত হয়ে নামা লোকটার তালগোল পাকানো মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করে অহেতুক, পরে, তেমনিই অহেতুক, নিজেকে কুরুক্ষেত্রে সব্যসাচীর মতো নিমিত্তমাত্র ভেবে একেবারে হালকা হয়ে যায় (পাষাণভার)। এরই মধ্যে একটু দূরে গিয়ে পিকনিক সেরে আসে কারা, ফেরার সময় সারা পথ সেই মেয়েদের পায়ের কাছে শাড়িঢাকা শব শোয়ানো—অসফল এক তরুণের। গ্রাম্য স্ত্রীকে শহর দেখাতে এনে ভারিক্কী স্বামী "বিদেশীকে নিজের সাম্রাজ্য দেখাবার ভঙ্গিতে" বলে "বিশতলা…আমি একবার উপরতলায় উঠেছিলুম।" আর পকেটের সব পয়সা—ফেরার ট্রেন ভাড়াও—চায়ের দোকানের বেয়ারাকে দিয়ে, সেলাম কিনে, যখন হেঁটে হেঁটে ফিরে যায়, তখন তার বউ বলে "যখন সেলাম করল, তোমাকে দারোগাবাবুর মতো লাগছিল। (শহরে আসা)।

"বয়সোচিত" গল্পটিতে বয়স যে যায়নি, সেটা প্রমাণ করতে একটি মানুষকে অফিসের স্পোর্টস-এ হাঁটার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়তে দেখি ; নইলে, তার ভয়, সে রিটায়ার হয়ে যাবে। বিস্ময় সেখানে নয়। বিস্ময় এইখানে, সেই মানুষই পরদিন অফিস থেকে বউকে বলে "আর রিটায়ার করাতে পারবে না।" কেন ?—"রিজাইন দিয়ে এলুম।" বাতিল-নম্বর এক ফুটবলারে মৃত্যুই তার "প্রত্যাবর্তন"। তার শেষ কয়দিনে তার ব্যক্তিগত সমস্যা ছিল একটা ন্যাড়া নিমগাছ। "গাছ তো তার পাতার মধ্য দিয়ে যা শুষে নেয়, তাই দিয়েই… বেঁচে থাকে। পাতাই নেই' তা-হলে ও বেঁচে আছে কী করে ?" (এই গল্পেরও পশ্চাৎপট স্পোর্টস, বলা যায়, মতিই প্রথম বাংলা গল্পে স্পোর্টকে যথার্থ সাহিত্যের বিষয় করেছে।)

এই সব গল্প, এইসব মানুষের। পুরো ফর্দ দেব না, গোড়ায় বলেই তো নিয়েছি, রানিং কমেনটারি আমার কর্ম নয়! বায়বীয় নয়, এই মানুষেরা বাস্তব, মাংস-মজ্জা-চামড়ার। ভৌতিক নয়, ছায়া পড়ে, তাদের ফটো তোলা যায়। মতি তাদের দেখেছে। দেখাটাই অবশ্য সব কথা নয়, দ্যাখে তো সকলেই। দেখাটাকে সে লেখাও করেছে। তার আদ্যোপান্ত দেখা জগৎকে। তার দৃষ্ট জগৎ, সৃষ্ট জগৎ নয়। এখানে তার সরাসরি আত্মীয়তা কোন্ পূর্বসূরীর সঙ্গে ?- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পারিবারিক চেহারার মিলটা সহজেই চেনা যায়।

মতিরও বড় শক্তি, তার অভিজ্ঞতা। মাল মশলা যার আছে, তাকে, ফং

দিয়ে কিছু তৈরী করতে হয় না। এদেশে সেকালের লোকে যেমন চেঁচিয়ে 'গোমাংস ভক্ষণ করেছি' বলে মুখে পুরত, সে ডিক্লেয়ার করে তেমন অশাস্ত্রীয় কিছু করে না। গল্পের শুরু আছে, মধ্য আছে এবং শেষ আছে, সে মানে। মাঝখানটাকে শেষে টেনে এনে শুরুকে ঢুকিয়ে দিয়ে মাঝখানে, লাগ-ভেলকি? সে লাগায় না। তার ন্যারেটিভ। নারী শরীরের বর্ণনা যেমন ধ্রুপদী ও সমুচিত, তেমনিই: মাথা থেকে ক্রমে নেমে পায়ের পাতা অবধি। গোড়ালি থেকে আরম্ভ করলে মুখে এসে মেয়েরা ফুরিয়ে যায়। আর প্রকরণ শাস্ত্রীয়-অশাস্ত্রীয় যেমনই হোক না, হোক 'অ্যানটি'-সব কিছু, তবু নঙর্থক বস্তু, বোধ বা বিষয়ও তো কিছু থাকবে? বোধ, না থাকলেও প্রশ্ন? মতি নন্দীর গল্প এই জীবনবোধ, জ্ঞান ও জিজ্ঞাসায় বিলক্ষণ ভরে আছে। তবু—

তবুটা কী? তবু এই যে, ভরে আছে কিন্তু ভরাট হতে চায় না। যেখানে মতির শক্তি, সেখানেই তার সীমা, তার চরিত্রেরা যেন ভয় পায় গলির বাইরে পা বাড়াতে। অথচ এটা তো ঠিক, প্রায় সব গলিই, শেষ পর্যন্ত গিয়ে দেখা যায় কানা? তাই মুখ ফিরিয়ে ফের তেপান্তরের মাঠে, এমনকি সমুদ্দুরেও যেতে হয়।

এই তত্ত্বটা মতি নন্দী নিশ্চয়ই জানে, নইলে সে একবার "ফেরারী" হত কি? তার "চতুর্থ সীমানা" গল্পের কাহিনীটার পাত্র-পাত্রী কেনা জমির চৌহদ্দির চারটে খুঁটি হারিয়ে ফেলত না। হারিয়ে ফেলার যে-মুক্তি তা চকিতে আভাস দিচ্ছে, পরমুহূর্তেই আবার বিমর্ষ ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে।

সাহিত্যের সত্য এই দুটোই। কাটা-ছেঁড়ায় নির্মম ছুরি, আর প্রলেপের মলম, দরকার এই দুই-ই। ঝকঝকে ছুরি দেখতে পাচ্ছি মতির হাতে, কিন্তু— এ-কথা লেখার জন্য সে আমাকে যেন মাপ করে— তাকে এখন মলম কিনতে হবে। মানুষের ভ্যানিটি ব্যাগের নাড়িভুঁড়ি সে বের করে এনেছে; চিৎ করে উপুড় করে দেখিয়ে দিয়েছে আত্মপ্রতারণা আছে যত রকম ["ওখানে (কোনারকে) সত্যি দেখবার জিনিস আছে।" "আপনি গেছেন?" "আমার নন্দাই গেছল।"] — এখন আর একটু ভালবাসাও চাই। শুকনো খেজুরের সঙ্গে সঙ্গে আঙুর, একটু টকটক্ হলেও ক্ষতি নেই। আঙুর অবশ্য মিলছে এক আধটা। এক বোন যখন ভাবছে "মানুষের মুখ মরচে ধরা টিনের কৌটোর মতো", তখন অন্য বোন দেখল, "হাসতে হাসতে ট্রেনের মুখ চলে যাচ্ছে"— এ কথা মতি নন্দীই লিখেছে।

লিখেছে, লিখে যেতে হলে তাকে আরও লিখতে হবে। বেলা যত পড়বে, জ্বালাও তত জুড়োবে। ছায়া ঘনাবে জমতে থাকবে মমতা। মলম আপনা থেকেই লেগে যাবে। শেষবেলার একটা গল্প মতি তো ইতিমধ্যেই লিখেছে—

"ছ'টা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন।"

> ওর (বুড়োর) শরীর থেকে বন্য গন্ধ আসছে।...ঘন ভুরু, দাড়িতে ভরা মুখটা রাস্তার আলোয় বিক্ষত দেখাল।
>
> "জানো, আমি আর কিছু বুঝতে পারি না।...একটা মেয়ে কাল ভাত দিল, খেলুম স্বাদ পেলুম না।...কাল পেচ্ছাপ করে ফেললুম, তাতেই সারারাত শুয়ে রইলুম। বুঝলে, আমার শীত করল না।"

"ছ'টা পঁয়তাল্লিশের গাড়িতে চলে গেল, আমাকে ফেলে", বুড়ো বলেছিল। তার আগে ট্রেনটা আমার "নিয়তি," বলেছিল এই লেখাটাই আর-এক চরিত্র—বিনোদ। এই গল্পটা পর্যন্ত পড়ে থেমে গেছি, আর এগোতে পারছি না। শুনছি "ছ'টা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন আজ আর আসবে না।" কিন্তু ও-ট্রেন তো আমার নয়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখছি, এগোরোটা বেজে পঞ্চান্ন। কার ট্রেন কখন?

সন্তোষকুমার ঘোষ

দ্বাদশব্যক্তি

একটা ক্যাচ ফেলেছিলাম কুড়ি বছর আগে।

হাইকোর্ট মাঠে সেই ম্যাচটি ছিল খুবই গুরুত্বর। জিতলে আমরা দ্বিতীয় ডিভিশন লীগে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রথম ডিভিশনে ওঠার জন্য প্লে-অফ ম্যাচ খেলার যোগ্যতা পেতাম। আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি, যেহেতু আমি ক্যাচটা ফেলেছিলাম। আজও সেই ক্লাব প্রথম ডিভিশনে উঠতে পারিনি। সেই ম্যাচে আমি ছিলাম দ্বাদশব্যক্তি।

এর এগারো বছর পর 'দ্বাদশব্যক্তি' লিখি। তার থেকে কয়েকটি অংশ তুলে দিচ্ছি ঃ

'খবরের কাগজ হাতে মা পাশে এসে দাঁড়াল। সেদিন ঠিক এইখানে এইভাবেই দাড়ি কামাচ্ছিলাম। জানি কি লেখা আছে। আয়না থেকে চোখ না সরিয়েই বললাম, "দ্বাদশব্যক্তি, টুয়েলফথম্যান।"

"তার মানে? তোকে নাকি খেলায় নেয়নি?"

"কে বলল?"

"সরলের মা শুনে এল, দত্তদের বাড়ির মেজছেলে বলছিল।"

বলতে পারতাম বাজে কথা বলেছে। কাগজে নাম বেরিয়েছে বলে হিংসে করছে। তাতে মা খুশিই হতো। মাকে খুশি করা সব থেকে সহজ ছিল। কিন্তু তার বদলে বললাম, "এগারো জনকে নিয়ে তো দল হয়, কিন্তু কারুর যদি হঠাৎ অসুখ করে কি চোট পায় তাহলে কি হবে? তখন দ্বাদশব্যক্তি তার জায়গায় খেলবে। একে কি দলে না নেওয়া বলে?"

দেখলাম মার মুখ থেকে উৎকণ্ঠা ঘুচে গেল। দেখে ভাল লাগল।

"আমায় নিয়ে যাবি?" মুখ ফিরিয়ে লাজুক স্বরে মা বলল। এই সময় আমার বুকের মধ্যেটা নিংড়ে উঠল, হাত কাঁপল, আয়নায় নিজের চোখের দিকে তাকাতে ভয় করল। বললাম, "কোথায়?"

"তোর খেলা দেখতে। একদিনও তো দেখলুম না।"

ইচ্ছে হল রুঢ়ভাবে বলি, খেলার তো কিছুই বুঝবে না, তবে দেখে কি হবে, বোকার মত পাঁচ-ছ' ঘণ্টা বসে থাকার কি দরকার। কিন্তু বললাম, "এ খেলাটা থাক। পরে একটা খেলায় নিয়ে যাব।"

"কেন এটাতেই নিয়ে চল না।"

কথা না বলে দাড়ি কামাতে লাগলাম। জবাব না পেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মা চলে গেল। তখন আয়নাটাকে ঘুঁষি মেরে ভেঙে দিতে ইচ্ছে হয়। দ্বাদশব্যক্তি, যে দলের বাইরে, যার কাজ ফেউয়ের মত দলের পিছনে ঘোরা, যে ব্যাট করতে পারবে না, বল করতে পারবে না, শুধু খাটুনি দিতেই যার ডাক পড়ে, যার কোন ক্ষমতাই নেই দলকে বাঁচাতে, যাকে কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেও আনবে না, সেই সাধারণ, অতি সাধারণ দ্বাদশব্যক্তি। যে এগারো জনের মধ্যেও পড়ে না তার মা কি জন্য যাবে খেলা দেখতে? গিয়ে দেখবে একজনও তার ছেলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে না টি সিনহা যতক্ষণ উইকেটে আছে কোন ভাবনা নেই। কিংবা—সিনহা আউট! এবার তাহলে ইনিংস শেষ!'

এই তারক সিংহ অফিসে লিফটে উপরে উঠছে ঃ

'শুধু শরীরটা সির্‌সির করে, হাল্কা লাগে। লিফটের দরজার মাথায় চৌকো আটটা সংখ্যার ঘর। সবাই সেই দিকে তাকিয়ে। এক এক তলায় এলেই সংখ্যার আলো জ্বলে উঠছে। কয়েক জন করে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই ওঠার সময় তারক বদলে যেতে থাকে। আস্তে আস্তে ভুলে যায় সে বঙ্কুবিহারী সিংহের পুত্র, রেণুকার স্বামী, দুই ছেলের বাবা, কোনক্রমে আই এ পাস এক নগণ্য কেরাণী, একবার বাংলার রঞ্জি ট্রফি দলে দ্বাদশব্যক্তি হয়েছিল। এই সিরসিরানিটা পাবার জন্য গত পাঁচবছরে সে একদিনও অফিস কামাই করেনি। হরতালেও অফিসে এসে বিদ্রূপ শুনেছে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের টান ছাড়িয়ে ওঠার কয়েক সেকেণ্ডের আনন্দ তাকে নেশার মত পেয়ে বসেছে। চোখ বুঁজে সে গোনে—দোতলা, তিনতলা এবার চারতলায় থামবে। তার মনে হয় এখন ডালহৌসি পাড়ার রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে লোকে আঙুলে দেখিয়ে বলবে—ওই যে তারক সিনহা। কতবার ভারতকে নিশ্চিত ইনিংস ডিফিট থেকে বাঁচিয়েছে।

তারক সিংহ দলে আসতে পারেনি যেহেতু ট্রায়াল ম্যাচে সে ব্যর্থ হয় ঃ

'তারকের মনে হল ব্যাটটা ঠিকই পেতেছিল কিন্তু বলটা হঠাৎ ছিটকে সরে এল মাটিতে পড়ে। কারণটা দেখবে কিনা ভেবেছিল। কিন্তু দেখেনি। দ্বিতীয় বলটা সাবধানে খেলবে স্থির করে স্টান্স নিয়ে বোলারের দিকে তাকাতে গিয়ে মনে হল গুডলেংথের কাছাকাছি যেন একটা কাঁকর রয়েছে। লহমার জন্য তারক জমির দিকে তাকিয়েছিল। বোলার তখন ছুটে আসছে। একবার মনে হয়েছিল, বোলারকে থামিয়ে পাঁচে কাঁকর আছে কিনা দেখে নেবে। সিদ্ধান্ত নেবার আগেই বলটা পড়ল গুডলেংথ স্পটে এবং না উঠে মাটি ঘষড়ে হড়কে এল। ব্যাট নামাবারও সময় সে পেল না। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা তারককে উইকেটকীপার বলেছিল, "সেকেণ্ড ইনিংস তো আছে, ঘাবড়াসনি।"

উইকেট ছেড়ে আসার আগে তারক পীচের উপর ঝুঁকে সত্যিই মটরদানার মত একটা কাঁকর দেখতে পায়। সেটা খুঁটে তুলে নিয়ে ফিরে আসতে আসতে তার মনে হয়েছিল—যদি আগেই এটাকে তুলে ফেলে দিতাম। আমার দ্বিধাই আমার সর্বনাশের কারণ হল! আর বোধ হয় টিমে আসতে পারলাম না।

দ্বিতীয় ইনিংস আর খেলা হয়নি। তবে মরীয়া হয়ে ফিল্ড করেছিল। একটি রান আউট ও দুটি ক্যাচ ধরে সে স্থান পায় দ্বাদশব্যক্তি রূপে।'

এই তারক অফিসে ইউনিয়ন নেতার সঙ্গে কথা বলছে ঃ

"ছুটির দিনে তো খেলতে পারেন।" হিরণ্ময় সহানুভূতি দেখাল। তারক ভাবল, একে বোঝান যাবে না খেলাটা তার কাছে সখের ব্যাপার নয়। তাছাড়া খেলা নিয়ে কথা বলতেই এখন ক্লান্তি আসে। "একবার যা ছেড়ে দিয়েছি, তা আর ফিরে ধরা সম্ভব নয়। এখন মনে হয় খেলার সময়টুকুতে দু পয়সা রোজগারের চেষ্টা করলে লাভ হবে। খেলে তো দেখেছি কি হয়।"

কাঁন চুলকোনো বন্ধ করে হিরণ্ময় দেশলাই কাঠিটা বাক্সে ভরে রেখে বলল, "শুধু আপনি একা নন। সারা দেশটাই এ রকম হয়ে পড়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক আজ আপনার মতই হতাশ। শুধু বাঁচবার জন্য দুটো পয়সার জন্য মানুষ তাব আনন্দগুলোকে বাতিল করে দিচ্ছে।"

ঘোড়ার ডিম করছে। তারক বিরক্ত হয়ে ভাবল, খালি বাঁধা বুলি আওড়ান। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে ফেলতে না পারলে যেন ওর কথা সম্পূর্ণই হয় না। লক্ষ লক্ষ থেকে আমি বাদ পড়লে কেউ টেরও পাবে না। কিন্তু বাদ না দেওয়াতেই হিরণ্ময়ের আনন্দ।

মাঝরাতে তারক একা ঘরে ঃ

'তারক অক্ষম রাগে নিজেকেই দায়ী করতে থাকল। দয়া মায়া মমতা—যে ক'টা ছ্যাঁদা আছে সব বন্ধ করে দেব, দেখি কোনখান দিয়ে ঝামেলাগুলো ঢোকে। ইণ্টারভিউ পাইয়ে দাও, পেট খসিয়ে দাও, খালি আবদার আর আবদার। ভেবেছে কি আমায়, বেগার খাটার' লোক? শুধু ফিল্ডিং দেবার জন্যই ডাকবে?

পায়ের ডিম আর উরুর পেশী শক্ত হয়ে উঠল তারকের। মাথার মধ্যে ঝনঝনানি শুনতে পাচ্ছে। একসঙ্গে বহু লোক খিস্তি করছে। ভেবেছে কি, ভেবেছে কি, মনে মনে সে আউড়ে চলল। দয়া মায়া মমতা থেকে রেহাই পাবার জন্য তারক হিংস্রভাবে বালিশটাকে তলপেটের নীচে চেপে অনুভব করল, সকালে ট্রামে যেভাবে চুলের গন্ধে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছিল, সেই রকম শ্বাস-রোধকারী উত্তেজনা। স্ত্রীলোকটিকে কল্পনায় প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে দেখল তেল চিটচিটে ব্রাশিয়ারের ফিতে, শিরদাঁড়ার একটা গ্রন্থি দুই কাঁধের সন্ধিতে। তখন প্রাণপণে সে গৌরীকে আঁকড়ে ধরতে গেল। দেড়শো বছরের বাড়ির অন্ধকার

সিঁড়ির খিলেনের তলা দিয়ে কিশোরী গৌরী ছুটতে ছুটতে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। কাতরস্বরে তারক বার কয়েক, গৌরী গৌরী, বলে ডেকে ধীরে ধীরে বালিশে এলিয়ে পড়ল।'

তারক গণোরিয়াগ্রস্ত। পেনিসিলিন ইঞ্জেকসন নেবার উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে কিন্তু কলকাতায় সে রাতে গুলি চলছে, আগুন আর বোমা। ডাক্তারখানাগুলো বন্ধ। তারক প্রাক্তন প্রণয়িনী গৌরীর বাড়িতে পৌঁছল ঃ

"আমার চিঠিগুলো কি রেখে দিয়েছ?" গৌরী উদ্বিগ্ন স্বরে বলল।

"না, আমার বিয়ের দিনই পুড়িয়ে ফেলেছি।"

"ভালই করেছ", হাঁফ ছেড়ে স্নিগ্ধ হয়ে গেল গৌরী। "বউয়ের হাতে পড়লে তোমার সুখ শান্তি চিরকালের মত ঘুচে যেত। শুনেছি নাকি খুব সুন্দরী।"

"গৌরী তোমার মাথাতেও কাঁকর ঢুকেছে।"

"কথা ঘোরালে কি হবে, শুনেছি দারুণ দেখতে। একদিন নিয়ে এসো না।"

"কিন্তু তুমি এখন আমায় একটা পাঁচ লাখ পেনিসিলিন দেবে।"

গৌরীর বাড়ি থেকে বিতাড়িত তারক বোমা, আগুন ও মিলিটারি নামা সেই হামলার রাতে আবার রাস্তায় ঃ

'তারক থমকে দাঁড়িয়েই ছুটে গিয়ে একটা বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে আশ্রয় নিল। চোখ তুলে বারান্দায় জানলার ছাদে আবছা আবছা মুখ দেখতে পেল। মাঠের মাঝখান থেকে গ্যালারিতে সারিবদ্ধ মুখের মত দেখাচ্ছে। সেই মুহূর্তে পর পর দুটো বিস্ফোরণ ঘটল তার প্রায় দুশো গজ দূরে।

"অ্যাই অ্যাই মশাই, পালান। এখানে দাঁড়িয়ে কি কচ্ছেন?" উপর থেকে একজন চীৎকার করে উঠল। তারক মুখ তুলে কাতর স্বরে বলল, "কোথায়? প্যাভিলিয়নে?"

"আরে মশাই আপনাকে দেখতে পেলে ওরা যে এদিকেই ছুটে আসবে, বাড়ি বাড়ি হামলা করবে। পাশের গলিটায় ঢুকে পড়ুন। হাতজোড় করে বলছি পালান।" তারকের পিছনেই জানলার একটা পাল্লা ফাঁক করে একজন বলল।

তারক সেখান থেকে সরে যেতে যেতে হতাশ স্বরে বলল, "কিন্তু সেকেণ্ড ইনিংস আর আমি পাব না।"

এই তারক সিংহ তার গণোরিয়া এবং তা থেকে মুক্ত হবার টাকা সমেত এর পর একজন স্ত্রীলোকের আহ্বানে বস্তিতে তার ঘরে ঢুকল।

উদ্ধৃতি কিঞ্চিৎ বিস্তৃতই হল। কারণ, দ্বাদশব্যক্তির প্রকাশক গত ছয় বছর ধরে জানিয়ে আসছেন প্রথম সংস্করণ বিকোতে পারেননি অর্থাৎ বইটি কম লোকই পড়েছেন।

আমি তারক সিংহ নই। কিন্তু ওর ভাবনা চিন্তায় আমি আছি। ওকে বানিয়েছি সম্পূর্ণতই কল্পনা দ্বারা। আশেপাশে দেখা বা মেশা মানুষদের আদল থেকে ও তৈরী হয়েছে। অভিজ্ঞতার পাল্লার মধ্যে ওকে শক্ত করে ধরে রেখেছি। আমার সব লেখার চরিত্রকেই তাই করি। দ্বাশব্যক্তিরূপে আমি যে গুরুত্বপূর্ণ ক্যাচটি ফেলেছিলাম সেটুকুমাত্র তারক সিংহকে দেওয়া ছাড়া, বাকি সব তারই অর্জিত। আমার কাছ থেকে ও আর যেটুকু পেয়েছে তা হল, আমার প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব এবং উত্তর কলকাতার যে পাড়ায় বংশানুক্রমে প্রায় একশো বছর আছি সেই পরিবেশ। কাহিনীর শুরু নায়কের অভ্যন্তর কেন্দ্র থেকে। তার পর্যবেক্ষণ এবং জগৎ সম্পর্কে চেতনায় ধরা ছাপ থেকে। তারপর গৃহসংসারের প্রতি দায়বোধ। পারিবারিক ব্যাপারটা আমার লেখার অজান্তেই এসে যায়। তারক সিংহকে গণোরিয়া নামক একটি অশ্লীল ব্যাধি দিয়ে তাকে তার ব্যক্তিগত জগতে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে নামিয়ে শুধু অনুসরণ করে গেছি। এটা আমার কাছে অ্যাডভেঞ্চারের মত। যতক্ষণ সে সক্রিয়, ততক্ষণ আমিও নিজের অভ্যন্তরে। আমার অভিজ্ঞতাগুলোকে জড়ো করে অনুসন্ধানে ব্যস্ত থেকেছি। এ জন্য আমার যে-কোন লেখা সম্পূর্ণ করতে সময় লাগে। এক-একটা গল্প তিন-চার মাসও আমাকে খাটিয়েছে। তারক সিংহের মধ্যে গোলমালটা কোথায়? কিভাবে তা এল? এই অনুসন্ধান কাজ যে-কোন শিল্পীরই নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য। এর থেকে প্রাপ্ত ফল পাঠককে জানাবার জন্যই কলম ধরা।

দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পাঠকদের সঙ্গে নৈতিকতা নিয়ে বাদানুবাদই আমি চাই। কিন্তু তাঁরা যদি মনে করেন বিতর্কে নামার মানে হয় না তাহলে ধরে নিই তাঁরা এ ব্যাপারে মাথা ঘামান না। সোজা এবং সহজ প্রশ্ন: ভাল কাজ কাকে বলব? ভাল মানুষ কাকে বলব? ভালত্ব কাকে বলে? এ সম্পর্কে প্রচলিত ধারনাগুলোকে মেরামত করে নিলেই কি চলবে?

অনুসন্ধান করে এগোতে এগোতে চরিত্ররা এক সময় কানাগলির মুখে দাঁড়িয়ে অসহায় হয়ে পড়ে। ওইখানে আমাকেও থামতে হয়। কোন একটা সিদ্ধান্তে এসে এগিয়ে যাবার পথ বাতলে দিতে বাণী উচ্চারণ, আমার পক্ষে এখনো অসাধ্য ব্যাপার। আমি এখনো জানি না টি সিন্‌হা বা অন্যান্যরা ফিল্ডিং খাটার দায় আর ক্যাচ ধরার ব্যর্থতা থেকে মুক্তি পেয়ে কিভাবে টিমে আসবে বা আদৌ আসা সম্ভব কিনা। নৈতিকবোধ মারফত শিল্পী সব সময়ই ব্যক্তিগত আদর্শ-জগৎ খোঁজে, অনেকটা প্রায় দালালের মত। যে জগতে সে নানান নকসা বুনতে পারবে: গোপন গূঢ় ব্যাপারগুলিকে লিখতে পারবে। খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে দেখছি এতে "কাঁকরের" ভূমিকা খুবই বৃহৎ।

এই 'কাঁকর' প্রথম দেখতে পাই, "তৃতীয় রিচার্ড" নাটকে। তার আগে অবশ্য 'ম্যাকবেথ' দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছি এবং তখনই আমার চিন্তা ও লেখা প্রথম বাঁক নেয়। তারপরই 'ফেরারী' (চতুষ্কোণ ১৯৬২) নামে একটি নভেল লিখি যাতে একটি খুন করে গৃহে স্বেচ্ছাবন্দী নায়ক ক্রমশই নেমে আসছে অস্বাভাবিক পর্যায়ে এবং বলতে চেয়েছি. এই লোকটির স্বাভাবিক মানবিক পর্যায়ে উঠে আসা সম্ভব আর একটি হত্যার দ্বারা। 'ফেরারী' এখনো বই হয়নি যেহেতু আমার এই বলতে চাওয়া ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি খুশী নই। যেন একটা সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়ে গেছি। হওয়াটা যেন খুব সোজা ব্যাপার। তারাশঙ্করের 'বিচারক' বিবেকের তাড়নায় অস্থির হয়ে ঈশ্বরের কাছে আশ্রয় নেবার সিদ্ধান্তে পেঁছেছিল। বয়স হোক, তারপর দেখা যাবে কোথায় পেঁছিই। তবে ঈশ্বরে যাবার কোন উপায়ই দেখছি না।

'তৃতীয় রিচার্ড' নাটকে টাওয়ারে ক্ল্যারেন্সকে খুন করতে আসা দুই ঘাতকের একজন দ্বিধাগ্রস্ত অস্থির হয়ে বলেই ফেলে ঃ এই বিবেকই মানুষকে কাপুরুষ করে দেয়। মানুষকে চুরি করতে দেয় না, অপরাধী করে তোলে ; শপথ নিতে দেয় না, বাধা হয় ; মানুষ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে শুতে পারে না, ধরিয়ে দেয়। এটা লজ্জায় রাঙা-মুখ আত্মা যা মানুষের বুকে বিদ্রোহ জাগায়, মানুষের মধ্যে অজস্র বাধা সৃষ্টি করে। সুখে জীবনযাপন করতে চায় যারা, এটা ছাড়াই তারা বাঁচতে চায়।

এই বিবেক, মানুষকে পাশবিক, নির্মম ও জঙ্গীভাবে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রাখে। দ্বিধায় ফেলে দেয়। তার মধ্যে দ্বন্দ্বের সঞ্চার করে। নিরস্ত করে নীতিবিরুদ্ধ কাজ থেকে এবং মহৎ ভাবগুলিকে লেলিয়ে দেয় যার ফলে তাড়া খেয়ে সে ভীত ক্ষিপ্ত হয়ে দৌড়তে থাকে।

দ্বাদশব্যক্তি এই তাড়াখাওয়া ক্ষিপ্ত ভীত মানুষ, যাকে অবশেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে এক সময় বিদ্রোহ করতেই হয় নিজের বিরুদ্ধে। ভূমিষ্ঠকাল থেকেই বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া দয়া. করুণা, ক্ষমা, প্রেম, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বাহিত ভাবগুলি আদৌ কাম্য অথবা নিজের পারিপার্শ্বিকে প্রার্থনীয় কিনা তাই নিয়ে সে চ্যালেঞ্জ জানায়। তখন সে বিরুদ্ধে দাঁড় করায় স্বাভাবিকত্বের বিরোধী যাবতীয় বস্তুকে। খুঁজতে শুরু করে আপনবৃত্তের মধ্যে নিজের শিকড়কে। বৃত্তটি ভেঙ্গে সে বেরিয়ে আসে আর একটি বৃত্তে, তখন সেটিও তাকে ভাঙ্গতে হয়। এবং এই ভাঙ্গাভাঙ্গি থেকে তার রেহাই কোন সময়েই নেই। বিবেক বিভিন্ন কালে নানানভাবে আক্রান্ত হয়েছে। আক্রমণের ভঙ্গিটা তদন্ত ও বর্ণনের বিষয়। ব্যক্তিগত বিদ্রোহ মারফত নিজেকে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যাচাই করে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের দিকে ব্যক্তি এগিয়ে না গেলে সভ্যতাও এগোতে পারে না।

বছর ছয়েক আগে লেখা 'একটি মহাদেশের জন্য' গল্পটি থেকে উদ্ধৃতি দিই :

"মানুষের শ্রেষ্ঠ ভয় মৃত্যু-ভয়, সেটা সামনে এসে দাঁড়ালে তখনই শ্রেষ্ঠ জীবনযাপন সম্ভব।" নীচু স্বরে কথাগুলো বলে মৃগাঙ্ক মুহূর্ত পরেই যোগ করল, "কিন্তু ভয়েরও রকমফের আছে।"

"কি রকম?" পুরু লেন্সের ওধারে চকচক করে উঠল প্রফুল্লর চোখ। মৃগাঙ্ক চুপ।

"আপনি কখনো ভয়ের মুখোমুখি হয়েছেন?" প্রফুল্ল আবার বলল।

অস্পষ্ট স্বরে মৃগাঙ্ক বলল, "আমার সন্তান নেই, হবার সম্ভাবনাও নেই।"

"মৃগাঙ্কবাবু, আপনি তো আবার বিয়ে করতে পারেন।" করবীর সহানুভূতি তার কণ্ঠে ধীরভাবে প্রকাশ হল।

"না।" মৃগাঙ্ক মাথা নেড়ে হাসল।

করবী বলল, "আপনি কি ভয়টাকে জীইয়ে রাখতে চান। কিন্তু এটা তো মোটেই ভয় নয়। মৃত্যুর মত এ ভয় অমোঘ নয়। ইচ্ছে করলেই আপনি এটা কাটিয়ে উঠতে পারেন।"

"মৃগাঙ্কবাবু বোধ হয় মানবিকতার শিকার হয়েছেন।" প্রফুল্ল তার ভারী গলায় লঘু স্বরে হেসে উঠল। "কিন্তু আপনি কি অনুভব করেন না এবার মানবিক বোধগুলোকে তাড়া করে হটাতে হটাতে তার ডায়মেনশানটাকে বাড়িয়ে এমন কিছু জিনিস এর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যাতে মনে হবে আমার মধ্যে গাঢ় উষ্ণ একটা জীবন সময় নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে? এক ধরনের ফিজিক্যাল ভয়ের মধ্যে আমার মনে হয় সব সময় বাস করা উচিত, সেটা পরমাণু বোমাই হোক আর কয়লাভাঙ্গা হাতুড়িই হোক। বেঁচে থাকার এটাই শেষ অবলম্বন।"

গল্পটি লেখা, যখন পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির নামে বেধড়ক মানুষ খুন হচ্ছে। মানুষ খুন করা বাঙালীদের কাছে নতুন ব্যাপার নয়। সরকারী হিসাবে ১৯৭১ এ পশ্চিমবঙ্গে খুন হয়েছে ২,৩৭৩ জন। স্কুল বালক আমি, ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও দেখেছি। তারও বছর তিনেক আগে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ইতস্তত ছড়িয়ে থাকত কঙ্কালসার শব। চাল্লিশের দশক থেকে কত যে 'দিবস' প্রতিবাদ ধর্মঘট এবং তার আনুষঙ্গিক বোমা, গুলি, আগুন, লাঠি এবং মৃত্যু দেখতে হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। ধারাবাহিক 'ফিজিক্যাল ভয়ের' মধ্যে টিঁকে থাকতে থাকতে ব্যক্তিমানসে তথা সমাজের কাঠামোয় মৌল পরিবর্তন ঘটবেই। এবং যা কিছু ঘটেছে তার মধ্যে অন্যতম, দ্বাদশব্যক্তির সংখ্যাবৃদ্ধি।

গল্পের প্রফুল্ল ও করবী প্রৌঢ় দম্পতি। উচ্চশিক্ষিত, একঘেঁয়ে দ্বৈত-জীবন যাপনে দিনগুলি বিস্বাদ শীতল, প্রায় স্থবির। 'গাঢ় উষ্ণ' অনুভব পেতে ওরা ভয়ের মধ্যে বাস করার জন্য নিজেদের কাল্পনিক খুন-খুন খেলা আবিষ্কার করেছে। অবশেষে একটি তরুণীকে ওরা সত্যিই খুন করে বসে।

এই রকমই, কয়েকটি কলেজের মেয়ে দল বেঁধে ঢিলিয়ে তাদের ক্লাসের একটি ছেলেকে গাছ থেকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলে "পিকনিকের অপমৃত্যু" গল্পে। "বারান্দা" উপন্যাসেও শেষে আছে একটি খুন। "শবাগার" গল্পের অন্তে আছে, গভীর রাতে মৃত্যু প্রতীক্ষারত স্বামীর কয়েক হাত দূরে স্ত্রীকে ধর্ষণ উদ্যত লোকটি বলছে ঃ "ও তো মরে যাচ্ছেই। তাহলে আর ভয় কিসের।"

আমার লেখায় গত ছয়-সাত বছর ধরে মৃত্যু প্রবেশ করেছে। হয়তো চারপাশের বীভৎস খুন এবং প্রগাঢ় নপুংসকতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছি, কিংবা ছেচল্লিশে দেখা সাম্প্রদায়িক দলবদ্ধ হত্যা দর্শনের স্মৃতির দ্বারা। মনে গেঁথে আছে – ছাদ থেকে ঝুঁকে দেখছি, বাড়ির পিছনের বস্তিতে একটি মুসলমান পরিবার হাতজোড় করে উপরে তাকিয়ে চারপাশের হিন্দু বাড়ির কাছে জীবন রক্ষা করে দেবার সাহায্য চাইছে। ওদের একটি ছেলের নাম ছিল, কচি। আমার সমবয়সী। ও আমাকে দেখে তখন আশান্বিত ভাবে ফিকে হেসেছিল। কি একটা যেন চেঁচিয়ে বলেও ছিল। পাঁচিল থেকে এক-পা, এক-পা করে পিছিয়ে এসেছিলাম। দূরে শোভাবাজারের কাছে একতলা বাড়ির ছাদে তখন পিটিয়ে মানুষ মারার দৃশ্য স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। জানিনা কচিদের কি ঘটেছিল, আমি কিন্তু রক্ষা পেলাম না। আজও আমি খোঁজ করছি সেদিন কচি চেঁচিয়ে কি বলেছিল।

আরো ছোটবেলায়, বাইরের ঘরে বাবার ছবির নীচে একটি বাঁধানো সার্টিফিকেট ছিল। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের আই এম এস। আমার এক বছর বয়সে মারা যান। সেই সার্টিফিকেটের এক কোণে সই ছিল 'George V'। মা সগর্বে বলতেন, ওটা পঞ্চম জর্জের নিজ হাতের সই। আমার মনে হয়েছিল রাবার স্ট্যাম্প। একদিন কাঁচ খুলে ব্যাপারটা পরীক্ষা করে বুঝলাম ওটা রাবার স্ট্যাম্পই। মা-র জন্য যে করুণাবোধ করেছিলাম, সেটা ক্রমশই সারল্যগ্রস্ত মোহের প্রতি মমতায় পরিবর্তিত হয়।

আর একটা জিনিস বাইরের ঘরে টাঙানো ছিল—মামলার রায়। কাকাদের সঙ্গে ফৌজদারী মামলা হয়। তখন আমি বছর ছয়েকের। বৃদ্ধ কাকা, নাবালক ভাইপোর কাছে আদালতে ক্ষমা চান। বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত সেই খবরটি কেটে বাঁধিয়ে রাখে আমার এক দাদা। উদ্দেশ্য ঃ কাকার ছেলেরা ওটা দেখে যেন নির্যাতন ভোগ করে। ব্যাপারটাকে ঘৃণা করেছি। পাঠশালায় আমাদের সঙ্গে পড়তো, নাম সম্ভবত নির্মল, স্বাস্থ্যবান গৌরকান্তি সুদর্শন। চাকরের সঙ্গে আসতো সোনাগাছি থেকে। দুপুরে চাকর তার জন্য আনতো দুটি বৃহদাকার সন্দেশ ও দুধ। অনেকে তার খাওয়া দেখতো, তার মধ্যে আমিও ছিলাম এবং ঈর্ষা বোধ করতাম। সোনাগাছিরই এক বারাঙ্গনার 'আঁটকৌড়ে' তোলার জন্য পাঠশালা থেকে কয়েক জন ছেলে নিয়ে

যাওয়া হয়, আমিও ছিলাম। খই, কড়ি, সুপারি ইত্যাদির সঙ্গে ছিল একটি দু আনি। আমার প্রথম আয়। দু আনিটা আমাকে অভিভূত করে রেখেছিল বহুদিন। ওটা আমার মেরুদণ্ডে কাঠিন্য এনে দিত, মাটিতে বেশ শক্ত ভাবে পা ফেলতাম। পরে ওটা হারিয়ে যায় বা চুরি যায়। এই সময়েই আমার এক দাদাকে পড়াতে আসতেন তারই সমবয়সী শিবুদা। মা-র মামাতো দাদার ছেলে। শিবুদার উচ্চারণ অবাক করতো। দেখা মানুষদের সঙ্গে এক দমই মিলতো না। কলেজকে 'কালেজ', কটেজকে 'কাতেজ' বলতেন। মনে হতো, আমার গলির বাইরে আর একটা জগৎ আছে সেখানে মানুষেরা অন্য ভাবে চিন্তা করে, কথা বলে। শিবুদা এখন বোধ হয় মেলবোর্নে পড়াচ্ছেন।

ক্লাস সেভেন থেকেই গড়ের মাঠে যাতায়াত। শৈলেন মান্নার ফ্রি-কিক দেখার লোভ সম্বরণের সাধ্য ছিল না। ডেনিস কম্পটন আর হার্ডস্টাফের ব্যাটিং দেখি সাহেবদের এক দিনের একটি ম্যাচে (কোচবিহারের যুবরাজও খেলেন), ইডেনে গাছ তলায় কাত হয়ে শুয়ে। কম্পটনের ফুটবল খেলা তখনকার মোহনবাগান মাঠে গোলের পিছনে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম। 'ভিক্টরি সেলিব্রেশন' ম্যাচ আই এফ এ-র সঙ্গে, খেলায় টিকিট ছিল না। গলিতে গ্যাসবাতি থেকে ব্ল্যাক আউটের ঠুলি তখনো খোলা হয়নি। বিকেলে সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুয়ে দাঁড়াতাম মিলিটারি দেখার জন্য। একদিন চমকে উঠেছিলাম, হাত দশেক দূরে জওহরলাল নেহরুকে দেখে। একটা ছাদখোলা মোটরের পাদানি থেকে নেমে তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে বসলেন। পিছনে ছুটে আসছে কিছু লোক জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে দিতে। জয়পুরিয়া কলেজের উদ্বোধন করতে নেহরু এসেছিলেন। কাছে থেকে সেই প্রথম একজন কান্তিময় পুরুষকে দেখা। বালক রোমাঞ্চ পেয়েছিল। কিন্তু ভাল লাগেনি গান্ধিজীকে। তিনি তখন বেলেঘাটায়। আমরা কংগ্রেস সেবাদলের স্বেচ্ছাসেবক। খাকি হাফপ্যান্ট-শার্ট ও সাদা খদ্দরের টুপি মাথায় ভোরে আমরা লরীতে যেতাম পাহারাদারীর, ভীড় নিয়ন্ত্রণের এবং ফরমাস খাটার জন্য। গান্ধিজীর গায়ে একবার আঙুল ছোঁয়াবার ইচ্ছা হয়েছিল। সকালে বেড়িয়ে ফিরছেন ভেবেছিলাম তখনই ছোঁয়াব। পাশে দাঁড়িয়েও সম্ভব হয়নি, হঠাৎ লজ্জায় পেয়ে বসে। ওঁর গায়ের গন্ধ পাচ্ছিলাম, খুব সাধারণ, মনে না-রাখার মত গন্ধ! মনে নেইও। এখন, প্রায় ত্রিশ বছর পর ইচ্ছা করে আবার গন্ধটা পেতে। বেলেঘাটার সময়ই ১৫ আগস্ট। সেই রাতে কলুটোলা দিয়ে লরীতে যেতে যেতে মুখে ফেনা তুলে চীৎকার করেছি 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই; ভুলোমৎ, ভুলোমাৎ।" কাঁচ তখন 'কাঁকর' হয়ে চেতনায় ঢুকে গেছে। ওটাই ছিল স্কুলে আমার শেষ বছর। পরের বছর ধ্যানচাঁদকে প্রথম ও শেষবারের মত ক্যালকাটা মাঠে খেলতে দেখি। কৈশোরই আমার মানসিকতার একটা ছাঁচ তৈরী করে দেয়।

খেলা আর মাঠ আমার কাছে জ্ঞান হওয়া থেকেই একটা ব্যাপার। এটাই অবশেষে আমার জীবিকা হয়েছে। খেলার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায়—মানুষের দেহের গুরুত্ব, দেহ সঞ্চরণের সৌন্দর্য, পরিশ্রমদ্বারা অধীত গুণাবলীর প্রকাশ যা কখনো কখনো শিল্প আস্বাদনের স্তরে উত্তীর্ণ হয়, এবং সমাজের নিচুতলার মধ্যবিত্ত মানুষের অস্তিত্বের চেহারাটি কেমন, তা আমাকে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দেয়। সুযোগটি আরো বেশি পেয়েছি আমার চাকুরির জন্য। যে দেশে এখনো কুড়ি কোটিরও বেশি মানুষ অর্ধাহারে ধুঁকছে, শতকরা ৭০ জন লিখতে-পড়তে জানে না, সে দেশের শিল্পীর পক্ষে দেশের এই অবস্থাটা কিছুতেই এড়ানো সম্ভব নয়, অবশ্য যদি যোগাযোগ থাকে। "স্ট্রাইকার" বা "কোনি" এই যোগাযোগেরই একটা দিক। এই দিকে রয়েছে হতাশা, আত্মঅবমাননা, নেতিমূলক ভবিষ্যৎ। এখানে আঁকড়ে ধরার জন্য একমাত্র অবশিষ্ট রয়েছে স্বপ্ন। তার মারফৎ কাঙ্ক্ষিত জগতে বিচরণ।

এখন বন্যার মত স্বপ্নরাজি ঢেলে দিচ্ছে রেডিও, রেকর্ড, সস্তার পত্রপত্রিকা, চলচ্চিত্র অর্থাৎ এদেশে যেগুলি গণমাধ্যম। এই স্বপ্নকেই বলা হচ্ছে গণ-সংস্কৃতি। আমাদের বুদ্ধিবাদী সংস্কৃতি একে গ্রহণ করতে নারাজ অথচ রবীন্দ্রনাথের বদলী হিসাবে অন্য কিছু দিতেও পারেনি। শরৎচন্দ্রেরই বদলী শুধু দিয়েছে। এই নতুন গণ-সংস্কৃতি তার অনুভবকে প্রকাশের জন্য নতুন অভিব্যক্তি তৈরী করেছে এবং আরো মারাত্মক, প্রচারের অভূতপূর্ব উপায় মারফৎ সে ফ্যাণ্টাসি ছড়াচ্ছে। আমাদের সভ্যতা সপ্তাহে এত স্বপ্ন উৎপন্ন করে যা যন্ত্রের দ্বারা এক বছরে উৎপাদিত হয়। এর ফলে এমন এক ফ্যাণ্টাসি জীবন গড়ে উঠেছে যা ভারতে অজ্ঞাত ছিল এবং কোটি কোটি মানুষের বাস্তব জীবনে এর উপস্থিতি অতীতের পৌরাণিক বা কাল্পনিক উপস্থিতির থেকে সম্পূর্ণই আলাদা। "অপরাজিত আনন্দ" রচনাটিতে একটি বালকের ফ্যাণ্টাসি ও বাস্তব জীবনের মধ্যে সংঘর্ষের কথা বলার চেষ্টা করেছি। তার দৈহিক অস্তিত্ব যতই বিপন্ন হয়েছে, সে আঁকড়ে ধরেছে স্বপ্নকে, তার মধ্যে বাঁচার আশ্রয় খুঁজেছে। জনগণের অজ্ঞানতা থেকে উত্থিত অবয়বহীন বিপুল ফ্যাণ্টাসি তার সর্বগ্রাসী অশুভতা সস্তা নায়ক ও শিশুসুলভ মহিমা এবং এরই মুখোমুখি রিউম্যাটিক হার্টের রোগী আনন্দের কাল্পনিক বীরত্ব, শৌর্য এবং করুণাকে স্থাপন করে পৌঁছতে চেয়েছি এমন কোনো মূল্যবোধে যা এই ফ্যাণ্টাসিকে নির্মল গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে। "অপরাজিত আনন্দ" এই দিক থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা-মূলক। সংস্কৃতি ব্যাপারটা আমার কাছে—ফ্যাণ্টাসির বিরুদ্ধে মহানতম বোধসম্পন্ন স্বপ্নের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তার থেকে সৃষ্ট নবরূপ।

কোন একটা ব্যাপারে নাড়া খেয়েই বা আগে থেকে সযত্নে প্লট তৈরী করে লিখতে বসা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। যুক্তিবিরোধী, অনুভূতিশীল, মনের

নির্জ্ঞান অংশ লেখকের কাজের জন্য নিজেদের ভূমিকা অবশ্যই পালন করবে। কিন্তু লেখকের সজ্ঞান মনও আছে এবং তা নিষ্ক্রিয় নয়। যখন সমগ্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে একাগ্রভাবে লেখক কাজ করে তখন তার মনের সজ্ঞান অংশটিই দ্বন্দ্ব সংঘাতের মীমাংসা করে, স্মৃতিগুলিকে সংগঠিত করে এবং একই সময়ে তার দুই দিকে চলার চেষ্টাকে রুখে দেয়। এক ভদ্রলোক আমাকে বলেন, সৌমিত্র চাটুজ্জে 'এক্ষণ' পত্রিকার জন্য লেখা চাইতে এক সন্ধ্যায় তার তেলিপাড়া লেনের বাড়িতে এসেছিল। তার ঘর একতলায় রাস্তার দিকে। হিরোকে দেখতে জানলা ভেঙ্গে পড়ার মত অবস্থা হয়। এর এক বছর পর লিখি নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান গল্পটি। তার দু বছর পর সেটিকে আবার লিখি বড় আকারে। এতে চরিত্র অনেকগুলো, প্রত্যেকেরই বিশেষ একটা সমস্যা আছে। গলিতে এক বাড়িতে সিনেমা নায়ক এসেছে, এমন সময় বিদ্যুৎ লোডশেডিং। অন্ধকারেই ওদের সমস্যাগুলো তীব্র হয়ে ঘটনা ঘটালো। ওরা প্রত্যেকে এক একটি অনুভবের চূড়োয় পৌঁছতেই পাড়ায় আলো জ্বলে ওঠে। পুরো ব্যাপারটা দু-তিন ঘন্টার।

লেখার এই সব চরিত্ররা যতক্ষণ না জমাট পারম্পর্যময় একটা অবয়ব পাচ্ছে বা কাহিনীর উদ্দেশ্য এবং রচনার বুনোট সম্পর্কে কিছুটা ধারণা তৈরী হচ্ছে, ততক্ষণ লেখা শুরু করি না।

কি ঘটবে সেই সম্পর্কে অল্প কিছু ধারণা প্রথমে থাকে। এজন্য ছক বেঁধে নিই না, নোটের সাহায্যও নয়। যখন চরিত্ররা জীবন্ত হয়, কথা বলে তখন এমন সব ব্যাপারের প্রত্যাশায় থাকি যা চমকে দেবে, বিব্রত করবে। ওরা বহু সময় নিজেরাই ঘটনা তৈরী করে কাহিনীর পথ বদল করে দেয়। কিন্তু আলগা রাশ সব সময়ই ধরে রাখি, ফলে গন্তব্যচ্যুত হতে দিই না। ওদের কার্যকলাপে যে সংশোধন মনে মনে করতে হয় তাতে অদ্ভুত মজা আছে। তা না করলে জীবনের আসল চেহারাটা মিথ্যা ভোল ধরে দাঁড়ায়।

নিম্নবিত্ত সরল, ভীত, হৃদয়বান ও হামবড়া যে মানুষগুলি "নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থানের" চরিত্র তারা কোন না কোনভাবে যদি আমাকে কৌতূহলী না করতো তাহলে ওদের প্রতি নিশ্চয়ই আকর্ষণ বোধ করতাম না। আমার অধিকাংশ লেখার চরিত্র এসেছে এই গলিটা থেকেই যেহেতু আমি জন্মাবধি আছি এইরকমই এক গলিতে এতেই আমি সড়গড়। এই পরিবেশেই আমার প্রধান চরিত্রদের বাস। বার বার এদের নিয়ে লেখা গল্প থেকেই বেরিয়ে আসে এমন একটি গল্প যাতে আছে আমার অনুভব ও স্পন্দন, যা অন্যগুলির থেকে আলাদা ধরনের। অন্যগুলো তো অধ্যয়নমাত্র। বার বার লেখা হয় একটি সার্থক গল্পের ভূমিকা রূপে। উদ্দেশ্য ও বাসনা নিয়েই লিখি।

ভাল লেখা দুর্ঘটনা ক্রমে হয় না। ওটা বারংবার লেখারই ফল। একই

গল্প বার বার লেখার বাতিক আমার আছে এবং ছাপাতে দেবার আগে আবার ফিরে লিখি। এ সম্পর্কে একশো বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গলার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন" রচনাটি যথাসম্ভব অনুসরণের চেষ্টা করি। বঙ্কিমের বারোটি নিবেদনের পঞ্চমটি হল: "যাহা লিখিবেন তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছুকাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছুকাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য, নাটক, উপন্যাস দুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তারপর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যাহারা সাময়িক সাহিত্যের কার্যে ব্রতী, তাহাদের পক্ষে এই নিয়মরক্ষাটি ঘটিয়া উঠে না। এ জন্য সাময়িক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে ক্ষতিকর।"

বাংলা ভাষায় যে সব রচনা গল্প-উপন্যাস নামে গত দুই দশক ধরে 'বিশেষ সংখ্যা'গুলি উদ্গীরণ করেছে, সেগুলির অধিকাংশেরই পাঠযোগ্যতা থেকে চ্যুত হওয়ার প্রধান কারণ বঙ্কিমই বলে দিয়ে গেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হবে প্রকাশক-বৃন্দের তাৎক্ষণিক লাভের কড়ি সংগ্রহের ইচ্ছা। বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণ-যুগে পুজোসংখ্যাগুলিতে একটিমাত্র উপন্যাসই প্রকাশিত হত। লেখকরা যত্ন নিয়ে লিখতেন। পাঠকরা যত্ন নিয়ে পড়তেন।

নিজের সম্পর্কে এইটুকু বলতে পারি, অযত্নের লেখা কখনো ছাপাতে দিইনি। শুরুতে বছর চারেক শুধু অনুশীলনই করেছি গল্প লেখার। পাইকপাড়ায় শিবশম্ভু পালের বাড়িতে প্রতি রবিবার আমি আর মোহিত চট্টোপাধ্যায় হাজির হতাম। ওরা পড়তো কবিতা, আমি গল্প। চার বছর প্রতি সপ্তাহে একটি করে গল্প লিখে গেছি। পরে ওগুলো ফেলে দিতাম। একদিন ওরা বলল, এটা 'দেশ' পত্রিকায় পাঠান যাক্। আমার নোংরা পাণ্ডুলিপি এবং হাতের লেখা দেখা মাত্রই সম্পাদক যে গল্পটি অবিলম্বে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেবে এ বিষয়ে ওরা নিঃসন্দিগ্ধ, তাই শিবশম্ভু কপি করে দেয় ওর মুক্তার মত হস্তাক্ষরে। বোধহয় বীরেন্দ্র দত্ত গল্পটি 'দেশ' অফিসে দিয়ে আসে। মাস ছয়েক পর ১৯৫৭-র মার্চের সকালে পাইকপাড়া থেকে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে শিবু আমাকে ঘুম থেকে তুলে আনন্দবাজার দেখাল। আগামী সংখ্যায় শ্রীমতি নন্দীর লেখা 'ছাদ' গল্পটি বেরোবে। কুড়ি টাকা পেয়েছিলাম।

'ছাদ'-এর পর পরিচয় পত্রিকায় পাঠাই 'চোরা ঢেউ' গল্পটি। মাসখানেক বাদে এক দুপুরে যাই, মনোনীত হবে কিনা জানতে। কোনো পত্রিকা দপ্তরে এই আমার প্রথম যাওয়া। মিষ্টি হেসে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর হাতের প্রুফটা এগিয়ে ধরলেন। সেটি 'চোরা ঢেউ' এর। কয়েক মাস পর তাঁর চিঠি পেলাম, পুজো সংখ্যার জন্য গল্প চেয়ে। গল্প চাওয়া প্রথম চিঠি আমার জীবনে। চিঠিটি আমার স্যুভেনির হয়ে আছে। লিখেছিলাম 'বেহুলার ভেলা'।

প্রতিবন্ধকতার ব্যাপারটা জানতে চাওয়া হয়েছে। এটা ঘটে দুরকমে। একটা বাইরের, অপরটা শিল্পীর ভিতরের। বাইরের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে মাথা ঘামাই না। যেমন, ধরা যাক্, 'দেশ সাপ্তাহিকে গত ১৯ বছরে আমার তিনটি মাত্র গল্প প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয়ের পর তৃতীয়টি ১২ বছরের ব্যবধানে। কে যেন বহুকাল আগে আমায় বলে, 'দেশ'-এ না লিখলে নাকি লেখক স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। মনে মনে বলেছিলাম—তাই নাকি! কথাটাকে চ্যালেঞ্জের মত মনে হয়েছিল। যখনই লিখতে বসি, মনে রাখি, আমার পাঠক অল্প। 'দেশ' আমার প্রভূত উপকার করেছে অলক্ষ্য অবদান দ্বারা। চ্যালেঞ্জ আমি প্রার্থনা করি। সহজ প্রতিষ্ঠা ঘুণ ধরায়। বস্তুত পত্রিকারা শুধু, কারুর লেখা অবিরত ছাপিয়ে ছাপিয়ে অজ্ঞদের মনে এই ধারণাটা তৈরী করিয়ে দিতে পারে যে এই লোকটি লেখক। আসলে, যে লেখক সে নিজেই হয়ে ওঠে।

•

আর ভিতরের প্রতিবন্ধকতা? লেখকের বড় শত্রু সে নিজে। বহু গূঢ় কথা বলার থাকে যা শুধু ভেবেই যাই কিন্তু লিখতে পারি না। চেতনার কোথায় যেন একটা সেন্সর ব্যবস্থা রয়ে গেছে যা দেহ ও মনের তীব্র ইচ্ছা বা ক্রিয়া কল্পনাকে ছেঁকে নেয়, বহু সত্য প্রকাশে বাধা দেয়, লেখার হাত চেপে ধরে। এ ব্যাপারে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, কোনো ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সংস্থা আমাকে সাহায্য করতে পারে না। ক্যাচ ধরার জন্য আকাশচুম্বী বলের নীচে দাঁড়ানো ফিল্ডারের মত তখন অসহায় নিঃসঙ্গ বোধ করি। আমি জানি, একাকীই আমাকে অভ্যন্তরের প্রতিবন্ধকতা ভাঙতে হবে। সে জন্য দৃকপাতহীন কাঠিন্যে মোড়া যে নির্মম সাহসটুকু দরকার তা আমি এখনো যোগাড় করতে পারিনি। কাঁকরের খচ্খচানি সব সময়ই পাচ্ছি আর দেখছি মতি নন্দীই তাড়া করছে আর এক মতি নন্দীকে, যে ক্ষিপ্ত ভীত হয়ে দৌড়চ্ছে দৌড়চ্ছে আর দৌড়চ্ছে। ॥ ১৩৮৩ ॥

চোরা ঢেউ

মেজ-জেঠিমারা উঠে যাচ্ছে বস্তিতে। আটমাসের ভাড়া বাকি পড়েছিল। বাড়িওলা লোক ভালো তাই আর কোর্টঘর করতে হয়নি। মেজ-জেঠিমা সে কথা স্বীকার করে চোখের জল মুছেছিলেন। ভানুদি, অক্ষয়কাকী, বুল্টা, রাঙাবৌদি আর তার প্রথম বাচ্ছাটা, এমনকি ফেলার মা'র পর্যন্ত কথা চুপ। আজ এগার বচ্ছর পরে মেজ-জেঠিমা এদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, আর এ পাড়ায় ফিরবেন না।

দু'টো ঠেলাগাড়িতে রংচটা তোবড়ানো ট্রাঙ্ক, ছেঁড়া তোশক, তক্তাপোশ, পুরানো জুতো আর ঘুঁটে সামনে রেখে মেজ-জেঠিমার রিক্সাটা কর্পোরেশনের জলমিস্ত্রিদের গর্তবোজানো গলিটায় টালমাটাল হতে হতে হুশ করে বেরিয়ে গেল বড় রাস্তার স্রোতে। যতক্ষণ দেখা গেল, সবাই চুপ। তারপরই যেন বন্ধ ডোবার থসথসে পাঁকে নদর গদর করতে করতে কতকগুলো পাতিহাঁস নেমে পড়ল। তাদের ঠোঁটের খোঁচায় অনেক কালের জমা বাতাস উঠে এল কাদার তল থেকে।

"এই একটা মানুষ ছিল গা। যদ্দিন ছিল হাসিতে খুসিতে কেমন ভরিয়ে রাখত।"

গামছাটা বিড়ের মতো পাকিয়ে মাথায় রাখতে রাখতে রাস্তায় দাঁড়িয়েই নিজের মনে বলল ভানুদি।

সদ্য চাপানো ভাজাটা উনুন থেকে নামিয়ে মেয়েমুখী রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। এখান থেকে রাস্তার লোকের সঙ্গে কথা বলা যায়।

"শুধু হাসিখুশি! মানুষটা কি রকম নরম-সরম ছিল তা বল! আট-বিয়েনি মেয়েমানুষের একদিনের তরেও দেখলুম না কাপড়-চোপড় এধার-ওধার হয়েছে।"

"তাই না তাই। তবু কপাল দ্যাখ্, বুড়ো বয়সে এ কী দুর্গতি ছিল বল্ দিকিন। অমন ডাঁটো ছেলেটা দু'দিনের জ্বরে ধড়ফড়িয়ে ম'লো, চিকিচ্ছেটুকুও কত্তে পারল না। কত্তার চাকরি গেল, তবু মুখের হাসিটি মোছেনি। আবার বস্তিতে ছোটলোকদের মাঝে বাস কত্তে গেল তবু হাসিটি লেগেই আছে।"

চোখ মুছল ভানুদি। হাঁপিয়েও পড়েছে, কেন না গলা চড়িয়ে অতক্ষণ ধরে কথা বলতে আজকাল বুকে টান ধরে।

"কার কথা বলচ গা, মেজবৌয়ের?" দোতলার গরাদভাঙা জানলা দিয়ে খুদীকেলোর মা'র কাঁচাপাকা মাথাটা বেরিয়ে এল।

"তবে আর কার।"

"আহা, ছেলেটা কি দুরন্ত-দুষ্টুই না ছিল। আবার পড়াশুনোতেও তেমনি মাথা। কেলোর যখন পা ভাঙল, রোজ আমায় হাসপাতালে নিয়ে যেত।"

"সেতো যাবেই, অমন মা যার। এই তো, রাঙাবৌয়ের আঁতুড়ে কি করাটাই না করল।"

ভানুদি তার ছোট্ট র‍্যাশনব্যাগটা পাট করে বগলে রাখলো। তখন থেকে জানলায় ঠায় দাঁড়িয়েছিল বুল্টা। চোখাচোখি হতেই ভানুদি বলল, "ক'টা বাজল, এগারটা বেজে গেছে?"

"কব্বে।"

চোখ বুজে নিচের ঠোঁট ওলটাল বুল্টা। ভানুদি চলে যাচ্ছে, তাই গলা তুলেই মিনতি করলঃ "একবার গৌরীকে ডেকে দিয়ো না, ওদের বাড়ি হয়েই তো যাবে।"

"আহা, মেয়ের আবদার দেখ। আমি বুড়ো মাগি এবাড়ি-সেবাড়ি করে বেড়াব, আর তোরা ছুঁড়িরা—চলাফেরায় ন'মাস পোয়াতির আলিস্যি।"

"ধ্যাত, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি যা-তা যে বল।" ভানুদি হেসে চলে যাচ্ছিল, বুল্টা আবার ডাকল।

"হারছড়াটা আছে তো, না বিক্রি হয়ে গেছে? আজকেও একবার দেখো ভানুদি।"

"জ্বালালে বাপু, রোজরোজ এক কথা। কিনবি তো পয়সা নিয়ে চল্।"

"বলেছি তো, পয়সা জমলেই কিনব।"

"আজ বাপু মন-টন ভালো নেই, সোজা রথতলা-ঘাটে গিয়ে ডুব দিয়ে আসব। সন্ধেবেলা মদনমোহনতলাটা ঘুরে আসব তখন পারি তো দেখব।"

এগিয়ে গেল ভানুদি। কাত হয়ে এক চোখে গরাদের ফাঁক দিয়ে যতদূর দেখা যায়, তাকে দেখল বুল্টা। আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে সে ঢোলেদের বাড়ির জানলায়।

"হ্যাঁ যাই, ডুবটা দিয়ে আসিগে। কাচ্ছিলে কি?"

ঢোলেদের ছোটবৌ আধখানা নকশা-তোলা চটের টুকরোটা তুলে দেখাল। এখনো নতুন, তাই বেশি কথা বলে না।

"হ্যাঁ, সেলাই বোনা কী না জানত। মেয়েদের ভিড় তো হরদম লেগেই

ছিল। তোমার ননদকে যখন দেখতে এল, ওই তো সাজিয়ে দিয়েছিল। রতন – ছাব্বিশ নম্বর বাড়ির রত্না গো—সূতিকায় ভুগে ভুগে কাঠিসার হয়েছে এখন, ওর বাসরে গান পর্যন্ত গেয়েছে!"

"গানও জানতেন!"

একটু জোরেই অবাক হল নতুনবৌ। অল্প হেসে সেটুকু উপভোগ করে ভানুদি চলতে সুরু করল।

ফেলার মা শীলেদের বাড়ি কাজ সেরে সেখানেই স্নান করে ফিরছিল.

"এখন গিয়ে উনুনে আগুন দেব। মেয়েটা একজ্বরি হয়ে পড়ে আছে আজ এগারো দিন। ওই দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নেব।"

ফেলার মা ব্যস্ততা দেখালেও ভানুদির থলথলে দেহটা ডোবায়-ভাসা কলসির মতো মন্থর হয়ে থেমে পড়ল।

"তোকে পই পই করে যেতে বলেছে, যাস একদিন।"

"আ পোড়া কপাল, যাব যে তার সময় কোথা!"

"তবে! তখন অত ঠ্যাকার করে বললি কেন, যাব।"

ঝাপটা-দেওয়া বাতাসের মতো ভানুদির কথাগুলো। তারই ধাক্কায় খানিকটা এগিয়ে গেল সে, ফেলার মা'কে ছাড়িয়ে।

"ভালোয়-মন্দয় সুখে-দুখে মানুষটা আমাদের সঙ্গে অ্যাদ্দিন কাটাল। আজ নয় চলে গেছে, তাই বলে সম্বন্ধটুকুও আর রইবে না?"

কথাগুলো বলার সময় পিছনে আর তাকায় নি ভানুদি। অস্বস্তিবোধ করাতে লাগল ফেলার মা। ছেলেটার জ্বর হতে মেজজেঠি একবাটি বার্লি আর একটুকরো মিছরি দিয়েছিল। জিনিশটা সামান্য, কিন্তু অন্তঃকরণটা কতখানি।

"তোরা বস্তিতে থাকিস ঠিক চিনে বার করতে পারবি, আমরা কি আর তা পারব।"

ভানুদি থামল। ডানদিকের পথটা ফেলার মা'র বস্তির দিকে গেছে।

ইতস্তত করে শেষকালে বলে ফেলল ফেলার মা, "চিরটাকাল কোঠাবাড়িতে কাটিয়ে আজ নয় অবস্থার পাকে পড়ে খোলার ঘরে উঠেছে, তাই বলে একদিনেই তো আর বস্তির লোকের মতো ছোট হয়ে যাচ্ছে না। এখন যদি সেখানে যাই লজ্জা পাবে, যাক না আর কিছুদিন।"

মাঝেমাঝে ফেলার মা দামি কথা বলে। পাড়ার যে কেউ, ইস্তক ভানুদি পর্যন্ত, তখন অবাক হয়ে যায়। ভাবনা ধরার মতই কথা। হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে শুরু করল ভানুদি। মানুষ যখন ছোট হয়ে যায় তখন লজ্জা পায়, মানীদের দেখলে নিজেদের হীন মনে করে। মেজবৌকে আরো সময় দিতে হবে কোঠাবাড়ি থেকে বস্তিতে নেমে যাবার ধাক্কাটুকু সামলাতে। ফেলার মা'র বুদ্ধি

আছে। আর থাকবে নাই বা কেন, গতর খাটিয়ে ওকে ছেলেপুলে আর গেঁজেল স্বামীর সংসার চালাতে হয়।

ভাবনা তো নয়, যেন ঢেউ। ধাক্কায় ধাক্কায় ওপরে-ভাসা শ্যাওলার মতো পুরানো বিচারবুদ্ধিকে কিনারে সরিয়ে পরিস্কার করে দেয় মাথাটা। আর তখনই যত আনকোরা ধরণধারণ সেখানে ছায়া ফেলে। শ্যাওলাগুলো পচে শুকিয়ে যায় এক সময়।

মাথাটা গুলিয়ে ওঠে ভানুদির। রোদের তাত বাড়ছে, পিচের রাস্তায় আর পা রাখা যায় না। রাস্তার ধারে ছায়া দেখে সরে গেল।

দুটি মাত্র ঘর। একদিনেই চুনকাম থেকে ধোয়ামোছা পর্যন্ত সেরে ফিটফাট তৈরি হয়ে গেল। পরদিন লরি এসে দাঁড়াল বড় রাস্তার মোড়ে। কুলির মাথায় জিনিসগুলো পেঁছিতে শুরু করল। রান্নাঘর থেকে মেয়েমুখী, ভাঙা জানলা থেকে মাথা বের করে খুদীকেলোর মা, বুল্টা, ঢোলেদের নতুনবৌ—সকলেই দেখল।

নতুন ঝকঝকে সিঙ্গল বেডের দুখানা খাট। পালিশের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে মেয়েমুখীর মনে পড়ল তার বিয়ের দানসামগ্রীর কথা। তিন ছেলেকে নিয়ে সে আজও সেই খাটে শোয়, কিন্তু তখন কী ফাঁকাফাঁকাই না লাগত। বড়ো বড়ো দুটো পাশ বালিশেও ভর্তি হত না খাটটা। সেই বড় বালিশদুটো অনেকগুলো ছানাপোনা বিইয়ে আজ নিজেরা মরে গেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেয়েমুখী, সে নিজেও একদিন মরে যাবে তার সাধ আহ্লাদগুলোর মত।

আয়নাবসানো পাল্লা আকাশের দিকে রেখে আলমারিটা নিয়ে এল কুলিরা। ঝকঝকে পরিষ্কার কাঁচ। দুটো কুলির মাথায় কাঁপতে কাঁপতে স্বচ্ছ একটা দীঘির মতো খুদীকেলোর মা'র মুখটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। অবাক হল গ্রামের মেয়ে খুদীকেলোর মা। একসঙ্গে আকাশ আর মুখ প্রায় চল্লিশ বছর আগে শেষ দেখেছে সে। বিয়ের পরই কলকাতায় চলে আসে। সংসার জমিয়ে বসার মুখেই স্বামী মারা গেল। দেশে আর ফিরল না। আঁটসাট যৌবনটার উপর ভরসা রেখে পান সাজতে বসল ভদ্দরবাবুদের অফিসের ধারে। তারপর তেলেভাজার দোকান। একটা গোরু কিনে উঠিয়ে দিল দোকানটা, আর খুদীকেলোকে পুষ্যি নিল। দুধের ব্যবসা তার এখনো আছে, সেইসঙ্গে সুদী কারবারও ফেঁদেছে। এ পাড়ায় ব্যবসাটা চলে ভালো।

এইমাত্র চল্লিশ বছর আগেকার গ্রামটাকে মনে পড়ল তার। বাঁশবনের দমকা বাতাস শুকনো পাতা উড়িয়ে এনে ফেলত পুকুরের জলে। জলটা কাঁপত। বুকের মধ্যে কেমন-যেন একটা কাঁপুনি লাগল খুদীকেলোর মা'র।

বয়স অনেক হল। মাঝেমাঝে বুকে একটা ফিক ব্যথা ধরে। এবার খুদীকেলোর বিয়ে দিতে হবে। গ্রামের মেয়েরা অল্প বয়সেই বেশ শক্ত-সমর্থ হয়। বিয়ের জন্যে টাকার দরকার। তা সে মন্দ জমায়নি। বন্ধক রেখে অনেকেই আর সোনাদানা ছাড়াতে পারে নি। মেজ বৌয়ের নোয়াটা এখনো কাঠের সিন্দুকের কোনায় পড়ে আছে। খুশি থাকলে সেগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে সে।

দ্রুত মাথাটা টেনে নিতে গিয়ে ঠুকে গেল দু পাশের গরাদে। মেজ বৌয়ের জায়গায়-আসা নতুন ভাড়াটেদের আলমারিটা খুব দামি, যন্ত্রণার মধ্যে এই কথাটাই আগে মনে পড়ল খুদীকেলোর মার। বোধ হয় পয়সাওলা। বিরক্তিতে মুখের ভাঁজগুলো আরও গভীর হয়ে উঠল তার।

চার মাসের-বিয়ে-হওয়া নতুন বৌ জানলা থেকে পিছিয়ে এল একটু। একটা তানপুরা আর হারমোনিয়াম ঠিক তার সামনে দিয়ে কুলির মাথায় চলে গেল, এত সামনে যে হাত বাড়ালে ছোঁয়া যেত। কতদিন যে হারমোনিয়াম ছোঁয়না সে। গরাদ থেকে পিছলে পড়ল নতুন বৌয়ের আঙুলগুলো। মনে পড়ে গেল সরস্বতী পুজোর জলসার ছেলেদের চোখের কাতরানি। গানের স্কুলের আরতিদির বড়দা, কি সুশ্রী ছিমছাম ঠাট্টাটাই না করত। আর একটু আস্কারা দিলে আরতির বৌদি হয়ে যেতে পারত সে। কিন্তু কেমন যেন বাধ-বাধ লাগত। শরীর সম্পর্কে অত্যন্ত শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিল তখন। আর এখন? ঢোলেদের নতুন বৌয়ের গলার কাছে চাপচাপ কান্না ফুলে ওঠে। চারমাসের বৌ রাতে স্বামীকে আটকে রাখতে পারে না বলে কানাকানি শুরু হয়েছে এবাড়ি ও বাড়ি। বিয়ের পরই বাপের বাড়ি থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে হারমোনিয়ামটা। সেটা বাজাতে এখন সংকোচ হয়, ভয় করে। বাজালেই বুঝি সবাই ছুটে আসবে, ডুগডুগির শব্দে বাঁদরনাচ দেখতে যেমন ভিড় জমে জানলার। শুধু ঝাড়মোছ করার সময় যেটুকু ছোঁয়া যায়। তাও আর যাবেনা। কোন কাজে লাগেনা, তাই খদ্দের খোঁজা হচ্ছে।

জমাট কান্নাটা কখন গলে ঝরে পড়ে গেছে। তার বদলে একটা ঝাঁঝালো যন্ত্রণা গরাদধরা আঙুলগুলোয় পাক দিয়ে উঠল নতুন বৌয়ের। হাত বাড়ালেই যখন পাওয়া যেত, তখন কেন তানপুরার তারগুলো পটপট ছিঁড়ে দিল না কিংবা ধাক্কা দিয়ে হারমোনিয়ামটাকেও তো ফেলে দিতে পারত।

দুধরঙা রাজহাঁসের মতো ওরা দুজন ভেসে এল। বুল্টা নিষ্পলক চাউনি ছুঁড়ে দিল ওদের গায়ে। পিছলে নামল তার চোখ ধবধবে পাঞ্জাবি বেয়ে। কতই বা বয়স ছেলেটির। হ্যাঁ, লোকটি নয়, ছেলেটি। আর বৌটি নয়, মেয়েটি। যেন ভাই-বোন। বুল্টার চেয়ে বড়জোর পাঁচ বছরের বড় হয়

যদি মেয়েটি। আটপৌরে শাদা শাড়িটা নতুন নয়, কিন্তু কী পরিষ্কার ভাঁজগুলো। টুকটুকে চটির সঙ্গে আলতাটুকু মিশে গেছে। কমলা-রঙের ব্লাউজ, হাতের ব্যাগটাও কমলা। হাঁটার ঢঙে পাঞ্জাবির হাতায় আছড়াচ্ছে লম্বা বেণীটা।

দু'ধারের বাড়িগুলো দেখতে দেখতে আসছে মেয়েটি। চোখাচোখি হল বুল্টার সঙ্গে, জানলার নিচে লুকিয়ে পড়ল বুল্টা। গালে বোধ হয় হলুদের দাগ লেগে আছে। গালটা কাঁধে ঘষে নিল। টকটক ঘামের গন্ধ। ঘাড় নীচু করে আগাগোড়া ফ্রকটা দেখল সে। রোল্ডগোল্ডের হারটা তিন হপ্তা আগে দেখেছে, দোকানের আলমারিতে। পছন্দ হয়েছিল, তাই সে পয়সা জমাতে শুরু করেছে। রোজই একবার দেখে আসতে ইচ্ছে করে, কিন্তু রাস্তার লোক-গুলোর চাউনি দেখলে ভয় করে। তাছাড়া মা-ও আজকাল বকাবকি করে, এমনকি জানলার ধারে বেশিক্ষণ দাঁড়ালেও। ফ্রকটা ছিঁড়ে গেছে। ফাঁক দিয়ে কোমরের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। চিনেবাদামের দানার মতো তেলতেলা বাদামি চামড়া। মেয়েটির কমলা-ব্লাউজও বাদামি রঙের কিনারে শেষ হয়েছে। রুখু চুলে যেদিন তেল পড়ে, সেদিন বেণীটা ওর সমানই লম্বা হয়। ভানুদিটা বড় অসভ্য-অসভ্য কথা বলতে শুরু করেছে তার শরীরের গড়ন নিয়ে।

মেয়েটির সঙ্গে খুঁটিয়ে নিজেকে যাচাই করে বুল্টা। কিছুতেই সমান বলে মনে হয়না। শাড়িতে-ঢাকা শরীরটা অনেক সুন্দর। তার যদি নিজের একটা শাড়ি থাকত। মার শাড়িটা সে পরে কিন্তু অল্পক্ষণের জন্যে। মাত্র দুখানা শাড়ি মা-র। তাছাড়া পরের শাড়ি পরেও সুখ নেই। ঝকঝকে ট্রাঙ্ক, চামড়ার সুটকেশ, আয়না-লাগানো আলমারি—এর প্রত্যেকটার মধ্যে কতগুলো শাড়ি থাকতে পারে। সেই ভাবনার মাঝেই বুল্টার মনে পড়ল মেয়েটির বয়স, তার থেকে মাত্র চার-পাঁচ বছর বেশি। আর চার-পাঁচ বছর পরে হয়তো তার বিয়ে হবে।

ছেলেটিকে আর একবার দেখার জন্যে বুল্টা জানলায় ঘেঁষে এল। ছুটে এল গৌরী জানলার কাছে। —"এরাই এল, নারে ?"

চুপ করে থাকে বুল্টা।

"নতুন বিয়ে হয়েছে, না রে ?"

বুল্টা চুপ।

"খুব আপ টু-ডেট।"

গৌরী এবার প্রশ্ন করল না। পাকাপাকি সিদ্ধান্ত।

ভারি বয়সটার জন্য ভানুদিই আগ বাড়িয়ে যায়। মেজবৌ যখন প্রথম এল, ভানুদি একেবারে রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছিল। বাঁহাতে ঘোমটা টেনে,

হেসে পিঁড়ি এগিয়ে দিয়েছিল মেজবৌ। এবারেও ভানুদি ভাব-সাব করার মন নিয়ে এগিয়ে গেল। ওইটুকু তো মানুষ, ভাবসাব আর কি! বরং ঘরকন্নার ধরনটুকু দেখে আসবে, আর দরকার বুঝে কিছু উপদেশও দিয়ে দেবে।

কিন্তু থেমে পড়ল ভানুদি সদর দরজাতেই। দরজা জানলা সবেতেই পর্দা। ভিতর থেকে ভেসে-আসা দমকা হাসিটা ভানুদির ভারি বয়সের কিনারে আছড়ে পড়ল। ভিতরে আর যাওয়া হল না।

ভানুদি ফিরে এলেও, ফেলার মা হাজাফাটা আঙুলে পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

এক আশ্চর্য দেশ থেকে যেন ফিরে এসেছে ফেলার মা। খুঁটিয়ে সকলেই তাকে দেখে। ওর কথাতেও আশ্চর্যের ছোঁয়া লেগেছে।

"দুবেলা পোড়া মেজে হাতের নোড়া ছিঁড়ে যাবার দাখিল। তার ওপর মানুষের শরীর, কখন কি হয়। জ্বর-জ্বারি হলে মাইনে কাটা, ট্যাকট্যাক কথা শোনানো, কত আর সহ্য হয়? এবার ট্যা ফোঁ করলে সিধে বলে দেব, রইল তোমার কাজ, দশটাকায় অমন অনেক কাজ জুটবে আমার।"

"এরা বুঝি দশটাকা দেবে, মোটে তো দুটো মানুষ!"

মেয়েমুখী যতখানি অবাক হ'ল ঠিক ততখানি গলা নামিয়ে গম্ভীর সুরে ফেলার মা বলল: "এই দেড়মাস হল বিয়ে হয়েছে। ভালো জায়গায় বাড়ি পেলেই উঠে যাবে। ভালবাসার বিয়ে, বাপ মায়ের অমতে করেছে। বৌকে ঘরে নেবেনা ছেলের বাপ, ছোট জাত কিনা। তাই আলাদা রয়েছে।"

"পোয়াতি?"

"ও মা, বললুম না, মোটে দেড়মাস বিয়ে হয়েছে।" লহমায় রাঙাবৌকে উত্তরদিল ফেলার মা।

"ভালোবাসার বিয়ে কিনা তাই, রাঙাবৌ বলল।"

চোখ বুঁজিয়ে থেমে থেমে বলল খুদী কেলোর মা। ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির বুড়বুড়ি কেটে, আবার বললো সে, "অবস্থা কেমন রে, পয়সা-কড়ি আছে?"

"ওই যা দেখেছ। মেয়ের বাপই সব দিয়েছে।"

"মেয়েটার গায়ে তো তেমন সোনাদানা দেখলুম না।"

চুপ করে বসে-থাকা ভানুদিকে কথা বলানোর জন্যে তার দিকে তাকিয়ে বলল খুদীকেলোর মা। অথচ উত্তর দিল গৌরী।

"আজকাল আর অত গয়না পরে না কেউ। শুধু একজোড়া লিচুকাট বালা হলেই হল।"

গৌরী কথাটা শেষ করল বুল্টার দিকে তাকিয়ে। ফিসফিসিয়ে বুল্টা জিজ্ঞাসা করল, "আজকে কি খোঁপা বেঁধেছিল রে?"

"টেলিফোন-খোঁপা। একদিন তোকে করে দেব।"

"আজকেই দে না।"

বুল্টা আর গৌরী উঠে গেল। ফেলার মা-ও উঠল। কলে জল থাকতেই এখন থেকে তিন বাড়ির কাজ তাকে সারতে হবে।

"কেমন-কেমন যেন, কারো সঙ্গে মেশে না। মেজজেঠি কিন্তু প্রত্যেকের বাড়ি যেত।"

হাঁটুর উপর হাত চেপে উঠে দাঁড়াল মেয়েখুখী। খুদীকেলোর মা'ও উঠল।

"এরা আলাদা জাতের মানুষ গো, দেখছ না কেমন চালচলন, ঠ্যাকার-ঠোকর। মিশতে গেলে ওদের মতো হয়ে মিশতে হবে। দরকার কি বাপু।"

"এইটুকু তো গলি। ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে কেউ চলতে পারে নাকি। ওদের ঠিকই আসতে হবে আমাদের কাছে।"

ভানুদির কথার উত্তর দিয়ে আর কথা বাড়াল না মেয়েমুখী বা খুদীকেলোর মা। চিনেবাদামওয়ালা হাঁক দিয়ে গেছে, তার মানে বেলা গড়াচ্ছে। ওরা দুজন চলে গেল।

ভাবনা তো নয়, যেন ঢেউ। বসে রইল ভানুদি, ঘরটা তারই।

পরদিন সন্ধ্যাটা পুরুষছোঁয়া কিশোরীর মতো শিউরে উঠল। ডোবার জলে দুজোড়া রাজহাঁস পাখার ঝাপটে চারপাশের নোনাধরা দেয়ালে অবাকের পলেস্তরা ধরাল।

সকলেই ভেবেছিল রাঙাবৌয়ের রেডিওতে গান হচ্ছে। ভুল ভাঙল, যখন চিকন আর ভরাট গলায় গান থামিয়ে হেসে উঠল ওরা। পুরুষ আর মেয়ে এক সঙ্গে গলা ছেড়ে গান গাইছে। প্রেমের গান! এ গলিতে মাঝরাতে সিনেমা-ফেরৎ দু একটা গানের কলি হল্লা তুলে মিলিয়ে যায়। তাছাড়া এ গলির জীবন স্রোতশূন্য অচকিত।

গৌরী ছুটে এল বুল্টাদের জানলায়।

"রবীন্দ্রসঙ্গীত!"

"তুই জানিস? শিখিয়ে দিবি?"

অন্ধকার ঘরে হারমোনিয়মটায় আঙুল বোলায় নতুন বৌ। খসখস শব্দ করে ওঠে রীডগুলো। রাত্রে হঠাৎ আলো জ্বাললে আরশোলারা যেমন শব্দ তুলে পালায়। একটা ঝাঁঝালো যন্ত্রণায় সবকটা আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরে রীডগুলো। বোবা হারমোনিয়মটার গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে করে নতুন বৌয়ের।

একগোছা রজনীগন্ধার ডাঁটা হাতে ফিরছিল ফেলার মা। মেয়েমুখী ডেকে জিজ্ঞাসা করল—"পেলে কোথায় গো?"

চোখের ইশারায় দেখিয়ে দিল ফেলার মা কোথা থেকে পেয়েছে। তারপর বলল: "ফেলে দিচ্ছিল। বললুম, এখনো তো তাজা আছে। তা বলল, না তেমন শাদা আর নেই। ধবধবে শাদা না হলে নাকি ঘরে রাখার মানে হয় না।"

ফুলগুলো মেয়েমুখীর মুখের কাছে তুলে ধরল ফেলার মা। একটা বাসি গন্ধ এখনো পাওয়া যায়, ফুলশয্যার পরের দিনও ঘরে যেমন গন্ধ থাকে।

"রোজই ফুল কিনে আনে, না?"

"তা প্রায় রোজই আনে।"

চোখ মটকে ফেলার মা আবার বলল,—"ভালোবাসে খুব কিনা।"

মেয়েমুখীও হাসে। অমন ভালোবাসাবাসি তাদেরও ছিল।

সেদিনই লক্ষ্মীপুজোর শেষে ঠাকুরের পট থেকে বেলফুলের মালাগাছটা তুলে নিল মেয়েমুখী। বড়ো ছেলেটার বুদ্ধি পাকতে শুরু করেছে। সবেতেই ওর কৌতূহল। মালাটা সে বালিশের নিচে লুকিয়ে রাখল।

সকালে ভাত খায় নি বুল্টা, রাতেও না। মা সাধাসাধি করে হার মেনেছে। তবু বুল্টার একরোখ। বাবা শুনে শুকনো হেসে বলেছে: "হবে, হবে, এই তো মোটে ষোলয় পড়ল, এর মধ্যে শাড়ি পরবার দরকার কি।"

"চোখ দিয়ে মেয়েকে দেখে তারপর বলো।"

মার দাঁত কিড়মিড়ানি শুনে চুপ করে গেল বাবা। রাত্রে ঘুম আসেনি বুল্টার। একখানাই ঘর। যত চাপাই হোক সে ঠিক শুনতে পায় বাবার কথা।

"দেখেই বলছি। মেয়ে তো আর রাস্তায় বেরোচ্ছে না। ঘরে ফ্রক পরে থাকবে তাতে লজ্জাটা কি?"

"লজ্জা ওর না তোমার? একখানা শাড়ি কিনে দিতে পার না?"

"দাম জান শাড়ির?"

"তা বলে ন্যাংটো থাকবে?"

'শাড়ি পরালে ও মেয়েকে আর ঘরে রাখতে পারবে? পাত্তর খোঁজার জন্য তারপর তো ঘ্যান ঘ্যান করবে।"

দু-কান চেপে বালিশে নাক ঘষতে শুরু করে বুল্টা, বিয়ের কথায় এই মাঝরাতে তার মুখ লুকোতে ইচ্ছে করছে।

"কত টাকা পাবে হারমোনিয়মটা বিক্রি করে?"

গড়িয়ে স্বামীর বুকের কাছে সরে এল নতুন বৌ। আজ মদ খায় নি।

নতুন বৌয়ের খুশি থাকার কথা। স্বামীর চিবুক টেনে আবার জিজ্ঞাসা করল সে।

"গোটা পঞ্চাশ তো পাব।"

"আমি দেব।"

বিস্ময়টা বুঝতে পারে নতুন বৌ, স্বামীর পাশ ফেরার ধরণ দেখে।

"বাপের বাড়ি থেকে দিয়েছিল বুঝি? কই আমায় তো বলনি।"

'তুমিই বুঝি কোনদিন জানতে চেয়েছ আমার কথা।" স্বামীর বুকে দেহটাকে হিঁচড়িয়ে টেনে তুলল নতুন বৌ। যেমন করেই হোক হারমোনিয়মটা তাকে রাখতেই হবে।

একটু গাঁইগুঁই করল খুদীকেলো, তারপরই চুপ করে গেল ধমক খেয়ে।

"এই ফাল্গুনে বিয়ে তোর দেবই। মামাকে চিঠি দিয়েছি। ওদেরই গাঁয়ের মেয়ে, বেশ ডাগর-ডোগর, এই তেরোয় পড়েছে। আর আমি তোকে রেঁধে খাওয়াতে পারব না।"

"হোটেলে খাব।"

"হ্যাঁ, পয়সা খরচ করে রাতটাও বাইরে কাটিয়ে আসবি। এসব মতলব করেছিস কি ঝেঁটিয়ে, ধুধুবুড়ি ছুটিয়ে দেব।"

খুদীকেলোর মার কথাগুলো শক্ত কব্জিটার মতোই শক্ত-শক্ত। শুধু বৌ নয়, দুশো টাকা পণও আসবে। দিনকাল খারাপ পড়েছে। জিনিশপত্রের দাম বাড়ছে, মানুষজনের চাকরি যাচ্ছে, ধুমসো ছেলেগুলো ঘরে বসে। তার কাঠের, সিন্দুকও ভরে উঠছে। তবু দিনকাল খারাপ আসছে। গলিতে নতুন মানুষ আসছে, সঙ্গে আছে নতুন ঢং-ঢাং। গলির মানুষগুলোতেই নতুন রং ধরেছে। বুল্টার মা বলে রেখেছিল, বুল্টার বিয়ের সময় শ পাঁচেক টাকা ধার নেবে। এখন আবার শুনছে উল্টোকথা। দেখতে যখন ভালোই তখন আর টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়ে কেন। যদি কোন ছেলের চোখে ধরে, সেধে এসে ঘরে তুলে নিয়ে যাবে। ভালোবাসার বিয়ে দেবে মেয়ের, বুল্টার মা। রাঙাবৌ ব্যাঙ্কে টাকা জমাবে এবার থেকে। 'ওদের' টাকা নাকি ব্যাঙ্কেই থাকে। শুনে অবাক হয়েছিল সকলেই। রাঙাবৌ এখন ইংরিজি-সই মক্‌সো করা শুরু করেছে। গল্পকথার মতো শোনায়। মেয়েছেলে সই দেবে আর টাকা উঠে আসবে। এরপর সকলেই টাকা জমাতে শুরু করুক। ভাবতেই মাথা গরম হয়ে ওঠে খুদীকেলোর মা'র! আপদ যত উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। যেখানে যাবার সেখানেই যাক না। এ পোড়াগলিকে চানকে কি গুষ্টির উদ্ধার হবে!

আপদরা নাকি চলে যাবে, খবরটা দিল ফেলার মা। বাসন কেনার জন্যে

তাপের শীর্ষে

"নাড়ু তোর মা মরে গেছে।"

সন্তোষ একটু নুয়ে কথাটা বলল। নাড়ু তাকিয়ে ছিল বাসটার দিকে। এইমাত্র যে ছেলেটা উঠল, একটু আগেই সে নাড়ুকে জিভ দেখিয়েছিল। নাড়ু দোতলা বাসটার দিকে তাই তাকিয়েছিল।

হাতের থলিটায় কাপড় আছে, মা আনতে বলেছিল। পেয়ারা আছে, মা খেতে ভালোবাসে। থলিটা দুহাতে বুকের কাছে আঁকড়ে নাড়ু তাকিয়ে রইল বাবার দিকে। চোখ সরিয়ে নিল সন্তোষ। আকাশটা ঘোলাটে। আজকেও বৃষ্টি হবে। ফুটপাথটা ন্যাড়া। নীলরতন সরকার হাসপাতালের দেয়াল ঘেঁসে ঘাস উঠেছে।

ঘাস মাড়িয়ে সন্তোষ হাঁটছিল। পিছনে নাড়ু আসছে। সন্তোষ ঘুরে দাঁড়াল।

"তুই আর আসিস নি, এখানেই থাক। আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি।"

"কেন?"

"ব্যবস্থা করতে হবে তো। সার্টিফিকেট না দিলে কিছুই তো করা যাবে না।"

নাড়ু দাঁড়িয়ে থাকল। বাবা চলে যাচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ডানদিকের ঘরের কোণের বেডে মা আছে। সিঁড়ির পাশেই খাঁচার মতো লিফট নেমে এল। কখনো সে ওঠেনি। দরজা খোলার সময় ছড়াৎ শব্দ হল। মাথায় রুমাল-বাঁধা মেয়েলোকটা লিফ্‌ট থেকে বেরোবার সময় তাকিয়ে গেল। ও কি কমলাদির মতো বিধবা? কমলাদি মাছ খায় না, কমলাদি মার কাছে এসে রোজ দুপুরে গল্প করত। একদিন কাঁদছিল মার কোলে মুখ গুঁজে। দুটো লোক লিফ্‌টে ঢুকল। চৌকো লোহাটা দেয়াল বেয়ে নামতে নামতে থামল। তারের দড়ি কাঁপছে। ওপর থেকে লিফ্‌টের দরজা খোলার শব্দ এল।

নাড়ু হাসপাতালের গেট পার হয়ে ফুটপাথে দাঁড়াল। বাস যাচ্ছে।

দোতলা থেকে একটা লোক থুথু ফেলল। রাস্তার গর্তে এখনো বৃষ্টির জল জমে। গর্তের চারপাশে খোয়া-ছড়ানো। ট্যাক্সিটা গর্ত মাড়িয়ে গেল। খোয়া ছিটকে এসে গায়ে লাগতে পারত।

নাড়ুর ঠোঁট কাঁপতে শুরু করল। আস্তে আস্তে সরে এসে গেটে ঠেশ দিয়ে দাঁড়াল। থলিটা বুকে চেপে ধরে কুঁজো হয়ে নাড়ু কাঁদল। কাঁদল অনেকক্ষণ ধরে। শুধু একটি বুড়ি যেতে যেতে ওকে দেখে একটুক্ষণ দাঁড়াল, কাছে আসার জন্য পা বাড়িয়েও কি ভেবে মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল। নাড়ু জোরে কাঁদে নি। হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছিল। পিঠটা অল্প অল্প কাঁপছিল। খুব কাছে কেউ এলে শুনতে পেত গুনগুন গানের মতো একটা সুর। ওর পিছন দিয়ে অনেক মানুষ চলে গেল। কেউ কেউ তাকিয়েছিল। শুধু বুড়িটা একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে চলে গেছল। অনেকক্ষণ পরে জামার হাতায় চোখ মুছে নাড়ু দোতলা বাস দেখতে লাগল।

অল্পবয়সী ডাক্তার দুঃখ জানালেন। বললেন, "আমরা চেষ্টার ত্রুটি করি নি। হঠাৎ পরশু থেকে—আপনি তো দেখেই গেছলেন। কাল থেকে গ্লুকোজ স্যালাইন চলছিল।" এরপর ডাক্তারবাবু বলার মতো কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে গেলেন। সন্তোষের মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে আবার বললেন, "সার্টিফিকেট আমি এখুনি দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি।"

সন্তোষ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। পর্দা সরিয়ে একটি নার্স উঁকি দিয়ে গেল। ওষুধের গন্ধ আসছে। ছপছপ শব্দ হচ্ছে বারান্দায়। জমাদার দড়িবাঁধা সোয়াবটা ছুঁড়ে ছুঁড়ে নিশ্চয় বারান্দা সাফ করছে। ফরফর করে উড়ল টেবিলের কাগজ। ডাক্তারবাবু কাঁচের ড্যালাটা নিয়ে লোফালুফি করছেন।

বারান্দায় বেরিয়ে এল সন্তোষ। থুথু ফেলল কাঠগুঁড়োর বাক্সে। বারান্দার বাঁ-ধারে দুটো কেবিন। পর্দা ঝুলছে। খাটে বসে গল্প করছে একটি জোয়ান। সিঁদুরপরা একটি মেয়ে কমলালেবু ছাড়াচ্ছে। ডানদিকে অনেক দরজা। দরজায় পর্দা নেই। সারি সারি খাট। খাটের ধারে ধারে মানুষ। এখন ভিজিটিং আওয়ার। এটা মেয়েদের ওয়ার্ড। সেই বাচ্চা মেয়েটির পায়ে-বাঁধা ভারি লোহাটা এখনো ঝোলানো রয়েছে। অনেকদিন ও এখানে আছে। হাউ হাউ করে একদিন কেঁদেছিল বাড়ি যাবার জন্য। ও ভালো হয়ে যাবে একদিন। একদিন বাড়ি ফিরে যাবে।

হাসপাতালের মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছে। একপক্ষ বুঝি গোল দিল। সন্তোষ মুখ ফিরিয়ে একবার তাকাল। মাঠটাকে ঘিরে থোকা-থোকা মানুষ। যেন কালো পিঁপড়ের সারি। দেখতে বেশ লাগে। সেই বইওয়ালাটা আসছে। ও রোজ একগাদা পত্রিকা সঙ্গে করে আনে। পা-ভাঙা মেয়েটিকে

একখানা বই কিনে দিলে কেমন হয়। পকেটে হাত দিল সন্তোষ। খড়খড় করল চারখানা দশটাকার নোট।

বুকে হাত জড়ো করে মেয়েটি শুয়ে আছে। সন্তোষ পাশে এসে দাঁড়াল। তাকাল মেয়েটি। অবাক হয়ে গেছে।

"কেমন আছ ?"

"ভালো।"

"বাড়ি থেকে কেউ আসে নি ?"

"এসেছিল, চলে গেছে।"

সন্তোষ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। মুখ ফিরিয়ে নিল মেয়েটি।

একে বই কিনে দিয়ে কি লাভ। একে খুশি করে কি আনন্দ পাব! অন্যের আনন্দ দেখে আমার কি দরকার মিটবে! আমার তো কিছুর দরকার নেই। সন্তোষ পাশের বেডে তাকাল। বেডটা খালি। লাল কম্বলে ঢাকা। হয়তো আজকেই কেউ এসে যাবে। কোণের সেই হাসিখুশি ফর্সা মেয়েটির নাকে অক্সিজেনের নল। আজ সকালে নিশ্চয় অপারেশন হয়েছে। ওকে জড়িয়ে ধরে নিশ্চয় ওর মা। উনি কাঁদছেন। মেয়ের বিপদ কেটে গেছে তাই কাঁদছেন। বমি করছে মেয়েটি। আঁচল দিয়ে মা মুখ মুছিয়ে দিলেন। ওই ছেলেটি কালকেও বোকার মতো বসেছিল। মেয়েটিকে কাল বিরক্ত দেখেছিলুম। আজও বিরক্ত করতে এসেছে। কেন আসে!

সন্তোষ পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল। সকলে ওর দিকে তাকাল, মেয়েটি কথা বলছে। কথা বলা ওর এখন উচিত নয়। চোখটা ভিজে ভিজে, কাঁদছে, বোধহয় কষ্ট হচ্ছে। নিচু হয়ে সন্তোষ ছেলেটিকে বলল, "কথা বলতে দিচ্ছেন কেন, তাতে বমি আরো বাড়বে।"

"বলা তো হয়েছে, কথা শুনছে না।"

চুপ করে মেয়েটির মুখের দিকে ছেলেটি তাকিয়ে বসে রইল। ছেলেমানুষ। এখনো সংসারের আঁচ গায়ে লাগে নি। ও চিরকাল হয়তো এমনি করে বোকার মতো তাকিয়ে থাকবে। সন্তোষ পিছন দিকে তাকাল। পাশে তাকাল। সব কটা বেডের মানুষ তার দিকে তাকিয়ে। ওরা কেন তাকিয়ে রয়েছে তা জানি। ওরা ফিসফিস করে কি বলছে তাও জানি। ওরা কৌতূহলী হয়ে পড়েছে। আমি এখনো কেন কাঁদছি না। ওরা খুশি হবে কাঁদলে। কিন্তু কেন কাঁদবো!

ঘরের আর-এক কোণের সেই বেডটা লাল পর্দায় ঢাকা। সন্তোষ পর্দার পাশে দাঁড়াল। সারা ঘরের মানুষ এখন আমায় দেখছে। একটু ঝুঁকে উঁকি দিলেই পর্দার ভিতরটা দেখা যাবে। কিন্তু কি দেখব! ওই মানুষগুলো রোজ আমায় আসতে দেখেছে, দিনের পর দিন। তবু ওরা আমায় দেখছে।

ওরা নতুন কিছু একটা আমার মধ্যে দেখতে চায়। কিন্তু আমি কি দেখাব? সেই মানুষটা আছে কি? হাসপাতালে আসার আগের মানুষটা! ও আগে হাসত, রাগ করত, রাগ ভাঙাবার জন্য অপেক্ষা করত। তারপর দিনের পর দিন বিছানায় শুয়ে থেকে থেকে স্বভাব বদলে গেল, চেহারা বদলে গেল। তার মানেই ও নতুন হল কি? নতুন কথাটার মানে কি? ওকে আগে দিনরাত কাছে পেতুম, কিন্তু হাসপাতালে মাত্র দুঘণ্টার সম্পর্ক তৈরি হল। বাঁধা সময়ে রোজ একধরনের কথা বলা আর শোনা। ক্লান্ত হয়ে পড়তুম। হাঁপিয়ে উঠতুম, ভালো লাগত না আর আসতে। আজ সেই একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পেলুম। তবে কেন কাঁদব? ওদের আশা পূরণ করতে কেন কষ্ট করব!

উঁকি দিলেই পর্দার ভিতরটা দেখা যায়। সন্তোষ না দেখে বারান্দায় বেরিয়ে এল। এবার হাঙ্গামা অনেক। আগে সার্টিফিকেটটা নিতে হবে, শ্মশানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। কলকাতায় চেনাশোনা কেউ নেই। কারুর সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

"সবই ভগবানের হাত।"

চমকে উঠল সন্তোষ। বইওয়ালা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। পাশ দিয়ে যাবার সময় আচমকা কথাটা বলেছে।

"হ্যাঁ, চেষ্টার তো ত্রুটি হয় নি। বহুদিন ভুগল।"

"কি হয়েছিল?"

"টিউমার, দুবার অপারেশন হয়েছে ধকলটা সামলাতে পারল না।"

সন্তোষ বারান্দার বাইরে তাকাল। পুরো বারান্দাটা জাল দিয়ে ঘেরা। কেন, রোগীরা যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে! মরাটা কি ভগবানের হাতে? হ্যাঁ তো বললুম, না ভেবেই বললুম। অমন না ভেবে আমরা অনেক কথাই বলি! আমার এখন মুখের ভাব বিষণ্ণ করা উচিত। নয়তো লোকটা কিছু মনে করতে পারে। কিন্তু যদি না করি তাহলে কি হয়। আজ বৃষ্টি হবে। না হলেই ভালো! কটা বাজল। যত রাত হবে ততই অসুবিধে! কলকাতাটাকে তো দিনের বেলাতেই ধাঁধাঁ মনে হয়।

"বাড়িতে আর কে আছে?"

"কেউ না! শুধু একটা বছর চারেকের বাচ্চা!"

মুখের চুকচুকানি শব্দটা শুনতে বেশ লাগে! লোকটা সত্যিই বেশ ভালো! একটা বই কিনে সাহায্য করা উচিত। বইওয়ালার হাত থেকে সন্তোষ একটা পত্রিকা তুলতে যাচ্ছিল! খপ করে বইওয়ালা কেড়ে নিল! সন্তোষের হাত দুটো ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "শান্ত হোন! ছেলেদের মুখ চেয়ে বুক বাঁধুন! অস্থির হলে কি চলে!"

নাড়ুটা এখনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ঠিকই বলেছে বইওয়ালা। ছোট

ছেলে, ওকে এখনই খাইয়ে দেওয়া উচিত! হাঙ্গামা চুকতে কটা বাজবে কে জানে!

"কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না! কলকাতায় চেনাশোনা তো কেউ নেই।"

"চারটে লোকও নেই?"

"না, কারখানায় ছুটি হয়ে গেছে। এখন আর সেখানেও কাউকে পাব না।"

"তাহলে তো সৎকার-সমিতিতে খবর দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

লোকটা ফিরিস্তি দিয়ে যাচ্ছে এরপর করণীয় কাজগুলোর। অনেক কাজ। কিন্তু এখন যদি এখান থেকে চলে যাই তাহলে কি হয়। ওরা অপেক্ষা করবে, আমার বাড়িতে খবর দেবে। না এলে গাদায় ফেলে দেবে।

"সঙ্গে টাকা আছে তো?"

"আছে।"

"আর দেরি করবেন না।"

"হ্যাঁ যাচ্ছি।"

হাঁটতে শুরু করল সন্তোষ। কালকেই বুঝেছিলুম ও আর বাঁচবে না। আজ পোস্টাপিস থেকে টাকা তুলে রেখেছি। সেভিংসের লোকটা খচ্চর। একবারে কোনো সময়েই সই মেলে না। আজ মিলে গেছে। বোধহয় ওর মেজাজ ভালো ছিল। বইওয়ালা জিজ্ঞেস করল সঙ্গে টাকা আছে কি না। যদি বলতুম নেই, তাহাল কি ও দিত! নিশ্চয় দিতে পারত না। ও কি আমায় আশ্বস্ত করতে চাইল? নাকি পরে এক সময় এ কথা বলেছি বলে নিজেকে বিবেকবান ঠাউরে আনন্দ পাবে!

"বাবা।"

"তুই এখানে এলি কেন?"

সিঁড়ির শেষ ধাপে সন্তোষ দাঁড়িয়ে। দরোয়ান তাকিয়ে আছে, ওর একটা হাত নাড়ুর কাঁধে। সান্ত্বনা দিচ্ছিল। অথচ ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছিল।

"আমি ওপরে যাব।"

"কেন?"

মাকে দেখতে চায় ছেলেটা। দেখে কি করবে। চোখ উলটে আছে হয়তো, কিংবা জিভটা ঝুলে আছে। ঠোঁট চাটা অভ্যেস। রেগে গিয়ে যখন কথা বলতে পারে না তখন ঠোঁট চাটে। মরার সময় হয়তো রেগে উঠেছিল। বুক পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল তো! কিন্তু রাগার সঙ্গে বুকের কি সম্পর্ক, সে তো মাথার।

"বাবা, দেখতে যাব।"

"কি দেখবি? দেখার আর আছে কি!"

নাড়ুর কাঁধে হাত রেখে সন্তোষ হাঁটতে শুরু করল। অন্ধকার হয়ে আসছে।

যারা রোগী দেখতে এসেছিল ফিরে যাচ্ছে। নার্সেস কোয়ার্টারে কেউ গান গাইছে। আউটডোরের দরজায় কাতরাচ্ছে মাঝ-বয়সী এক সধবা। হাতের তিনটে আঙুল ছেঁচে গেছে।

ট্রামরাস্তা পার হয়ে ওরা তিনটে হোটেল পেল।

"নাড়ু কিছু খেয়ে নিবি নাকি?"

"খিদে নেই।"

"পরে পাবে, খেয়ে নিলে হত।"

"না খিদে নেই।"

"নাড়ু তুই এখানে থাক। আমি সৎকার-সমিতির অফিসে যাচ্ছি, এখুনি ফিরব।" হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে সন্তোষ কথাগুলো বলল।

"এক প্যাকেট সিগারেট কিনি।"

"মা তোমায় সিগারেট খেতে বারণ করেছিল।"

থমকে পড়ল সন্তোষ। ছেলেটা মনে করে রেখেছে। ওর সামনেই একদিন কথা হয়েছিল বটে। মরার সঙ্গে স্মৃতির একটা যোগ আছে। পুরনো মানেই তো মৃত। স্মৃতিও তাই। স্মৃতি জ্যান্ত মানুষকে মেরে ফেলে। কি দরকার পুরনো কথা মনে রাখার। রাত্রে অপারেশন হয়েছিল। সারারাত গেটে বসেছিলুম। ভোরবেলায় দরোয়ানকে বলেছিলুম একটু খবর এনে দিতে। ও যেতে রাজি হয়নি। ঝগড়া হয়েছিল। আমাকে আটকেছিল, ভেতরে যেতে দেয় নি। গালাগালি দিয়েছিলুম। কিন্তু এখন ও আর আমায় আটকাবে না। এখন আর ওর ওপর রাগ নেই. কিন্তু সেদিন অসম্ভব রেগে হাঁটতে শুরু করি। রাস্তায় তখন জল দিচ্ছিল। দাঁড়ালুম, পাশে ছিল সিগারেটের দোকান। সাড়ে তিনবছর পর খেলুম পরপর তিনটে।

"সিকিটা পালটে দাও ভাই।"

প্যাকেট খুলতে খুলতে সন্তোষ পিছনে তাকাল। অনেক দূরে নাড়ু দাঁড়িয়ে। এইদিকেই তাকিয়ে রয়েছে। বইয়ের ছেঁড়া পাতা জুড়তে মোড়কের কাগজটা কি কাজে লাগবে? লেখাপড়ায় ছেলেটা ভালো। কিন্তু এখনো কাঁদল না তো?

দড়ির আগুনে সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিল। বুকের অসুখ এখনো সারে নি। বেশি জোরে টান দেওয়া ঠিক নয়। ওর ভয় ছিল সিগারেট খেলে আমি শিগগিরই মরে যাব। কিন্তু ওই আগে মরল। বেঁচে থাকতে খাই নি, আমার নিজের মরার ভয়ে না ওর কথা রাখতে।

"বাবা।"

"তুই এখানে দাঁড়িয়ে থাক! আমার বেশি দেরি হবে না।"

জোরে জোরে টান দিয়ে সন্তোয় সিগারেটটা ফেলে দিল। বাসটা এসে গেছে। "তুই থাক, কেমন।"

আকাশটা মেঘলা। মাথা নিচু করে নাড়ু আস্তে আস্তে হাঁটল। মা বলত, নাড়ু বৃষ্টি হবে, ইস্কুল যাস নি। বলত, তোর বাবার গেঞ্জিটা এখনো শুকোল না, এসে রাগ করবে। তোর বাবা পোস্তর বড়া খেতে ভালোবাসে, লক্ষ্মীটি চট করে কানাইয়ের দোকান থেকে ঘুরে আয়।

ইটের টুকরোটায় শট মারল নাড়ু, রাস্তার মাঝখানে গিয়ে পড়ল। ওটা যদি ট্রাম-লাইনের ওপর পড়ত তাহলে ট্রামটা গুঁড়িয়ে দিয়ে যেত। ট্রামের তার থেকে অমন বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠে কেন! মা বলেছিল আকাশের বিদ্যুতকে মেশিনে জমা করে রাখে। তাই থেকে খরচ হয়। বিদ্যুৎ চমকায় শুধু বর্ষাকালে, তাও মাঝে মাঝে। ওইটুকুতে সারা বছর এত আলো হয় কি করে? সেই ছেলেটা আমায় জিভ ভেঙিয়ে গেছে। ওর মা যদি জানতে পারে তাহলে কি বকবে?

মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে নাড়ু হাসপাতালের মধ্যে ঢুকল। চুপচাপ। থমথমে। আউটডোরে গল্প করছে দুটি ছাত্র। সধবাটির ছেঁচা আঙুলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে কম্পাউণ্ডার। একটা বেড়াল ঢুকল। গোড়ালি ঠুকল একজন। বেড়ালটা বেরিয়ে গেল। হাফপ্যাণ্ট-পরা ওয়ার্ডবয় দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঝিমোচ্ছে। এই বাড়িটা ছাড়িয়ে আর একটা রাস্তা। নাড়ু রাস্তায় নামল।

গন্ধ আসছে। ওষুধের গন্ধ। কুনীপিসীর ছেলে হবার সময় এমন গন্ধের ওষুধ এসেছিল। মা দু-রাত্তির ওদের বাড়ি ছিল। কুনীপিসী মরে গেল, সবাই কাঁদল, মাও কাঁদল। কুনীপিসী বাবার বোন নয়, পাশের বাড়িতে থাকে। বাবা কাঁদল না।

"এস খোকন, এখানে বোসো।"

দারোয়ান নাড়ুকে ডাকল। গুটিগুটি ওর পাশে নাড়ু দাঁড়াল। ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে, চুপ করে বসে রইল দারোয়ান। ছড়াৎ করে লিফ্টের দরজা খুলল। খটখট করে চলে গেল এক ডাক্তার।

"ওপরে যাবে, দেখতে?"

চুপ করে রইল নাড়ু।

"যাও।"

দারোয়ান পিঠে হাত রেখে চাপ দিল। পায়ে-পায়ে নাড়ু সিঁড়ির দিকে এগোল। জুতোর শব্দ হচ্ছে ঠিক ওই ডাক্তারের মতো। জুতো কিনতে যাবার সময় মা বলে দিয়েছিল ফিতেওয়ালা কালো রঙের জুতো কিনতে। বাবা মার জন্য একটা চটি কিনেছিল, কালো রঙের।

"খোকা দাঁড়াও," উঠে এল দারোয়ান। "লিফ্‌টে চড়বে ?"

নাড়ু ঘাড় কাত করল।

"এই জগদীশ খোকাকে দোতলায় নিয়ে যা।"

নাড়ু লিফ্‌টের মধ্যে ঢুকল। বোতাম টিপতেই 'গোঁওও' শব্দ উঠল। ঝাঁকুনি দিয়ে লিফ্‌ট উঠতে শুরু করল। দারোয়ান হাসছে। ওর জুতো, হাঁটু পেট, মাথা দেয়ালে ঢাকা পড়ে গেল। বুক শিরশির করছে। সেই চৌকো লোহাটা এখন নিচে নেমে আসছে। পেটের নিচে ব্যথা করছে। মা রোজ রাত্তিরে ঘুম থেকে তুলে নর্দমায় বসিয়ে দিত। মা ধরে দাঁড়িয়ে থাকত, নইলে ঘুমের ঘোরে পড়ে যেতুম।

লিফ্‌ট থামতে নাড়ু বেরিয়ে এল। লিফ্‌ট আবার নিচে নেমে গেল। চৌকো লোহাটা ওপরে উঠতে উঠতে থেমে গেল। লোহার দড়িটা কাঁপছে। যদি দড়িটা ছেঁড়ে! নাড়ুর বুক কাঁপল, বাজপড়ার শব্দে এমন করে বুক কাঁপত। ছুটে মাকে জড়িয়ে ধরতুম।

বারান্দা ধরে নাড়ু হাঁটতে শুরু করল। কেবিনে একটা লোক খাটে শুয়ে বই পড়ছে। বারান্দাটা জাল দিয়ে ঘেরা। পাখিরা আসতে পারবে না। জুতোর শব্দ হচ্ছে। রোগীরা ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। একেবারে শেষের দরজায় নাড়ু দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে চেয়ারে বসে নার্স কি লিখছিল। ওকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েও আবার বসে পড়ল।

আঙুলে ভর দিয়ে নাড়ু ঘরে ঢুকল। সবাই দেখছে। মাথা নিচু করে লাল পর্দা-ঘেরা খাটের পাশে নাড়ু দাঁড়াল। এবার কেউ দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু রোগীদের কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

"এইটিই তো আসত বাপের সঙ্গে।"

"হ্যাঁ। বড় ছেলে, আর-একটি আছে।"

"তবু রক্ষে, মাত্র দুটি। আমার মতো হলে বাপের অবস্থাটা ভাবুন তো !"

"ভাবব আর কি, আবার বিয়ে করবে।"

"ইস্‌, অতই সোজা !"

শাদা চাদরে মুখ পর্যন্ত ঢাকা। নাড়ু সাবধানে চাদরটা গলা পর্যন্ত নামিয়ে দিল। চোখ বোজানো। মুখটা একটু ফাঁক করা। চোখের কোলে কালি। নাড়ু ঝুঁকে দাঁড়াল, চোখের পাতা যেন ভিজে-ভিজে। কেঁদেছিল।

চাদর দিয়ে নাড়ু চোখ মুছিয়ে দিল। কপালটা চওড়া দেখাচ্ছে। চুলগুলো পাতলা হয়ে গেছে। জট পড়েছে। কমলাদি মাঝে মাঝে খোঁপা বেঁধে দিত, এখন যদি আঁচড়ে দি তাহলে কি নার্স এসে আমায় বকবে ?

খাটের লাগোয়া ছোট্ট আলমারিটা নাড়ু খুলল। চিরুনি, সিঁদুর-কৌটো,

আয়না, সাবান, মাজন, তেলের শিশি। সবগুলো একবার হাতে করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে কান পাতল, নার্সের জুতোর শব্দ শোনা যায় কি না।

"উনিও বলেন, গানের মধ্যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতই সব থেকে ভালো। এখানে একটা রেডিও থাকলে বেশ হত।"

"ষাট নম্বর বেডের মেয়েটি গান জানে, ডাকুন না।"

"আপনি যান, কাল একটা বই চেয়েছিলুম, দেয় নি।"

খসখস শব্দ হল। অনেকদিনের জট, চিরুনি আটকে যাচ্ছে। মাথাটা নড়ে উঠতেই ফ্যাকাশে মুখ করে নাড়ু তাকিয়ে রইল।

চুলের গোছা আঙুলে প্যাঁকিয়ে মা চুল আঁচড়াত। না হলে মাথায় খুব ব্যথা লাগে। চুলগুলো সব পিঠের তলায়।

মৃতের কাঁধ ধরে নাড়ু তুলতে গেল। মাথাটা কাত হয়ে গড়িয়ে পড়ল বালিশে। খটখট জুতোর শব্দ আসছে। তাড়াতাড়ি মাথাটা সিধে করে চাদর টেনে দিল। পিছিয়ে আসার সময় থলিতে পা লাগল।

দুটো পেয়ারা গড়িয়ে পড়ল। থলিটা তুলে নিল নাড়ু।

"তুমি একা যে, বাবা কোথায়? এখানে আর থেকো না, বাইরে গিয়ে বোস।"

নার্স ওর কাঁধে হাত রেখে ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল। নাড়ু মাথা নামিয়ে হেঁটে গেল বারান্দা ধরে। নিচে নেমে দেখল দারোয়ানের টুল খালি। আবার রাস্তায় এসে দাঁড়াল। গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে তখন।

সন্তোষ আর সৎকার-সমিতির ছাইরঙা পোষাক-পরা লোকটি গাড়ির মধ্যে স্ট্রেচারটা তুলে দিল। ডালা দুটো বন্ধ করতেই গাড়ির পিছনটা একটা টিনের বাক্স হয়ে গেল। ড্রাইভার আর সমিতির দুজন লোক বসল সামনের সারিতে, পিছনে সন্তোষ আর নাড়ু। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সামনের রাস্তায় পড়তেই সন্তোষ বলল, "দেরি হয়ে গেল। গাড়ি ছিল না, তাই বসে ছিলুম।"

রাস্তার দিকে মুখ ফেরাল নাড়ু। পাশ দিয়ে ট্রাম যাচ্ছে। সমান সমান যাচ্ছে। ঘণ্টা পড়ল। ট্রামের গতি মন্থর হল। নাড়ু হাসল।

"বাবা, ট্রামগাড়ি মোটরের সঙ্গে পারে না?"

"ওকে যে থামতে থামতে যেতে হয়, লোক উঠবে নামবে—তবে তো!"

সন্তোষ আড়চোখে তাকাল একবার। জ্বলজ্বল করছে ছেলেটার চোখ। গোগ্রাসে বাইরের সবকিছু যেন গিলছে।

দোকান, আলো, মানুষ। সমিতির আপিসের কেরানিটি বেশ গপ্পে লোক! ফোন করে ডাকলে ওরা যায় না। অনেকবার গিয়ে নাকি ঠকেছে। বেশির

ভাগ ক্ষেত্রেই ঠিকানা দেওয়া হয় বিয়ে-বাড়ির—ঠাট্টা করা আজ এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। নাড়ু তখন ছ-মাসের। মুখে রুমাল বেঁধে ডাকাত সেজে একবার ওর মাকে ভয় দেখিয়েছিলুম। তারপর থেকে রোজ খিলটা খুললেই ছুটে ঘরের মধ্যে পালাত। একবারও দেখত না কে কড়া নেড়েছে। মাসকয়েক পরেই ও ভুলে গিয়েছিল ব্যাপারটা। ঠাট্টা জিনিসটাই এমন। নাড়ু এখন বাইরে তাকিয়ে। ভুলে গেছে হাত কয়েক পিছনেই ওর মা রয়েছে। ও কি এটাকে ঠাট্টা ভেবেছে! মরাটা কি ঠাট্টা? তাই যদি হয় তাহলে বাঁচাটাও কি তাই? ঠাট্টা মানুষ ভুলে যায়। বাঁচাও কি ভোলে? তাহলে কি আমি বেঁচে নেই?

চমকে উঠল সন্তোষ। গাড়িটা একটা গর্তে পড়েছিল। ঝনঝন করে উঠেছে পিছনের বাক্সটা। তালু দিয়ে পিঠের টিনের পাতাটাকে সে ছুঁলো। কনকনে ঠাণ্ডা। এর মধ্যে একটা মড়া আছে। মড়াটা ঝাঁকুনিতে নিশ্চয় নড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে ঠাট্টা কোথায়! চিরজীবন কি এই মড়াটাকে পিছন নিয়ে আমায় বুঝতে হবে যে বেঁচে আছি?

ট্র্যাফিক-আলোর নির্দেশে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ খলবল করে নাড়ু বলল, "বাবা সেই ট্রামটা!"

"তুই বুঝলি কি করে?"

"বারে, ওই মোটকা লোকটা যে তখনো বই পড়ছিল।"

ছেলেটা ভুলে গেছে পিছনেই একটা মড়া চলেছে। সন্তোষ ড্যাশবোর্ডের লাল আলোটার দিকে তাকিয়ে রইল। অপরিণত মনই পারে জীবন-মৃত্যুর কথা ভুলতে। ওরাই কিন্তু সুখী হয়। সুখের জন্য আমি কি এই মুহূর্তগুলোকে ভুলে যাব? যদি যাই তাহলে ক্ষতি কি!

"বাবা, এ রাস্তাটার নাম কি?"

সন্তোষ চুপ করে তাকিয়ে রইল বাইরে। চিকচিক করছে রাস্তা। জলে আলো পড়েছে। বৃষ্টি হয়েছে। কাঠগুলো ভিজে থাকবে। ধোঁয়া হবে, চোখ জ্বলবে। পুড়তে দেরি হবে। শুয়োরের বাচ্চা এই বৃষ্টিটা।

"বাবা, বৃষ্টি নামলে ওই বইওয়ালারা কি করে?"

"তেরপল দিয়ে ঢেকে দেয়।"

কাঠগুলো কি খোলা জায়গায় রাখে। ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করলেই পারে, করলে কত সুবিধে হয়। হাঙ্গামা বাঁচে। খাটুনি বাঁচে। এখন হয়তো সারারাত চিতার সঙ্গে লড়াই করতে হবে

"বাবা—"

"চুপ কর দিকিন।"

গাড়িটা মেডিকেল কলেজের গেট পার হল। এখানে থেকে আর একটা মড়াকে তুলে নেওয়া হবে। পাশ-বালিশের মতো একটা পুঁটলি নিয়ে দুটো

লোক অপেক্ষা করছিল। পুঁটলিটাকে পিছনের বাক্সে তুলে দিয়ে লোকদুটো সন্তোষের পাশে বসল। এবার গাড়িটা সোজা শ্মশানে যাবে।

সামনের সীটে সৎকার-সমিতির লোক দুটি মাঝে মাঝে কথা বলছে। সন্তোষ ওদের কথায় কান পাতল। জিনিসপত্তরের দাম বাড়ছে আর এই প্যাচপ্যাচ বর্ষায় ধোপারা কাপড় দিতে দেরি করে। সন্তোষ বাইরে মুখ ফেরাল।

"উনি আপনার কে হন?"

"স্ত্রী।"

"আমার ভায়ের মেয়ে। এর আগে দুটিকে শ্মশানে দিতে হয়েছে। বেচারা একদম ভেঙে পড়েছে।"

মুখ ফেরাল সন্তোষ। ওপাশের লোকটি গাছের গুঁড়ির মতো বসে। রাস্তার আলোয় জ্বলজ্বল করছে চোখ। চোখের নীচে ভাঁজগুলো ঠিক কাকের মতো। ওর চোখ ফুটে যদি এখন দুটো কাকের ছানা বেরিয়ে আসে, কেমন হয়। চিৎকার করবে, মুখের লাল গর্তটা দেখা যাবে। নাড়ুর মার পেটের ব্যাণ্ডেজটা কালো হয়ে গেছে।

হঠাৎ গাড়িটা কাঁপতে শুরু করল। ট্রাম-লাইন সারানো হচ্ছে। রাস্তা খোঁড়া হয়েছে। সন্তোষ কান পাতল, পিছনে যেন একটা শব্দ হচ্ছে। পুঁটলিটা বোধহয় গড়িয়ে গেল। ওর মধ্যে একটা বাচ্চা আছে? বাচ্চাটা গড়িয়ে নাড়ুর মার কোলের কাছে যাবে কি! ছেলেপুলে খুব ভালোবাসে। হাত বাড়িয়ে পুঁটলিটাকে বুকে চেপে যদি আদর করে!

গাড়িটা কাঁপছে। সন্তোষও কাঁপছে। খপ্ করে নাড়ুর হাতটা সে আঁকড়ে ধরল! নখ বসে গেল। হাতটা মুচড়ে ছাড়াতে চাইল নাড়ু। উল্টো পাকে সন্তোষ চেপে থাকল। কিসকিস করে উঠল তার কষের দাঁত। নাড়ু অস্ফুট শব্দ করল।

সমান রাস্তায় পড়তেই গাড়ির কাঁপুনি থেমে গেল। সন্তোষ হাতটা ছেড়ে দিল। বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে বলল, "তোর ভয় করছে?"

"না।"

"আমারও না।"

গাড়িটা, দশটার কেরানির মতো শ্মশানের দিকে ছুটছে। হাওয়া আসছে। সন্তোষ চোখ বুঁজল। পাশের লোকদুটো জবুথবু হয়ে রয়েছে। নাড়ু রাস্তার মানুষ আলো দোকান দেখছে।

উবু হয়ে বসে আছে সন্তোষ। মোটা গুঁড়িগুলো পাতা হয়েছে। চেলাকাঠ চৌকো ছকে তার ওপর সাজানো হচ্ছে। নাড়ু দেয়ালের লেখা

পড়ছে কাঠকয়লায় লেখা মৃতদের নাম আর ঠিকানা। দুচার লাইনের পদ্যও আছে। পড়তে পড়তে নাড়ু দূরে সরে গেল। ছোট্ট চিতাটা জ্বলছে।

"তোমাদের শেষ হতে সেই দুপুর রাত।"

দুজন লোকের একজন বলল। চুপ করে রইল নাড়ু। লোকটা কিছুক্ষণ নাড়ুর দিকে তাকিয়ে পাশের গুম মেরে-থাকা লোকটিকে বলল। "তুই একবার তারকেশ্বরে যা, কত লোকেরই তো মনস্কামনা পূর্ণ হচ্ছে। আর নয়তো বল, সুকুমারের বোনের সঙ্গে সম্বন্ধ করি, ওদের বাড়ির মেয়েরা এক একটা আট-বিয়োনী, ছ-বিয়োনী।"

হু-হু করে চিতাটা জ্বলছে। মুখটা দেখা যাচ্ছে। ছোট্ট একটা কচি মুখ। নাড়ু সরে দাঁড়াল। উনুন ধরাবার সময় মার চোখ দিয়ে জল পড়ত। পেঁয়াজ কাটার সময়ও জল পড়ত। মার নাম আর ঠিকানা যদি দেওয়ালে লিখি তাহলে কি কেউ বকবে? এ দেওয়ালটা কাদের? কাঠ কেনার সময় বাবা যাদের পয়সা দিল, তাদের কি? নাম লিখতে কি পয়সা লাগবে। বাবার কাছে পয়সা চাইলে বকবে। বাবা কাঁদেনি, ঐ লোকটা কাঁদছে। ধোঁয়ার জন্য কাঁদছে কি? কিন্তু ওখানে তো ধোঁয়া নেই। আমি কেঁদেছিলুম। আমি মাকে ভালোবাসি।

সন্তোষ একইভাবে বসে ছিল। চিতা সাজানো হয়ে গেছে। এধার-ওধার তাকিয়ে সে নাড়ুকে ডাকল। চিৎকার করে ডাকল। দেওয়াল ঘেঁষে অন্ধকার দিকটায় নাড়ু সরে গেল। তিনটে লোক দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে রয়েছে। ওদের এড়িয়ে নাড়ু আরো অন্ধকারে পাঁচিলের ধার পর্যন্ত চলে এল। পাঁচিলের পরেই গঙ্গা।

চিৎকার আসছে। নাড়ু পাঁচিল আঁকড়ে দাঁড়াল, যাব না। কিছুতেই না। এখানকার গন্ধ ভালো লাগছে না। গরম লাগছে। মানুষগুলো সব কেমন-কেমন। এখানে থাকব না, দেওয়ালে মার নাম লিখব। লুকিয়ে লিখব!

সন্তোষ খুঁজতে খুঁজতে নাড়ুর কাছে এল। নরম সুরে বলল, "আয় নাড়ু, এখানে থাকিস নি।"

ওরা সাজানো চিতার কাছে এল। সমিতির লোকেরা মৃতদেহটা মাটিতে নামিয়ে দিয়ে গেছে। সেইভাবেই এতক্ষণ পড়ে আছে। তবে পরনের কাপড়টা সন্তোষ বদলিয়ে একটা কোরা থানে ঢেকে দিয়েছে।

"পায়ের দিকটা তুই ধর, তুলে দি।"

মৃতের কাঁধ ধরে সন্তোষ তাকাল। নাড়ু ইতস্তত করছে। চিতা সাজানোর ডোম নাড়ুর পাশে দাঁড়াল।

"ভয় কি খোকাবাবু, এ-তো হালকা লাশ আছে।"

গোঁজ হয়ে নাড়ু দাঁড়িয়ে রইল। ডোম হাসল। সন্তোষকে লক্ষ্য করে বলল, "কষ্ট হচ্ছে, হবেই তো।"

"তুমি একটু ধর তো, ভাই।"

সন্তোষ কাঁধটা মাটি থেকে খানিকটা তুলে ধরে তাকিয়ে রইল ডোমের দিকে। নাড়ু অস্বস্তি বোধ করল। কেমন শক্ত চোখে বাবা তাকাচ্ছে। রেগে গেলে অমনভাবে তাকায়, নিতুদের নতুন চুনকাম-করা দেওয়ালে ছবি এঁকেছিলুম বলে নালিশ করেছিল। বাবা তখন ওইভাবে তাকিয়ে ছিল। মা জড়িয়ে ধরেছিল তাই লাঠির ঘা পিঠে পড়ে নি। মার হাতে কালশিরে পড়েছিল। কাচের চুড়ি ভেঙে গিয়েছিল। ডোমটা মার পা দুটো আঁকড়ে ধরেছে। ঝড়ু জমাদার ছুঁয়ে দিয়েছিল বলে মা চান করেছিল। বাবা ঝড়ুকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছিল। একে বাবা নিজে থেকে ডেকেছে।

"সর, আমি ধরছি।"

মৃতের পা-দুটো নাড়ু প্রায় ছিনিয়ে নিল। ডোম হেসে সরে দাঁড়াল। হালকা দেহটা অনায়াসেই চিতায় উঠল। শুধু সাজানো কাঠগুলো একবার খচমচ করল। কতকগুলো কাঠ মৃতের বুকের ওপর ডোম চাপিয়ে দিল।

"নাড়ু আয়, মুখে আগুন দিবি।"

সন্তোষ হাতে, মাথায়, কপালে ঘি মাখিয়ে দিল। অল্প আলোতে চুলে লেগে-থাকা বনস্পতির গুঁড়োগুঁড়ো দানাগুলো আকাশের তারার মতো দেখাচ্ছে। চিতা জ্বলে উঠলেই, চুলের সঙ্গে ওগুলোও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তুলো পাকিয়ে, একটা সলতে তৈরি করে সন্তোষ মৃতের ঠোঁটের ওপর রাখল।

"নাড়ু, কাছে আয়।"

দেশলাই জ্বেলে সন্তোষ কাঠিটা নাড়ুর হাতে দিল। নিভে গেল কাঠিটা। আর একটা জ্বালতে গেল, জ্বলল না। চারটে কাঠি নষ্ট হতেই বিরক্ত হল সে। ঝিরঝিরিয়ে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েই থেমে গেল। ছোট্ট চিতাটা এখনো জ্বলছে। ছুটে গিয়ে সন্তোষ দেশলাইটা সেঁকে আনল। কাঠি জ্বেলে নাড়ুর হাতে তুলে দিয়ে দুহাতে আড়াল করে ধরল।

এক পলকের জন্য নাড়ু সন্তোষের মুখে তাকাল। ঠোঁটদুটো তেলতেলা। ফুঁ দিয়ে যদি নিভিয়ে দিই কাঠিটা, তাহলে ধরে ফেলবে, মারবে!

হয়তো নিজেই আগুন দিয়ে দেবে। মার মুখে ছেলেদেরই আগুন দিতে হয়, নয়তো পাপ হয়।

সলতেটা জ্বলে উঠতেই নাড়ু কাঠিটা ফেলে দিল। মড়মড় করে পাটকাটি ভাঙছে ডোম। পিছিয়ে গেল নাড়ু।

"কতক্ষণ লাগবে পুড়তে?"

"ঘণ্টা তিন-চার।"

"কাঠ ভিজে নেই তো, যা বৃষ্টি শুরু হয়েছে কদিন ধরে।"

নাড়ু হাঁটছে। দুপাশে সার-দেওয়া মাটি-খোঁড়া জমি, দুটো নিবুনিবু চিতার পাশে জটলা করছে কতকগুলো লোক। মাঝখানের পথটা সিধে গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে। সিঁড়ির মাথায় এসে নাড়ু দাঁড়াল। শ্মশানের আলোয় জল দেখা যাচ্ছে। জল চিকচিক করে কাঁপছে! হাসলে মার গোটা শরীরটা অমন কাঁপত। আমার গঙ্গায় চান করতে ইচ্ছা করছে।

"হ্যাই, তোজো, হিটলার, সবকোই ফল-ইন হো যাও। হাম গোলি করেঙ্গা।"

গলায় শালপাতা-জড়ানো লোকটা বীরদর্পে আকাশের দিকে আঙুল তুলে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল।

"টে—ন্ শন্।"

পা জোড়া করে, গটগটিয়ে লোকটা কুণ্ডলি-পাকানো কুকুরটাকে লাথি কষাল। কুকুরটা ছুটে পালাতেই সে ঘুরে দাঁড়াল নাড়ুর দিকে। নাড়ু ছুটে পালিয়ে এল সন্তোষের পাশে। চিতা ধরে গেছে। আধ-পোড়া পাটকাঠিগুলো গুঁজে দিচ্ছে ডোম।

"কোথায় গেছলি ?"

"ওই দিকে গঙ্গা দেখছিলুম।"

"একা যাস নি, মাতাল-গেঁজেলরা আছে।"

একটানা সুর করে কিছু পড়ার শব্দ আসছে। অনেক লোক একসঙ্গে পড়ছে। উবু হয়ে সন্তোষ দেখছে ডোমের কাজ। মাংস পোড়ার গন্ধ।

"আবার কোথায় যাচ্ছিস ?"

নাড়ু থেমে গেল। সেখান থেকেই বলল, "এদিকে গান গাইছে।"

"না যেতে হবে না, এখানে থাক।"

নাড়ু সন্তোষের কাছে এসে দাঁড়াল। কাঠের ফাঁক দিয়ে আগুন উঠছে। কুঁকড়ে গুটিয়ে গেল চুলগুলো। মুখটা দেখা যাচ্ছে। চোখ বোঁজানো। ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক করা। হাতের আঙুল কালো হয়ে উঠেছে। গোড়ালি দুটো ভারী দেখাচ্ছে। একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেল। মাথার কাছে এক ঝলক আগুন হুস করে ঠেলে উঠল।

নাড়ু চোখ ফেরাল। সন্তোষকে আড়চোখে দেখল। চোখদুটো যেন ঘুমে ভারী। অমন চোখ করে পুজোর সময় বাবা যাত্রা দেখে! মা থাকে চিকের আড়ালে। কৌটোভর্তি পান না থাকলে মা যাত্রা দেখতে পারে না।

একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেল। আগুনের আঁচ লাগল নাড়ুর গায়ে।

"কোথায় যাচ্ছিস ?"

"ওই দিকে।"

"না।"

হাতের মুঠো শক্ত করে নাড়ু তাকিয়ে রইল। উঠে দাঁড়াল সন্তোষ। চিতার আলোয় তার চোখ জ্বলছে।

"তুই এখান থেকে বারবার পালাচ্ছিস কেন?"

নাড়ুর কাঁধে নাড়া দিল সন্তোষ। পুটপুট শব্দ হচ্ছে। চিতার পাশে দাঁড়-করানো একটা কাঠ পড়ে গেল।

"কথা বলছিস না কেন? মন খারাপ করলে কি মা বেঁচে উঠবে? অমন অনেক কষ্ট আসবে জীবনে, সইবি কি করে!"

"বল হরি—হরিবোল।"

চমকে ওরা মুখ ফেরাল। অনেকগুলো মানুষ ঢুকল শ্মশানে। আথালি-বিথালি কাঁদছে এক মাঝবয়সী বিধবা। কয়েকজন তাকে ধরে নিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। ওদের পাশ দিয়েই খাটটাকে বয়ে নিয়ে গেল। ইউক্যালিপটাসের গন্ধে ঝেঁঝেঁ উঠল জায়গাটা। সন্তোষ মুখ ঘুরিয়ে নিল। সিঁড়ির কাছ থেকে কান্নার রেশ আসছে।

"হাওয়াটা এমন বিদঘুটে বইছে!"

চিতার ওপর ঝুঁকে সন্তোষ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে আবার বলল, "আগুন সব মাথার দিকে উঠে এসেছে। পা দুটো এখনো ধরল না।"

"বাবা আমি দেয়ালে নাম লিখব।"

"কি লিখবি?"

চোখাচোখি হল ওদের। পা দিয়ে একটুকরো জ্বলন্ত কাঠকে চিতায় ঠেলে সন্তোষ বলল, "কি হবে লিখে। কালকেই বৃষ্টিতে ধুয়ে যাবে।"

পাগলটা চিৎকার করছে। বিধবার কান্না শোনা যাচ্ছে। মৃতদেহ নামিয়ে লোকগুলো চাপা সুরে জটলা করছে। সারা শ্মশানে মাংস পোড়ার গন্ধ চারিয়ে রয়েছে। বাইরে রেলইঞ্জিন হঠাৎ হুইসল্ দিল।

নিচু হয়ে নাড়ু একটা ফুল তুলে নিল। এইমাত্র খাট থেকে পড়ে গেছে। সন্তোষের নজর এড়ায় নি। হাত বাড়াল সে। নাড়ু হাত মুঠো করে পিছনে রাখল।

"কি করবি ওটা নিয়ে!"

"বাড়িতে নিয়ে যাব।"

"কেন?"

"আমি গঙ্গায় দেব।"

"না, গঙ্গার কাছে যেতে হবে না।"

"আমি চান করব।"

"না, অসুখ করবে।"

সন্তোষ উঠে দাঁড়াল। নাড়ু পিছিয়ে গেল। পিছনে দেওয়াল। সামনে জুড়ে সন্তোষ এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ একটা কুকুর ছুটে এল। পাগলটা ওকে তাড়া করেছে। সন্তোষ ঘুরে রুখে দাঁড়াল। পাগল থমকে গেল। কুকুরটা নাড়ুর গা ঘেঁষে আসতেই, তাড়াতাড়ি একটা ঢিল কুড়িয়ে নিল। "মেরো না খোকা, ও কামড়াবে না।"

শ্মশানের গেটের কাছে-শোওয়া লোকটা শুয়ে শুয়েই বলল, "আজ সকালেই ওর বাচ্চাটা রেলে কাটা পড়েছে। ওকে মেরো না।"

পাগলা একদৃষ্টে তাকিয়ে। সন্তোষ নাড়ুকে আগলে শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

"এ ভাই ক্যাপ্টেনসাব, ইধার আও।"

গেটের কাছে-শোওয়া লোকটা পাগলকে ডাকল। মিলিটারি কায়দায় ঘুরে পাগল সেলাম করল। গটগট করে লোকটার কাছে গিয়ে হাত পাতল। মাটি থেকে একটা ঢিল তুলে লোকটা ওর হাতে দিতেই সেলাম করে পাগল চলে গেল সিঁড়ির দিকে। আচমকা ইঞ্জিনের হুইসল বাজল। মালগাড়ি শাণ্টিং-এর শব্দ আসছে।

"ভয় পেয়েছিলি?"

চিতার একধারটা ধ্বসে পড়ল। গুঁড়োগুঁড়ো ফুলকি উড়ছে। আগুন গোলাপী হয়ে উঠছে।

"আমাদের ভাগ্যি ভালো এখনো বৃষ্টি নামে নি।"

টেনে টেনে কান্নার সুর আসছে। মালগাড়ি শাণ্টিং হচ্ছে। লোহায় লোহায় ঠোকাঠুকি হয়ে কর্কশ শব্দটা গুড়গুড় করে সরে যাচ্ছে এক গাড়ি থেকে আর এক গাড়িতে।

"শম্ভুজ্যাঠার দিদি মালগাড়ির তলা দিয়ে পার হতে গিয়ে কাটা পড়েছিল।"

নাড়ু চুপ করে থাকল। চারদিকে চোখ বুলিয়ে সন্তোষ আবার বলল, "সকাল হলেই আগে তোর জন্য কোরা কাপড় কিনতে হবে। কিন্তু ডোম ব্যাটা গেল কোথায়! একবার ডেকে আনবি?"

"কেন?"

"মাথাটা বাঁশ দিয়ে ভেঙে দেবে।"

দেওয়ালের সঙ্গে সিঁটিয়ে গেল নাড়ু। থরথর করে কেঁপে উঠল ওর গোটা শরীর। ভয় করছে। হাসপাতালের লিফ্‌টের সেই চৌকা লোহাটার মতো বাবা যেন নেমে আসছে। অনেকক্ষণ পেচ্ছাপ করি নি। যন্ত্রণা হচ্ছে। খিদে পাচ্ছে। থলিতে পেয়ারা আছে। মা খেতে ভালোবাসে।

"দাঁড়িয়ে রইলি যে?"

"পারব না।"

"কথা বললে শুনিস না কেন? তখন বললুম ফুটা দিতে দিলি না কেন?"

"আমার ইচ্ছে, আমার খুশি।"

নাড়ু চিৎকার করে উঠল। সন্তোষ থ হয়ে গেছে। গোড়ালি আর পায়ের পাতা এখনো পোড়ে নি। ফুলে টসটস করছে। হাওয়া দিচ্ছে। আগুন কাত হয়ে মাথার দিকে জ্বলছে।

"আমার কথা শুনবি না?"

"না।"

"শুনবি না?"

"না।"

থলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে নাড়ু একটা পেয়ারা ধরল। বাবা এগিয়ে আসছে। মারব। চৌকো লোহার মতো এগিয়ে আসছে। পালাব। এই শ্মশান থেকে বেরিয়ে যাব। যেদিকে হোক চলে যাব। ছুটব।

"আমার অবাধ্য হবি? বল্, অবাধ্য হবি?"

নাড়ুর হাত মুচড়ে ধরল সন্তোষ। বিকট চিৎকার করে বিধবাটি ছুটে এল। সাজানো চিতায় মৃতদেহটা তোলা হচ্ছে।

ছিটকে পিছিয়ে গেল সন্তোষ। হাতে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। শরীর জ্বলে উঠল। ছেলে আমায় ঘৃণা করে। আমি কি অন্যায় করেছি! ও শাস্তি দিতে চায়, অতটুকু ছেলে কি বোঝে দোষগুণের। ওকে শায়েস্তা করতে হবে। মারতে হবে। ভীষণ মারব, ওকে কাঁদিয়ে ছাড়ব।

ছুটে এল সন্তোষ নাড়ুর দিকে। জ্বলন্ত চিতাটাকে পাক দিয়ে নাড়ু ছুটল। শ্মশানের গেট পার হয়ে রাস্তায় পড়ল। পিছনে সন্তোষ ছুটে আসছে। দুধারে নির্জন রাস্তা গঙ্গার ধার ঘেঁষে সিধে চলে গেছে। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। সামনে সারি দিয়ে মালগাড়ি দাঁড়িয়ে। এক লহমা ইতস্তত করে নাড়ু মালগাড়ির তলা দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

নিচু হয়ে গাড়ির ফাঁক দিয়ে সন্তোষ গলে এল। অন্ধকার। একহাত দূরেই আর একসার ওয়াগান। লম্বা টানা একটা গলি যেন। চিৎকার করে সন্তোষ ডাকল। কান পাতল। সাড়া নেই। আবার চিৎকার করল। সাড়া নেই। টুকরো পাথরে গলিটা এবড়োখেবড়ো। সন্তোষ টলে পড়ছিল। দুহাত দিয়ে দুদিকের ওয়াগন ধরে দাঁড়াল।

লোহার লাইনে কাঁপতে কাঁপতে কাছে আসছে একটা শব্দ। অন্ধকারে ফুলকিগুলো ছিটকে উঠছে। ইঞ্জিন আসছে। কোন লাইনে আসছে! সন্তোষ নাড়ুর নাম ধরে চিৎকার করল। কান পাতল। লাইনে গুড়গুড় শব্দটা জোর হচ্ছে। ওপাশে যেন পাথর ছিটকে পড়ার শব্দ হল। নাড়ু কি হাঁটছে!

ইঞ্জিনটা কোন লাইন ধরে আসছে? ও যদি ভয় পেয়ে গাড়ির তলা দিয়ে আবার পালাতে যায় আর সেই সময়ই ইঞ্জিন গাড়িতে ধাক্কা দেয়! শম্ভুজ্যাঠার দিদির মুণ্ডুকাটা লাশটা কাঁপছিল। কাঠের স্লিপার কটা অনেকদিন পর্যন্ত কালো ছোপ ধরে ছিল। নাড়ুর মার পেটের ব্যাণ্ডেজটা কালো হয়ে গিয়েছিল। এই গলিটা অন্ধকার। কিচ্ছু দেখা যায় না।

খড়খড় শব্দ হল গাড়ির ওধারে। কেউ যেন কুচো পাথরের ওপর হাঁটছে। সন্তোষ উবু হয়ে গাড়ির তলা দিয়ে তাকাল। অন্ধকার। হাত দিল চাকায়, নিরেট, ঠাণ্ডা, এটার ওজন কত? আবার যদি নাড়ুকে ডাকি তাহলে ও ভয় পাবে। আবার পালাতে চাইবে। তার থেকে চুপিচুপি গিয়ে ধরে ফেলি।

সন্তোষ কুঁজো হয়ে এগোল দুসারি ওয়াগনের মাঝে ফাঁকটুকুর দিকে। হঠাৎ ঝাঁকুনি খেল একদিকের সারিটা। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সন্তোষ। ইঞ্জিনে ধাক্কা দিয়েছে। সারিটা একটু পিছিয়ে গিয়ে থেমে পড়ল।

মাটি আঁকড়ে সন্তোষ শুয়ে আছে। ওর একদিকের সারিটা অনড়। অন্যদিকেরটা চলতে শুরু করেছে। মাটিতে মুখ চেপে শুয়ে থাকল সে, শব্দ হচ্ছে, লোহায় লোহা ঘষার শব্দ। ওধারে নাড়ু এখন কি করছে? পার হতে যদি দেরি হত? মুণ্ডুকাটা লাশটা এতক্ষণে কাঁপতে শুরু করত। লাইনে শব্দ হচ্ছে। মালগাড়িগুলো দূরে সরে যাচ্ছে। পায়ে পিঁপড়ে উঠেছে। মাটিতে সোঁদা গন্ধ। ঘাম জমেছে কপালে। মরে যাচ্ছিলুম। এমনিভাবে মাটি আঁকড়ে শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে।

বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। তীক্ষ্ণ শীতল জলের ধারা। ইঞ্জিনটা মালগাড়ি টেনে নিয়ে গেছে। উঠে দাঁড়াল সন্তোষ। লাইনের ওধারে মাটির ওপরে একটা অন্ধকার জমাট হয়ে রয়েছে। কেউ কাটা পড়েছে কি? টলতে টলতে ছুটে এল সন্তোষ। ওকে দেখে কুকুরটা হাড় চিবনো বন্ধ করল। লেজ নাড়ছে। একটুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার সে হাড় চিবতে শুরু করল।

বৃষ্টি পড়ছে। সারা শরীরে বৃষ্টি পড়ছে। কাঁপতে কাঁপতে সন্তোষ লাইন ধরে হাঁটতে শুরু করল। নাড়ুর মার চিতাটা বোধহয় নিভে গেল।

সন্তোষ নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করল।

নিরর্থক

"এই বারান্দাটা এত ভাল লাগে, এত কথা মনে পড়িয়ে দেয়।" প্রৌঢ়া এই বলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। ঠিক বারান্দা নয়, প্রায় ছাদ। সন্ধ্যায় তাঁরা দুজন ওখানে বসতেন। অশোক-অতসী সে গল্প জানে।

"এখনও মাঝে মাঝে বসি, পরীক্ষার খাতাপত্তর নিয়ে, যদি কোন বই, হাতের কাছে থাকে, চমৎকার, না?"

উনি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলেন। ওদের দিকে তাকালেন, বাঃ তোমরাও আসছ না কেন, এমন চোখের ভাব নিয়ে।

অশোক এবং অতসী ওঁর পাশে এগিয়ে এল।

"বসবে এখানে?"

অশোক-অতসী মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। উনি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে পাটি এনে পাতলেন।

এই বারান্দার তিন দিকেই বাড়ি। দুদিকে দুবাড়ির পাঁচিল, আর একদিকে প্রায় পনেরো গজ দূরে, আর এক বাড়ির দোতলা। হাওয়া-আলো এই দিক থেকেই আসে।

এখন সন্ধ্যা শেষ হয়ে রাত্রি শুরু হচ্ছে। অশোক সেই পনেরো গজ ফাঁকা অঞ্চলটার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার বারান্দার ওয়েসিস।"

প্রৌঢ়া হেসে উঠলেন। "উনিও প্রায় এই রকমই বলতেন।"

"কিন্তু কতদিন এরকম থাকবে। ওরা যদি ভাড়া দেবার জন্যে দোতলার উপর ঘর তোলে? মানুষ যা লোভী হয়ে পড়ছে।"

অতসী, লোভ জিনিসটা যে কত দুঃখের গলার স্বরে বুঝিয়ে দিল।

"নাঃ, হাজার তিন-চার খরচ করার মতো সামর্থ্য ওদের নেই। দেখছ না কি রকম চুনবালি খসা।"

"আজকাল ভাড়াটেরাই টাকা দেয়। আমাদের সামনের বাড়িতেই তো এমনি করে তিন তলা উঠল, এখন দম বন্ধ হয়ে আসে!"

"ভাবতেও কেমন লাগে।"

ভয়ে ভয়ে উনি পনেরো গজ ওপাশের বাড়িটার দিকে তাকালেন।

"যদি আপত্তি জানাই ?"

"কার কাছে ?"

"ওদের কাছে, কর্পোরেশনের কাছে।"

অশোক ঠোঁট মুচড়ে হাসল।

"সামনের বাড়ির ওরা পাইখানার সয়েল পাইপটা তুলল ঠিক আমাদের জানলার সামনে ; আপত্তি জানানো হল, কিছু হল না। রয়েই গেছে।"

"রয়ে গেল !"

বালিকার মতো তাকিয়ে রইলেন। অতসী ভারিক্কী চালে বলল, "শুনলেন না, নমিতাদি সেদিন কি বলছিলেন, ওদের গলিতে ড্রেন ঢাকা পাইপটা চুরি হয়ে গেছে আজ কুড়ি দিন, হাঁ-হয়ে আছে রাস্তাটা। একটা বুড়ি একদিন রাতে পড়েও গেছল।"

প্রৌঢ়া হেসে বললেন, "আমি রাতে বেরোই না।"

"ভালই করেন।"

"কি করতেই বা বেরোব, কোথায়ই বা যাব।"

হতাশ স্বরে বললেন, গলায় সরু চেনটা টেনে ঘোরালেন। অশোক চট করে দেখল, ঘাড়ের মাংসে কেটে বসেছে যেন গহনাটা। অতসী বলল, "আপনার যে ভাই টালিগঞ্জে থাকে, তার ওখানেও তো মাঝে মাঝে যেতে পারেন !"

"সময় কই। বিকেলে ইস্কুল থেকে গিয়ে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। ট্রামে বাসে যা ভীড়।"

"হ্যাঁ", অশোক নিমেষে প্রসঙ্গটা ধরে নিল, "আমাদেরই অসুবিধে হয়, ভয়ও করে।"

উনি হেসে উঠলেন, "ভয় করে ?"

"নিশ্চয়, কালকেই অফিস যাবার সময় ট্রামে উঠতে গিয়ে পিছলে পড়লাম, একজন লাথি মেরে সরিয়ে দিল, তাই পাটা চাকার তলায় গেল না।"

"আপনি কি করে যে ট্রামে আসেন ওই সময়।"

অতসী শিউরে উঠল। অশোক নিজের কথার খেই ধরে বলল, "দোষটা কিন্তু আমার ছিল না। থামতে না থামতেই ঘণ্টা দিয়ে দিল, হ্যাণ্ডেল ধরে ছুটতে ছুটতে চেঁচাচ্ছি, পা সরান, একটুখানি জায়গা দিন—কে শোনে ! লাফালুম, একজনের জুতোয় পা পড়ল, তিনি পা ছুঁড়লেন।"

"ও মা, তাতো জানতাম না, এমন কাণ্ড ঘটে গেছে !" উনি অশোকের শরীরে চোখ বোলালেন। উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি। তাড়াতাড়ি অশোক বলল, অবশ্যই হাসির মতো করে, "আশ্চর্যের কথা, কোথাও ছড়েটড়ে যায় নি।"

"মারাত্মক কিছুতো হতে পারত, আমি তো অফিসের সময়ই উঠি, এমন দৃশ্য কিন্তু একদিনও চোখে পড়ে নি।"

অতসী অনুযোগের স্বরে বলল "হুঁশ, বলে আপনার কিছু আছে নাকি! এইটে ক্লাস নিতে গিয়ে থ্রীতে পড়িয়ে এলেন, এখনো টিচার্স রুমে তাই নিয়ে হাসাহাসি হয়।"

উনি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। লক্ষ্য করল অতসী। "থ্রীতে তখন ক্লাস ছিল লক্ষ্মীদির। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গলদঘর্ম। ওরে বাবা! হেডমিস্ট্রেসকে কি করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতে বলে, বলুন? তাছাড়া স্কুলে যা গম্ভীর থাকেন!"

খুশী হলেন অতসীর কথায়। গলার হারটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, "ওটা ডিসিপ্লিনের জন্য। কত বছর মাষ্টারী করলুম বলতো?"

"চব্বিশ।"

অশোক উত্তর দিল। ও'র সব কথাই তার এবং অতসীর জানা। "তোমার তো মোট দেড় বছর, দেখবে আর দু-বছরের মধ্যে কেমন গম্ভীর হয়ে যাবে।"

অতসীকে বললেন, বলে তাকালেন অশোকের দিকে, "উনি এই গম্ভীর ভাবটা কিছুতেই পছন্দ করতেন না, ভারী হাসাতে পারতেন। যতক্ষণ বাড়িতে থাকতাম হেসে হেসে মারা যাবার দাখিল। তুমি হাসাতে পার? হাসাও দেখি।"

উৎসুক হয়ে তাকালেন, অস্বস্তিতে নড়ে চড়ে বসল অশোক। অতসী শুকনো গলায় হেসে উঠল, "বাঃ এমনি এমনি কেউ হাসাতে পারে নাকি?"

"উনি পারতেন।"

"যা দিনকাল—হাসি আসে নাকি?"

অশোক যুক্তি দেখাবার মতো করে বলল, অতসী ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানাল। উনি বিব্রত হলেন, "তা বটে, সত্যিই অনেক তফাৎ। তোমার বয়সে আমার বিয়ে হয়ে গেছল।"

"নাঃ, সে রকম আর কি তফাৎ, বিয়ে তো আমরাও বহুদিন আগেই করতে পারতাম।"

প্রৌঢ়া যেন আহত হলেন। হাত নেড়ে বললেন, "তবে করনি কেন?"

ওরা দুজন চুপ করে তাকিয়ে থাকল। এতক্ষণে বোঝা গেল পাশের বাড়ির রেডিওয় একটা হাসির নাটক হচ্ছে।

'আজ পয়লা।"

"হ্যাঁ, শুক্রবার।"

"কী গরম পড়ছে!"

অশোক-অতসী নিজেদের মধ্যে বলল।

"বসো, চা করি।"

"আমি কিন্তু খাব না, আজ তিন কাপ হয়ে গেছে।"

"আধ কাপই না হয় খেও।"

উনি চলে গেলেন ভিতরে। অন্ধকারে ওরা দুজন নিশ্চল বসে থাকল। এক সময় অতসী বলল, "রান্নাঘরটা বেশ বড়। দুটো জানালা, গরম কম হয়।"

"একার জন্যে দুটো বেডরুম নিয়ে কি করে থাকে। অস্বস্তি হয় না! রান্নাঘরের পাশের ঘরটাও বেডরুম করা যায়, তা হলে তিনটে হবে।"

ওরা আবার চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। একসময় অশোক বলল, "অফিসের পর, এই রকম বারান্দায় চান করে, মাদুর পেতে শুয়ে থাকতে বেশ লাগবে।"

গলা নামিয়ে নিচু স্বরে অতসী বলল, "এই জায়গায়টায় প্রাইভেসি আছে, শোননি কতবার বলেছে আমরা এখানে বসতাম।"

"আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছ, চৌবাচ্চাটা সব সময় জলে ভরা। অনেক বার ভেবেছি, গামছা থাকলে এখান থেকেই চান করে যেতুম।"

"তোমাকে তো কতবার বলেছি, কলের মুখ একটা মিস্তির ডাকিয়ে নিচু করে নাও, দেখবে জল বেড়ে যাবে। বাড়িওয়ালার ভরসায় থাকলে কি চলে? অন্য ভাড়াটেরা পয়সা দিক বা না দিক তুমি করিয়ে নাও, আমাদের বাসায়তো দেখলাম।"

"তোমাদের বাসায় লোক কম, তাই মনে হচ্ছে জল বাড়ল। ধর যদি বাড়েই কতটা বাড়বে? আমাদের ছ'জন, দোতলায় প্রায় দশ। তিনতলায় দুই। পয়সা খরচ করে কত জল বাড়াতে পারব? তা ছাড়া এ মাসে প্রিমিয়াম দিতেই হবে।"

অশোক উত্তেজিত হয়ে গলা চড়িয়ে ফেলেছে। অতসী প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেবার জন্য বলল, "আমাদের শোভনাদির স্বামী অফিসের কো-অপারেটিভ থেকে লোন নিয়ে মধ্যম গ্রামে জমি কিনেছে। আটশো টাকা কাঠা। আজ আট বছর টাকা জমাচ্ছে।"

"লোক কজন?"

"শুধু একটা বাচ্চা।"

ওরা চুপ করে রইল, চায়ের কাপ হাতে সন্তর্পণে প্রৌঢ়া এলেন। মুখে চাপা হাসি। "ক্রাউডেড্ হয়ে গেল তো!"

ওরা হাসল। অতসী নিজের কাপ থেকে খানিকটা অশোকের কাপে ঢেলে দিল। অশোক চুমুক দিচ্ছে। উনি উদ্বিগ্ন হয়ে তাকিয়ে থাকলেন, চুমুক শেষ করে অশোক হাসল:

"চমৎকার!"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন প্রৌঢ়া। "আজ ষোল বছর এই দোকান থেকে চা নিচ্ছি। উনি কিনতেন।"

অতসী বলল, "সত্যিই চা টা ভাল। এর লোভেই আসতে ইচ্ছে করে।"

"মুখেই তোমরা বল, কি একা একা যে লাগে! বিনা দরকারে কেউ আসে না।"

ওঁর স্বরটা এত বিষণ্ণ হয়ে গেল যে, চুপ করে না থাকাটাই কুরুচিকর হয়ে পড়ে। নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত চুপ করে থেকে অশোক বলল, "আপনার এক ভাই তো বেহালায় থাকেন, সেখানে যদি থাকতেন, তাহলে একা লাগত না।"

এবার উনি চুপ করে থাকলেন। অতসী বলল, "তার তো ছেলে মেয়েতে ভরা জমজমাট সংসার, সেখানে নিশ্চয় একা বোধ করবেন না।"

. "না, যাওয়া যায় না। বহুদিন সম্পর্ক নেই।"

"যা কিছু মনোমালিন্য, সে তো বাবার সঙ্গে হয়েছিল। তিনি বেঁচে নেই। ভাইয়ের কাছে যাবেন তাতে আর এমন কি"—অতসীকে থামিয়ে প্রৌঢ়া বলে উঠলেন, "কিন্তু এত জায়গা থাকতে সেখানেই যে যেতে হবে, তার কি মানে আছে?"

"তাহলে আর থাকবার জায়গা কোথায়?"

অশোক গম্ভীর ভাবে বলল, "তারা আপনার নিজের লোক, আত্মীয়; এখন ওদেরই দরকার। আপনার বয়স হয়েছে। এখন তো দিন দিন অশক্ত হয়ে পড়বেন।"

থতমতের মতো উনি তাকিয়ে থাকলেন। অন্ধকারে জমাট দুটি ছেলেমেয়ের মুখ দেখার চেষ্টাতেই যেন ঝুঁকে বললেন, "কি বলছ!"

অশোক বলল, "যদি আপনার ভারী কোন অসুখ হয়, কে দেখবে?" অতসী বলল "বিপদের কি কোন ঠিক-ঠিকানা আছে?"

অশোক বলল, "কত রকমের উড়ো গোলমাল জুটতে পারে কে জানে। বত্রিশ টাকা ভাড়ায় এই বাজারে এতগুলো ঘর নিয়ে রয়েছেন, বাড়িওয়ালা ভদ্র লোক ছিল তাই, কিন্তু ওর ছেলেরা যদি এখন ভাড়া বাড়ানোর মামলা করে।"

অতসী বলল, "চার পাশেই তো ভাড়াটে বাড়ি। যদি কোন বদখত প্রতিবেশী জোটে, তো জ্বালাতন করে মারবে, ঝগড়াঝাটিও ওরা করতে পারে।"

অস্ফুটে প্রৌঢ়া বললেন, "কেন?"

"ধরুন," অশোক বলল, "আপনার এই বারান্দাতেই হয় তো ময়লা ফেলতে শুরু করল, তখন কি করবেন?"

প্রৌঢ়া শিউরে উঠলেন।

"আর কদিনই বা চাকরী করবেন। বিশ্রাম তো নিতেই হবে।" প্রৌঢ়া ঘাড় নাড়লেন।

"খরচ চালাবেন কি করে, তখন তো আরও একা লাগবে।"

"কেন, তোমরা আসবে না ?"

"নিশ্চয় আসব।"

প্রায় একসঙ্গে দুজনে বলে উঠল। তারপর অতসী বলল, "কিন্তু তখন তো আরও কাজের চাপ পড়বে আমাদের।"

"হ্যাঁ, তোমাদের তখন বিয়ে হয়ে যাবে।"

অশোক বলল, "আপনি বরং এখনই দাদার বাড়িতে চলে যান।"

"হ্যাঁ।"

উদগ্রীব হয়ে তাকাল ওরা দুজন। প্রৌঢ়া ভাবছেন। সিদ্ধান্তটা এখনই হয়তো জানিয়ে দেবেন। কোন কথা বললেন না। শুধু তাকিয়ে থাকলেন এই দুটি ছেলেমেয়ের দিকে।

"কাল না পরশুর কাগজেই একটা খবর পড়লুম। সেই থেকে যা ভয় ধরে গেছে!"

অতসীকে অশোকই প্রশ্ন করল, "কি ?"

"এক বুড়ী নার্স একা থাকত ভাড়াটে বাড়িতে। একদিন রাতে চাকর তাকে গলা টিপে মেরে গয়নাগাটি নিয়ে চম্পট দেয়। অবশ্য ধরা পড়েছে।"

"আমার তো পয়সা বলতে প্রায় কিছুই নেই।"

প্রৌঢ়ার গলার স্বর কেঁপে উঠল! অন্ধকারে বোঝা গেল না মুখের ভাব কেমন। চিন্তিত হয়ে অশোক বলল, "ওরা আর সে সব বোঝে না; ভাবে নিশ্চয় সোনাদানা আছে। তবে বাড়ির চাকরই যে সব সময় করে তা অবশ্য নয়। কত রকমের ফিরিওয়ালা আসে, আশ-পাশের বাড়ীর চাকরেও করতে পারে! আপনার চাকরটি তো ভালই মনে হয়, তাই না ?"

প্রৌঢ়া কথা বললেন না। ওরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উঠে পড়ল। দরজা বন্ধ করার সময় প্রৌঢ়া বললেন "তোমরা বলছ যেতে ?"

অনুমোদন করার ভঙ্গীতে দুজন তাকিয়ে থাকল। প্রৌঢ়া ধীরেধীরে দরজা বন্ধ করলেন।

গলি থেকে বেরিয়ে ট্রাম রাস্তায় পা দিয়েই অশোক বলল, "কবেকার কাগজে খবরটা বেরিয়েছে ?"

"কাল-পরশু হবে। মা বলছিল।"

"আমাদের কথা কিছু বলেছেন ?"

"হ্যাঁ, তোমাকে দাদার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে।"

সিগারেটের জন্য পকেটে হাত দিয়ে ক্ষুব্ধ স্বরে অশোক বলল, "বাসাই জোগাড় হল না, দেখা করে কি হবে ?"

ভ্রূ কোঁচকাল অতসী। তাই দেখে দেশলাই জ্বালতে অশোক দাঁড়াল।

"আমাদের ওই বাসায় গিয়ে থাকতে পারবে?" অশোক সিগারেটে আগুন দিল। অতসী বলল, "আলাদা একটা ঘর আমাদের জন্যে তো চাই।"

"আমি তো তাই বলছি।"

সিগারেটের প্রথম ধোঁয়া ছেড়ে হাঁটতে শুরু করল।

"কালকেও আবার আসতে হবে।"

"কোথায়? ও হ্যাঁ, এক সঙ্গেই আসবখন।"

"কি ভাবছ।"

"না এমনি, এ ভাবে থাকার কি যে মানে হয়।"

"আমরা?"

"না, ওঁর কথা বলছি।" বাসাটা ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেই পারেন।"

আশ্বস্ত হয়ে বড় করে টান দিল অশোক। গল গল করে ধোঁয়া ছেড়ে, দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তা পার হবার জন্যে। একটা লরী আসছে, হাত তুলে অতসীর গতি রোধ করে বলল "সেণ্টিমেণ্টাল," তারপর বলল, "দেখে পার হও!"

জায়গাটার সঙ্গে অতুল কয়েকদিনের মধ্যেই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে।

হিসেব যুক্তি প্রভৃতির দ্বারা অমলাই বুঝিয়ে দেয়, কলকাতা ছেড়ে এখানে বাসা ভাড়া করে থাকলে সাশ্রয় তো বটেই মন এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। কলকাতা থেকে মাইল ষোল। ট্রেনে অফিস যাতায়াতে অতুলের যতটা সময় লাগবে, পাতিপুকুর থেকে ততটাই লাগে। উপরন্তু ওখানে চাকরিটা নিলে অমলা এখানকার চাকরির থেকে সত্তর টাকা বেশি পাবে। বুজুমেরও বিশেষ অসুবিধা হবে না ওখানে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হতে।

অমলার কথামত সবই ঠিকঠাক হয়ে গেছে। বাসাটা স্টেশন থেকে মাইল-খানেক। খেয়ে উঠে এতটা পথ হাঁটতে অতুলের কষ্ট হয়। তাছাড়া সে ভালই আছে; প্রচুর হাওয়া, মশা কম, স্নানের জন্য অঢেল জলও। অতুল ভালই আছে। সব থেকে বড়কথা মাথার চুল ওঠা, যার ফলে খুলিটা দিনে দিনে চর-এর মত ভেসে উঠছে, সেটা বন্ধ হয়েছে।

অতুলের কষ্ট লাঘবের জন্য মাসকাবারি রিক্সার ব্যবস্থা করেছে অমলা। স্টেশনে অতুলকে নামিয়ে দিয়ে অমলা সেই রিক্সাতেই অফিসে চলে যায়। অতুলকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রিক্সাকে সিকি মাইল পথ বেশি ঘুরতে হয়। এজন্য ভাড়া আট টাকা বেশি লাগে। ওর ভয় ছিল, অমলা এটাকে অযথা মনে করে হয়তো পথেই রিক্সা থামিয়ে বলবে, "এটুকু তো হেঁটেই যেতে পার।" কোনদিনও বলেনি, তবু রিক্সায় অতুল কাঁটা হয়ে থাকে।

রিক্সা থেকে নেমে সে একটা হাত সামান্য তুলে "চলি" বলে। অমলা ঘাড়টা ঈষৎ হেলিয়ে রিক্সাওলাকে বলে "চলো।" তারপর অতুল স্টেশনের মধ্যে আসে, খবরের কাগজওলার কাছে কাগজ কেনে, প্ল্যাটফর্মের শেড ঠিক যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে ট্রেনের জন্য। এইখানে দাঁড়ালে যে কামরাটা সামনে পড়ে, সেটায় বসারও জায়গা পাওয়া যায় এবং এইভাবে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই ওকে তার চোখে পড়ে এবং সে লক্ষ্য করতে শুরু করে।

সে লক্ষ্য করল, স্টেশনের দিকে আসার দুটি রাস্তার দক্ষিণটি দিয়ে ও

আসে। ওদিকের বাড়িগুলো যথেষ্ট পুরানো, ঘিঞ্জি। হেঁটেই আসে অর্থাৎ কাছাকাছিই থাকে। অতুল এখানে মাস দেড়েক এসেছে, কয়েকটা অঞ্চলের নাম সে জানে মাত্র আর জানে গঙ্গার ঘাটে যাওয়ার পথটি। ও প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে গিয়ে অপেক্ষা করে, অতুলের ঠিক পিছনের কামরাটার জন্য। সেটাতেও বসার জায়গা পাওয়া যায়। অতুল লক্ষ্য করেছে দারুণ রোদেও শেডের বাইরে ঠিক ওইখানেই ও দাঁড়ায়ঃ বৃষ্টিতেও এইভাবে দাঁড়ায় কিনা সেটা অবশ্য সে জানে না। তবে প্রথম থেকেই তার মনে হয়েছে, গ্রীষ্মে বা বর্ষায় ও বাইরেই দাঁড়ায়।

সাধারণভাবে পরিপাটি ওর শাড়ির কুঁচি ও ভাঁজগুলোর মতই শরীরের ভাঁজ, ব্লাউজের হাতা, পিঠের আঁচল, উঁচু করে বাঁধা খোঁপা এমনকি মাথা তুলে থাকার ভঙ্গিটিও। হাতের ব্যাগটির বাইরের খাপে মাঝে মাঝে খবরের কাগজ গোঁজা থাকে। হয়তো পড়ার সময় করে উঠতে পারেনি তাই নিয়ে যাচ্ছে। বোধহয় বাড়িতে কাগজ পড়ার কেউ নেই, থাকলে নিয়ে যেত না। অমলা রাত্রে কর্মখালির বিজ্ঞাপনগুলো পড়ে আর আনমনা হয়ে হিসাব করে।

অতুলের একদিন দেরি হয়ে যাওয়ায় ছুটে এসে ট্রেনে ওঠে। সেই কামরায় ও ছিল। এরপর থেকে সে এই কামরাতেই ওঠে। চেষ্টা করে ওর পিছন দিকে থাকতে যাতে ও মুখ ফেরালে প্রোফাইলটা দেখতে পায়। কিন্তু ও কদাচিৎ মুখ ফেরায়।

অন্যান্য অভ্যাসগুলো নিছকই অভ্যাস, কিন্তু একটি সম্পর্কে অতুল সচেতন। অভ্যাসটা হল, সারা সকাল ধরে সে জেনে থাকে ওকে সে দেখতে পাবে। এই সামান্য ব্যাপারটায় সে এত উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে মাঝে মাঝে তার হাসি পর্যন্ত পায়। কিন্তু তাহলেও সকালটা তার বেশ লাগে স্টেশনে যতক্ষণ পর্যন্ত না ও আসছে উত্তেজনাটা থাকে। ও এলেই অতুল এক ধরনের স্বস্তি পায় এবং ট্রেনে সত্যিই আরামবোধ করে। অনেকটা আরামদায়ক কোন ঘরে, নিশ্চিন্ত খবরের কাগজ কিংবা গল্পের বই পড়তে পড়তে শুধু অনুভব করা কাছেই ও আছে। নিজেকে সে মনে মনে বলে, ঠিক এই রকম, অনেকটা এই রকমই।

কিন্তু ট্রেন কলকাতায় পেঁছালেই কামরার লোকেরা দরজার কাছে ভিড় করে এলেই ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যায়। উত্তেজনাটা তখন আর একরকমের, সেটা একদমই ভাল লাগে না তার। অতুল জানে ট্রেন থেকে নেমে কোনপথ দিয়ে ও ট্রাম স্টপ পর্যন্ত যাবে। যদি একদিন সকালে, আর সবদিনের মতই দুজনে ট্রেনে উঠে কলকাতায় নামে, এবং এই বিশেষ একদিন সকালে ও ট্রাম স্টপে না গিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়েই গেটের ওধারে তার জন্য অপেক্ষা করে, তারপর দুজনে নিরিবিলি কোথাও গিয়ে বসে। যদি এমন হয়!

ওর সঙ্গে কি করে আলাপ করা যায়, অতুল সেটাই ভাবল। জায়গাটা নতুন তাছাড়া লোকসংখ্যাও যথেষ্ট, ট্রেনেও বেশ ভিড়। গায়ে পড়ে সাদামাটা ভাবেও, কি ভিড় দেখেছেন বলা সম্ভব নয়। সিনেমা হল আছে এবং নিশ্চয়ই লাইব্রেরী আছে। কখনো কখনো মনে হয়েছে, এখানকার লাইব্রেরীতে ভর্তি হয়ে যাবে। ও নিশ্চয় বই পড়ে এবং নিশ্চয়ই লাইব্রেরীটার মেম্বার। কিন্তু অমলা দশটার একমিনিটও বেশি আলো জেবলে রাখতে দেবে না। বেশি রাত পর্যন্ত পড়লে চোখ খারাপ হবে। অমলার সঙ্গে দুই রবিবার সিনেমা দেখতে গিয়েছিল, কিন্তু অতুল ওকে দেখতে পায়নি। বাজারে ছিট কাপড়ের দোকান-গুলোর সামনে এক চায়ের দোকানে পরপর কদিন সে চা খেয়েছে। কিন্তু ব্লাউজের কাপড় কিনতে ও আসেনি। বোধহয় কলকাতাতেই কেনে। গঙ্গার ধারেও পায়চারী করেছে, না, ও গঙ্গার ধারেও আসে না।

একদিন অতুলের মনে হল বৌয়ের সঙ্গে রিক্সায় স্টেশনে আসাটা ঠিক হচ্ছে না। তাই বাড়ি ফিরেই সে বলল, "মিছিমিছি আটটা টাকা বাড়তি খরচ হচ্ছে।"

"কি রকম ?"

"এটুকু পথ তো হেঁটেই যেতে পারি। খাওয়ার পর আস্তে আস্তে হাঁটাটা শরীরের পক্ষে খুবই দরকার হজমে সাহায্য করে। বড় রাস্তাতেই যদি নামিয়ে দাও, তাহলে রিক্সাওলাকে বাড়তি আট টাকা আর দিতে হয় না। বুজুমের একজোড়া চটি হয়ে যাবে।"

অমলা কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "আচ্ছা।" সুতরাং অতুল তারপর থেকে একাই স্টেশনে আসে। একটু কষ্ট হয় দেরি হয়ে গেলে। জোরে হাঁটতে হয় এবং মনে মনে তখন বলে, ওর জন্যই তো কষ্ট করছি, তবে হাত নেড়ে বৌ-এর কাছে বিদায় নেওয়াটা ও এখন থেকে আর দেখতে পাবে না। বৌ আছে জানলে ও আগ্রহী হবে না। ওকে আগ্রহী করতেই হবে কেন না, অতুল আবার মনে মনে বলে, আমি ভালবেসেছি।

যাই হোক, অবশেষে অতুল এটাকে স্বীকারই করে নিয়েছে। অবশ্য বরাবরই, এই রকমই একটা কিছু যে হবে সে জেনে গিয়েছিল, প্রায় প্রথম দিনেই যখন ওকে স্টশনের দিকে আসতে দেখে। ও প্ল্যাটফর্মে ঢোকামাত্র তার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া ঘটে তার মনে হয়েছে ঝাঁকুনি লাগার মতই সেটা।

এখন থেকে তার, ভোরে গঙ্গার ধারের মন্থর বাতাস, ঘাটে জলের আঘাতের শব্দ এমনকি পাটকলের চিমনির ধোঁয়াও ভাল লাগছে অবাক করছে : কুণ্ডলি-পাকান ধোঁয়া ছড়িয়ে যাবার পর সে তারমধ্যে নানারকম প্রাকৃতিক আকার দেখতে পায়। প্রেমের গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত বা ফিল্মের, সে শোনে। বস্তুত অফিস ছুটির পর কয়েকটি ফিল্মও দেখেছে এবং বাড়ি ফিরে বলেছে ট্রেনের গোলমালের জন্য

দেরি হল। একটা ইংরাজী ফিল্মে সে দেখে—দুজন ডিটেকটিভকে নিয়ে ভদ্রমহিলা এক হোটেলের বন্ধ কামরার দরজায় টোকা দিল। বেশ কিছুক্ষণ পর নগ্ন শরীরে তোয়ালে জড়িয়ে এক ভদ্রলোক দরজা খুলেই ভ্যাবলার মত তাকিয়ে রইল। ওরা ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখে বেশ সুন্দরী একটি মেয়ে খাটে শোওয়া, ওদের দেখেই তাড়াতাড়ি গলা পর্যন্ত চাদর ঢাকা দিল। একজন ডিটেকটিভ বলল, 'মিস্টার হোল্ডার, এই মহিলা বলছেন আপনিই মিস্টার বার্টলেট, এর স্বামী।' এই বলে লোকটা খাটের দিকে তাকাল, 'উনি নিশ্চয় মিসেস হোল্ডার।'

'আমি বার্টলেট।' এই বলে বিষণ্ণ চোখে সে স্ত্রীর দিকে তাকাল।

এই দৃশ্যটার আগে পর্যন্ত বার্টলেটের প্রতি একটা চাপা ঈর্ষা অতুল অনুভব করছিল। কিন্তু তারপরই ডিভোর্স, মাসোহারা নিয়ে দরাদরি এবং একমাত্র ছেলেটির অভিভাবকত্ব নিয়ে যা সব হল, তার অনেক কথা না বুঝলেও অতুল অজান্তেই নিজেকে বলে, না এসব নয়। অমলা এরকম কিছু করবে, না, আমিও এভাবে কেলেঙ্কারী করব না।

করব না কেন ? রাত্রে অতুল অনেক কিছু ভাবল। অন্যকোনভাবে কিছু যদি করা না যায় তাহলে বার্টলেটের মত নয় কেন ? পরদিন সকালে স্টেশনে এসে সে ঠিক করল ওকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে হবে : আমরা যদি এভাবে দুজন দুজনকে না পাই তাহলে আর কি করতে পারি ? তুমি যদি আমাকে ভালবাস, দারুণভাবে ভালবাস তাহলে আমি বলতে পারি যা খুশি করতে চাও, করতে পার। যত টাকা অমলা চাইবে সব দেব।

এরপরই অতুল নিজের চিন্তা হৃদয়ঙ্গম করে দারুণ অবাক হয়ে এবং যথেষ্ট মজা পেয়ে বেশ জোরেই হেসে উঠল। তাই শুনে ও মুখ ফেরালো চাপা হাসি নিয়ে। কামরার আরো কয়েকজন অতুলের দিকে তাকিয়ে হাসল। হাতল ধরে দাঁড়িয়ে কোন লোক আপন মনে জোরে হেসে উঠলে সকলে তাকাবেই। কিন্তু ও হেসেছে এবং হাসিটি অত্যন্ত সুন্দর। ও অত্যন্ত সুন্দর।

অতুল সেই মুহূর্ত থেকে ট্রেনের দোলায় ঝিমিয়ে পড়তে পড়তে ভাবল, কোনদিনই নয়। আমি কোনদিনই পারব না আমার এই হাসিটার হাত থেকে রেহাই পেতে।

শীত

একদিন ভোর থেকে ইলাকে পাওয়া গেল না। সতেরো বছরের ডাঁটো মেয়ে, স্বভাবটা ইদানীং ছলবলে হয়ে উঠেছিল। ওর মা, ছায়া, চোখেচোখেই রাখত কিন্তু কতক্ষণই বা তা সম্ভব। স্কুলে যাওয়া ছাড়াও যখন-তখন জানলায় নয়তো সদরে গিয়ে দাঁড়ালে কিই বা করা যেতে পারে। তবু চোখের সামনে না দেখতে পেলেই রান্নাঘর থেকে ছায়া চেঁচিয়ে ডেকে এনে, যা হোক একটা কাজে লাগিয়ে দিত। বাড়িওলার বৌ নাকি একদিন দোতলা থেকে দেখেছিল, ইলা চিঠি নিচ্ছে একটা অপরিচিত ছেলের কাছ থেকে। তাই নিয়ে বেশ কথা কাটাকাটি হয়ে যায়।

"এ বাড়ির বদনাম আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি, আপনি পাড়ায় জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।" বাড়িওলা চেঁচিয়ে বলেছিল আনন্দমোহনকে, "আপনার মেয়ের জন্য কি আমরা পাড়ায় মুখ দেখাতে পারব না? মেয়েকে সামলাতে না পারেন তো উঠে যান।"

এরপর আনন্দ ও ছায়া পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কাঠ হয়ে বসেছিল। কিছুক্ষণ পরই ইলা প্রহারে জর্জরিত হয়। তার ছোট দুটি ভাই সোমেন ও রমেন, তখন ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এরই তিন দিনের মধ্যে ইলা নিরুদ্দেশ হল। আনন্দ ও ছায়া পরস্পরের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

"বলছ কি!"

"হ্যাঁ, ও বেরিয়ে গেছে।"

"চুপ। কেউ যেন না টের পায়।"

"কি করে তা সম্ভব!"

"সম্ভব হতেই হবে। নয়তো এখানে আর বাস করা চলবে না। যাব কোথায়? এত কম ভাড়ায় কোথায় ঘর পাব?"

"খোঁজ নেবে না ও কোথায় গেল?"

সোমেন ও রমেন তখন পড়ার বই খুলে মাথা হেঁট করে বসে থাকল। বেরিয়ে যাওয়াটা যে খুবই লজ্জার ব্যাপার, তা ওরা বোঝে।

আনন্দ থানায় গিয়ে সব কিছুই বলল। কিন্তু বলতে পারল না কাকে তার সন্দেহ হয়। ফিরে এসে ছায়াকে জিজ্ঞাসা করল সেও বলতে পারল না। বাড়িওলার বৌ কাকে দেখেছিল, এখন তা জিজ্ঞাসা করলে জানাজানি হয়ে যাবে। ইলার পাড়ার বা স্কুলের বন্ধুদেরও জিজ্ঞাসা করা যাবে না। যেভাবেই হোক চেপে রাখতে হবে।

দিন কয়েক পর বাড়িওলার বৌ বলল, "কদিন ধরেই ইলাকে দেখছি না যে?"

"ওকে আমার বোনের বাড়ি পাঠিয়েছি।" অত্যন্ত সহজ স্বরে ছায়া বলল। ভেবেচিন্তে সে ঠিক করে রেখেছে বলবে, ইলা এলাহাবাদে তার মাসীর বাড়ি গেছে। সেখানে থেকেই পড়াশুনো করবে। কলকাতা থেকে ওকে এখন দূরে সরিয়ে রাখাই ভাল।

"যা বলেছ। এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা আজকাল। আর রাস্তাঘাটে এত অসভ্যতা শুরু করেছে। কালকের কাগজে দেখনি, পুলিশ দুটো ছেলেমেয়েকে ধরেছে!"

"দরকার কি ওসব দেখে। যে যার নিজের ছেলেমেয়েকে সামলালেই আর এ-সব হয় না।" এই বলে ছায়া প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চাইল। কারণ সে ভালভাবেই জানে, কোন বাপ-মার পক্ষেই সামলানো সম্ভব নয়। এটা শুধু কথার কথা।

"আসবে কবে ইলা?"

"তা বলতে পাচ্ছি না। আমার বোন এদিকে খুব কড়া। পড়ার ক্ষতি হলে একদমই পাঠাবে না। আমি বলেছি পুজোর কি গরমের ছুটিতে একবার যেন আসে। বছরে অন্তত একবার যেন দেখতে পাই।"

"সে তো বটেই, নিজের মেয়ে তো। ওর পড়ার খরচ-টরচ কে দেবে?"

"সব কিছু বোনই দেবে বলেছে। ওর তো ছেলেমেয়ে হয়নি। উনি বললেন, তা কি করে হয়। ইলার জামাকাপড়, স্কুলের বই-মাইনে সব আমরাই দোব। বোন তো প্রথমে রাজি হয়নি।" ছায়া হাসতে থাকল। হাসতে হাসতে দুই ছেলের দিকে তাকাল।

"খাই-খরচ ওর মাসীই দেবে?"

"হ্যাঁ।"

কাজের অজুহাতে ছায়া সরে গেল। আনন্দকে এক সময় সে জানাল এই কথাগুলো। আশ্বস্ত হয়ে আনন্দ বলল, "এছাড়া আর উপায় কি।" তারপর একটু চিন্তা করে বলল, "আর একটা কথা অবশ্য বলতে পারতে, ইলা মাসীর বাড়ি গিয়ে অ্যাকসিডেণ্টে মরে গেছে। নয়তো আজীবন ওকে মাসীর বাড়ি রেখেই যেতে হবে। তা তো কেউ বিশ্বাস করবে না।"

ছায়া আপত্তি করে উঠতে গিয়ে দমে গেল। মাসীর বাড়ি চিরকাল কেউ

থাকতে পারে না। কিন্তু তাই বলে ইলাকে মেরেই বা ফেলা হবে কেন। ও তো ফিরেও আসতে পারে। তখন কি দূর করে দেব? বেশ কয়েকদিন ছায়া এই নিয়ে ভাবল। তার রাগ হল, দুঃখ হল, ভয়ও করল। কেন এইভাবে মুখ পুড়িয়ে গেল, ওর অসুবিধাটাই বা কি হচ্ছিল। সতেরো বছরে কত কিছুই তো ভাল লাগে তাই বলে এত বাড়াবাড়ি কেন? কোথায় কার সঙ্গে যে গেল! বেঁচে আছে কি মরে গেছে তাই বা কে জানে। জেদী, একগুঁয়ে। একটা চিঠি দিয়েও জানাল না। লজ্জায় বোধহয় পারছে না। কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে তো জানাজানি হয়ে যাবে। মেয়ে বিক্রিওলাদের হাতে পড়েনি তো! কিংবা আত্মহত্যাও করতে পারে। কেন করবে? করার মত কি এমন ঘটেছে? অ্যাকসিডেণ্টে যদি মরে যায়! রেলে কাটা গেল কি জলে ডুবে। লাশ সনাক্ত করা গেল না, তাহলে ইলা আর কোনদিনই ফিরবে না।

•

ছায়া অনেক রকম করে ভাবল। কিন্তু আনন্দকে কিছুই বলতে পারল না। শুধু দিন দিন সে শুকিয়ে যেতে লাগল। আর আগের থেকে কম কথা বলে। একদিন ছায়া লক্ষ্য করল, আনন্দও রোগা হয়ে গেছে। লম্বা দেহটা ঝুঁকে পড়েছে। চোখে চোখ রেখে কথা বলে না।

"পুলিশ খোঁজ পেল না এখনো।" বাড়ি ফিরে আনন্দ একদিন বলল, ছায়া কোন কথা বলল না।

পাড়ায় কানাঘুষো উঠেছে, ইলা নাকি পালিয়ে গেছে। সোমেনকে পাড়ার ছেলেরা জিজ্ঞাসা করেছিল। দিদি মাসীর বাড়িতে গেছে এই কথা বলতেই ওরা মুচকে হাসে। ছায়া শুনে কাঠ হয়ে গেল। আনন্দ শুনে কাঠ হয়ে গেল।

বাড়িওলার বৌ জিজ্ঞাসা করল, "ইলা কবে আসছে গো। পুজোর ছুটিতে আসবে তো?"

ছায়া বুঝল তাকে শিকার করতে এসেছে। ফাঁদ পাতছে।

"কি জানি। বোন তো চিঠি দিয়েছে সঙ্গে করে পাঠাবার লোক পাচ্ছে না। ভগ্নিপতির সময় হবে না। আর অতদূর থেকে কি মেয়ে একা আসতে পারে?"

এর দুদিন পরই আনন্দ একজোড়া শাড়ি কিনে আনল। ছায়া সেই শাড়ি দেখিয়ে আনল দোতলায়—ইলাকে পাঠান হবে। কিছুদিন পর একটা চিঠি দেখাল, ইলার লেখা। লিখেছে শাড়ি পছন্দ হয়েছে, তবে না পাঠালেও চলত। মাসী তার কোন অভাবই রাখেনি। সে খুব মন দিয়েই পড়াশুনো করছে। পুজোয় বোধহয় যাওয়া হবে না। তবে সবাইকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

চিঠি পড়ে বাড়িওলার বৌ আর কিছু বলেনি। কিন্তু সোমেন বলল, পাড়ার একজন ইলার মত একটা মেয়েকে নাকি বর্ধমানের ট্রেনে একা যেতে দেখেছে। তাই শুনে ছায়া কি করবে ভেবে পেল না। ইলা যদি ফিরে

আসে! ভয়ে রাত্রে আর তার ঘুম হয় না। পাড়ায় জোড়া জোড়া চোখের সামনে দিয়ে মাথা হেঁট করে ইলা আসছে—এমন একটা দৃশ্য তার চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠতে লাগল। সবাই মুচকে হাসছে। বাড়িওলা তম্বি করছে। আনন্দ কাঠ হয়ে বসে, মাথাটা হেঁট করা। ছায়ার আর ঘুম হয় না। মনে মনে সে ভগবানকে ডাকে ইলা যেন না ফেরে।

আনন্দ বলল, "বলে দাও কলেরা হয়ে মাসীর বাড়িতেই মরে গেছে। কদ্দিন এভাবে চালাবে।"

"তারপর যদি এসে হাজির হয়?"

"আর আসবে না।"

"ও কথা বোলো না।"

"যদি আসে, আমিই ওকে গলা টিপে মারব।"

"পারবে?"

আনন্দ গনগনে চোখে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর চোখ সরিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলে, "কেন পারব না।"

তাই শুনে ছায়া কেঁদে ফেলে।

এর দুদিন পরেই বাড়িওলার বৌ হন্তদন্ত হয়ে এল—"কি শুনছি সব পাড়ায়। ইলা নাকি পালিয়ে গেছে আর তোমরা বলছ মাসীর বাড়ি গেছে?"

"গেছেই তো" ছায়া রুখে উঠল। "আপনি আমার মেয়ের নামে এসব কি বলছেন? মাসীর বাড়ি গেলে কি পালিয়ে যাওয়া হয়, এ কোন দেশী কথা!"

"ওই যে বললে পুজোয় আসবে, এল কই?"

"আসতে পারেনি, আনার লোক ছিল না বলে। পরীক্ষার পর বড়দিনের ছুটিতে আসবে লিখেছে।"

"বেশ দেখা যাক।"

"হ্যাঁ, তাই দেখে নেবেন।"

ঝোঁকের মাথায় কি বলেছে কিছুক্ষণ পরে তা বুঝে ছায়া হতভম্ব হয়ে রইল। খবরটা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল, ইলা আসছে বড়দিনের ছুটিতে, মাসীর বাড়ি থেকে। সারা পাড়া তাকিয়ে রইল বাড়িটার দিকে। বড়দিনের আর মাত্র দশদিন বাকি।

আনন্দ বলল, "একি করলে?"

"তখন কেমন যেন হয়ে গেলুম, মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে এল।"

"এখন কি হবে!"

দুজনেই ভেবে পেল না, কি হবে। ছায়া একবার ফিসফিস করে বলল, "যদি সত্যিই এসে পড়ে!"

আনন্দ হাসবার চেষ্টা করে বলল, "এখন দৈবের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

"দৈবও তো অনেক সময় ঘটে !"

"যারা আশা করে থাকে, তাদের ভাগ্যে ঘটে না।"

"তুমি কি আশা করছ না, ও ফিরে আসুক ?"

"আমি আশা করা ছেড়ে দিয়েছি।"

দেখতে দেখতে বড়দিন এসে গেল। বাড়িওলা আনন্দকে ডেকে বলল, "লোকে হাসাহাসি করবে সেটা কি সইতে পারবেন, তার থেকে বরং চুপচাপ উঠে যান অন্য কোথাও। শুধু আপনাদের নয় বদনাম বাড়িরও তো হয়।"

"বড়দিনের মধ্যেই ওর আসার কথা।"

"আরে মশাই বড়দিন তো কাল। আর কবে আসবে ?"

"আজকের দিনটা পর্যন্ত দেখি।• আপনারা ধরেই নিচ্ছেন কেন যে, আমরা মিথ্যে কথা বলছি।"

বাড়িওলা কিছুক্ষণ আনন্দর দিকে তাকিয়ে থেকে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "আজকের রাতটা কাটুক, কাল নিশ্চয়ই দেখা হবে।"

ঘরে এসে আনন্দ শুয়ে পড়ল। রান্না করে সোমেন-রমেনকে খাইয়ে ছায়াও শুয়ে পড়ল। কারুরই ঘুম আসছে না। কেউই কথা বলছে না। রাত গভীর হতে ছায়া চুপিসাড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সদর দরজায় খিল খুলে অল্প ফাঁক করল। রাস্তার আলোটা বাড়ির গায়েই। রাস্তায় খুব আলো, অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। উঠোনের গা ঘেঁষে দরজা পর্যন্ত রক। ছায়া সেখানে বসল। কদিন ধরে খুব শীত পড়েছে। রাস্তার কুকুরগুলো পর্যন্ত আর ঘুরে বেড়ায় না। জড়োসড়ো হয়ে বসে ছায়া দরজার ফাঁক দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। পিছনে খসখস শব্দ শুনে, চাপাস্বরে বলল, "কে ?"

"আমি।" আনন্দ পাশে এসে দাঁড়াল। "কি কচ্ছ এখানে ?"

"ইলার খুব ভয় কুকুরকে।"

"ঠাণ্ডা লাগবে ঘরে এস।"

ছায়া জবাব দিল না, উঠলও না। রাস্তায় শব্দ হল, কেউ যেন আসছে। ছায়া ঝুঁকে পড়ল। দুটো পাল্লার ফাঁক দিয়ে তাকাল রাস্তায়। শব্দটা এগিয়ে আসতে আসতে আবার মিলিয়ে গেল মোড়ের কাছ থেকে।

"ও আসবে না। আশা করলে তা পূরণ হয় না।"

"কত কিছুই তো কখনো আশা করিনি, পূরণ হল কই ?"

"কি আশা করোনি ?"

"জানি না। জানলে তো আশাই করতুম।"

"কি কি আশা করেছিলে ?"

ছায়া চুপ করে রইল। আনন্দ ওর পাশে বসে আবার জিজ্ঞাসা করল

"সারা জীবনই কেমন ভয়ে ভয়ে কাটল।" ছায়া কেঁপে উঠল শীতে। "ভেবেছিলুম কোন না কোনদিন ভয় কেটে যাবে।"

"কাল ওরা তো ঝাঁপিয়ে পড়বে।"

"কেন, ইলা কি আজ আসবে না। এখনো তো সময় আছে।"

"না, আর আসবে না।" আনন্দ শুকনো স্বরে বলল, ছায়া কুঁকড়ে রইল। কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে বসে থেকে দুজনে ঘরে ফিরে এল।

সেই আবছা মুখগুলো

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দুজন ইতস্তত করল। উপুড় হয়ে, মাথাটা হাড়িকাঠের মত দুই বাহুর মধ্যে রেখে গীতা মেঝেয় শুয়ে, সন্ধ্যা থেকেই এইভাবে শুয়ে থাকে, কিছু করার না থাকলে। ওরা দুজন তাক থেকে পড়ার বই নিয়ে, ঘরের কোণে খাট আর দেয়ালের মধ্যে অল্প জায়গাটুকুতে বসল. খাটটা ইট দিয়ে উঁচু করা, সংসারের তিন-চতুর্থাংশ বস্তু রাখা, ঘরের বাইরে দালানটায় রান্না হয়, রাত্রে ক্যাম্পখাট পেতে অসীম শোয়।

বিড়বিড় করে ওরা পড়ছে। গীতা ওদের দিকে না তাকিয়েই বলল, "সারাদিনই তো শুধু খেলা, হাত-পায়ের নোংরা কাদা ধোবে কে?"

ওরা দুজন গুটিগুটি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, গীতা আবার বলল, "নন্দুকে বলো বাড়ি ফিরতে, দীপ্তদের বাড়ি গেছে।"

নীলু আর বাচ্চু রাস্তার টিউবওয়েলে পরিষ্কার হয়ে. পেট ভরে জল খেল।

"হারুদাদের রকে ক্যারাম খেলছে, যাবি?"

"দেরি হয়ে যাবে, দিদিকে ডাকতে হবে না?" নীলু এক বছরের বড়, স্বরে তা ফুটে উঠল।

দীপ্তদের সদরে দাঁড়িয়ে নীলু চিৎকার করে ডাকতেই ছাদ থেকে ঝুঁকে নন্দু বলল, "একটু পরে যাচ্ছি বল গিয়ে।" নীলু ওর মুখটা দেখার চেষ্টা করল, অন্ধকারে দেখতে পেল না, ফেরার সময় হঠাৎ বাচ্চু হেঁচাক তুলে কুঁজো হয়ে বমি করল। শুধু টিউবওয়েলের জলটুকু বেরোল। কাতর হয়ে বারবার সে বলল, "মাকে বলবি না তো।"

ঘরে এসে ওরা এবার চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করল। গীতা একইভাবে শুয়ে। সাতদিন ধরে একই পদ্য চীৎকার করে পড়ে চলেছে বুঝেও সে চুপ রইল। ভাবনা নন্দুকে নিয়ে। আড্ডা দিয়ে এখনো ফিরল না। কদিন আগে দীপ্তর মেজদাকে অন্য পাড়ার ছেলেরা নাকি মেরেছে, মেয়ে স্কুলের কাছে কি করেছিল বলে। ও-বাড়িতে রোজ রোজ যেতে মানা করা সত্ত্বেও যাবেই। শরীরটাকে হিঁচড়ে তুলে গীতা ভাবল, মারতে মারতে ওকে বাড়ি আনব।

তখনই নন্দু ফিরল। গীতা তীব্রভাবে তাকাল ওর দিকে। চোখ ছলছলে,

উত্তেজনায় মুখে লাবণ্য ধরেছে বলে গীতার মনে হল। তাইতে বুক কেঁপে উঠল। নন্দুর ব্লাউজের বোতাম, খোঁপা, শাড়ির ভাঁজগুলো উপযুক্তভাবে আছে কিনা একপলকে দেখেই গীতা চড় মারতে হাত তুলল। "ও বাড়িতে এতক্ষণ পর্যন্ত থাকার কি আছে? ডাকলে গ্রাহ্য হয় না, সঙ্গে সঙ্গে আসতে পার না?"

"আসছিলুম তো। বুড়িদির শ্বশুরবাড়ি থেকে কাঁঠাল পাঠিয়েছে, জেঠিমা বলল অত বড় কাঁঠাল কে খাবে?"

পড়া বন্ধ করে নীলু, বাচ্চু তাকাল। গীতা উদ্যত হাতটা নামিয়ে নিয়ে বলল, "খেয়ে এসেছিস।"

"গোটাটা খেলি?" নীলু বিশ্বাস করতে পারছে না। বাচ্চু বলল, "দিদির পেট খারাপ হবে, না মা?"

গম্ভীর হয়ে নন্দু শাড়ি বদলাতে লাগল। পড়া ভুলে ওরা তাকিয়ে! গীতা ক্লান্ত স্বরে বলল, "কাপড়গুলো সকাল থেকে সেদ্দ হয়ে পড়ে আছে, কাচবি কখন।"

"চৌবাচ্চায় কি জল আছে। ওপরের ওরা তো সবাই বিকেলে হুড় হুড় করে জল ঢেলে গা ধুল।"

"না থাকে, নীলু টিউকল থেকে এনে দেবে।"

সঙ্গে সঙ্গে নীলু দাঁড়িয়ে পড়ল। বাচ্চু বলল, "আমি কল টিপব।"

কল ঘরে যাবার সময় কাপড়ের ছেঁড়া জায়গাগুলো ঢাকার চেষ্টা করতে করতে নন্দু বলে গেল, "বোরোবার একটা ভাল কাপড় নেই ঘরেও যে পরব তাও নেই।" ওর সঙ্গে নীলু বাচ্চুও বেরিয়ে গেল, গীতা দুই বাহুর হাড়িকাঠে মাথা রেখে আবার শুয়ে রইল।

নিঃসাড়ে ঘরে ঢুকে নৃসিংহ জামা খুলছে টের পেয়েই গীতা উঠে বসল। তাকাচ্ছে না নৃসিংহ তার দিকে। চশমাটা ঘামে পিছলে নেমে এসেছে অনেকখানি। লুঙ্গি পরে চশমাটা আঙুল দিয়ে ঠেলে তুলে দিল।

"কাল রেশন আসবে কি?"

গামছা নিয়ে নৃসিংহ সাবানের বাক্সটা খুলে দেখার ছলে গীতার দিকে তাকিয়েই বেরিয়ে গেল দ্রুত। নন্দুর কাপড় কাচার ধপধপ শব্দ আসছে। গীতা বসে থাকল দেয়ালে ঠেস নিয়ে। নীলু চেঁচাচ্ছে, "দিদি বালতি দে, বাবা টিউকলে চান করবে।"

চোখ বুজে গীতা বসে আছে। সদরে কড়া নেড়ে কে বলল, "অসীম ফিরেছে?"

"না।" নন্দু চেঁচিয়ে বলল।

"ফিরলে বলবেন পটাদা খোঁজ করছিল, যেন বাড়ি থাকে। আমি আবার আসব।"

গীতা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বছর চল্লিশের কালো, বেঁটেখাটো একটি লোক। হাতে ফোলিও ব্যাগ। পাঞ্জাবির বুক পকেটে ঝুলে রয়েছে চশমার একটা ডাঁটি। গলায় প্রচুর চর্বি—তার মধ্যে বসে আছে পাতলা সোনার চেন।

"অসীমকে খুঁজছি।"

"আমি অসীমের মা।" সন্তর্পণে গীতা বলল। লোকটা তখুনি দোকানদারের মত নমস্কার করে বলল, "আগে একবার ঘুরে গেছি বৌদি। আমাদের গ্রামে কাল ফাইনাল খেলা, আমার টিম উঠেছে।" লোকটির মুখ সুখে ভরে উঠল। তারপরই অসহায় কণ্ঠে বলল, "আমার স্টপার ছেলেটার মা আজ সকালেই মারা গেছে।" বলে তাকিয়ে রইল গীতার দিকে। অস্বস্তি বোধ করল গীতা। ভেবে পেল না কি বলা উচিত।

"অসীমই আমায় উদ্ধার করতে পারে।" লোকটি হাঁফ ছেড়ে উঠল।

"ও তো হাবড়া না কোথায় যেন খেলতে গেছে। আসার তো কিছু ঠিক নেই।"

"তাইতো," লোকটি মুষড়ে পড়ল। "হঠাৎ এমন বিপদেই পড়ে গেলুম, মৃত্যুর ওপর তো আর হাত নেই কারু। গেছলুম এক ফার্স্ট ডিভিশন প্লেয়ারের কাছে। তিরিশ টাকা আগাম দোব বলে কবুল করলুম। বলল, আজ সকালেই আর এক জায়গা থেকে টাকা খেয়ে বসে আছে, না গেলে তারা পিঠের চামড়া তুলে নেবে।"

লোকটা জোরে কথা বলে, তড়বড়িয়ে বলে, বেশি বলে। গীতা অভ্যস্ত নয় এইসব কথাবার্তায়! চুপ করে রইল।

"আমি বরং একটু ঘুরে আসছি। দাদা কোথায়?"

"উনি চান করছেন।"

"আচ্ছা আচ্ছা, অসীমকে আমার হয়ে একটু বলবেন। বড্ড বিপদে পড়ে গেছি, মৃত্যুর ওপর তো আর হাত নেই।"

নৃসিংহ ফেরামাত্র গীতা কথাগুলো তাকে জানাল।

"বসতে বললে না কেন? আজই তাহলে খোকা তিরিশ টাকা পেয়ে যেত। ঘুরে আসছি মানে ততক্ষণ আর কাউকে ধরতে গেল। পেয়ে গেলে আর আসবে না।"

হতাশায় নৃসিংহ খাটে গা এলিয়ে দিল। গীতা ব্যস্ত হয়ে নীলুকে বলল, "দেখ তো লোকটা বেশি দূর হয়তো যায়নি। দেখলে ডেকে নিয়ে আসবি!"

নীলুর সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চুও ছুটে বেরিয়ে গেল। বিরক্ত স্বরে নৃসিংহ বলল, "বুদ্ধি করে আটকে রাখবে তো।"

'কিভাবে আটকাবো? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করব না ঘরে এনে বসাব? এক কাপ চা-ও তো দিতে হবে।"

রেগে উঠল গীতা, সদরে এসে উঁকি দিয়ে দেখল। উঠোনের তারে ভিজে কাপড় মেলতে মেলতে নন্দু গুনগুন করছে। একটু পরেই নীলু বাচ্চু ফিরল মাথা নাড়তে নাড়তে।

"তিরিশ টাকা হাতে না নিয়ে খোকার যাওয়া উচিত হবে না।" গীতা ঘরে ঢোকামাত্র নৃসিংহ বলল।

"অত কি দেবে, নবদ্বীপে গিয়ে তো কুড়ি পেয়েছিল।"

"কত বড় একটা মাছ এনেছিল!" বাচ্চু দ্রুত যোগ করল।

"বিপদে পড়ে এসেছে বলেছে যখন, তিরিশ চাইলে তিরিশই দেবে। ফার্স্ট ডিভিশনের যা সব প্লেয়ারের ছিরি, খোকা তাদের থেকে কিসে কম!" নৃসিংহ উঠে বসল, "ওসব নামকা ওয়াস্তেই ডিভিশনের প্লেয়ার, এই বয়সে আমি যা থুদ্দু দোব পারুক দেখি কেউ।"

"গৌতমের সঙ্গে পারবে?" বাচ্চু, ফিসফিসিয়ে নীলুর কাছে জানতে চাইল। আড়ে বাবাকে দেখে নিয়ে নীলু ঠোঁট ওলটালো, "দাদার সঙ্গেই পারবে না।" বাচ্চু সায় দেবার মত চোখ করল।

"আমরা শিখেছিলুম মুখে রক্ত তুলে। তখন তো পাঁচ দশ হাজারের ব্যাপার ছিল না যে টাকার মুখ চেয়ে খেলব। ট্রাম ভাড়া পেলেই বর্তে যেতুম। তবুও তো খেলেছি।"

নৃসিংহ চিবুক তুলে এমনভাবে তাকাল যে ছাব্বিশ বছরের চেনা স্বামীকে গীতার মনে হল এই প্রথম দেখছে। নন্দু গল্পের বই নিয়ে বসেছে। গীতা বলল, "দেখ না নন্দু একটু ভাল চা পাওয়া যায় কিনা, ভদ্রলোক এলে দিতে হবে তো।"

"দীপ্তিদের বাড়ি থেকে?" চোখ না তুলেই নন্দু বলল। "পারব না। কেরোসিন এনেছিলুম এখনো শোধ দেওয়া হয়নি। আর আমি কিছু চাইতে পারব না।"

"তা পারবে কেন, শুধু লোকের বাড়ি খেয়ে আসতে পারবে। সংসারে উপকার হয় যে কাজে তা করবে কেন।"

"করি না? ঝিয়ের মত শুধু তো খেটেই চলেছি। ভাল একটা কাপড়ও জোটে না, একটা সিনেমা পর্যন্ত দেখতে পাই না। শুধু গালাগাল আর মার, এবার যেদিকে দু-চোখ যায় চলে যাব।"

নন্দু গলা কাঁপিয়ে তারপর দপদাপিয়ে বেরিয়ে গেল। বিকৃত করা ছাড়া নৃসিংহ মুখটাকে নিয়ে আর কিছু করতে পারল না। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'রকে গিয়ে বসছি।"

থম্ হয়ে বসে রইল গীতা। নীলু কিছু বলতে যাচ্ছিল, ধমকে উঠল, "তোদের কি পড়াশুনো নেই ?"

রকের একপ্রান্তে কয়েকজন যুবক তাশ খেলছে। কর্পোরেশনের রাস্তার আলোটা দিনেও জ্বলে। বালবটা কয়েক হপ্তা অন্তর কেটে যায়। এবার কবে কাটবে তাই নিয়ে নৃসিংহ ও পরিমলবাবু কথা শুরু করে গাফিলতি, ঘুষ, ভেজাল ইত্যাদির বহুবিধ উদাহরণ দিয়ে মানুষ কি পরিমাণ চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছে প্রমাণে ব্যস্ত হয়ে উঠল। নৃসিংহ বলল, "টাকা না দিলে আজকাল কোন কাজই করান যায় না। খেলবে, তাও টাকার জন্য। আমাদের সময় কি ছিল ? ইজ্জৎ। ট্রফি নোব, ক্লাবের নাম বাড়াবো, তার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারতুম, আর আজকালকার ছেলেরা ?"

রকের প্রান্ত থেকে গলা খাঁকারি দিয়ে কে বলল, "রামায়ণ পাঠ শুরু হল।"

"মনে আছে পরিমলবাবু কে ও'এস বি-র সঙ্গে সেমি ফাইনাল ?"

"দু দিন ড্র হয়েছিল।"

"লিগামেণ্ট ছিঁড়ে গেছে, হাঁটতে পর্যন্ত পারছি না।" নৃসিংহ উত্তেজনায় সিধে হয়ে গেল। গলা কাঁপছে।

পরিমলবাবু একটা বিড়ি এগিয়ে ধরল। নৃসিংহ ভ্রুক্ষেপ করল না।

হারুবাবু এসে দুটো হাত চেপে ধরে বললেন, ক্লাবকে ফাইনালে তুলে দে। এত বড় সম্মান আগে ক্লাবের সামনে কখনো আসেনি। হাত ছাড়া হয়ে যাবে নৃসিংহ তুই থাকতে ? কথাগুলো বুকে গেঁথে গেল। বুঝলেন পরিমলবাবু তখন মনের মধ্যে যা হল কি বলব। অত বড় ক্লাব যেন আমার মুখ চেয়ে রয়েছে।"

"সেই খেলাই তো আপনার কাল হল। পা-টা চিরকালের মত গেল। যাই বলুন, আপনার নামা উচিত হয়নি।"

হা-হা করে নৃসিংহ হেসে উঠল।

"ফাইনালে ক্লাব উঠল। আমার থ্রু থেকেই নেট করল বিশু সামন্ত, এখনও দেখা হলে বিশু বলে—" নৃসিংহ লোকটিকে দেখে উঠে দাঁড়াল। "আপনি কি অসীমকে খুঁজছেন ?"

ঘাড় নেড়ে লোকটি কিছুক্ষণ ধীরে ধীরে বিস্ময় দ্বারা আবিষ্ট হবার পর বলল, "ইস একি চেহারা হয়েছে দাদা। চিনতেই যে পারা যায় না। সেই ছোটবেলায় কবে দেখেছি আর এই। ওহ্ গোরা টিমগুলোর সঙ্গে আপনার সেইসব খেলা। এখন তো আর মাঠেই যেতে ইচ্ছে করে না।"

চশমাটা উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে নৃসিংহ বলল, "থাক থাক, ওসব কথা ভাই আর তুলে লাভ কি ! দিন তো কারু জন্য বসে থাকে না।"

ঝরঝর করে হেসে নৃসিংহ লোকটিকে নিয়ে যেতেই তাশের দলের একজন

চেঁচিয়ে বলল, "পরিমলবাবু, গপ্পো করার যদি দরকার হয় অন্য কোথাও বসে করুন। পাঁচ লক্ষবার ওর গপ্পো শুনেছি, আমাদের বাবারাও শুনেছে। আর পারা যায় না।"

"না না, তোমরা ঠিক জান না। সত্যি কথাই বলে লোকটা। আমরা যে দেখেছি ওর খেলা।" পরিমলবাবু দ্রুত স্থান ত্যাগ করলেন।

ঘোমটা দিয়ে গীতা খাটের ধারে দাঁড়াল। নৃসিংহ ওর দিকে তাকিয়ে লোকটিকে বলল, "যাবে কিনা তা তো বলতে পারব না। বলছিল না গো কাল কোথায় যেন যেতে পারে?"

গীতা কিছু একটা বলল অস্ফুটে। লোকটি দুজনের দিকে ঘনঘন তাকিয়ে কাতর হয়ে পড়ল।

"গ্রামের টিম, কিছুই খেলতে পারে না! একজন অন্তত ডিফেন্সটা যদি সামলে না রাখে তা হলে একেবারে ডুবে যাব। ওরা পাঁচজনকে হায়ার করে নিয়ে যাচ্ছে কলকাতা থেকে।"

"জানি না, ইতিমধ্যে খোকা অ্যাডভান্স নিয়ে ফেলেছে কিনা।" নৃসিংহ চিন্তান্বিতমুখ লোকটিকে দেখাল।

"তাহলে ফেরত দিয়ে দিক, আমি তিরিশ টাকা দিয়ে যাচ্ছি। বলে দিক পায়ে চোট লেগেছে। এর ওপর তো আর কথাই নেই?"

লোকটি সড়াৎ করে চেন টেনে ব্যাগ খুলল। তিনটে দশ টাকার নোট নৃসিংহর দিকে এগিয়ে ধরতেই গীতা চাপা গলায় বলল, "খোকার হাতে দিলেই তো ভাল হয়।"

"তাতে কি হয়েছে। বাবা-মা কি পর?"

লোকটি যে দ্রুত টাকা ধরিয়ে দিতে চায়, নৃসিংহর হাতে গুঁজে দেওয়ার ব্যস্ততার মধ্যেই গীতা টের পেল।

"তা ছাড়া কার হাতে দিচ্ছি সেটাও তো দেখতে হবে বৌদি! দাদাদের কাছে শুনেছি, গোল করে তারপর রেফারিকে জানিয়ে দিলেন হাতে ঠেলে গোল করেছি। সোজা ব্যাপার নয়, মহামেডানের সঙ্গে খেলা ছিল! হাফটাইমে সাপোর্টাররা সব গ্যালারির থেকে নেমে এল ওকে মারবার জন্য। জুতো ছুঁড়ছে, ঢিল মারছে। তখন উনি বললেন, 'ধৈর্য হারাচ্ছেন কেন?' —হ্যাঁ দাদা, বলুন না কি বলেছিলেন?"

"থাক-থাক ওসব কথা।" নৃসিংহর গলা ভারী হয়ে এল। চশমাটা ঘামে নেমে এসেছে। হাতে নিয়ে বাচ্চুর জামায় ডাঁটিটা মুছতে মুছতে বলল, "ঠকিয়ে জিতে দুটো পয়েণ্টই নয় পাওয়া যায়, কিন্তু আনন্দ?"

"শুনলেন তো বৌদি, শুনলেন, এই লোকের হাতে তিরিশ কেন তিন কোটি টাকাও আমি তুলে দিতে পারি। এর ওপর আর কোন কথা চলতে পারে না।"

লোকটি খুব হাসতে থাকল। নৃসিংহ দেখল গীতা একদৃষ্টে বিহ্বল হয়ে তার দিকে তাকিয়ে। চোখে চোখ পড়তেই প্রথম শাড়ি পরা কিশোরীর মত নিজেকে সামলাতে শুরু করল।

"চা হচ্ছে খেয়ে যাবেন।" দরজার বাইরে নন্দুকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে দেখে গীতা বলল।

"না না আমাকে এখুনি ট্রেন ধরতে হবে।" ঘড়ি দেখতে দেখতে উঠে দাঁড়াল। "কাল সকালে ঠিক ন'টায় আসব। ওকে রেডি হয়ে থাকতে বলবেন।" লোকটি চলে যাবার পর নোটগুলো গীতার হাতে দেবার সময় আঙুলের ছোঁয়া লাগল। নৃসিংহ উত্তেজনা বোধ করল তাইতে। কিছুক্ষণ গীতার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বুঝতে পারল, কিছু একটা হচ্ছে তার দেহে, মনে। বহুদিন এমন হয়নি। আনন্দ সহকার সে বলল, "ওদের খেতে দাও।"

নীলু বাচ্চুর খাওয়া দেখতে দেখতে নৃসিংহ বলল, "শুকনো রুটি খেতে ওদের ভাল লাগছে না, একটু বোঁদে আনলে কেমন হয়?"

"না না, ওর থেকে এক পয়সাও নয়।" গীতার স্বরে দু জোড়া চোখের উত্তেজনা দপ করে নিভে গেল। "নীলু কাল সকালেই রেশন দোকানে যাবে। না হলে বাবা দাদা কেউ ভাত খেয়ে বেরোতে পারবে না।"

"মা জানো," গল্পের বই থেকে মুখ তুলে নন্দু বলল, "দীপ্তির কাকা আজ সাড়ে চার টাকা কিলোয় চাল কিনেছে।"

"ওদের কথা বাদ দে।"

রাত হয়ে গেছে, অসীম এখনো ফেরেনি। নৃসিংহ রাস্তায় পায়চারী করে ফিরে আসতেই গীতা বলল, "দূরে গেলে এই রকম দেরি তো হয়ই! কোনদিন কি লক্ষ্য করেছ? মুখ ফুটে একদিনও কি জিজ্ঞেস করেছ, কেমন খেলছিস?"

"কেন কেন, বলেছে নাকি কিছু?"

"বলবে আবার কেন, দেখে বুঝতে পারি না? নয় বাপের মত ওর অত নামই হয়নি।"

গীতার চিবুক ফিরিয়ে নেওয়ার গতিপথটুকুর দিকে তাকিয়ে নৃসিংহ বলল, "ওর খাওয়ার দিকে একটু নজর দিতে হবে। ডিম দুধের ব্যবস্থা করতে হবে।"

"থাক, খুব দরদ দেখান হচ্ছে, দেখো ও তোমার থেকেও ভাল খেলবেখন।"

শুনে নৃসিংহের শরীর চুঁইয়ে সুখ নামতে শুরু করল। ধীরে ধীরে সে আনমনা হয়ে গেল।

অবশেষে অসীম ফিরল। ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়েছে, নন্দুও। নৃসিংহ ওর চলন দেখে এগিয়ে এসে হাত ধরল।

"কোথায় লেগেছে?"

"আবার সেইখানটায়।" ডান উরুতে, হাতের ভর দিয়ে নিচু হয়ে অসীম খাটে বসল। প্যাণ্ট তুলে বাঁ পা ছড়িয়ে বড় করে হাসল। "চুন হলুদ গরম করো তো!"

পায়ের গোছে হাত বুলিয়ে বলল, "দুটো খাস্তা উইং ব্যাক দু পাশে। হুড়হুড় করে ইনসাইড দুটো ঢুকে আসছে, স্টপার কি করবে?"

"হেরে এসেছিস?"

"খেয়ে এসেছিস?"

"আর খাওয়া! টাকা পর্যন্ত দেয়নি। দুটো উল্লুক ব্যাক নিয়ে স্টপার কি করবে? মাইল খানেক প্রায় অন্ধকারে ছুটেছি।"

ঝুঁকে হাত বোলাচ্ছে অসীম। টেরিলিন শার্টের গলা দিয়ে বুকের রোম নৃসিংহের চোখে পড়তে তার মনে হল, পুরো দস্তুর পুরুষ হয়ে উঠেছে ছেলেটা।

"এখনো মিষ্টির দোকান খোলা আছে, আনব?"

"বাড়িতে কিছু নেই?"

"আমি তো জানি খেয়েই আসবি।"

নৃসিংহর হাতে টাকা দেবার সময় গীতা লক্ষ্য করল, অসীম দেখছে। বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। ও জানে না এটা কিসের টাকা। এখন জানানো উচিত হবে কি। তাড়াতাড়ি সদরে গিয়ে নৃসিংহকে দাঁড় করাল।

"কাল তাহলে কি হবে?"

"এখন কিছু বলো না।"

কাগজ জেবলে গীতা চুন হলুদ গরম করে লাগিয়ে দিল।

"জিতলে ব্যাটারা মুরগীর ঝোল খাওয়াবে বলেছিল।" মুখটাকে বেঁকিয়ে অসীম হাঁ করে চিৎ হয়ে পড়ল। ঝুঁকে গীতা বলল, "হ্যাঁরে খুব বেশি লেগেছে কি? একটা লোক এসেছিল, পটাদা নাম বলল। কাল তারকেশ্বরের কাছে ওদের খেলা।"

"রাখো তোমার খেলা। এই পা এখন কি ভোগায় কে জানে।"

"তিরিশ টাকা দেব বলেছে।" গীতা আর একটু ঝুঁকল। অসীমের মুখটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। চামড়া রুক্ষ, গাল চোপসান, কানের পাশের হাড় উঁচু, বুক চ্যাপ্টা, কনুইয়ে শিরার জট। গীতার মনে হল এই বয়সে একটা ছেলের যেমন দেখতে হওয়া উচিত খোকা তা নয়। যেমন করে কথা বলা উচিত তা বলে না। গীতা দুঃখে ভরে উঠল।

অসীম পায়চারি শুরু করল। "লাগছে বেশ।" উবু হয়ে বসার চেষ্টা করতে করতে দাঁড়িয়ে পড়ল নৃসিংহকে ঢুকতে দেখে।

"এর আগেও তো এমন কত লেগেছে, আবার লাফালাফিও করেছিস।"

গীতা লঘু স্বরে বলল, "তোর মত সহ্য শক্তি আমি বাপু কারুর দেখিনি। আর ফোলাটোলাও তো দেখছি না!"

অসীমের মুখ থেকে এক পরত রুক্ষতা মুছে গিয়ে তরলতা ভেসে উঠল। জোড় পায়ে কয়েকবার লাফালো, কাল্পনিক বলে শট করল, তারপর বলল, "ফোলা আছে তো। সাবধান না হলে জন্মের মত খতম হয়ে যাব।"

নৃসিংহ পান খাচ্ছে, হাতে সিগারেটের নতুন প্যাকেট। খাটে বসে বলল, "মিলিটারি টিমগুলোর কাছে কি কম মার খেয়েছি।" লুঙ্গিটা হাঁটু পর্যন্ত তুলে সে মারের দাগ খুঁজতে শুরু করল। তারপর অপ্রতিভ মুখে গীতাকে বলল, "দই ছাড়া আর কিছু পেলুম না।"

"খাটটা পেতে দাও তো মা শোব।" অসীম উঠে দাঁড়াল, গীতা দালানে ক্যাম্প খাট পাতছে সেই সময় নৃসিংহ বলল, "তোকে নেবার জন্য একজন এসেছিল।"

"জানি জানি।"

নৃসিংহ ওকে সাহায্যের জন্য কাঁধ ধরতে হাত বাড়াল।

"ঠিক আছে, এমন কিছু লাগেনি।"

হাতটাকে অগ্রাহ্য করে অসীম দালানে গিয়ে ক্যাম্প খাটে বসল। নৃসিংহ সিগারেট ধরিয়ে তারপর কয়েকটা টান দিল। শুনতে পাচ্ছে অসীমের দই খাওয়ার শব্দ। গলা চড়িয়ে সে বলল, "কি দাম হয়েছে জিনিসের দই সাত টাকা! আমরা আট আনা সেরের রুই দেখেছি, টাকায় চারসের দুধ, খাবে কি, খেলবেই বা কোত্থেকে!"

কোন সাড়া না পেয়ে নৃসিংহ চুপ করে গেল। চাপা স্বরে অসীম বলল, "বাবাকে ভ্যাজভ্যাজ করতে বারণ করো তো মা।"

"বলুক না, তুই অমন কচ্ছিস কেন? মিথ্যে কথা তো আর নয়।"

"জানগো" নৃসিংহ আবার বলতে শুরু করল, "শক্তিবাবু আজ দুঃখ্যু করে বলছিল—মাইনের টাকায় দশদিনের বেশি চলে না, ছেলেটা এম এস-সি পড়া ছেড়ে চাকরি নিয়েছে। পই-পই করে বললুম যেভাবেই হোক তোর পড়ার খরচ চালাবেই, ছাড়িসনি পড়া, ছেলে শুনল না। মুখের ওপর বলল, ভাইবোনেদের ভাত থেকে বঞ্চিত করে বিদ্বান হয়ে আমার কাজ নেই।"

নৃসিংহ অপেক্ষা করল, দালান থেকে কোন কৌতূহল আসে কিনা! তারপর সিগারেটে টান দিয়ে বলল, "বলতে বলতে শক্তিবাবু হাউহাউ করে কি কান্না। একটা কথাই বারবার বলল, বাপের মুখ চেয়ে ভবিষ্যতকে বিসর্জন দিল আমার ছেলে।"

গভীর রাত্রে গীতা বলল, "ওসব গল্প খোকার সামনে কোর না। কষ্ট পায় শুনে। কাল যদি খেলতে না যায় তাহলে কি হবে, টাকা তো নিয়ে রাখলে।"

"টাকা কি আমি নিজের জন্য নিয়েছি ?"

"যদি ভাল না হয় ? টাকা সকালেই ফেরত দিতে হবে তো।"

দুজন চুপ করে রইল। ভারি নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে দুজন কাঠ হয়ে যেতে লাগল। দুজনকে ক্রমশ ভয়ে ধরল। দুজন ধীরে ধীরে ফোঁপরা হতে শুরু করল।

"বলছিল আবার লাগলে জন্মের মত খতম হয়ে যাবে।"

"জানি, আমারও তাই হয়েছিল।"

"কাল টাকা ফেরত দিয়ে দাও। যা খরচ হয়েছে পরে দিয়ে দোব।"

"কাল সকালেই ও ঠিক হয়ে যাবে।"

"ওর ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে।"

"তুমি কি শুধু ওর মুখ চেয়েই কথা বলবে। কাল লোকটা এসে যখন আমায় অপমান করবে ?"

"নয় সইলে।"

"তোমার গায়ে লাগবে না ?"

উত্তরের আশায় সারারাত জেগে রইল নৃসিংহ।

পরদিন সকালে রাস্তায় ভিড় জমে গেল, লোকটি চীৎকার করছে—"ওসব চালাকি আমার জানা আছে। না যায় আপনার ছেলে, টাকা ফেরত দিন, পুরো তিরিশ টাকাই !"

ভিড়ে যারা নবাগত তাদের কৌতূহল মেটাতে লোকটি বৃত্তান্ত বর্ণনার আগে ভূমিকা শুরু করল।—"মশাই, নামকরা প্লেয়ার ছিল কত ভক্তি শ্রদ্ধা করতুম আর সেই মানুষের কি অধঃপতন দেখুন—"

ঘরে নৃসিংহ মাথা নামিয়ে বসে, বাইরে থেকে লোকটির গলা ভেসে আসছে। ঘরে কেউ কারুর দিকে তাকাচ্ছে না। উপর তলার লোকেরা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামার সময় প্রাণপণে এ ঘরের দিকে না তাকিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বাচ্চু বাইরে উঁকি দেবার চেষ্টা করেছিল, নন্দু কান ধরে বসিয়ে দেয়।

"টাকা নিয়েছিলে কেন ? কে নিতে বলেছে ?" ঠকঠক করে অসীম কাঁপছে।

আস্তে আস্তে মাথা তুলে নৃসিংহ তাকাল গীতার দিকে। এটা যৌথ দায়িত্ব, তোমারও অংশ নেওয়া উচিত, তুমি কিছু বলো—এই কথাগুলোই সে যথাসম্ভব চোখে ফুটিয়ে তুলল। দেওয়ালে গীতা স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে; সরাল না।

"তুমি ফুটবল খেলেছ না ঘোড়ার ডিম খেলেছ। জান না আবার লাগলে আমার কি হবে ?"

নৃসিংহ আবার তাকাল গীতার দিকে। এ সংসার কি একা আমারই,

নিষ্ঠুর আমাকেই হতে হবে, তোমার ভাগ কি শুধু স্নেহের ?—এই অভিযোগ তার চাহনিতে উচ্চারিত হল। গীতা শোনার চেষ্টা করল না।

"গালাগালি দিক, থুথু দিক, জুতো পেটা করুক। আমি যাব না, কিছুতেই যাব না।" দু হাতে মুখ ঢেকে অসীম নুয়ে পড়ল।

বাইরে থেকে চীৎকার করে লোকটি অসীমকে ডাকছে। ঘরে সকলেই শুনতে পেল তবু বাচ্চু বলল, "দাদাকে ডাকছে।" নন্দু ধমকাল ওকে। নীলু ফিসফিসিয়ে বলল, "তোর সবতাতেই ওস্তাদি।"

উঠে দাঁড়াল নৃসিংহ। সব কটা চোখ ঝাপটা দিয়ে তার মুখে এসে পড়ল।

"কোথায় যাচ্ছ।" গীতার কাঁপা স্বরে শিউরে উঠল অন্যরা।

"বাবা যেও না," নন্দু হাত ধরল নৃসিংহের। "যে কটা কম পড়েছে আমি দিচ্ছি, আমার জমানো আছে।"

"না।" মাত্র একটি শব্দ মহীরুহ পতনের মত ঘরে ছড়িয়ে গেল।

বাচ্চু অনিশ্চিতভাবে নীলুর কাছে জানতে চাইল, "লোকটা কি বাবাকে মারবে ?"

নৃসিংহকে দেখামাত্রই রাস্তাটা চুপ করে গেল। অলসভাবে সে দুধারে তাকাল। পরিচিতরা তাকে লজ্জা থেকে রেহাই দিতে ঔদাসীন্য দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বারান্দায় মেয়েরা এক পা পিছিয়ে গেল। শিশুরা এগিয়ে এল কৌতূহলে। পথিকেরা কিছু একটা ঘটবে আঁচ করে মন্থর হতে লাগল।

"আপনার সঙ্গে কি শত্রুতা করেছি যে এমন জব্দে ফেললেন ? বলুন বলুন কি করেছি ?" লোকটি চিৎকারের বদলে আর্তনাদ করে উঠল, "বিপদে পড়েই এসেছি প্যাঁচ কষে যদি আরও টাকা আদায় করতে চান, করুন।" পাগলের মত ব্যাগের চেন টানল সে, পাঁচ টাকার একটা নোট বার করে এগিয়ে ধরল। "নিন, নিন, উদ্ধার করুন আমায়।" ঠোঁটের কোণে ফেনা জমেছে লোকটির। চোখে বেপরোয়া চাউনি। "আরও চাই ? বলুন লজ্জার কি, কত দিলে অসীমের পা ভাল হয়ে যাবে ?" ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করল। নৃসিংহর হাতটা টেনে নিয়ে নোটটা মুঠোর মধ্যে গুঁজে দিতে গেল। ভাঙা ডালের মত হাতটা ঝুলে পড়ল। নৃসিংহ নিজেকে টানতে টানতে রকে এনে বসিয়ে দিল। কপাল থেকে ঘাম গড়িয়ে চশমার কিনারে পৌঁছে গেছে। উদাসীনরা স্বাভাবিক হয়ে উঠল। মেয়েরা রেলিং-এ ঝুঁকে।

"বিশ্বাস করছেন না ? নিজেই তো দেখলেন ও খোঁড়াচ্ছে। আপনার টাকা থেকে যেটুকু খরচ করে ফেলেছি শোধ করে দোব, ঠিক দোব। এই কৃপাটুকু অত্যন্ত করুন।"

নৃসিংহ দুই হাত জোড় করে তুলে ধরতেই কুড়ুলের মত দশ টাকার নোট ধরা একটি হাত নেমে এল। অসহায়ভাবে সে চারপাশ, উপরে এবং সদর

দরজায় দাঁড়ানো গীতার দিকে তাকাল। ঘাম গড়িয়ে নামছে কাঁচের উপর। মুখগুলো ক্রমশ আবছা হয়ে এল। কাঁচ ভেদ করে তাকাবার চেষ্টায় কুঁচকে গেল মুখের চামড়া, হাত দুটো ঝুলে পড়ল। মাথা নেড়ে নেড়ে সে বলল, "আমি ধর্মপথে থাকতে চাই! জোচ্চুরির কলঙ্ক এই বয়সে আর আমার মাথায় তুলে দেবেন না।"

"কিন্তু এখন আমি ওর বদলে কাকে পাব? সময়ই বা কোথা। এইভাবে আমার টিমকে ডোবাবেন না, দয়া করুন। আপনি বললেই হবে।"

কে একজন বলল, "অত করে বলছেন ভদ্রলোক, ছেড়ে দিন না ওকে। যা পাচ্ছেন নিয়ে নিন না!"

আর একজন বলল, "ওকেই নিয়ে যান না। এমন থ্রু পাস দেবে, গোল অবধারিত।"

কয়েকটি শিশু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'গোল, গোল, গোল।"

নৃসিংহ আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না। বহু দূরের অস্পষ্ট ঢেউয়ের মত হাজার হাজার চীৎকার মাথার মধ্যে উঠছে আর পড়ছে। মুখের কাছে মুখ এনে লোকটি কি সব বলছে। ঝাপসা কাঁচের মধ্য দিয়ে বহুদিনের বাসি পুরানো লাগছে মুখটা। গ্যালারি থেকে ধাপে ধাপে যেন নেমে এল। নৃসিংহ বুঝতে পাচ্ছে না মুখটা কি চায়। থুথু দেবে, জুতো ছুঁড়বে, ফালাফালা করে চিরবে?

"অনেক খেলাই তো যৌবনে দেখিয়েছেন, বুড়ো বয়সে খেল আর নাই বা দেখালেন।"

"কেন দেখাব না? নৃসিংহ কথা বলার চেষ্টা করল। গলা বুজে গেছে। চেষ্টা করেও গীতার কাপড়ের রঙ ঠাওর করতে পারল না। লোকটা কি বলছে আর শোনা যাচ্ছে না। শুধু আবছা মুখ গ্যালারীতে। চোখ বন্ধ করে নৃসিংহ মনের মধ্যে উঠে দাঁড়াল। আমার থেকেও খোকার ভবিষ্যৎ বড়। ওকে পাঠাব না। থাকো সবাই দাঁড়িয়ে। দেখবে খোকা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরবে।

কে একজন বলল, "ওকে বলে কিছু হবে না মশাই, দেখছেন না স্যায়নার মত কেমন বিড়বিড় করছে। ওর বৌকে গিয়ে বলুন না, ওই তো দাঁড়িয়ে।"

অনেকক্ষণ পর নৃসিংহের মনে হল কে তাকে বাবা বাবা বলে ডাকছে।

"কে খোকা?". ধড়মড়িয়ে সে উঠে দাঁড়াল। রাস্তায় পথিকের আনাগোনা, শিশুরা খেলা করছে আর বাচ্চু অবাক হয়ে তাকিয়ে।

'দাদা তো খেলতে চলে গেছে। ভাত খেয়ে অফিস যাবে না? মা ডাকছে।"

ইমেজ

জ্ঞানশেখর তৈরি হয়েই অপেক্ষা করছেন। চৈত্রের মাঝামাঝি, তিনদিন পরই অন্নপূর্ণা পুজো। সকাল থেকেই ত্বক চিটচিট করে তবু তিনি সাদা ঢলঢলে সুতীর ট্রাউজার্সের সঙ্গে সুতীর ঘি-এ রঙের কোটটাও পরেছেন। কোটের হাতা ছাড়িয়ে নেমে আসা শার্টের কাফ্‌জোড়ায় ময়লা ধরেছে। এইমাত্রই এটা লক্ষ্য করেছেন। ভেবেছিলেন শার্টটা বদলাবেন, তারপর ভাবেন কাফ্‌টা গুটিয়ে লুকিয়ে নেবেন। কি ভেবে আর করা হয়নি। ভেবেছিলেন টাই পরবেন। চুরুটটা হাতে নিয়ে বসে আছেন, কি ভেবে সেটাও ধরাননি। জুতোর চামড়া পিঁজে—দুতিনটে ভাঁজ পড়েছে। নতুন ব্লেডে একটু আগেই দাড়ি কামিয়েছেন। ভিজে ব্লটিংয়ের মত গালে হাত বুলোতে বুলোতে চোখ বুজলেন। ঠাণ্ডা, নরম মসৃণ। তাঁর মনে হল, কোটটা খুলে রাখলে মন্দ হয় না!

তখনি নিচে থেকে মোটরহর্নের বিপবিপ্‌ ভেসে এল। সামনের টেবিলে রাখা ছোট স্যুটকেসটার দিকে তাকিয়ে তিনি জানলায় এলেন।

কালো ফিয়াটটা ঠিক জানলার নিচেই। গাড়ির পিছনের জানলায় রাখা একটুখানি বাহু ও কনুই তিনি দেখতে পেলেন। অলি, বড় নাতনী অলির। ড্রাইভার বংশী কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম জানাল। জ্ঞানশেখর মাথা হেলালেন এবং তাকে উপরে আসতে ইশারা করলেন.।

তিনি নামলেন, পিছনে স্যুটকেস হাতে বংশী। অলি একা নয়, আরো দুটি মেয়ে গাড়িতে। পিছনের দরজা খুলে ধরে অলি বলল, "দাদু এসো।" তিনি ইতস্তত করে সামনের সীটে বসা মেয়েটির দিকে তাকালেন। আশা করছেন মেয়েটি নেমে এসে পিছনে ওদের সঙ্গে বসবে। তাই হওয়া উচিত। এদের মধ্যে তিনিই বয়স্ক, যথেষ্ট বড়ো, অন্তত অর্ধ শতাব্দীর। গাড়িটি তাঁরই ছেলের। সেরা আসনটি তাঁরই পাওয়া উচিত।

মেয়েটি শান্ত চাহনিতে একবারমাত্র জ্ঞানশেখরের দিকে তাকাল। কোলে রাখা রঙিন একটা পত্রিকা। মাথা হেঁট করে আবার মনোযোগী হল। অপ্রতিভ বোধ করলেন জ্ঞানশেখর। ফিকে হাসলেন এবং ছ' ফুট দু ইঞ্চি

দেহটা নুইয়ে পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন। আড়ষ্ট হয়ে বসা ছাড়া উপায় নেই তিনজনের।

"দাদু এরা আমার বন্ধু, জ্যোতি আর রুণা। এরাও যাচ্ছে।"

"বেশ।"

তাঁর পাশেবসা মেয়েটি দুইমুঠি তুলে নমস্কার জানাবার চেষ্টা করল। ভেবেছিলেন হয়তো প্রণাম করবে। উনি জোড়কর কপালে ঠেকালেন, ঈষৎ মাথা নুইয়ে। দেখলেন চুরুটটা এখনো হাতেই রয়েছে। কোটের বুকেপকেটে সেটি রেখে দিলেন।

"আমার দাদু, ওঁর কথা তো বলেইছি।"

পাশের মেয়েটি মাথা হেলাল। সামনের মেয়েটির কানে অলির স্বর যেন পোঁছয়নি মনে হল। এদের মধ্যে কে জ্যোতি আর কে রুণা এখনো তিনি জানেন না।

"কি হল বংশী, দেরি হয়ে যাচ্ছে যে।" অলি জানলা দিয়ে মুখ বার করে বলল। পিছনে কাঁচ দিয়ে দেখার জন্য ঘাড় ফেরাতে গেলেন জ্ঞানশেখর। মেয়েটির বাহুতে ও হাঁটুর কাছে তাঁর দেহের চাপ পড়ল। মেয়েটি যেভাবে কুঁকড়ে গেল তাতে তাঁর মনে হল, যেন এটা প্রত্যাশা করছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সামনে তাকিয়ে নিজেকে কাঠ করে ফেললেন। পিছনে ডালা বন্ধ করার শব্দ হল।

"অ্যাম্বাসাডারটা হলে ভাল হত।" গাড়ি চলতে শুরু করার পর জ্ঞানশেখর বললেন।

"ক্লাচ প্লেটটা স্লিপ করছে। গ্যারেজে পাঠান হয়েছে।" অলি বলল।

"বৌমা যাবে না?"

"মা কাল যাবে ট্রেনে, বাবার সঙ্গে। এখন আর বেশিদূর কারে যেতে পারে না।"

ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে, কোন্ রাস্তা দিয়ে যেতে হবে বলা জ্ঞানশেখরের বরাবরের অভ্যাস। ট্যাক্সিতে উঠেও তাই করেন। এটা তাঁর কাছে তৃপ্তিদায়ক ব্যাপার। গাড়িটা ল্যান্সডাউন থেকে সার্কুলার রোডে পড়ে বাঁ দিকে বেঁকছে, তিনি "আহ্" বলে উঠলেন। বংশী থামিয়ে ফেলল।

"ডাইনে, মৌলালি হয়ে বেলেঘাটা ভি আই পি রোড ধরে চলো।"

"না, বাঁ দিকে যাবে। আমার ক্যামেরাটা নিতে হবে বিডন স্ট্রীট থেকে। তারপর মানিকতলা দিয়ে ভি আই পি।" সামনের মেয়েটি, এতক্ষণে জ্ঞানশেখর নামটা জেনে গেছেন, জ্যোতি, আলতো কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল, বংশী বাঁ দিকেই, চৌরঙ্গি রোডের দিকে গাড়ি ঘোরাল।

জ্ঞানশেখর প্রফুল্লতা হারালেন। তাঁর মনে হল, পরনের কোটটার মতই তিনি

এই গাড়িতে ফালতু লোক। কিন্তু জ্যোতির কণ্ঠস্বর তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। বলার ভঙ্গিতে, বহুকাল পর মৃদু তরল কম্পন তাঁকে ছুঁয়ে গেল। মেয়েটি একবারও মুখ ফেরায়নি বা পিছনের দুজনের কথার মধ্যে অংশ নেয়নি। দুই কান ঢেকে ঝালরের মত মরচে রঙের চুল হলুদ শার্টের কলারের উপর দিয়ে। নাকের ডগা, চোখের পাতা বা চিবুক ছাড়া আর কিছু তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। পাশের মেয়েটি রুণা, ওর রেশমকাপড় থেকে তিনি বাসি সুগন্ধ পাচ্ছেন। অলির কথার পিঠে কথা যুগিয়ে যাওয়াই ওর কাজ। তিনি মাঝে মাঝে কান পাতলেন। যাদের সম্পর্কে ওরা বলছে, তাদের উল্লেখ করছে পদবী বা ডাকনামে—বিজি, সেহনবীশ, ফেনি, জিতা, খোসলা। পদবীগুলো ছেলেদের। ড্রাইভারের জন্য পিছন দেখার ছোট্ট আয়নাটায় তিনি জ্যোতির একটি চোখ ও ঠোঁটের আধখানা কাঁপতে দেখলেন। দেখতে দেখতে একসময় তিনি নিজেকেই বললেন, 'এই মেয়ে কোনদিন কাউকে আপন করবে না, করা সম্ভব নয় এর দ্বারা।' তারপর ভাবলেন, এরা মনে করে, দুনিয়াটা ওদের কাছে বশ্যতা মেনে আছে। তবে এরা, এই জ্যোতিরা, ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের মেজাজে ঠিকই চলে যায়। যায় যেহেতু টান ধরাবার মত চেহারা এদের থাকে আর অবশ্যই কিছু বোবা পুরুষও।

বিডন স্ট্রীটে প্রাচীন একটি বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল। সারিবন্ধ বিবর্ণ খড়খড়ির জানলা আর বালিখসা দুটো মোটা থাম এবং জরাজীর্ণ লোহার ফটক। জ্যোতি নেমে বলল, 'এক মিনিট।' পরনে কাউবয় জিন্স। ছুটে সে বাড়িটার মধ্যে ঢুকে গেল। জ্ঞানশেখর তারিফের ভঙ্গিতে মাথাটা নোয়ালেন। চমৎকার মেয়ে! ও জানে, নিশ্চয়ই জানে বা মনে হয় জানে কি ও পেতে চায়: যত তুচ্ছই চাওয়াটা হোক্ না ঠিকই পেয়ে যায়। এরা যা চায় সে সম্পর্কে এদের স্পষ্ট ধারণা থাকে। তাছাড়া ভগবান এদের আকর্ষণ দিয়েছে, চাওয়া জিনিসটার দিকে ওর কাঁচা বয়স তড়বড় করে এগাতে পারে, একে প্রতীক্ষা করতে হবে না যেভাবে জ্ঞানশেখর নিজে করেছেন। দুনিয়াটাকে ও দৃকপাত না করেই চলে যেতে পারে।

একটি বালক চাকর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'আপনাদের চা খেতে ডাকছেন।'

অলি ও রুণা নেমে গেল। জ্ঞানশেখরকে সঙ্গী হতে বলল না। তিনি আশা করেছিলেন বলবে। চুরুটটা ধরাবার কথা একবার ভাবলেন। তলপেটটা ভার লাগছে। রাস্তায় নেমে কোথাও ভারলাঘব করা যায় কিনা দেখার জন্য যতটা সম্ভব রাস্তাটা সমীক্ষা করে হতাশ হলেন।

ওরা একসঙ্গে ফিরে এল। জ্যোতির কাঁধ থেকে ঝুলছে চামড়ার খাপে ভরা ক্যামেরা। ওদের কথা থেকে জ্ঞানশেখর বুঝলেন এটা জ্যোতির মামাবাড়ি।

ভি আই পি রোডে একটা অ্যামবাসাডর ওদের অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছিল, জ্যোতি হাত বার করে নাড়তে থাকল। মন্থর হয়ে অ্যামবাসাডরের তরুণ চালক দাঁত ঝলসিয়ে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

"বন্ধুর বাড়ি, বসিরহাটে অন্নপূর্ণা পুজো দেখতে। তুমি কোথায় ?"

"এয়ারপোর্টে, দিদিরা আসছে টোকিও থেকে।"

ইতিমধ্যে জ্যোতি ক্যামেরা চোখে তুলেছে। তরুণটি চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে হাসতেই শাটারের শব্দ হল।

"উঠবে তো ?"

"মনে তো হয়।"

"কপি দিও, বাই।" অ্যামবাসাডর গতি বাড়িয়ে দ্রুত ক্ষুদ্রকায় হল।

"গাড়িটার পিক্আপ দারুণ, কে রে জ্যোতি ?"

"দুটো বাড়ি পরে থাকে।"

বাতাসের তাত বাড়ছে। জ্ঞানশেখর কোটের বোতাম খুলে দিলেন। রুণা বলল, "কাঁচটা আরো নামিয়ে দিলে ভাল হয়।"

হাতটা ঘোরাবার জন্য তিনি সামান্য ঝুঁকলেন। রুণার হাঁটুতে তাঁর হাঁটু স্পর্শ করল। রুণা সংকুচিত হল। জ্ঞানশেখরের মনে হল, অলি এদের কাছে নিশ্চয় তাঁর সম্পর্কে কিছু বলেছে। কি বলতে পারে তা তিনি জানেন। দাদু কেন একাকী আলাদা থাকেন, এটা রুণার মত মেয়েরা ওকে জিজ্ঞাসা করবেই। আয়নায় দেখলেন, হু হু বাতাসের বিরুদ্ধে জ্যোতির চোখ তন্দ্রাচ্ছন্নের মত। কানের পাশে ঝাপটাচ্ছে চুলগুলো। জ্ঞানশেখরের মনে হল, এই মেয়ে নিশ্চয় কোন মানুষকে দখল করতে কিংবা বিত্ত বা কেরিয়ারটা গুছিয়ে নেবার জন্য বহু আগে থেকেই নিজেকে মনে মনে তৈরি করে রাখবে। বাজি ধরে বলতে পারেন, যেটা ও চায় সেটা ঠিকই পেয়ে যাবে। আর যদি বুঝতে পারে, কিরকম অদ্ভুত-ভাবে যেন বুঝতে পারে, পাওয়াটা যেরকমভাবে যতটা হওয়ার তা হচ্ছে না, তাহলে সেটাও সময়মত বুঝে যাবে। তখন ও নির্দয়ভাবে ভ্রূক্ষেপ না করে চলে যাবে, কণামাত্র লাবণ্য নষ্ট না করেই।

বসিরহাটে বাড়িতে পৌঁছে গাড়ি থেকে তিনিই প্রথম নামলেন, তারপর জ্যোতি। মাটিতে পা রাখতেই দুই হাঁটু থরথর করে উঠল। এতক্ষণ মুড়ে বসে থাকায় অসাড় হয়ে গেছে। দুমড়ে ভেঙে পড়ছে, হাত বাড়িয়ে গাড়ির দরজাটা ধরতে গিয়ে ফস্কালেন এবং মাটিতে দু হাত রেখে উবু হয়ে বসে পড়লেন। সাহায্য করবে না, এমন এক সিদ্ধান্ত নিয়েই যেন অবিচল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল জ্যোতি। পাঁচ-ছয় সেকেণ্ড পর হেসে ব্যাপারটি চুকিয়ে ফেলে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়েও পারলেন না। অন্যরা গাড়ির মধ্য থেকে তাঁর দিকে তাকিয়ে। কেউ সাহায্য করতে আসেনি সেজন্য কৃতজ্ঞ হলেন। দরকার নেই

কেননা সত্যিই তিনি অথর্ব নন্, বুড়োও হননি; একাত্তর। অবশেষে বংশীই সাহায্য করল বগলের নিচে দু হাত রেখে টেনে তুলে।

"ঠিক আছি ঠিক আছি, পা-টায় ঝিঁঝি ধরেছিল।"

ওদের আগে তিনি বাড়িতে ঢুকলেন। জ্ঞানশেখরের ঘরটি পুবে। দক্ষিণে প্রধান দেউড়ি এবং ঠাকুরদালান। দোতলায় ওঠার আগে তিনি সিঁড়ির পাশে একদা সেরেস্তাখানা বড় ঘরটায় উঁকি দিলেন। আধখানা জুড়ে ধানের বস্তা, একটা চৌকি আর চাষের কয়েকটা যন্তর ও পাম্পসেট। খালিগায়ে অল্পবয়সী একটি ছেলে স্ক্রু ড্রাইভার হাতে। ওঁকে দেখে ছেলেটি সসম্ভ্রমে লুঙ্গিটা হাঁটুর নিচে নামিয়ে বলল, "আমি মঞ্জুল সেখের ছেলে, আপনাদের চাষ করি।"

"ভালো।" জ্ঞানশেখর মাথা হেলালেন। এখনকার কাউকেই তিনি চেনেন না। বছরে একবার কয়েকদিনের জন্য এলে বাড়ির লোকজন বা আজকের দুজন অতিথির মত কেউ ছাড়া, আর কারুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎও সম্ভব নয়। মঞ্জুল আর অঞ্জুল, বছর পনেরো আগে কয়েকটি বাচ্চাকে এনে দেখিয়েছিল। ওদের ব্যাটা, তারই একজন।

"কি হয়েছে এটার?"

"ঘটঘট শব্দ করছে, হঠাৎ জোরে চলে আবার কখনো আস্তে হয়ে যায়।"

জ্ঞানশেখর সিঁড়ির দিকে এগোলেন। পদুর মা নিচে নামছে। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

"কিরে, তুই এখনো বেঁচে আছিস!"

পদুর মা একগাল হেসে মাথা কাত করল।

"সরস্বতী পুজোর সময় এট্টু জ্বর-জ্বর মত হইছিল। তুমি কেমন আছ?"

"ভালো। দিদিমণি কোথায়?"

"উপরে।"

পদুর মা প্রায় সত্তর। এগারো বছর বয়স থেকে এবাড়িতে। জ্ঞানশেখরের বিধবা বোন, ঘাটের কাছাকাছি দেবিকা নামতে নামতে বলল, "কে, দাদা?"

"দেবি কেমন আছিস রে।" জ্ঞানশেখর কয়েক ধাপ উঠে সিঁড়ির বাঁকের চওড়া জায়গাটায় দাঁড়ালেন। দেবি ঝুঁকে প্রণাম করতে উদ্যত, জ্ঞানশেখর "থাক্ থাক্" বলে উঠলেন। আঙুল জুতোয় স্পর্শ করল কিনা বুঝতে পারলেন না। তবে দেবি নিজের হাতের আঙুল মাথায় ছোঁয়াল।

"গরমে কোট পরেছ, দেখছি তো ঘামছো!"

"এপ্রিলে গরম তো হবেই, একশো ডিগ্রি ছিল পরশু।"

"ঘরে যাও। জল দিয়ে রেখেছে, স্নানটা সেরে নাও। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি—চা খাবে? ঘোল কি ডাব কি দুধ?"

"চা-ই ভাল। অলি আর ওর বন্ধুদের বরং ডাবই দিস।"

"তাহলে তোমাকেও ডাব দিই। অলি শেষ মুহূর্তে জানাল আসছে। ওর বন্ধুদের দিয়েছি তোমার পাশের ঘরটা। তোমার বাথরুমটা ওরাও ব্যবহার করবে।"

জ্ঞানশেখর দোতলায় নিজের ঘরে এলেন। ঘরটা একই রকম রয়েছে শুধু আসবাবগুলোর কয়েকটা জায়গাবদল করেছে। বেতের ইজিচেয়ারটা জানলার কাছে নেই। তবে ঘরটা আরামদায়ক শীতল। অ্যাশট্রে, পাপোষ, কুঁজো, মশারি ছোটখাট এইসব নিয়ে কেমন ঘরোয়া, ন্যাওটা ভাব, যেন নিয়মিত বসবাস হয়। ব্যাপারটা তাঁর কাছে একদমই অপরিচিত, বিশেষ করে ঘরের কাছেই যেন অপরিচিত তিনি। কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে এই বাড়ি যতটা টানতো এখন আর তা পারে না। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে জ্ঞানশেখর ভাবলেন এইবার চুরুটটা ধরাবেন। কোটটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ দলা পাকিয়ে, একের পর এক, দমকা বেগে পুরনো কথাগুলো তার মনে এল। সারা বছর ওগুলো তাঁর মনের কোণেই পড়ে থাকে। কিন্তু এখানে এলে তিনি বহু আগের অথচ চোখের আড়াল নয় তার এমনসব দুঃখগুলোকে নিয়ে একবার বাৎসরিক সমীক্ষা করেন।

এই বাড়ি, এটা তাঁরই ছিল কিন্তু এখন তাঁর ছেলে পবিত্রশেখরের। পঁচিশ বছর আগে তিনি সোয়ালাখ টাকায় বাড়িটা ও জমিদারী যাকে বিক্রি করেছিলেন, তার দশ বছর পর সেই লোকটি তার একমাত্র জামাই পবিত্রশেখরকে সবই দান করে। সেই আমলে দামটা ভালই পেয়েছিলেন এবং তখন তার টাকার খুবই দরকার ছিল। যাবতীয় কিছুরই তখন দরকার ছিল। কলকাতায় যে বাড়িতে এখন রয়েছেন, সেটা ওই টাকা থেকেই কেনা। ভাড়াটেদের কাছ থেকে যা পাচ্ছেন তাতেই তার চলে; সাদার্ন অ্যাভিন্যুয়ে পবিত্রশেখরের বাড়ি, শ্বশুরের অ্যাটর্নি অফিসটার পুরো মালিক। তাঁর মনে পড়ল একদিন পবিত্রশেখর তাঁকে বলে, "মা বলছিল, ডিভোর্স করার দরকার নেই।" অবাক হয়ে তিনি বললেন, "এসব কি কথা!" "নানান জায়গায় কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, মানে, মিসেস নাগই হয়তো ছড়াচ্ছেন, কিন্তু ব্যাপারটা তো খুব একটা বাজে কথা নয়, মার সঙ্গে তোমার ব্যবহার তো আমি নিজেই দেখেছি। ব্যাপারটা যদি হয়—অর্থাৎ ডিভোর্স—তাহলে সত্যিই সেটা খুব লজ্জার হবে। আমার বা আমার বৌ কি মেয়ের কথা বাদই দিচ্ছি, বংশের মানমর্যাদার কথাও তুলছি না, কিন্তু মার পক্ষে এটা মারাত্মক হবে, মুখ দেখাতে পারবে না। তাছাড়া আমার মনে হয়, তোমার এই বয়সে এসবের, অর্থাৎ ডিভোর্সের দরকারই বা কি। উনি তো তোমার সঙ্গে এমনিই বসবাস করছেন, তাই করুন না। বহু টাকা নষ্ট করেছ, টাকাকড়ি যা তোমার দরকার হবে আমিই দেব।" পবিত্রশেখর সবশেষে বলেছিল, "মা যদি আত্মহত্যা করে লোকে তোমায় স্কাউন্ড্রেল বলবে।"

রেণুকা নাগ তখন রাজনীতিতে জায়গা পাবার জন্য ব্যস্ত। পার্লামেণ্টে যাবার প্রাথমিক কাজও শুরু করেছে। তার তখন ইমেজ চাই। বিয়ে না করে বসবাস, সেটা তার শত্রুপক্ষের হাতিয়ার। চাপ দিয়েছিল ডিভোর্স করার জন্য। আর অপেক্ষা করে নিজের কেরিয়ার গড়ার কাজে দেরি করতে সে রাজী নয়। জ্ঞানশেখর পারেননি। সাহস হয়নি। তার কারণ, চেয়েছিলেন সন্তানের ইমেজ রক্ষা করতে, বৌমার ইমেজ রক্ষা করতে, সদ্যোজাত নাতনীর ইমেজ রক্ষা করতে। স্ত্রীকে বাঁচাতে। আর আজও ওদের ইমেজ রক্ষা করে যাচ্ছেন—ওদের বাবা, শ্বশুর বা দাদু যে ভিখিরি নয়, কারুর বোঝা নয়, এটা ওরা এখনো বলতে পারে। ভাগ্যিস বাড়িটা তখন কিনেছিলেন বা ওর নামে লিখে দেননি। রেণুকা বিয়ে করেছে এক পাঞ্জাবীকে, এম পি-ও হয়েছিল। কিন্তু সেদিন তিনি ছেলেকে বলেছিলেন, "ভাবছি কলকাতার বাড়িটা বিক্রি করে বাঙ্গালোরে পরিতোষের কাছে চলে যাব। ওখানে ভাল প্র্যাকটিস জমিয়েছে, কেস-টেস দিয়ে আমাকে হেল্প নিশ্চয়ই করবে।" তিনি জানতেন ঠিক এই ধরনেরই কিছু একটা পবিত্রশেখর চাইছে। তবে মাসখানেকের বেশি বাঙ্গালোরে বাল্যবন্ধুর বাড়ি তিনি থাকেননি।

দরজার বাইরে বারান্দার মেঝেয় ভারী কিছু একটা রাখার শব্দ হল। মঞ্জুল সেখের ছেলে ডাবের কাঁদি আর দা হাতে। অলি তার দুই বন্ধুকে নিয়ে হয়তো নদী দেখতে গেছে কিংবা ঠাকুর দালানে।

"তুমি বরং ডাবগুলোর মুখ ছুলে রেখে দিয়ে যাও। ওরা এখুনিই এসে পড়বে। আর আমার জন্য একটা গ্লাসে ঢেলে দাও।"

ছেলেটি চলে যাবার পর জ্ঞানশেখর গ্লাসে চুমুক দিলেন। ঈষৎ নোনতা কিন্তু স্নিগ্ধ। একচুমুকে শেষ করে প্রফুল্ল বোধ করলেন। সিঁড়িতে ধুপধাপ আওয়াজ শুনে বুঝলেন ওরা তিনজন ফিরেছে।

"জ্যোতি তোদের এই ঘরটা। ওপাশেরটা আমার আর এপাশেরটা দাদুর।"

"তুই বুঝি আমাদের সঙ্গে থাকবি না?"

"খাটটায় তিনজন ধরবে না রে। মেঝেয় শুবি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, জ্যোতি কি বলিস আমরা মেঝেয়ই শোব। তাড়াতাড়ি বাপু কর্। আমি কিন্তু সাঁতার জানি না, অলি আমায় টানাটানি করবি না বলে রাখছি।"

শ্বেত পাথরের টেবলে রেখে যাওয়া মুখ ছোলা, গোটা সাতেক ডাবের দিকে তাকিয়ে জ্ঞানশেখরের হঠাৎ একটা ছেলেমানুষী ইচ্ছা হল। হাতে করে ডাবগুলো ওদের ঘরে নিয়ে যাবেন। বিশেষ করে জ্যোতির, মসৃণ গ্রীবা তুলে ডাবে চুমুক দেওয়া তিনি দেখবেন। দৃশ্যটা কল্পনায় প্রত্যক্ষ করে চমৎকার একটা আবেশ অনুভব করলেন। মনোযোগ দেবার মত একটা মানুষের দেখা

বহু বিরস নিঃসঙ্গ বছরের পর পেয়েছেন। কথা বলে নিশ্চয় মজা পাওয়া যাবে; এই পৃথিবীটাকে কি চোখে দেখছে, আকাঙ্ক্ষা কতটা, সেটা পূরণে কতটা এগিয়েছে বা কতটা মোহভঙ্গ ঘটেছে—তার ফলে দার্শনিক কথাবার্তা শিখেছে কিনা। বহুদিন বাচ্চা মেয়েদের সঙ্গে খুনসুটি করা হয়নি। দু হাতে দুটো ডাব নিয়ে নজরানা দেবার ভঙ্গিতে হাজির হলে নির্ঘাৎ ও গাম্ভীর্য রাখতে পারবে না।

জ্ঞানশেখর ঠিক করলেন বারান্দা দিয়ে না গিয়ে বাথরুমের সঙ্গে পাশের ঘরের যে দরজাটা, সেটা দিয়ে যাবেন। বারান্দায় রুণা আর অলি তোয়ালে হাতে দাঁড়িয়ে। ওদের ডেকে ডাবগুলো দেবেন কিনা ভাবলেন। আগে জ্যোতিকে তারপর ওদের, ঠিক করলেন।

দুটি ডাব হাতে বাথরুমে ঢুকে তিনি দেখলেন পাশের ঘরের সঙ্গে লাগোয়া দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে আছে। হয়তো ওদের কেউ বাথরুমে এসে ফিরে যাবার পর দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছে। ডান হাতের ডাবটা দিয়ে দরজায় টোকা দিলেন। জ্ঞানশেখরের মনে হল যেন ঘরের মধ্যে থেকে ভেসে এল "এক মিনিট।" তারপর মনে হল বোধহয় ভুল শুনেছেন। স্বরটা যেন "ভেতরে আয়" বলল। যাদের দু-তিনবার ভিতরে আসতে বলতে হয়, তাদের তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করেন। তাছাড়া এইভাবে বাজে ধারণা তৈরি করিয়ে আলাপ শুরু করাটা মোটেই উচিত হবে না।

তিনি দরজাটা খুললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন তার শোনাটা ঠিকই হয়েছিল, জ্যোতি "এক মিনিটই" বলেছিল। ঘরের মাঝখানে, কস্ট্যুম পরার জন্য জ্যোতি কুঁজো হয়ে রয়েছে, নিরাবরণ দেহে। মুহূর্তে জ্ঞানশেখর জেনে গেলেন জীবনের আর যে কটা দিন তাঁর বাকি রয়েছে তা শেষ হয়ে গেল। মেয়েটির চোখে রক্তহিমকরা খুন আর আজীবনের জন্য তাঁর প্রতি ঘৃণার প্রতিশ্রুতি। ঠাণ্ডাগলায় সে বলল, "বেরিয়ে যান এখুনি, নোংরা বুড়োভাম কোথাকার।"

জ্ঞানশেখর ফিরে এলেন তাঁর ঘরে এবং আরামচেয়ারে। আপন মনে চুরুটটা ধরালেন। যা কিছু করলেন সবই দীর্ঘসময় নিয়ে মন্থরগতিতে। হাতে এখন অফুরন্ত সময়, অত্যন্ত বেশিই যেন তাঁর জন্য। তিনি জানেন আর ঘণ্টাখানেক পর থেকেই নিজেকে তিনি একটা ঘৃণ্য কীট হিসাবে ভাবতে শুরু করবেন। কিন্তু তার আগে এই আরামচেয়ারে বসে চুরুটটা শেষ করতে করতে ভয়ঙ্কর একটা সন্ত্রাসের ছক্ নিজের জন্য রচনা করতে থাকবেন।

দুই ভাগে

"বলো আপনার বড় জ্যাঠাবাবুর ছেলে বিনোদবাবু এসেছেন।"

চাকরটির ভ্রূ পলকের জন্য কুঞ্চিত হয়েছিল। তারপরই সৌজন্য স্বরে বলল, "বসুন।"

সে ভিতরের ঘরে ঢুকল। কিছু পরে এসে বলল, "অপেক্ষা করতে বললেন।"

টাইপ করে চলেছে একটি লোক। ফিরেও তাকাল না। টাইপ কাগজগুলো সাজিয়ে রাখছে আর একজন। সে বলল, "দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।"

প্রায় আধ ঘণ্টা পর কাপড়ে জড়ান খাতা আর কাগজের বাণ্ডিল হাতে তিনটি লোক ভিতরের ঘর থেকে বেরোল। ঘণ্টা বাজল। চাকরটি ছুটে গেল, এসে বলল, "ডাকছেন।"

পুরু কাঁচ সেক্রেটারিয়েট টেবলের উপর। ব্রিফ ছড়ানো। নিয়ন আলো জ্বলছে তবু একটা টেবলল্যাম্প। ঘনু মুখ নামিয়ে একটা মোটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছে, থামছে, আবার ওলটাচ্ছে। টাক পড়েছে, মোটা হয়েছে। পাশে দাঁড়িয়ে এক যুবক, হাতে মোটা বাঁধানো বই। বাইরের ঘরের মত এটাও বইয়ে ঠাসা। টেবলের তিন দিকে পাঁচ-ছটা চেয়ার। বিনোদ একটার পিঠে হাত রেখে দাঁড়াল।

তখন ফোন বেজে উঠল। যুবকটি ব্যস্ত হয়ে রিসিভার তুলে কানে দিয়েই মৃদু স্বরে বলল, "স্যার আপনার।"

রিসিভার হাতে নেবার আগে ঘনু ইশারায় বিনোদকে বসতে বলল।

"হ্যাঁ ভালই পরীক্ষা দিয়েছে। স্ট্যাণ্ড করার কথা কি বলা যায়, তবে আশা তো করি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা। এ সময় তো ব্যস্ত থাকিই।"

রিসিভার নামিয়ে রাখতে দেখে বিনোদ বলল, "ঘনু এই দ্যাখ্।"

ভাঁজ করা খবরের কাগজের একটা পাতা, এতক্ষণ যেটা হাতে ধরা রয়েছে, বিনোদ টেবলে রাখল।

"দাঁড়িয়ে কেন বোস।"

"অনেকদিন পর দেখা, বোধহয় বড় জ্যাঠাবাবু মারা যাওয়ার পর এই প্রথম।"

ঘনু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে। হয়তো জিজ্ঞাসা করবে, কেমন আছিস, কোথায় থাকিস, কি কচ্ছিস। বিনোদ পাতাটা তুলে নিয়ে বলল, "এই যে এই খবরটা।"

কাগজটা তুলে লাল পেন্সিল দাগানো জায়গাটা ঘনু পড়তে শুরু করল। যুবকটি দেয়াল ঘেঁষা চেয়ারটিতে গিয়ে বসল। দেয়ালে একটা অয়েল পেইন্টিং। গোঁফওয়ালা মেজকাকা, ঘনুর বাবা। উকিলের পোশাকে, মুখে হাসি, কিন্তু বিনোদ ওকে কখনো হাসতে দেখেনি। কম বয়সী দেখাচ্ছে, কিন্তু মারা গেছেন সাতাশিতে। একবার খবরও দেয়নি, শ্রাদ্ধেও না।

ঘনুর মুখে ভাবান্তর হচ্ছে না। কি ভাবছে সেটা বুঝতে না পেরে বিনোদ খাপছাড়া ভাবে বলল, "সেজন্য মোটেই আত্মহত্যা করেনি, ডাহা মিথ্যে কথা ছাপিয়েছে।"

"কে এই বীরেন্দ্রনাথ?"

"আমার বড় ছেলে।"

ঘনুর বিস্ময়সূচক শব্দ টেবলের এধারে পৌঁছল দেরিতে।

"আমার ছোট মেয়েও এবার পরীক্ষা দিল। তোর কটি ছেলেমেয়ে?"

"তিন ছেলে এক মেয়ে। খোকাই বড়।"

"খোকাই বীরেন্দ্রনাথ? ভেরি স্যাড।"

ঘনু শোকার্ত ভঙ্গিতে মাথা নামিয়ে কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইল। টেবলে অনেকগুলো পেপারওয়েট। তার একটা মুঠোয় চেপে ধরল বিনোদ।

"একটা ছেলেকে মানুষ করে তোলা যে কি জিনিস। ওরা তো ফলাফল ভেবে কাজ করে না। আসলে এই বয়সে ওরা সেন্টিমেন্টাল থাকে।"

ঘনু ব্যথিত স্বরে বলল কথাগুলো। বিনোদ তখন দেখছিল টেবলের কাঁচে তাদের দুজনের ছায়া। ঘোলাটে, বহিঃরেখাহীন দুটো মাথার ছাঁচ টেবলে যেন শোয়ান। খোকার মুণ্ডু আর ধড় আলাদা করে লাশকাটা টেবলে রাখা হয়েছিল।

টেবলে আর একটা মাথা ছায়া ফেলল।

"স্যার পেয়েছি।"

যুবকটি হাতের বইটার পাতা খুলে টেবলে রাখল। ঘনু ঝুঁকে পড়ল। সন্তর্পণে হাত বাড়িয়ে বিনোদ নিজের ছায়াটা মুছল। কাঁচে ঘামের দাগ পড়ল। আবার মুছল। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। অনেকটা খোকার মুখের মত। মুখটা ফুলে রয়েছে। চোখের মণি দুটো বড় হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ঠিক এইভাবেই খোকা একদিন তাকিয়েছিল। কবে যেন ··

বিনোদ মনে করার জন্য এক একটা দিনকে বইয়ের পাতা ওল্টাবার মত অতিক্রম করে অবশেষে গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়াল। ঘাটের উপর তারা মাত্র

দুজন। সে আর খোকা। সে বলল, "কি আর তোকে খাওয়াই, একটা ডিম আর দুটো কলা।"

"না, না, সবাই তাকিয়ে থাকে।"

"ওদের কথা ভেবেই তোর পিছনে খরচ করি। পুষ্টিকর জিনিস না খেলে ব্রেন তৈরি হয় না। লেখাপড়ায় ভাল না হলে, উন্নতি করবি কি করে। আমি তোকে মানুষ করব, এটা আমার কর্তব্য। তুই ছোট ভাইদের মানুষ করবি। এই ভাবেই তো সংসার চলে, জগৎ সংসার। আমি আর কদিন।"

খোকা মাথা নামিয়ে শুনছিল। থুতনি ধরে মুখটা তুলতেই জল নেমে এল চোখ থেকে। মাথা নেড়ে বলল, "আমার ভয় করে ভাবতে। আমি পারব না।"

ওর চোখে কি অদ্ভুত ত্রাস। মণি দুটো বড় হয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসছে। আঙুল ছুঁইয়ে দিতেই ও চোখ বন্ধ করল।

"আমার ছেলে?" বিনোদ কাঁচের উপর ছায়াটায় আঙুল রেখে বলল, "সন্ধ্যের পরই খোঁজ শুরু করি।"

"কোথায় খুঁজলি?" ঘনু মৃদুস্বরে বলল।

"ওর সঙ্গে পরীক্ষা দিচ্ছে একটা ছেলে, কাছেই থাকে। তার বাড়ি গেলাম। সে বলল, টুকছিল বলে পরীক্ষার হল থেকে খোকাকে বার করে দিয়েছে। বাজে কথা, এসব কাজ ওর পক্ষে করা সম্ভব নয়।"

বিনোদ স্থির দৃষ্টিতে ঘনুর দিকে তাকিয়ে রইল, যেন অনুমোদন না পেলে আর কথা শুরু করবে না। ঘনুও চোখে চোখ রেখে, সামান্য একটু ঘাড়ও নাড়াচ্ছে না। বিনোদ রুক্ষ স্বরে আবার বলল, "এ কাজ ওর পক্ষে সম্ভব নয়।"

"কি করে বুঝলি!"

বিনোদ অসাড় বোধ করল একজোড়া চোখ মতলববাজের মত তাকে তাক করছে দেখে।

"তোর ছেলে কি টুকেছিল? হাতেনাতে ধরে ফেলেছে বলে কাগজে লিখেছে।"

"মিথ্যে কথা লিখেছে। সেইজন্যই এসেছি, মানহানির মামলা করব।"

ঘনু ভ্রূ নাচাল। যুবকটি দুজনের দিকে তাকিয়ে আবার বইয়ে মন দিল।

"তাহলে বার করে দিল কেন?" ঘনু কোণঠাসা প্রশ্ন করল ধাতব কণ্ঠে, দ্রুতস্বরে।

"ভুল করে।"

" সেটা যে ভুল, কে বলল তোকে? ছিলিস সেখানে?"

"ছেলেরা, যারা ওই ঘরে পরীক্ষা দিচ্ছিল, তারা বলেছে।"

"গার্ড যখন ধরল, ওরা কেউ কি তখন তাকে কিছু বলেছিল, প্রতিবাদ করেছিল ?"

বিনোদ চুপ রইল।

"তাহলে ?"

ঘুনু দুই হাঁটু নাচাচ্ছে। গেঞ্জীর নিচে থলথল করছে চর্বি।

খোকা কি এক কথায় খারিজ হয়ে গেল ! বিনোদ অবাক হয়ে ঘুনুর দিকে তাকিয়ে রইল। চোখের পাতা ঝুলে মণির অর্ধেকটাই ঢাকা। তিন-চারটে ভাঁজ চোখের তলায়। স্তিমিত, ধূর্ত, পরিতৃপ্ত চাহনি। বিনোদের গা সিরসির করে উঠল। এই চোখ, ঘুনুর এই চোখই কি উজ্জ্বল দীর্ঘ ছিল ; পুরনো বাড়ির হলঘরের দেয়ালে একটা অয়েল পেইন্টিংয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে ঘুনু বলেছিল, ঠিক কর্ণের মত তাকিয়ে রয়েছে। কি তেজ দেখেছিস !

কোন সময়ের কর্ণ ? ঘুনু বলেছিল, রথচক্র যখন মাটিতে বসে গেছে তখন অর্জুনের দিকে তাকিয়ে যখন বলল এক সেকেন্ড, আগে এটা তুলে নিই, তখনকার কর্ণ।

একি সাইকেলের পাংচার হওয়া টিউব বদল করা ? ঘুনু বলেছিল, অর্জুনটা কাওয়ার্ড স্পোরটিং স্পিরিট দেখাতে পারেনি।

তুই দেখাতে পারতিস ? ঘুনু জবাব না দিয়ে আয়নার সামনে তার দীর্ঘ চোখ থেকে তেজ বার করে দেখাবার চেষ্টা করতে থাকে।

"ঘুনু কি তেজ, কি অহঙ্কার দেখলাম দু চোখে।"

"কার ?"

"খোকার। মর্গে দেখলাম ওর মরামুখে শুধু দুটি চোখ।"

ঘুনু দুহাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল। চাকরটি ঘরে ঢুকে ইতস্তত করে বেরিয়ে গেল। যুবকটি উসখুস করছে।

"সে তো তেজ দেখিয়ে, তার নিজের অহঙ্কার রক্ষা করল। কিন্তু এখন তুই ? লোকে তো বলবে এর ছেলে পরীক্ষায় টুকেছিল।"

"সেইজন্যই তো তোর কাছে এসেছি। বিচার হোক। বিশ্বাস কর, ওর চোখে গ্লানি ছিল না।"

"অতএব আমার ভাইপো নির্দোষ। সে টোকেনি, কাগজে মিথ্যা রিপোর্ট ছেপে তাকে কলঙ্কিত করেছে, তার বংশকে অপমান করেছে। সুতরাং হুজুরের কাছে নিবেদন, আমার ভাইপোকে, বংশকে কলঙ্ক মুক্ত করুন। কারণ তার চোখে—"

ঘুনু থেমে গেল পেপারওয়েট হাতে কাঁপতে কাঁপতে বিনোদকে উঠে দাঁড়াতে দেখে। যুবকটি দ্রুত এসে বিনোদের হাত চেপে ধরল। ঘুনুর মুখে টকটকে রাগ ফেটে পড়ার উপক্রম করছে।

বিনোদ মাথাটা হেলিয়ে বিড়বিড় করে বলল, "আমার ছেলে আত্মহত্যা করেছে, সেজন্য আমি গর্বিত।"

এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য দরজার কাছে এসেছে তখন ঘনু বলল. "নদু তুই ভুল বুঝছিস।"

"কি বললে ?"

তারপরই শুধরে নিয়ে বিনোদ বলল, "কি বললি ?"

ঘনু কথা বলছে। ওর ঠোঁট, গাল আর থুতনির চর্বি নড়াচড়া করছে। কিন্তু বিনোদ তার একটা কথাও শুনতে পাচ্ছে না। এখন লক্ষ-যোজন মাইল দূর থেকে একদল শব্দের ধ্বনি একটা দিনের স্মৃতি গমগম শব্দে বহন করে আনছে। টলতে টলতে তারা বিনোদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি ধ্বনির কণ্ঠে বাবার মুখ। সলজ্জ কাতর চোখ দুটি ফিরিয়ে চুপ করে বসে। অনেকটা এখন যেভাবে ঘনু তাকাচ্ছে।

বহু বছর আগেকার যুবক বিনোদকে দেখতে পেল বিনোদ। পায়চারী করছে আর বাবার দিকে তাকাচ্ছে। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়াচ্ছে, তখন উনি চমকে আড়চোখে তাকাচ্ছেন। এক সময় যুবক বিনোদ বলল, "একবার যা দান করেছ, এতকাল পর তা চেয়ে নিতে তোমার লজ্জা করবে না ?"

"কুঞ্জ বলেছিল ফেরত দেবে।"

"হ্যাঁ বলেছিল, কিন্তু তাকে তুমি বলেছিলে, সারা জীবন তুই আমাদের বাড়ি দুধ বেচেছিস, তিন হাজার টাকার জন্য তোর ছেলের বিলেতে ডাক্তারি পড়তে যাওয়া আটকাবে, এটা কি একটা কথা হল ? টাকা আমায় ফেরত দিতে হবে না।"

"বলেছিলুম। কিন্তু কুঞ্জ তারপরও বলে, বড়বাবু ছেলে যদি মানুষ হয়ে ওঠে তাহলে ও টাকা আপনাকে ফেরত নিতেই হবে। কুঞ্জর ছেলে এখন দিনে হাজার টাকা রোজগার করে। নদু পরশুর মধ্যেই দু হাজার টাকা চাই। মামলাটায় হেরে গেলে এবাড়ি নীলাম হয়ে যাবে। তোর কাকারা আমায় চোর প্রতিপন্ন করবে। আর মুখ দেখাতে পারব না।"

যুবকটি তীব্রস্বরে বলল, "তোমার বয়স তো এখন একাত্তর। বললেই বা চোর কদিন আর তুমি বাঁচবে ?"

"নদু তোকে যে চোরের ছেলে বলবে !"

যুবকটির দিকে তখন একজোড়া চোখ এমনভাবে তাকিয়ে যেন এবারই জীবন শুরু হবে, সামনে একাত্তর বছরের ভবিষ্যৎ যেন পড়ে রয়েছে। কিন্তু যুবক তিক্ত কন্ঠে বলে ওঠে,

"কাকারা যা খুশি বলুক। কিন্তু লোকে যে আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবে, এর বাবা, এর বাবা, এর বাবা।··ফেরত নেবে না বলে যা দিয়েছিল আবার তা ভিক্ষে করে নিয়েছিল।"

"কি বললি ?" চীৎকার করে উঠেছিলেন।

বিনোদ চমকে দেখল ঘনুর হাতে একশো টাকার একটা নোট। ঘাড় নামিয়ে ড্রয়ারটা বন্ধ করছে।

"এটা নে।"

"কেন ?"

"এমনিই দিচ্ছি। কেন, আমি দিলে কি তুই নিবি না? তোর ছেলে-মেয়েদের মিষ্টি খাবার জন্য কি কিছু দিতে পারি না ?'

"ঘনু আমাদের সেই ছবিগুলো নীলামে কারা কিনেছিল জানিস কিছু ?"

"কোন ছবি !"

"যার একটার চোখ দেখে বলেছিলিস কর্ণের মত।"

কয়েক সেকেণ্ড মনে করার চেষ্টার পর ঘনু হেসে ফেলল।

"নাহ্, ওসব ছবির সেণ্টিমেণ্টাল ভ্যালু ছাড়া কোন দাম নেই এখন।"

এই বলেই সে দেয়ালে নিজের বাবার ছবিটার দিকে তাকিয়ে ভ্রু কোঁচকাল। বিনোদও তাকাল।

"আসলে কি জানিস নদু, একটা বংশ বিরাট বটগাছের মত। মাটির তলায় অনেক দূর পর্যন্ত শেকড়টা ছড়িয়ে পড়ে। যদি গাছটা ধীরে ধীরে মরেও আসে, তবু শেকড় অনেকদিন বেঁচে থাকে, আমাদের সেই বাজ পড়ে জ্বলে যাওয়া পাম গাছটার কথা ভাব। কতদিন পর্যন্ত খাড়া ছিল !"

ঘনু মাথা নাড়ল। বিনোদ অস্ফুটে বলল, "কতদিন পর্যন্ত শেকড় বাঁচে ?"

"টাকাটা ধর্। মক্কেলরা বাইরে বসে।"

"কুঞ্জ গয়লার ছেলে এখন বিরাট ডাক্তার। ওর বিলেত যাওয়ার টাকা কে দিয়েছিল জানিস ?"

"শুনেছি বড়জ্যাঠাবাবু দিয়েছিলেন।"

বিনোদ উঠে দাঁড়াল।

"তুই যদি মামলা করতে রাজি হোস তাহলে নেব।"

ঘনু ফিকে হেসে মাথা নাড়ল।

"নদু এ নিয়ে মামলা হয় না। শোকে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। অবশ্য হওয়ার মতই ব্যাপার।"

"তাহলে কি নিয়ে মামলা হয় ?"

কথাটা বলেই বিনোদ টেবলের কাঁচে তাকাল। তার সন্দেহ হল, মর্গে খোকার চোখ তেজ দেখিয়ে না বাসি হয়ে যাওয়ায়, কোন কারণে ফুলেছিল ? হঠাৎ তাহলে কেন ঘনুকে বলতে গেলাম, তেজ ছিল অহঙ্কার ছিল। মিথ্যা বললাম ? তিনদিনের বাসি খোকা ফুলে টসটসে হয়ে দুভাগে ভাগ করা ছিল। ওর চোখে তেজ কি সম্ভব ! ঘনু হয়তো মনে মনে হাসছে।

"মামলা করে কি লাভ হবে তোর ? ধর্ প্রমাণ হল তোর ছেলে টোকেনি, তাহলে বাপ হিসেবে হয়তো মর্যাদা রক্ষা পাবে, ছেলেটা কি তাতে বেঁচে উঠবে ?"

বিনোদ অত্যন্ত অসহায় বোধ করল হঠাৎই। কথাটা কয়েক বারই তারও মনে হয়েছিল। খোকা কোন ভাবেই তো বেঁচে উঠবে না, তাহলে মামলা করে কি লাভ ! আবার মনে হয়েছে তবে মর্যাদাটা বাঁচাবার চেষ্টা করতে দোষ কি ?

"পাবে. রক্ষা পাবে। খোকার মর্যাদা রক্ষা পাবে। সে হীনতা করেনি, এ কথাটা চিরকাল থেকে যাবে। এটাই আমি চাই।"

"চাস নিজের জন্য। এটা সখের ব্যাপার তোর কাছে।"

বিরক্ত ঘ্নন্ন ঘণ্টা বাজাল। চাকর ঘরে ঢুকতেই বলল, "আসতে বল্।" তারপর একশো টাকার নোটটা এগিয়ে ধরল। খবরের কাগজটা পকেটে রাখতে রাখতে বিনোদ বলল,

"না থাক্।"

প্রায় একঘণ্টা পর একই স্বরে বিনোদ বলল, "না থাক্।"

কথাটা বলে বিনোদ আর একবার ঘরের মধ্যে চোখ বোলাল। এতবড় ডাক্তার কিন্তু জিনিসগুলো অতি সাধারণ ও সামান্য। ঘরের কোণে রোগী পরীক্ষার জন্য খাট, একটা বেসিন, আলমারিতে কিছু যন্ত্রপাতি আর ওষুধের শিশি। টেবলে স্তূপকরা নানান ওষুধ কোম্পানীর কাগজের মধ্যে ফাঁকা জায়গা অল্পই।

এই হচ্ছে কুঞ্জর ছেলে। গেটের ধারে বাবার চটি আগলে দাঁড়িয়ে থাকত। ভিতরে ঢোকার সাহস ছিল না। কুঞ্জ দুধ দিয়ে ফিরে এসে চটি পরত। কুঞ্জকে 'তুমি' বলত বিনোদ।

লম্বা চওড়া, ভারী গড়ন। কাঁচাপাকা ঘন চুল। ঢিলে বুশ শার্ট। পুরু ফ্রেমের চশমা। শান্ত গভীর চাহনি। ধীরে কথা বলে। একে 'আপনি' বলতে হবে।

"চলি এখন। আপনি ব্যস্ত মানুষ, আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। এমনিই এসেছিলাম। বাবার সঙ্গে অনেকদিন আগে বোধহয় আপনার দেখা হয়েছিল !"

"তা, কয়েক বছর তো হল, বলেছিলেন ডায়াবিটিসে ভুগছেন। পরীক্ষাও করেছিলাম। সেরে ওঠার প্রশ্নই ছিল না, যে কটা দিন···শেষে কি খুব কষ্ট পেতেন ?"

"না না, তেমন কিছু নয়।"

"বলেছিলাম আবার আসতে।"

বিনোদের মনে হচ্ছে একটা ট্রেনের জন্য সে অপেক্ষায় রয়েছে। ট্রেনটা লেট

করে আসছে, কিন্তু কত দেরিতে আসবে বুঝতে পারছে না। তাই প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে কোথাও যেতেও পারছে না।

"এসেছিলেন ?' কথাটা বলতে বলতে নিশ্বাস নেওয়ার কাজ বন্ধ হয়ে এল বিনোদের। দূরের অস্পষ্ট এলোমেলো শব্দ একটানা হয়ে ক্রমশ যেন বড় হয়ে উঠছে। ট্রেন আসছে বোধ হয়।

"না।" ডাক্তার ললিত ঘোষ মাথা নাড়ল। "দেখাতে আর আসেননি।"

বিনোদ নিশ্বাস ছাড়ল, বুক ভরে নিল।

"তবে অন্য একটা ব্যাপারে এসেছিলেন।"

ললিত ইতস্ততঃ করে টেবলে কলমটা ঠুকতে লাগল। বিনোদ কান পাতল। ট্রেনটা আসছে। খোকা শুয়ে পড়ছে লাইনে গলা রেখে। সার্চ লাইটের আলো থরথর করে লাইনে পড়ছে, পিছলে যাচ্ছে। এবার হুইস্‌ল দেবে, কেন না ড্রাইভার দেখতে পেয়েছে ব্যাপারটা।

"উনি টাকা চাইতে এসেছিলেন।"

বিনোদই বলেছিল ললিতের হয়ে। কৃতজ্ঞ ললিত হাসল।

"বলেছিলাম পরের দিন আসতে। চেক্ নিতে রাজি হননি।"

"এসেছিলেন ?"

ললিত মাথা নাড়ল।

বিনোদ সঙ্গে সঙ্গে যুবক বিনোদকে দেখতে পেল। বিরাট ফাঁকা বাড়িতে একটা চটির শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসতে আসতে হলঘরে এসে থামল। হলঘরে বিনোদ দাঁড়িয়ে। আসবাব, ছবি সবই নীলামদাররা বহু আগেই নিয়ে গেছে। বাড়ি আজই ছেড়ে দিতে হবে।

"রাত্তিরে গেলে হয় না।"

"কেন !"

"দিনের বেলা সবাই ভিড় করে দেখবে।"

"দেখুক না।" বাবা হাসলেন। "চোর নাকি আমরা ?"

ঘরের দেয়ালে চৌকো চৌকো সাদা, ওখানে ছবি টাঙানো ছিল। বিনোদ সেই সাদায় চোখ রেখে বলেছিল, "রাত্তিরে গেলে ক্ষতি কি।"

বাবা গম্ভীর হয়ে গেলেন, চোয়াল শক্ত করে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। অনেক পরে বললেন, "তাহলে রাতেই যাব।"

কণ্ঠস্বরে যেন পাহাড়ের চুড়ো ভেঙে পড়ার শব্দ ছিল। বিনোদ চেষ্টা করল মুখটা দেখতে। কপাল থেকে থুতনি, রেখাটা অসমান চড়াইয়ের মত। পাথরের মত কর্কশ মণি দুটো। গালে জমাট লাভাপ্রবাহের প্রাচীনত্ব। দুই ভুরুতে বন্য গুল্মের ঝোপ। দাঁড়াবার ভঙ্গিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বিশালত্বের অহঙ্কার।

"থাক্, দিনেই যাব।"

"কেন ?"

বাবা ঘুরে দাঁড়ালেন। 'কেন্' শব্দটায় হলঘর ভরে গেল।

"যখনই যাই না কেন, লোকে তোমায় দেখতে পাবেই।"

এই বলে যুবক বিনোদ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, উনি ডাকলেন। বিনোদ ফিরে দাঁড়িয়ে দেখল, প্রান্তরের মধ্যে পাহাড়ের ভেঙে পড়া একটা টুকরোর মত নিঃসঙ্গ একটা লোক।

"নদু যত দীন হবি, ততই আত্মসম্মান বোধ চেপে বসবে। কি লাভ, কি লাভ, এইসব মর্যাদা দিয়ে।"

বিনোদ তাকাল যেভাবে যুবক বিনোদ তখন তাকিয়েছিল। তারপর এখন মাথা নেড়ে বলল, "না থাক্। টাকা আমি ফেরত নেব না। বাবা দিয়েছিলেন, তিনিই যখন আর নিতে আসেননি ·।"

বিনোদ বুক ভরে নিশ্বাস নিল এবং ঘরে আসার পর এই প্রথম গন্ধটা পেল। তীব্র ঝাঁঝালো। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে কিছুক্ষণ এই গন্ধের মধ্যে থাকলে স্নায়ুগুলো কুঁকড়ে আসে। বিনোদের মনে হল বাসি একটা শবদেহ কোথাও পচে ফুলে উঠে টসটস করছে। তাকে গোপন করার জন্যই এই তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধটা। মর্গে এই রকম গন্ধই ছিল। খোকা দু ভাগে টেবলে পড়ে।

"এটা একটা মর্যাদার ব্যাপার। যাচ্ছিলাম এখান দিয়ে ভাবলাম দেখে যাই, এমনিই কৌতূহলে···টাকার কথাটা মনেই ছিল না। আপনি বললেন তাই।"

"আমিও তুলতাম না !" ললিতের চোখ, বিনোদের বসে যাওয়া গাল থেকে জীর্ণ চটি পর্যন্ত ঝটিতি নেমেই, আবার মুখে নিবদ্ধ হল। "উনি বলেছিলেন, যদি আমার ছেলে কি নাতিরা কখনো এসে চায়—আপনি আসতে মনে হল হয়তো।"

বিনোদ স্মিত হাসল। মাথা নাড়ল মৃদু মৃদু। উঠে দাঁড়াল।

"বট গাছটা শুকিয়ে গেলেও, শেকড় যে অনেক গভীরে ছড়ানো, সহজে মরে না।"

বিনোদ আবার হাসল, মাথা নাড়ল এবং বেরিয়ে এল, সদর দরজার কাঠের পাটায় সাদা অক্ষরগুলো আবার পড়ল। আউট্রাম ঘাটের ধারে বেড়াবার সময় বাবা একদিন বলেছিলেন, তার বিলেত যেতে ইচ্ছে করে। ঘাটের একটা গাছের গুঁড়িতে বিনোদ ছুরি দিয়ে 'এন্' খোদাই করছিল, বাবা তখন ধমক দেন।

বিনোদ হাঁটতে হাঁটতে শেয়ালদা স্টেশনে এল। প্ল্যাটফর্মে অসম্ভব ভিড়। দু ঘণ্টা কোন লোকাল ট্রেন আসেনি, বিদ্যুৎ বন্ধের জন্য। বিনোদ সেই শিশু যুবা বৃদ্ধ বালক নারী, প্রভৃতির থিকথিকে ভিড়ের কিনারে অপেক্ষা করতে

লাগল। আধ ঘণ্টা পর একটি ট্রেন আসা মাত্র প্রায় দশটি ট্রেনের যাত্রী সেইটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিনোদ এগিয়েছিল কিন্তু জমাট পিণ্ডাকার মানুষ ভেদ করতে পারল না।

ট্রেনটি ছেড়ে দেবার পর সে যখন প্ল্যাটফর্মের একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তখন চোখে পড়ল মেঝেয় পড়ে থাকা বালাটা। বাচ্চার হাতের, সোনারই হবে। দু-তিন পা এগিয়ে বিনোদ কুড়িয়ে নিল। তাকিয়েই বুঝল সোনার, পকেটে রাখল, সন্তর্পণে দুপাশে তাকাল।

যুবকটি মুচকে হাসল চোখাচোখি হতেই। বিনোদের বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করল। দেখেছে ও। হাতে অ্যাটাসে, গলায় টাই। পায়ে পায়ে বিনোদের পাশে এসে দাঁড়াল।

"কি যেন কুড়োলেন।"

বিনোদ পকেট থেকে বালাটা বার করল। মুখটা পাংশু, হাত কাঁপছে।

"সোনারই।" যুবক বালাটা হাতে নিয়ে ওজন অনুভব করতে করতে বলল, "চার আনার মত মনে হচ্ছে।"

বিনোদ অনুমোদনসূচক মাথা নাড়ল। যুবক এধার ওধার তাকাচ্ছে আর বালা ধরা মুঠোটা খোলা-বন্ধ করতে করতে কি যেন ভাবছে।

"কি করবেন?"

বিনোদ জবাব দিতে পারল না। শুধু অসহায় চোখ মেলে রইল।

বার কয়েক আড়চোখে বিনোদকে লক্ষ্য করে যুবক বলল, "এটা জমা দেওয়া উচিত। দামী জিনিস নিশ্চয় খোঁজ খবর করবে। অবশ্য নাও করতে পারে। সোনা হারালে ফিরে পাবে, এমন আশা করে কেউ কি খোঁজ করবে" হাসল, "আজকালকার দিনে?"

নির্বাক বিনোদ মাথা নাড়ল। ওটা কুড়িয়ে পকেটে রাখলাম কেন? এই প্রশ্নটা এখন তার সর্বাঙ্গে পোকার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটা চুরি করারই চেষ্টা, তাছাড়া অন্য কোন অজুহাত খুঁজে পাওয়া যাবে কি! ও যদি না দেখত তাহলে এটা পকেটেই থাকত। উচিত ছিল নাকি সঙ্গে সঙ্গে জমা দেবার কথাটা ভাবা। বিনোদ মনে করে দেখল, সে একবারও তা ভাবেনি। কিন্তু এই ভদ্রলোক ভেবেছে।

"জমা দেওয়াই উচিত।" বিনোদ বলল।

"হুঁ। তবে খোঁজ নিতে কেউ আসবে না, পড়েই থাকবে। যারা বাচ্চার হাতে এই রকম বালা পরায় তাদের পয়সা আছে। গ্রাহ্যও করবে না। কত দাম হবে মনে হয়?"

সোনার দর বিনোদ জানে না। বিরক্ত হল।

"বলতে পারব না।"

"বাইশ ক্যারেট মনে হচ্ছে। কত আর হবে, গোটা তিরিশ টাকা বড়জোর।"

যুবক আবার আড়চোখে বিনোদকে লক্ষ্য করল। বিনোদ ঘাড় নাড়ল। পোকাগুলো সারা শরীরে কামড় বসিয়েছে। এই বালা, যুবক, স্টেশন থেকে সে এই মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হতে চায়।

"আমি এই রকম একটা বালা করাব ভাবছি, মেয়ের জন্য। তিরিশ টাকাই চেয়েছে।"

যুবক মসৃণ হেসে পকেট থেকে পার্স বার করল :

"হাফাহাফি হোক। আপনার ফিফটি, আমারও।"

"একটি দশ ও পাঁচটি এক টাকার নোট এগিয়ে ধরল যুবক।

"কি লাভ জমা দিয়ে বলুন? যারা অসাবধান, তাদের পানিশমেণ্ট এ ভাবেই হওয়া উচিত। আমার দরকার ছিল পেয়ে গেলাম, আপনিও ফোকটে কিছু পেলেন। ধরুন।"

বিনোদ বোবার মত তাকিয়ে। এই লোকটি দেখতে না পেলে বালাটা নিশ্চয় আমার পকেটেই থাকত। ওটা বিক্রিই করতাম। তখন নিশ্চয় এইসব কথাই নিজেকে বলতাম। এটা যদি প্ল্যাটফর্মে পড়েই থাকত, দেখেও মুখ ফিরিয়ে নিতাম তাহলে অন্য কেউ কুড়িয়ে নিতই। সে কি জমা দিত?

"জমা দেবেন না?"

"আরে দূর মশাই, ধরুন ধরুন। এ রকম কত জিনিস আমাদের হারায়, কোনদিন কি ফেরত পেয়েছেন? ট্রেনেই আমার কলম গেছে। আপনিও ভেবে দেখুন কখনো টাকা মার গেছে কিনা। আর তা পেয়েছেন?"

এক ঝলকে ঘুনুর হাতের নোট বা ললিতের মুখটা বিনোদের মনে পড়ল। সে বিষণ্ণ হতে হতে ভাবল, খোকাকে ফেরত পাওয়া যাবে না। ঘুনুও বলেছিল, 'ছেলেটা কি বেঁচে উঠবে?'

যুবকের হাত থেকে নোটগুলো বিনোদ নিল।

ট্রেনে বিনোদ অনুভব করল, তার সর্বাঙ্গে পোকার কামড় বা চলাফেরা সে আর অনুভব করছে না। আর একবার তার মনে হয়, কি রকম একটা পচা বাসি দুর্গন্ধ যেন সে পাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে সে ভেবে বুঝল, গাদাগাদি মানুষের শরীরের গন্ধ এটা। তারপর এক সময় বিনোদ পকেট থেকে খবরের কাগজের পাতাটা বার করে, দু ভাগে ছিঁড়ে ট্রেনের জানলা দিয়ে ফেলে দেয়।

নিজেকে যে-সব প্রশ্ন

ট্রামে খুবই ভিড়। কোনরকমে একটু পা রাখার জায়গা পেয়ে অশোক হাতল ধরে ঝুলে যাচ্ছে। নামার থেকে ওঠার লোকই বেশি। স্টপেও বেশিক্ষণ তাই দাঁড়াচ্ছে না। ঘড়ি দেখে হিসেব করে সে প্রসন্নবোধ করল। প্রায় ঠিক সময়েই আজ অফিস পৌঁছতে পারবে যদি এইভাবে ট্রামটা চলে।

ট্র্যাফিকের লাল আলোয় ট্রামটা একবার দাঁড়াতে বাধ্য হওয়ায় অশোক বিড়বিড় করে বলল, এই এক ঝামেলা। এবার সামনে মিছিল পড়ুক একটা, ব্যস! এমন সময় হঠাৎ এক মহিলা ছুটে এসে ট্রামে ওঠার চেষ্টা শুরু করলেন। তখন অশোকের সামনের লোকটা খেঁকিয়ে বলল, "পা রাখবারই জায়গা নেই কোথায় উঠবেন ?"

"হসপিটাল যাব, প্লীজ একটু জায়গা দিন, ছেলের খুব অসুখ।"

শোনামাত্র অশোক ওর মুখের দিকে তাকাল এবং চিনতে পারল।

"একটু জায়গা দিন্ না।"

"দোব কোত্থেকে, দেখছেন না ঝুলে যাচ্ছি।"

অসহায়ভাবে ট্রামের দরজায় ভিড়করাদের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে অশোকের মুখের ওপর চোখ পড়ামাত্র থমকে, পূর্ব পরিচয়ের আভাস ফুটে ওঠার উপক্রম হতেই ট্রাম ছেড়ে দিল। অশোক ঘাড় শক্ত করে সামনে চেয়ে রইল এবং একটু পরই নিজেকে প্রশ্ন করল, কেন ?

বাসনার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে সাত না আট বছর আগে ? মুখটি চিনতে একটু সময় লাগে। মুখটি শীর্ণ হয়েছে, পরিপাটি সাজও নেই। কালোপাড় সাদা শাড়ির সঙ্গে গায়ের রঙ, একগাছা সরু চুড়ি, গলায় সরু হার মিলিয়ে ওকে বিধবার মতই দেখাচ্ছে। এই প্রথম, বিধবা বাসনাকে অশোক দেখল। বস্তুত যেদিন বিধবা হল সেদিনই ওকে শেষবার দেখেছিল।

কিন্তু ওকে দেখে আড়ষ্ট হবার কি আছে ? অশোক ট্রামের হাতল আঁকড়ে থেকে বোঝবার চেষ্টা করল। সুকুমারের মরার খবরটা দিতে গেছলাম ওর বেলগাছিয়ার বাসায়। মরার কয়েক মিনিট আগে ঠিকানাটা দিয়েছিল সুকুমার। রাস্তার উপরই কথা বলতে বলতে কার্ডটা হাতে দিয়ে বলেছিল,

একদিন এসো না, বাসনা খুব খুশী হবে। তার আগে অবশ্য সুকুমার বলেছিল, একটা ভাল ফ্ল্যাট দেখে দিতে পার, দুশো পর্যন্ত দিতে রাজি আছি। সাউথে কিংবা তোমাদের ওদিকে। তারপর কার্ডটা দিয়ে বলেছিল পেলে দিও। কুলোয় না আর, ছেলেটা বড্ড দুরন্ত হয়েছে। একটু বড় জায়গা দরকার।

সুকুমারকে দেখে তখন একটু ঈর্ষা হয়েছিল। কিন্তু কেন? সুখী জীবনের চিহ্ন শরীরে লেগেছে বা দামী পোশাক পরার জন্য বা দুশো টাকা ফ্ল্যাট ভাড়া দিতে পারে বলে কি? নাকি সে বাসনার স্বামী শুধু এইজন্যই। অশোক ট্রামের পাদানীতে কোনরকমে একটুখানি পা রেখে বোঝবার চেষ্টা করল। সুকুমার তখন খুব মদ খেয়েছিল। কথাগুলো মাঝে মাঝে জড়িয়ে গেলেও হুঁশ ছিল ঠিকই। একটা পকেট বই ছিল ওর হাতে, মলাটে একটা মেয়েমানুষ পোশাক খুলছে। হেসে বলেছিল এখন এসবই পড়ি বাড়ি ফিরে বাসনা বড্ড সিরিয়াস। তুমি তো জানই। সেই আগের মতই রয়ে গেছে এখনো। শুনে বিদ্রূপ করতে ইচ্ছে করেছিল অশোকের। সিরিয়াসই যদি হবে তাহলে গোটা ফিফথ ইয়ার ধরে বাসনা যে সব কথা বলেছিল, প্রতিজ্ঞা করেছিল. প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা এই সুকুমারকে দেখেই ভেঙে ফেলল কেন?

হাতের বইটা দোলাতে দোলাতে সুকুমার বলেছিল, বোধহয় বইটা একবার রাস্তায় পড়েও যায় তখন, বলেছিল, তাই বলে ভেব না ওকে আমি ভালোবাসি না। অসাধারণ মেয়ে, আমি যে কি ভাগ্যবান তা বলে বোঝাতে পারব না। এত যে খাটি সে ওকে সুখে রাখব বলেই। শোনামাত্র অশোকের মনে হয়েছিল লোকটা খুবই অসুখী আর চালিয়াৎ। বৌকে ভালবাসার কথা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বৌয়ের প্রাক্তন প্রণয়ীর কাছে জাহির করা কেন!

দুটো লোক নেমে যেতেই অশোক একটু ভিতরে ঢোকার সুযোগ পেল। এখন দুটো পায়ের উপর পুরো ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছে। হাতলটা আলতো করে ধরলেই চলে। ভিড়ের চাপটাই শুধু মাঝে মাঝে দম বন্ধ করে দিচ্ছে। যে লোকটা বাসনাকে ওঠার জায়গা দিল না, সে এখন অশোকের পাশেই। অশোক লক্ষ্য করল লোকটার গাল দুটি মেয়েদের মত মসৃণ, দাড়ি ওঠেনি। চোখে ঘুমভাঙার আমেজ। সুকুমার অনেকটা এইরকম চোখে তাকাচ্ছিল পথ চলতি মেয়েদের দিকে। তারপর বলল, আর একটু খেয়ে নিলে হয়। রোজ খেতে দেয় না, রাগারাগি করে আজ অনুমতি দিয়েছে। দুপুর থেকেই খাচ্ছি। ভাল কথা ইন্সিওর করেছ?

সুকুমার হঠাৎ ইন্সিওরের কথা তোলায় অবাক হয়ে গেলাম। বুঝতে পেরে ও বলল, আজ প্রিমিয়াম দিলাম। জানই তো আমার আত্মীয়স্বজন বিশেষ নেই, বিষয় সম্পত্তি তো নেই-ই। হঠাৎ যদি মরে যাই বাসনা আর ছেলেটা অগাধ জলে পড়ে যাবে। মাঝে মাঝে খুব ভয় করে মরার কথা

ভাবলেই। এ শহরকে তো বিশ্বাস নেই। ভাবছি খাওয়াটা ছেড়ে দেব। কোনদিন গাড়ি চাপা পড়ব কে জানে।

এর মিনিট দশেকের মধ্যেই সুকুমার একটা ডবলডেকার চাপা পড়ে মারা গেল। হঠাৎ ও, আর একটু খেয়ে নি, বলেই হনহনিয়ে চলে যায়। তখন বিকেল শেষ হবার মুখে। পশ্চিম আকাশে রাশ টানা তেজী ঘোড়ার মত একটা মেঘ থমকে আছে। সূর্যরশ্মি তার কেশরে চিকচিক করছে ঘামের মত। কিছুক্ষণের জন্য অশোক তাকিয়েছিল মেঘটার দিকে। তারপর রাস্তা পার হবার জন্য ডানদিকে তাকাতেই দেখল দূরে কি যেন একটা হয়েছে।

সেদিন যদি কৌতূহলী না হতাম তাহলে জানতেই পারতাম না সুকুমার গাড়ি চাপা গেছে। বাসে উঠে বাড়ি চলে আসতাম। সাত বছর দেখা নেই নয় আরো সাত-আট বছর পর হঠাৎ দেখা হয়ে যেত। এইমাত্র যেভাবে দেখা হল। তবে বাসনাকে বিধবা দেখে কৌতূহল নিশ্চয়ই হতো। ট্রাম থেকে নেমে পড়তাম কি? অশোক এখন মাথার উপরের রড এক হাতে ধরার সুযোগ পেয়েছে। বুকে অতটা আর চাপ লাগছে না। নামবার সময় একজন জুতোর ঠোক্কর দিল গোড়ালিতে। এতে বিরক্ত বোধ করল সে।

সেদিন কৌতূহল ছিল। এখনও কি নেই? যদি দেখতাম বাসনার মাথায় সিঁদুর তাহলে? ছুটে গেছল অশোক অন্যদের সঙ্গে। একটা লোক তখন বলেছিল, একদম মরে গেছে কি? আর একজন বলল—সঙ্গে সঙ্গেই, ইন্সট্যান্ট। একজন বলল, সঙ্গী কেউ নেই? অশোক ততক্ষণে দেখে ফেলেছে মৃত লোকটিকে। প্রাণের কোন চিহ্ন থাকা সম্ভব নয়। প্রথমেই মনে পড়েছিল সুকুমারের কথাটা—মাঝে মাঝে খুব ভয় করে মরার কথা ভাবলেই। তারপরই অশোক কাঁপতে কাঁপতে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল। উচিত ছিল ওইখানে চীৎকার করে ওঠা—আমার বন্ধু। কলেজের বন্ধু। একে চিনি আজ দশ-বারো বচ্ছর ওর বাড়ির ঠিকানাও জানি।

তা না করার জন্যই কি এখন বাসনাকে দেখে আড়ষ্ট হলাম? অশোক লক্ষ্য করল একটি বসা লোক নড়াচাড়া করছে, হয়তো উঠবে। কি মনে হয়েছিল সেই মুহূর্তে। অশোক মনে করার চেষ্টা করল বাসনাকে দেখতে ইচ্ছে করেছিল? সুকুমারের মৃত্যুতে খুশী হয়েছিলাম? বাসনাকে খবরটা পৌঁছে দেবার কর্তব্যবোধ জেগেছিল? তা কি করে হয়, তা হলে তো প্রথমেই চেঁচিয়ে ওঠা উচিত ছিল! তা না করে ছুটে একটা বেলগাছিয়ার বাসে উঠে পড়েছিলাম। ওঠার পরই মনে হয়েছিল এভাবে লাফিয়ে ওঠা উচিত হয়নি। হাতলটা ফসকে গেলে চাকার নীচে চলে যেতে পারতাম!

বসা-লোকটি এইবার উঠছে। অশোক হাঁটু দিয়ে পাশে দাঁড়ানো মসৃণ গাল লোকটির পথ আটকে রইল। বুঝতে পেরে মসৃণ গাল বাঁকা সুরে বলল,

"বসতে চান তো বসুন না।" শোনামাত্র ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল অশোকের মাথা। খানিক আগেই লোকটা বাসনাকে উঠতে দেয়নি, অথচ এমন ভাব করল যেন ওর দাক্ষিণ্যেই বসার জায়গা পেলাম। গম্ভীর মুখে অশোক জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকল। এই ধরনের রাগ তার প্রায়ই হয়। সুকুমারের বাসার কাছে পেঁছেও সেদিন হয়েছিল। বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না আসছিল বাড়িটা থেকে। কড়া নাড়ার বদলে তখন পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করেছিল। খবর পেয়ে গেছে তাহলে। অপ্রিয় কাজটা তার করতে হল না ভেবে ভালও লেগেছিল। তাহলে তো মর্গ থেকে মড়া বার করা, শ্মশানে নিয়ে যাওয়া, এইসব নিয়ে ছুটোছুটি ঝামেলায় পড়তে হতো। চলে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছে তখন বাড়ি থেকে ঝি-গোছের একজন বেরিয়ে এল। তার কাছে জানতে পারল বাড়িওলার মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে গত সপ্তাহে আর বাসনা ছেলেকে নিয়ে পার্কে বেড়াচ্ছে। শোনামাত্র অশোকের মনে হয়েছিল, এখনো পালাবার সময় আছে। এই বিনিয়ে কান্নাটা যদি বাসনার হতো, সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতো। খবর দেওয়ার বিশ্রী কাজটা থেকে রেহাই পেত। তখন অশোকের রাগ ধরেছিল নিজের উপর, সুকুমারের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর দু-চার কথা বলেই তো একটা বসে উঠে বাড়ি চলে যেতে পারত। ঠিকানা লেখা কার্ডটাই বা নেবার কি দরকার ছিল? না নিলে, এখান পর্যন্ত আসা হত না। রোজই তো কত মানুষ চাপা যাচ্ছে। সেই ভাবেই ব্যাপারটা নেওয়া যেত। দায়িত্ব বোধ থেকেই কি এখানে ছুটে আসা? তাহলে তো প্রথমেই উচিত ছিল সুকুমারেকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়া।

বাসনাকে খানিকক্ষণ লক্ষ্য করে তবেই চিনতে হয়েছিল। সাতবছরের ব্যবধানের জন্য চিনতে যতটা সময় লাগে তার বেশি লাগেনি। শরীরটা ভারী হয়েছে মাত্র। ঘাড় নোয়ালে চিবুকের ভাঁজটি অটুটই আছে, ঝুরো চুলগুলো কপাল থেকে তুলে নিচ্ছে আলতো আঙুলে। বাসনাই প্রথমে বলল, "তাই বলি কে অমন করে তাকাচ্ছে অতক্ষণ ধরে।" বলার মধ্যে সহজ ঝরঝরে ভঙ্গি ছিল। এরপর শোকবার্তাটি দিতে অশোকের ইচ্ছে করেনি। কথায় কথায় সুকুমারের প্রসঙ্গ উঠেছিল।

অশোকের পাশে বসা লোকটি উঠল। অশোক মসৃণ গালের দিকে তাকিয়ে সেই জায়গায় বসার ইসারা করতেই ও তাচ্ছিল্য ভরে ঠোঁট বাঁকাল অশোক ধরে নিল, মসৃণ গালের নামার জায়গা এসে গেছে। বাসনা বলেছিল, তুমি এখনো বিয়ে করছ না কেন? যদি করো তো মেয়ে দেখি। বাসনার পাঁচ বছরের ছেলেটা তখন ছুটোছুটি করছে দু'তিনজন সমবয়সীর সঙ্গে। এদের জন্যই সুকুমার ভাবত, এদের জন্যই ওর মরতে ভয় করত। বাসনাকে তখন অশোক বলেছিল, সুকুমার যদি পাগল হয়ে যায় কি সন্ন্যাস নিয়ে নিরুদ্দেশ হয় তাহলে কি করবে? কথাটা উঠেছিল তখন বোধহয় বাসনা বলেছিল—সুকুমার

ক্লান্ত বোধ করে খাটতে খাটতে, আমি ঠিক ক্লান্তি ঘোচাতে পারি না তাই মদ খেলে আপত্তি করি না যদি না বাড়াবাড়ি করে।

বাসনা খুব একচোট হেসে বলে, পাগল বা সন্ন্যাসী হওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব। সংসার ও ভীষণ ভালবাসে। আসক্তি খুব। তারপর একটা কথার জবাবে বাসনা বলেছিল, সুকুমারের অস্তিত্ব কোনক্রমেই ভোলা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

আর কি কি কথা হয়েছিল অশোক মনে করার চেষ্টা করল জানলার বাইরে তাকিয়ে। নামার জায়গা এসে যাচ্ছে। বাসনা বলেছিল, তোমাকেও খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তারপর দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। সুকুমারের মৃত্যুর খবরটা দিতে তখন একটুও ইচ্ছে করছিল না। স্পষ্ট এখনো মনে পড়ছে অশোকের, ইচ্ছে করছিল ঠিক প্রেমিক প্রেমিকার মত গভীর আবেগ বা ব্যাকুলতা দমন করে স্থির হয়ে বসে থাকার ভান করতে। নিজেকে তখন কি মনে হচ্ছিল?

ট্রাম থেকে নেমে সন্তর্পণে অশোক রাস্তা পার হল। হাজিরা খাতায় সই করার আগে অফিসের দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হয়ে উঠল। সই করতে করতে মনে হল, বাসনা নিশ্চয় জানে না সেদিন সুকুমারের মৃত্যুটা চোখের সামনে দেখেই ওর কাছে গিয়ে প্রেমিকের মত পাশে বসে থাকার ইচ্ছে হয়েছিল।

চেয়ারে বসে টেবলের ড্রয়ার খুলে পেন্সিল, পেপার ওয়েট, জলের গ্লাস, পিনকুশন ইত্যাদি টেবলে সাজিয়ে রাখবার সময় অশোকের মনে হল, মসৃণ গাল লোকটা ভালই করেছে বাসনাকে ট্রামে উঠতে না দিয়ে। চিনতে পারলে কথা বলতে হত। তখন কি কথা বলতাম?

অশোক দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থেকে নিজেকেই প্রশ্ন করল, কি বলতাম?

আত্মভুক

ঘন-বুনোটের জাল জানলায় আটকান। মাছির মত ছটফট করে খুকীর চোখদুটো। রাস্তা দিয়ে মানুষ হাঁটে, রিকশা, ঠেলাগাড়ি যায়, ইলেকট্রিক ইন্সপেক্টরের মোটর সাইকেলও মাসে দু'একবার আসে, জালের এপার থেকে খুকী তাকিয়ে থাকে। খুকীর কোন কাজ নেই। ঘড়ির দিকে তাকায়, ঠিক পাঁচ মিনিট পরেই বাবা অফিস বেরিয়ে যাবে। তারপরেই এক ছুটে চলে যাবে ও হালদার বাড়ি।

নাকের উপর ধুলোর তিলক কেটে দিয়েছে জালটা। জালে চাপড় দেয় খুকী। এইটুকু তো ঘর। লাফিয়ে হাত বাড়ালে কড়িকাঠটাকে বোধহয় ছোঁয়া যায়। জংসন স্টেশনের মত কড়িকাঠের কাটাকুটি। উই পোকায় ঝাঁঝরা করে দিয়েছে বরগা। দরজার চৌকাঠটাও ক্ষয়ে ক্ষয়ে মিশিয়ে এসেছে মেঝের সঙ্গে। ঘরে রোদ্দুর আসে না। লেপ তোষকে ভ্যাপসা গন্ধ। একতলা বাড়ি। ছাদের সিঁড়ি নেই, বিছানা রোদে দেওয়া যায় না। খুকী হাঁপিয়ে ওঠে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। সিমেণ্ট-ওঠা উঠোন। পুরু শ্যাওলা। এখন আর পা হড়কায় না। একপাশে রান্নাঘর আর বাড়িওয়ালী বুড়ী থাকে। খুকী ঘড়ি দেখে আবার, আর এতক্ষণে, যেন এই প্রথম মনে পড়ল, হালদার বাড়িতে একটাও কড়িকাঠ নেই। ঢালাই কংক্রিটের ছাদ। এ পাড়ায় ওই একটি বাড়িতেই ওপর দিকে তাকালে ধবধবে দেওয়াল দেখা যায়। নতুন কালির গন্ধ এখনো ফুরোয় নি। অত তো হাওয়া! আর দরজায় পালিশ। হাত দিলে পিছলে পড়ে হাত। কেউ ডাকেনি, নিজে যেচে আলাপ করা খুব সোজা কথা নয়। তবু অনেকটা সোজা হয় যদি সমবয়সী কোন মেয়ে থাকে, কিন্তু হালদার বাড়িতে মেয়ে নেই, ছোট বউ কম করেও তার থেকে দশ বছরের বড়। হালদার গিন্নী চালচলনে রাশ ভারী, আর বড় বউ যেন মোমে গড়া পুতুল। কি খুশীই না হলো ওরা তাকে দেখে। সেই প্রথম দিনেই মুগ্ধ হয়েছিলো খুকী। ইচ্ছে করে এবাড়ির মেয়ে হয়ে থেকে যায়। গল্প করে এটা—ওটার। সতের নম্বরের ন' পিসির গল্প বলে। হালদার বাড়ির সুন্দর ফুরফুরে বউ দুজন, অবাক চোখে শোনে, আর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বলে, "ওমা, তাই নাকি!"

ওদের বিস্ময়ে খুকী খুব খুশী। সে চাইছিল ওরাও তাকাক তার দিকে, শুনুক তার কথা। ন' পিসিকে ওরা জানে স্বামী পরিত্যক্তা দুঃখিনী! তাই রসিয়ে রসিয়ে খুকী গল্প করে। অল্পবয়সী কোন সম্পর্কের কার সঙ্গে যেন ন' পিসি বেরিয়ে গিয়েছিল, তারপর কেমন করে জানি বাপের বাড়িতে ঠাঁই পেয়েছে। বড় বৌ, ছোট বৌ, দুজনেই খুকীর গা ঘেঁষে আসে। মৃদু তাপ পাওয়া মোমের মত নরম নরম হাত বড় বৌয়ের, খুকীর হাত ছুঁয়ে যায়। ছোট বৌয়ের ডাগর চোখ, খুকীর চোখ পলক না ফেলে তাকিয়ে থাকে। সময় কাটে গল্পে। তারপর খুকী বাড়ি ফেরে। মা ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

"ছিলি কোন চুলোয় এতক্ষণ ?"

"হালদার বাড়িতে।"

স্নান করা বেড়ালের মত চুপসে যায় মা।

"কি রোজ রোজ যাস ওদের বাড়ি। গেলেই তো এটা ওটা খেতে দেবে। ওতে কখনো মান থাকে।"

খুকী চুপ করে থাকে, শুধু আর একটা কথা শোনার জন্য। প্রতিদিনের শোনা কথাটা।

"হ্যাঁরে, আজ কি খেতে দিল রে ?"

তারপরই কথায় কথায় ঢেউ ছড়ায় খুকী, মার প্রশ্নের ঘাটলায়।

প্রায় লাফিয়ে উঠল খুকী। পাঁচটা মিনিট কেটে গেছে অনেকক্ষণ। মা একবার চিৎকার করে ওঠে। "তাড়াতাড়ি ফিরিস। কাপড় সেদ্ধ করতে দিচ্ছি। এসে কেচে দিবি।"

কথাটা শুনতে পেল কি পেল না, খুকী ততক্ষণে হালদার বাড়ির বড় বৌয়ের ঘরের পর্দা সরিয়ে ইতস্তত করতে শুরু করে দিয়েছে। নতুন বালা গড়িয়ে এসেছে। আয়নার সামনে বালাপরা হাতটাই নয় শরীরটাকেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে বড় বৌ। খুকী মুগ্ধ চোখে আয়নাটারই তারিফ করে। কি বড় আয়নাটা! আরশুলা রঙের ড্রেসিং টেবল, গা-ডোবান সোফা, বসলেই আরাম জড়িয়ে ধরে গলা পর্যন্ত। ঝকঝকে রেডিও সেট, রঙীন শেডের ল্যাম্প, ডানলোপিলোর বিছানা। প্রত্যেক দিন খুকী এ সব দেখে, আজকেও দেখল বড় বৌকে দেখার সঙ্গে। তারপর পায়ে পায়ে ঘরের মাঝে এসে দাঁড়াল।

ফুরফুরে হাওয়া আসছে। পাখাটা বন্ধ। তবু হাওয়া আসে। তিনতলায় ঘর। সারা দেওয়ালটাই তো জানলা দিয়ে তৈরি। আলো, আলো আর হাওয়া। ঘুম পেয়ে যায় খুকীর। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, শুধু ঘুমিয়ে থাকতে পারে সে এমন একটা ঘর পেলে। একটু খানির জন্য চোখটা বুজেও আসে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তীক্ষ্ন করে নেয় দৃষ্টিটা। বড় বৌয়ের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠেছে। খুকীর মন দুরুদুরু। না বলে ঘরে

ঢুকেছে, তাই কি ? এবাড়ির রীতি, জিজ্ঞাসা করে ঘরে ঢোকা। কিন্তু সে তো ঝি-চাকরদের জন্য নিয়মটা। না, ঝি-চাকরদের সঙ্গে তার তফাত নিশ্চয় আছে। কথাটা ভেবে মনে মনেই লজ্জা পেল খুকী। কি আক্কেলে সে নিজেকে ঝি-চাকরদের সঙ্গে তুলনা করার কথা ভাবতে পারল।

খুকী আবার তাকায়। বিরক্তি চিহ্নটা নেই। তবু যথেষ্ট ভরসা পায় না।

"মার যেমন পছন্দ। এটাকে ভেঙে আবার গড়াব।" বড় বৌ বলে হঠাৎ। মুখের বিরক্তিটা হাতে টেনে, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বড় বৌ খুলে ফেলল বালাটা। খুকী চুপ করে রইল।

"আজকাল কি আর ঐ ফ্যাশান চলে।"

নড়েচড়ে বসল খুকী। এবার বড় বৌ কথা চাইছে তার কাছ থেকে।

"তারকদার বৌয়ের কিন্তু ঠিক ওমনি একটা বালা আছে।" নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল খুকী। তারকদার বৌয়ের গল্প এ-বাড়ির সবাই জানে। বি এ পাস। প্রেম করে বিয়ে হয়েছে। কি একটা আপিসে চাকরি করে, মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়। এই নিয়ে তারকদার সঙ্গে বৌয়ের তুমুল ঝগড়া হয় মাঝে মাঝে। গলার শির ফুলিয়ে নয়, দাঁতে দাঁত চেপে কথা কাটাকাটি হয়। হাজার হোক শিক্ষিত তো দুজনেই। নিজেদের কথা আর পাঁচজনকে শুনতে দিতে চায় না।

"তুমি শুনেছ ওদের ঝগড়া ?"

স্প্রীংয়ের ধাক্কায় দুলতে দুলতে বড় বৌ খাটের কিনারে গড়িয়ে এল। খুকী ঝগড়া শোনেনি, তবু ইচ্ছে হল বলে, হ্যাঁ শুনেছি। তাহলে হয়ত, বড় বৌ ওকে টেনে নিয়ে খাটের উপর শুইয়ে, মুখের কাছে মুখ নিয়ে শুনতে চাইবে গল্পটা। এমন খাটে কোনদিন শোয়নি খুকী। লোভী চোখে তাকাচ্ছে সে বড় বৌয়ের প্রায় অর্ধেক-ডোবা শরীরটার দিকে। "কি ? শুনেছ, কি বলে ওরা ঝগড়ার সময় ?"

মুখ টিপে হেসে খুকী একবার খোলা দরজাটার দিকে তাকিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, "সে বড় অসভ্য কথা।"

হাত বাড়িয়ে খুকীকে খাটের ওপর টেনে আনল বড় বৌ। যা ভেবেছিল তাই। খুকী বিছানায় সাবধানে হাত বুলিয়ে, হাসল। কি রকম গা এলিয়ে শুয়ে রয়েছে বড় বৌ। এমন বিছানায় শোয়া ওর অনেক দিনের অভ্যাস। খুকী তার নিজের বসবার ভঙ্গীটাও অনেকখানি শ্লথ করে দিল।

এতক্ষণে বড় বৌয়ের মনে হল, গরম চায়ের সঙ্গে খুকীর গল্পটা ভাল জমবে।

"খুকী ভাই একটা কাজ করবে। নীচে গিয়ে ঠাকুরকে বলবে দু'কাপ চা পাঠিয়ে দিতে।" খুকী উঠে দাঁড়াল।

"কিছু মনে করলে না তো। ঝিটা যে থেকে থেকে কোথায় ডুব মারে। আর বিস্কুটের টিনটাও নামিয়ে দিয়ে যাও।"

ঝড়ের মত নীচে নেমে আসে খুকী। এ বাড়ির বাজার আসে দশটায়। স্কুল বা অফিসের ভাত খাওয়ার কোন লোক নেই। ব্যবসাদারের বাড়ি। তবু দশটা বেজে গেছে, তাই মরবার ফুরসুত নেই এখন ঠাকুরের।

"ঠাকুর শিগগিরী দু'কাপ চা করে দাও।"

"চা-ফা এখন হবে না। এতক্ষণ উনুন কামাই যাচ্ছিল, তখন আসনি কেন।"

ভাঁড়ারঘর আর রান্নাঘরের মধ্যে কয়েকবার ছোটাছুটি করে ঠাকুর। তবু দাঁড়িয়ে থাকে খুকী। তিন তলার ঘরে, ফুরফুরে হাওয়া। সাদা দেওয়ালে ধাক্কা লাগা সূর্যের আলো। নরম সোফা, আর বড় বৌ, এদের ঘেরাটোপের মধ্যে বসে চা খাওয়া। তার জন্য কিছুক্ষণ কেন, সারা বেলাটাই তো সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

ডাল ফুটছে উনুনে। পিঁড়িতে পা গুটিয়ে বসে ঠাকুর তাকাল খুকীর দিকে। সরু সরু পা। ফ্রকটা ঝলমল করে কোমরের নীচে হাঁটুর তলা পর্যন্ত। কিন্তু অস্বস্তি হয় পনেরো বছরের খুকীর। বুকের কাছটায় হাত পাশাপাশি করে দাঁড়িয়ে থাকে, অন্যমনস্কোর ভান করে।

পানের ছোপ পড়া ঠাকুরের দাঁতগুলো কাল ঠোঁট দুটোকে পিছনে ফেলে খুকীর দিকেই যেন এগিয়ে আসে। চৌকাঠের ধারে সরে আসে খুকী। ঠাকুর এ বাড়িতে অনেক দিনের লোক।

"চলে যাচ্ছো নাকি!"

ডালের কড়া নামিয়ে, কেটলি বসাল ঠাকুর। "তুমি নিজেই করে নিয়ে যাও।"

ঘরের মধ্যে গুটি গুটি এসে দাঁড়াল খুকী। ঠাকুর পা চুলকোতে শুরু করল। খুকী আড়ষ্ট হয়ে তাকিয়ে থাকে কেটলির দিকে। গনগনে আঁচ, দু'কাপ জল সঙ্গে সঙ্গেই ফুটে উঠল! চা ছেঁকে দুধ, চিনি দেবার সময় হাঁ-হাঁ করে উঠল ঠাকুর।

"করছ কি অতখানি চিনি দেয়। মা যদি জানতে পারে, তাহলে কুরুক্ষেত্তর বাধাবে।"

ভয়ে আর নিজের কাপে চিনি দেয় না খুকী। পেয়ালা হাতে উঠে দাঁড়ায় সে। কানা ছাপিয়ে পড়ছে চা। সাবধানে পায়ে পায়ে এগোতে শুরু করে। প্রায় ধমকে তাকে থামায় ঠাকুর। "চিনি না দিয়ে চা খাবে কি!"

দু' চামচ চিনি কাপে ঢেলে, চামচ নাড়তে থাকে ঠাকুর। বাঁ হাতটা খুকীর কাঁধে এসে পড়ে যেন আচমকা। সরে যেতে গেল খুকী, আঙুলগুলো কাঁকড়ার মত খুবলে ধরল ঘাড়টা। ভয়ে কেঁপে ওঠে খুকীর হাত। খানিকটা চা

চলকে পড়ল পায়ে। কেউ যদি এসে পড়ে, কেউ যদি দেখে ফেলে, তার চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলে কেমন হয়।

কিংবা একটা চড় যদি মারা যায়, কিন্তু দু হাতে যে কাপ রয়েছে। যদি ভেঙে যায়। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে খুকী সোনালি নকশা করা পাতলা ফিনফিনে কাপ দুটোর দিকে। এত কথা যখন ভাবছিল ততক্ষণে চাপ চাপ, বিড়ি আর দোক্তার গন্ধ তার গালে ঠোঁটে বুলিয়ে গেল ঠাকুর।

রান্নাঘর থেকে প্রায় ছিটকেই খুকী এল। গরম চা আঙুলে পড়ল। উঠোনে দাঁড়িয়ে থরথরিয়ে একবার কেঁপে উঠল। চারতলা হালদার বাড়িটা চায়ের কাপে দুলে উঠে, ভেঙে ভেঙে যেতে লাগল। সিঁড়িতে ওঠার আগে কাপ দুটো সে নামিয়ে ফুঁ দিল আঙুলে। কেমন একটা পুরুষালি গন্ধ, গা গুলিয়ে উঠল খুকীর। যদি কেউ দেখে ফেলত তাহলে কি হতো। ভয়ে শিরশির করে ওঠে হাঁটুদুটো। নিশ্চয় তাকেই সকলে খারাপ ভাবত, এই বাড়িতে আসাও বন্ধ হয়ে যেত।

থুথু ফেলে কাপ দুটো তুলে নিল খুকী। হালদার বাড়ির সিঁড়ির রেলিংগুলো নির্ভুল ছায়া ফেলে কাপের মধ্যে এখন পাশাপাশি সাজান রয়েছে। ঘরে ঢুকতেই কপট ঝঙ্কার দিয়ে উঠল বড় বৌ।

"ওমা, তুমি আবার নিজে হাতে করে আনলে কেন, ঠাকুরকে বললেই তো হতো।"

"আপনাদের ঠাকুরের যা মেজাজ। কত খোসামোদ করে তবে চা তৈরি করে আনলুম।"

হেসে তাকাল খুকী বিস্কুটের টিনটার দিকে।

হালদার বাড়ি থেকে বার হতেই বার নম্বরের জেঠিমা ডাকল খুকীকে। বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল, তবু হেসে জানলার ধারে এগিয়ে এল খুকী।

"সত্যি বলছি, আর একদম সময় পাই না। নইলে বলুন আপনার কাছে তো রোজই আসতুম।"

"আহা-হা, কি এমন কাজের লোক হয়েছিস' শুনি। হালদার বাড়ি রোজ যাবার সময় তো ঠিকই পাস।"

জেঠিমার সুরে অভিযোগ নয় অভিমানটাই তীব্র। খুকী জানলার রডে হাত বুলোয়। কোন কথা বলে না সে। যেন জেঠিমার কথাটাই সে মেনে নিয়েছে এমন ভঙ্গিতে মাথা নীচু করে থাকে।

"হ্যাঁরে ছোট বৌয়ের বাপের বাড়ি আহিরীটোলায় না? সেদিন ভাগ্নীর বড় ননদ এসেছিল। সে-ই বলল, হালদার বাড়ির ছোট বৌ ওদের শ্বশুর বাড়ির পাড়ার মেয়ে। বাপটার বুঝি মনোহারী দোকান আছে। দেখতে সুন্দর, কটা গায়ের রঙ বলেই না উতরে গেল।"

খুকীর কথা যেমন করে থামিয়েছিল জেঠিমা, তেমনি করে খুকী বলে উঠল, "আচ্ছা, জেঠিমা এখন চলি, মা রাগ করবে।"

"আহা, এই তো মোটে সাড়ে এগারোটা, ভেতরে আয় না। ডলু কি কেলেঙ্কারী করেছে শুনেছিস তো।"

মনে মনে ক্লান্ত হয়েছিল খুকী। এক কাপ চা, খান দুই বিস্কুট খিদেটাকে যেন চাগিয়ে দিয়েছে। ইচ্ছে হলো ভিতরে গিয়ে বসে। তারিয়ে তারিয়ে শোনে ডলুর কথা। সবই জানা, তবু নতুন কিছু হয়তো ঘটেছে এবারে। জেঠিমার পাশ দিয়ে সে ঘরের মধ্যেটা দেখতে পায়। ছোট্ট ঘর, সারা ঘর জুড়ে প্রায় সেকেলে ভারী পালঙ্ক। খাটে স্তূপীকৃত বালিশ আর তোশক। খাটের নীচে বড় কয়েকটা ট্রাঙ্ক। দেয়ালে তাক ভর্তি টিনের কৌটো আর শিশি বোতল। আলমারী, আলনা আর ঠাকুর দেবতার ছবি। দম আটকে আসে শুধু তাকিয়ে থাকলেই। সঙ্গে সঙ্গে হালদার বাড়ির ঘরগুলোও মনে পড়ে খুকীর।

পাড়ার অন্য বাড়িতে আর না যাবার কারণটা এই মাত্র যেন খুঁজে পেল খুকী। ভাল লাগে না। এই দম চাপা ঘর, ময়লা জামা-কাপড়, নোংরা চালচলন। ঠিক এই জন্য তার নিজের বাড়িটাও ভাল লাগে না। এরা চুপ করে থাকতে জানে না। অবাক হতে জানে না। এদের মাঝে খুকী অতি সাধারণ হয়ে যায়। কত তফাৎ এদের সঙ্গে হালদার বাড়ির। সেখানকার বড় বৌ, ছোট বৌ, নভেল হাতে বিছানায় গড়ায়, রেডিওর কাঁটা ঘোরায়, সাজগোজ করে সিনেমায় যায়। অজস্র সময় আর উপকরণ ফেলে ছড়িয়েও শেষ করতে না পেরে, হাঁপিয়ে ওঠে। খুকী ঈর্ষা করে না। তাতেও তার ভয়। যদি ওরা জেনে ফেলে। কাছে আসতে যদি না দেয়।

"না জেঠিমা আজ বসব না। আর একদিন এসে শুনব।"

চলে যাচ্ছিল খুকী। জেঠিমা ডেকে জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁরে ওদের দু বোয়েরই ছেলেপুলে হয় নি কেন রে?"

"জানি না।"

ক্লান্তস্বরে খুকী জবাব দিল। আবার প্রশ্ন আসে জেঠিমার, "ছোট বোয়ের ভায়ের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে শুনলুম?"

ঘাড় নেড়ে খুকী এগিয়ে যায়।

'ভাগ্নীর ছোট ননদ এবার আই এ পাস দিয়েছে, একবার বলিস না কথাটা।"

খুকী তখন অনেক দূরে।

দুপুরের অর্ধেক পর্যন্ত কাপড় কেচে, ক্লান্ত হয়ে পড়ে খুকী। মাদুরে শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ে, আর কাঠওয়ালির চীৎকারে কাঁচা ঘুমটা ভেঙে যায়। একদিন বুঝি ওর কাছ থেকে কাঠ কিনেছিল, তাই রোজ জানলার কাছে চীৎকার করে যাবে। খোলা কল দিয়ে জল পড়ছে। বিরক্ত হয়েই খুকী

কলটা বন্ধ করে দেয় আর গজগজ করে। এই এক আপদ জুটেছে। রোজ এসে ঘ্যান-ঘ্যান করবে। বিরক্ত হয়েই খুকী কলঘরে যায়।

কিন্তু খুকী যখন হালদার বাড়ির ছাদের পাঁচিলে কনুই রেখে দাঁড়ায়, বিরক্তির রেশমাত্র তখন আর থাকে না। গোটা পাড়াটাই ঐখান থেকে দেখা যায়। অবাক লাগত প্রথম প্রথম। নতুন মনে হত বাড়িগুলোকে এত ওপর থেকে দেখলে, অবাক হবার সুযোগটুকু দেবার জন্য হালদার বাড়ির কাছে কৃতজ্ঞতা জানাল খুকী মনে মনে। নীচু নোংরা বাড়ি আর মানুষগুলোর হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্যও তাকে রক্ষা করেছে হালদার বাড়ি।

এতদিন যাওয়া-আসা করছে খুকী, হালদার বাড়ির প্রকৃতি সে চিনে নিয়েছে তার বুদ্ধি দিয়ে। সময় কাটাবার অজস্র উপকরণের মধ্যে খুকী আর তার গল্পও একটা উপকরণ। তাই খটকা লাগল খুকীর। আজ কয়দিন ধরেই সে লক্ষ্য করেছে, তাকে দেখে আর হালদার বাড়ি তেমন খুশী হতে পারছে না। সারা বাড়িটা যেন থমথমে মুখ নিয়ে তার দিকে ভ্রূকুটি করে আছে। খুকী ভয় পায় এসব দেখে। হালদার বাড়িতে সে অবাঞ্ছিত হয়ে পড়েছে। এ বাড়ির প্রতিটি কথা আর ভাবভঙ্গী বিশ্লেষণ করে। ভয়টা তার বেড়ে যায়, সেদিন চিল-কোঠার ঠাকুর ঘরে হালদার গিন্নীর কথাটা মনে পড়ে।

ঠাকুর ঘর পরিষ্কার করছিল হালদার গিন্নী। শুধু একবার তাকিয়ে কাজে মন দিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে খুকীই প্রথম কথা শুরু করল।

"ভট্চাজদের শ্রীধরের কাজগুলো সব দত্ত কাকীই করে। বাসন মাজা ঘর ধোয়া এমন-কি পুরুত ঠাকুরের জামা কাপড় পর্যন্ত কেচে দেয়।"

হালদার গিন্নী শুনেও শোনে না। খুকী তাতে কিছু মনে করে না। আপন মনেই সে বলে যায়, শুধু চোখ দুটোকে তীক্ষ্ম রেখে!

"এই নিয়ে কত কথা উঠেছিল, আর উঠবে নাই বা কেন, অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে, তার অত রাত পর্যন্ত মন্দিরে থাকার দরকারটাই বা কিসের? পুরুত তো লোক ভাল নয়। ছোটবেলায় ডলুকে একবার কি করেছিল জানেন?"

"জানি কি করেছিল।"

এতটুকু হয়ে যায় খুকী, হালদার গিন্নীর স্বরের তীব্রতায়। গুটি গুটি সে তিনতলায় নেমে এসেছিল। উল বুনছিল বড় বৌ। খুকী চুপ করে দেখছিল। হঠাৎ সে বলে ওঠে।

"তারকদার সোয়েটারটা দেখেছেন তো, খয়েরী হাতায় কালো বর্ডার। বলুন তো কে করেছে।"

বড় বৌ কথা বলে না, আরো দ্রুত হাত চলে। উত্তর না পেয়ে অপ্রস্তুত হয় না খুকী। জবাবটা সে নিজেই দেয়।

"নীলিমাদি। আগে ওদের বাড়িতে ভাড়া ছিল। তারকদার বিয়ের আগেই উঠে গেছে। এখনো তারকদা ওদের বাড়ি যায়। প্রত্যেক রোববার। নীলিমাদির এখনো বিয়ে হয়নি, খুব ভাব ছিল ওদের দু'জনের। এই নিয়ে বৌদির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল। তাতে বৌদি কি বলেছিল জানেন ?"

"জানি।"

ছোট বৌয়ের ঘরে পা দিয়েই মনে পড়ল আবার, এ বাড়িতে ক্রমশই সে অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ছে। খাটে শুয়ে সিনেমা পত্রিকার ছবি দেখছিল ছোটবৌ। শুধু একবার মুখ ফিরিয়ে দেখল খুকীকে।

"পড়ছেন বুঝি! কি পড়ছেন ?"

জবাব পেল না খুকী। তা'তে কি হয়েছে, এ বাড়িতে তার কথাই তো সকলে শুনতে চায়।

"আপনার মতো বিনুদিরও বই পড়ার বাতিক আছে। ওর ভায়ের মাস্টার রোজ বই এনে দেয়। একদিন বই না পেলে সে'কি ছটফটানি বিনুদির। শুধু বই তো আর নয়, ওর মধ্যে আরও একটা জিনিস থাকে।"

"জানি, চিঠি থাকে তো!"

জানি জানি আর জানি। আর কিছু জানতে বাকি নেই এদের। কেউ তার কথা শুনতে চায় না। এ বাড়ির কৌতূহল যেন ফুরিয়ে গেছে। সব সম্পর্ক ফুরিয়ে আসছে তার হালদার বাড়ির সঙ্গে।

কাঠের রেলিংয়ে হাত রাখে খুকী। কি পালিশ! পর্দাগুলো হাওয়ায় দুলছে। পর্দায় ময়ূরের নকশা মনে হয় যেন নাচছে। চোখ ফেরান যায় না। চা খাবার জন্য কেউ তাকে ডাকল না।

বাড়ি ফিরে খুকী ঠিক করল, আর সে হালদার বাড়ি যাবে না। পরপর কতগুলো বিকেল গড়িয়ে গেল, রাত পুইয়ে এল।

সদর দরজা থেকে পায়ে পায়ে দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে যায় খুকী ডলুদের সদর দরজা লক্ষ্য করে। হালদার বাড়ির সীমানা দিয়েই সে ছুটে একদম ডলুদের রান্নাঘরে এসে উঠল।

"বেশ করেছি। আমার সর্বনাশ আমি করেছি তাতে তোমাদের কি ?"

ঘর থেকে চাপা চীৎকারে বাতাস তোলপাড় করল ডলু। রান্না ঘর থেকে একই সুরে জবাব দিল ডলুর মা।

"তুই কি আমার একটা মেয়ে ? অন্যগুলোর ভবিষ্যৎ দেখতে হবে না ? এই কেলেংকারীর পর ওদের আর বিয়ে হবে ?"

"বিয়ে না হয়, তাহলে আমি যা করেছি তাই করবে। সংসারে যখন এনেছিলে মনে ছিল না, খাইয়ে পরিয়ে বিয়ে দিতে হবে।"

"বলি তোর বিয়ে কি আমরা ইচ্ছে করে দিচ্ছি না ? বাপের রোজগার-পাতি, সংসারের মানুষ জন, সব মিলিয়েই না বিবেচনা করতে হয় ।"

কি একটা বলবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল ডলু, খুকীকে দেখে চুপ করে ফিরে গেল। জ্বলজ্বলে চোখে খুকী তাকায় ডলুর ঘরটার দিকে। হালদার বাড়িতে প্রবেশের ছাড়পত্র যেন ডলুর কাছে। এবার সে এমন করে তার গল্পের ঝুলি ভরাবে যাতে আর কোনদিন না হালদার বাড়ি বলতে পারে, জানি।

শ্বেতপাথরের সিঁড়ি মাড়িয়ে, চকচকে রেলিং ধরে ধরে, ময়ূর আঁকা পর্দার সামনে, নিঃসংকোচে দাঁড়াল খুকী। ফুরফুরে হাওয়ায় পর্দার ময়ূরটা নাচছে। খুকী পর্দা সরিয়ে ঢুকল। ছোটবৌ চা খাচ্ছে। পাতা জোড়া ছুঁই ছুঁই করছে সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে। ফিসফিস করে খুকী বলল, "জানেন কি হয়েছে ডলুর।"

"জানি।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য খুকীর চোখের সামনে ময়ূর নেচে উঠল। জানি জানি আর জানি। ওরা সব জানে। সব ? ওদের জানার বাইরেও কি কিছু থাকতে পারে না ? খুকী অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকল ছোটবৌয়ের দিকে, তারপর টপটপ করে জল পড়তে শুরু করল তার চোখ থেকে।

"কি ব্যাপার, কাঁদছ কেন ?"

খুকী ফুঁপিয়ে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

"কিছু হয়েছে কি তোমার ?"

খুকী মাথা নোয়াল। "আমার, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

অবাক হয়ে ছোটবৌ উঠে ওর পাশে এল। খুকী ফিসফিস করে কি যেন বলতেই ছোটবৌ কৌতূহলে ফেটে পড়ে বলল, "অ্যাঁ, কার সঙ্গে ? কে করল তোমার···কবে হল, কি ভাবে ?"

খুকী মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "না না বলতে পারব না।"

আর সে মনে মনে ধারাবাহিক সুখে বলতে থাকল, এইবার এইবার, দেখি কেমন করে জানি বলো, এইবার দেখব।

একটি সাধারণ ব্যাপার

অপরাহ্ণ বেলায় কলকাতার ঠিক মাঝখানে, রাজপথের উপর একটি বিরাট বাড়ির নীচে দাঁড়িয়ে মেয়েটি ভাবছে।

এই সময় এই অঞ্চলের মোটর গাড়ির সংখ্যা বেড়ে যায় এবং অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে সেগুলো ছোটার চেষ্টা করে, পথিকজন ব্যস্ত হয়ে পথ চলে। ফুটপাথে দোকানীরা আর একটু বেশী চিৎকার দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যস্ত হয়। এই সময় কলকাতার এই মধ্যদেশ উত্তেজনা চাঞ্চল্য ও লঘুতা দ্বারা কিছু বেসামাল হয়ে ওঠে।

মেয়েটিকে ঈষৎ চঞ্চল বা উত্তেজিত দেখা গেল। সে ঘন ঘন এধার ওধার তাকাচ্ছে। কোন পথিককে নিকটবর্তী হতে দেখলেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে। এক একজন তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হতাশার ছায়া চোখে নেমে এসে মুখমণ্ডলকে মলিন করে দিচ্ছে।

মেয়েটি সত্যই একজনের জন্য অপেক্ষা করছে। লোকটিকে সে চেনে না। তাকে চিঠি দিয়ে দেখা করতে বলেছে লোকটি। লোকটি বিবাহেচ্ছুক। মেয়েটির জন্ম অতি দরিদ্র পরিবারে, কলকাতার শহরতলীতে। শৈশব থেকে সে অনাদর, অশিক্ষায় ও অর্ধাহারের মধ্য দিয়ে লালিত। কিন্তু স্বভাবে ভীরু ও হৃদয়ে কোমলতার অভাব নেই। স্কুলের কয়েক শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর আর তাকে বাড়ির বাইরে বেরোতে দেওয়া হয় নি। তবে পাড়ার মধ্যে একা এবাড়ি-ওবাড়ি যাওয়ার অধিকার আছে। মেয়েটিকে প্রচলিত ধারণায় কোন-ক্রমে সুন্দরী বলা যায় না, শ্রীময়ীও নয়। শীর্ণ ফ্যাকাসে সাদা দেহটির জন্য তার বাবা কিংবা মা খুব বিরক্ত হয়ে 'প্যাকাটির' সঙ্গে তুলনা করেন। ওরা প্রায়ই রাগেন। মেয়েটির বয়স প্রায় তিরিশ কিন্তু এখনও বিবাহ দেওয়া সম্ভব হয় নি। অর্থাভাবে তো বটেই, তাছাড়া মেয়েটির রূপও তাদের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করেছে। ওরা হাল ছেড়ে দিয়ে ললাটে করাঘাত করেছেন, আর মেয়েটি আড়ালে প্রতিবার অশ্রু বিসর্জন দিয়েছে।

মেয়েটির কৈশোরে, কিছু প্রেমিক জুটেছিল। কয়েক বছর মেয়েটি অনটন ও লাঞ্ছনার মধ্যেও সুখ লাভ করে। প্রত্যেকেই তাকে বিবাহ করার প্রতিশ্রুতি

দেয়, সে তাদের বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার দেহে যুবতীসুলভ মনোহারিত্বের অভাবগুলি প্রকট হওয়ায় এবং প্রেমিকদেরও সাংসারিক দায়িত্ব ও চিন্তা বেড়ে যাওয়ায় মেয়েটি একসময় লক্ষ্য করল, সে আবার একা হয়ে গেছে। সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করল, প্রণয় দ্বারা কোন পুরুষকে সে আকর্ষণ করতে পারবে না, অর্থ ব্যয় দ্বারা বিবাহ দেওয়ার সামর্থ্যও পরিবারের নেই। একমাত্র দৈববশেই যদি বিবাহ হয়।

মেয়েটির একজন বান্ধবী আছে। প্রতিবেশী বধূ ওরই সমবয়সী। মেয়েটির দুঃখে বধূটিও সমদুঃখী। এই বধূটিই একদিন খবরের কাগজের একটি বিজ্ঞাপনের প্রতি মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, "লেখো না একটি চিঠি। শুধু ঘরের কাজ জানা মেয়েই চেয়েছে। রূপ গুণ, বয়স নিয়ে কোন দাবি জানায় নি যখন, চিঠি দিতে অসুবিধা কিসের? মাত্র কুড়িটা পয়সা তো খরচ। না হয় না হবে, কিন্তু হয়েও তো যেতে পারে।"

মেয়েটির হৃদপিণ্ড কিছুক্ষণের জন্য অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিল বধূটির শেষ কথাটিতে। তার মনে হয়েছিল এটাই বোধহয় দৈব। হয়তো এই বিজ্ঞাপনের মধ্যেই তার দুঃখের অবসান আছে। কিন্তু লজ্জা ও ভয়ে সে প্রথমে অস্বীকার করল চিঠি লিখতে। বারবার তার অবিশ্বাসের এবং মন্দভাগ্যের নজিরগুলির পুনরাবৃত্তি করল। বধূটি দৃঢ়ভাবে জানাল, "বেশ তাহলে আমিই তোমার হয়ে লিখে পাঠাচ্ছি।"

এক সপ্তাহ পরেই বধূটি ওকে ডেকে পাঠাল চিঠির জবাব এসেছে। পত্রদাতা ঠিকানা দেয়নি। একটি নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে একটা জায়গায় অপেক্ষা করতে বলেছে আলাপ করবে বলে। মেয়েটি ঠক্‌ঠক্‌ করে কেঁপে উঠল, বধূটির উদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকিয়ে। বোধহয় দৈব সদয় হয়েছে এতদিনে। বোধহয় সত্যিই এবার কিছু ঘটবে। বহুবার খুঁটিয়ে সে চিঠিটা পড়ল। চিঠি থেকে সে একটা পুরুষের আকৃতি নির্ণয় করার চেষ্টা করল।

তার মনে হল এই পুরুষটিই পরিহাসপ্রিয়, পরিচ্ছন্নতা বিলাসী, দীর্ঘদেহী, চটপটে, পুরুষটির ললাট উন্নত, মধ্যভাগ ক্ষীণ বক্ষ-কপাট প্রশস্ত, চক্ষে কৈশোরের চাপল্য, গাত্রবর্ণ চাঁপা ফুলের মত। এবং সহজেই কামমোহিত হয়ে পড়ে। তার মনে হল পুরুষটি খুবই দুঃখী তারই মত। খুবই রূপবিহীন তারই মত। এইভাবে কয়েকদিন মেয়েটি ভাবল। তখন দিনগুলি লঘু পক্ষ বিস্তার করে তার দেহের প্রতি প্রান্তে নানান ভঙ্গীতে উড়ে ফিরল। দিনগুলি তাকে বিবশ করল, সংসারের কাজে সে বিরস হল। মাঝে মাঝেই তার মনে হল, এখন অন্যের সংসারে রয়েছি।

নির্দিষ্ট দিনে চুপিচুপি সে বধূটির বাড়ি এল। বধূটি তাকে নিজের শাড়িতে সাজিয়ে দিল, হালকাভাবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েটি মুগ্ধ চোখে নিজেকে

বারবার দেখল। বধূটি তার স্বামীর কাছ থেকে জেনে রেখেছিল কি ভাবে সেই নির্দিষ্ট জায়গাটিতে পৌঁছতে হবে। মেয়েটিকে সে পুঙ্খানুপুঙ্খ বুঝিয়ে দিল।

মেয়েটি ঠিক মতই এসে পৌঁছেছে। ঘড়িওলা বড় বাড়িটার নীচে দাঁড়িয়ে সে প্রথমে ভয় পেল। এমন প্রবল ব্যস্ততা ও বৃহৎ জনকোলাহলের মাঝে সে আগে কখনও দাঁড়ায় নি। নিজেকে সে অকিঞ্চিৎকর বোধ করল। হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে, আর ফিরতে না পারার ভয়ে সে কেঁপে উঠল।

কিন্তু সম্মুখের প্রবাহমানতা অচিরেই তার কৌতূহল আকর্ষণ করতে শুরু করল। সে ভীতভাব কাটিয়ে নানান বেশভূষা এবং ভঙ্গির নরনারীদের, নিকটের একটি দোকানের সামগ্রী, অতিকায় বাস এবং ক্ষুদ্র মোটর গাড়িগুলির গমনাগমন ও তার আরোহীদের দেখতে থাকল।

কিছুক্ষণ পর সে ক্লান্ত বোধ করল। সবই তার কাছে একই দৃশ্যের বারংবার ফিরে আসার মত মনে হল। সে লক্ষ্য করল, বহু লোক তাকে দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ ঘাড় ফিরিয়েও দেখছে। কেউ কেউ তার সামনে এসে মনোহর হয়ে সোজা মুখের দিকে তাকাল। অস্বস্তিতে ভরে উঠল মেয়েটি। সে ঘড়ির দিকে তাকাল। নির্দিষ্ট সময় পৌঁছে গেছে। সে লোকটিকে দেখার জন্য বহুদূর পর্যন্ত তাকাল। এখন প্রত্যেককেই মনে হচ্ছে সেই লোক। এবার সে ব্যস্ত হয়ে উঠল। দেহে-মনে চঞ্চলতা এবং শিহরণ লেগেছে। ঘড়ির দিকে বারবার তাকাল এবং হঠাৎ মনে হল, এখন তাকে খুবই বিশ্রী দেখাচ্ছে। নিজেকে দেখবার জন্য কয়েক পা হেঁটে একটি দোকানের কাঁচের শো কেসের সামনে দাঁড়াল। মনে হলো তাকে আরো শীর্ণ দেখাচ্ছে, আরো শুষ্ক। কপালটা ঠেলে উঠেছে, পুরো বাহুর শিরাগুলি দড়ির মত, বক্ষদেশ সমতল. চোখের নীচে অপুষ্টির ঘনছায়া।

মেয়েটি বিষণ্ণ-চিত্তে নিজের প্রতিবিম্ব থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েই চমকে উঠল। কুড়ি-পঁচিশ হাত দূরেই এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে। তার দিকেই তাকিয়ে, মুখে চাপা হাসি। মেয়েটি বিহ্বল হয়ে পড়ল। ধীরে চোখ নামিয়ে নিল সে। লোকটি রুমালে মুখ মুছছে। মেয়েটি সঙ্গোপনে দেখল, দীর্ঘদেহী, ক্ষীণ কটি, উন্নত ললাট এবং বলিষ্ঠ। পোশাকে বিলাসী, চাহনীতে চটুল, ভঙ্গিতে তরুণ। লোকটি কাছে এগিয়ে, কয়েক হাত দূরে মাত্র দাঁড়াল। গলা খাঁকারি দিল। মেয়েটির মনে হল, লোকটি কুণ্ঠিত হচ্ছে। জেনে নিতে চাইছে, যার অপেক্ষা করার কথা, সেই মেয়েটিই কিনা। স্বাভাবিকই। কোন ভদ্রলোকই নিশ্চিন্ত না হয়ে এক্ষেত্রে অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। লোকটিকে নিশ্চিন্ত করার জন্য মেয়েটি হাসল।

"যাবার জায়গা আছে?" ফিসফিস করে লোকটি বলল প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। মেয়েটি মাথা নাড়ল।

"তা হলে আমাকেই জায়গা ঠিক করতে হবে ?"

"আমি এই প্রথম এখানে এসেছি। কিছুই চিনি না।" কাঁপা গলায় মেয়েটি কোন ক্রমে বলল। লোকটি হেসে ওর আপাদমস্তকে চোখ বোলাল। সেই চাহনিতে কি যেন আছে, মেয়েটির ভাল লাগল।

"এস আমার সঙ্গে।" লোকটি চলতে শুরু করল। মেয়েটি অনুসরণ করল। একটা গলির মধ্যে ঢুকে খানিকটা চলার পরই জীর্ণ একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে লোকটা বলল—"দাঁড়াও আসছি।"

মিনিট পাঁচ পর সে বেরিয়ে এল সঙ্গে দাড়িওলা এক প্রৌঢ়। মেয়েটিকে খুঁটিয়ে দেখে প্রৌঢ় ঘাড় নাড়ল এবং বলল, "এ তল্লাটে আগে কখনো দেখিনি। মনে হচ্ছে একদম নতুন।"

লোকটি সন্তুষ্ট হয়ে হেসে মেয়েটিকে বলল, "চলো ঘর পাওয়া গেছে।"

দোতলায় একটা ঘরে ওরা এল। মেয়েটির এখন মনে হচ্ছে, লোকটি বোধহয় ভুল করেছে কিংবা সে নিজেই।

"আপনি কি আমাকে খুঁজতেই এসেছিলেন ?" মেয়েটি বলল।

"নিশ্চয়।" গলা থেকে টাই খুলতে খুলতে লোকটি বলল।

"আপনার কে কে আছে ?"

"কেউ নেই, তাইতো এসেছি তোমার জন্যে !" বলতে বলতে লোকটি উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করল।

"আমাকে কি আপনার পছন্দ হবে ?"

"পছন্দ হয়েছে বলেই তো, এখানে এলাম।" হাত ধরে কাছে টানতে টানতে লোকটি বলল।

হাত ছাড়াবার জন্য মেয়েটি মোচড় দিতে গিয়ে দেখল তার শরীরে বিন্দুমাত্রও শক্তি অবশিষ্ট নেই।

"আমি কিন্তু বেশি দিতে পারব না। ঘরটার জন্যই দশটাকা বেরিয়ে গেল।"

মেয়েটি বলল, "আমাকে পছন্দ হয়েছে আপনার ?"

"বললাম তো।"

অতঃপর মেয়েটির মনের মধ্যে কোন একস্থান থেকে গভীর সুর উৎপন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। সে কোনরূপ আপত্তি করল না।

এক ধরনের অসুখ

দয়ানন্দ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল এইভাবে : "জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, হিন্দু আত্মীয়স্বজনহীন. যে কোন জাতির মেয়েকে বিবাহেচ্ছু। পাত্রী স্বয়ং পত্র-লিখুন।"

ঠিকানা ছিল বক্স নম্বরে। তিনদিন পরে কাগজের অফিস থেকে দয়ানন্দ ছেচল্লিশটি চিঠি নিয়ে আসে। অফিস ছুটির পর মনুমেণ্টের কাছে মাঠে বসে একে একে চিঠিগুলি পড়ে, তিনটি বেছে রাখে।

একটি চিঠি সন্তানহীনা বিধবার। স্বামী মারা যাবার পর একমাত্র ছেলেটি তিন বছরের হয়ে মারা যায়। এখন স্কুল শিক্ষিকা. গ্র্যাজুয়েট। লিখেছে : "থাকি শ্বশুর বাড়িতেই। দ্যাওর বিয়ে করেছে, ভাল চাকরি করে, এ বাড়িতে আপাতত আমার প্রযোজন ফুরিয়েছে. বাপের বাড়িতে সৎমা। আমার বয়স আঠাশ. বিয়ে হয়েছিল আঠারো বছরে, সেই স্মৃতি আর কিছুই মনে নেই।

দয়ানন্দ ভাবল, বিধবা, অন্য পুরুষের বাচ্চাও পেটে ধরেছে। তবু চিঠিটায় কেমন মায়া রয়েছে, টানছে। প্রায় বাল-বিধবাই বলা যায়, তার ওপর সন্তান হারিয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে শোকে তাপে এতগুলা বছর কাটিয়ে বিয়েয় বসতে চাইছে। শ্বশুর বাড়িতে নিশ্চয় ভাল ব্যবহার করে না, বাপের বাড়িতে গেলে নির্ঘাৎ হাঁড়ি ঠেলে আর সৎ ভাইবোনদের মানুষ করতে করতে একদিন শুকিয়ে মরে যাবে। উদ্যোগী হয়ে বিয়ে দেবারও কেউ নেই। এইসব মেয়েদের মধ্যে স্নেহ প্রেম, মমতা বেশি থাকে। তাইতো দরকার।

দ্বিতীয় চিঠিতে লেখা : "আমরা নয় ভাইবোন। বাবা সাড়ে ছয় শত টাকা মাহিনা পান। আড়াই বছর পর রিটায়ার করিবেন, বড় বোনের বিবাহ হইয়াছে। ভগ্নিপতি স্কুল শিক্ষক, মেজো বোনেরও বিবাহ হইয়াছে, লাভ ম্যারেজ, বাবা কোন বাধা দেন নাই। আমি সেজো, ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়িয়াছি। বয়স চব্বিশ, সংসারের কাজ আমিই করি। মা হাঁপানিতে ভুগিতেছেন। আমি সুন্দরী। দয়া করিয়া যদি বিবাহ করেন তাহা হইলে খুবই উপকার হয়। প্রণাম জানিবেন।"

চিঠিতে একজায়গায় কাটা। ভুগছেন-টাকে কেটে 'ভুগিতেছেন' লেখা। দয়ানন্দ ভাবল কাজটা কার? সম্ভবত বাবা রিভাইজ করে দিয়েছে। লিখেছে ক্লাস সেভেনে পড়ি। অর্থাৎ ফোর হবে। চব্বিশ বছরটা নির্ঘাৎ ছাব্বিশ। হোক, এইসব মেয়েরা একটু বোকা ধরনের হয় বটে কিন্তু অল্পেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকে। আমার মত গেরস্ত লোকের পক্ষে এই ভাল। অন্তঃকরণ সাদা হবে, অসুখ বিসুখের ঝামেলা থাকবে না, সেবাযত্ন করবে মন দিয়ে। লিখেছে আমি সুন্দরী। কি ছেলেমানুষ! বোধহয় রঙটা ফর্সা আর মাথায় খুব চুল। মায়ায়-মমতায় দয়ানন্দর বুক ভারী হয়ে উঠল।

তৃতীয় চিঠি দয়ানন্দকে লোভে ফেলল। লিখেছে আঠারো বছরের এক কলেজের মেয়ে: "সাক্ষাতে সব বলব। আপনার সাথে কোথাও দেখা হতে পারে কি?" বেশী কথা লেখেনি। ঠিকানা দিয়েছে কাঁচরাপাড়ার।

দয়ানন্দ এক কথায় চিঠিটাকে নাকচ করে দিতে পারে। শুধু বয়স আর বিদ্যেবুদ্ধির বহর দিয়ে তার কি হবে। কেন বিয়ে করতে চায়, সেইটাই লেখেনি। সাক্ষাতে সব বলবে, কেন, চিঠিতে লিখে দিলেই তো পারত। গোলমাল আছে। তাহলে আর একে দিয়ে কি হবে। বিয়ে করে তো আরো গোলমালে পড়তে হবে।

কিন্তু অন্যকিছুও তো হতে পারে। কৌতূহল দয়ানন্দকে নাকানি-চোবানি দিতে শুরু করেছে। স্কুল ফাইন্যালটা তো পাস করা, তাহলে চাকরিও তো খুঁজে পেতে করতে পারে, নাকি বাড়ির অবস্থা ভালই। তবে বিয়ে করতে চায় কেন। লটঘট করেছে? সামাল দিতে একটা স্বামীর দরকার?

দয়ানন্দ ভাবল খুব বেঁচেছি, ভাগ্যিস মনে পড়ল! তাহলে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হত। রবিবাবু সেদিন তো একটা গল্প বলল, তাদের পাড়ার একটা ছোকরা শেষমেশ আত্মহত্যাই করে ফেলল। বৌটার খুব চটক ছিল, বিয়ের পরও কলেজের ছেলে বন্ধুরা আসত। দয়ানন্দ আন্দাজ করতে পারে, আঠারো বছরের এই কলেজে পড়া মেয়েটা নিশ্চয় চটকদার। ছেলে বন্ধু-টন্ধু তো আছেই।

তবে বিজ্ঞাপন দেখে বিয়ে করতে চাইছে যখন, বাড়িতে বাপ-মা হয়তো নেই, কিংবা কোন আত্মীয়ের পোষ্য, জোর করে টাকার লোভে বিয়ে দেওয়া যায়, যাকে বলে মেয়ে-বিক্রি—সে রকম কেস নয়তো?

দয়ানন্দের মাথা তালগোল পাকিয়ে গেল। অনেকক্ষণ বসে সে ভাবল। এদিকে গড়ের মাঠে সন্ধ্যা নেমে আসছে। ক্লাবের মালীরা ক্রিকেট পীচ জলে ভিজিয়ে খুঁটি পুঁতে ঘিরে দিয়েছে। আশেপাশে কিছু লোক বসে, কেউ একা, কেউ বা আড্ডায়। ঠিক মত শীত এখনো পড়েনি। দয়ানন্দর দিকে তাকাতে তাকাতে একটি স্ত্রীলোক দুবার ঘুরে গেল। কালো ওভারকোট গায়ে

পায়চারী করছে পুলিশ। চা-ওয়ালাকে ডাকার ইচ্ছে হচ্ছিল, বরং মেসে গিয়েই খাবো, এই ভেবে দয়ানন্দ উঠে পড়ল। হিম লাগানোটা ঠিক হচ্ছে না, শ্লেষ্মার ধাত। মাথায় র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে সে ছুটল ট্রামের উদ্দেশে। গলির মধ্যে মেস। তিরিশ বছর এই বাড়িতেই। দয়ানন্দ আছে সাতাশ বছর। সব থেকে পুরনো বোর্ডার, তাই ম্যানেজারের পরেই ওর খাতির। আলাদা ঘর, যা আর কারুর নেই। ঘরে ঢুকে আলো জেবলেই দয়ানন্দ শুয়ে পড়ল। রাত্রের খাবার যেমন ঢাকা তেমনিই রইল। একবার শুধু উঠেছিল, কাঁচরাপাড়ায় চিঠি লেখার জন্য।

শনিবার যা কখনই করে না, দয়ানন্দ আজ তা করে বসল। পাট ভাঙা ধুতি পাঞ্জাবি পরে অফিসে গেল। অফিস থেকে ঠিক দুটোয় বেরিয়ে গুটি গুটি এসে পৌঁছল ময়দানে। যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের স্মৃতি স্তম্ভের চাতালে দাঁড়িয়ে চারপাশে মন দিয়ে তাকাল। স্তম্ভের গায়ে হাত খানেক চওড়া রক। একটু নিচে সিঁড়ির ধাপ। রুমাল দিয়ে বার কয়েক ঝেড়ে সে বসল।

সামনের জমিতে কিশোরদের গুটি পাঁচ-ছয় দল ক্রিকেট খেলছে। ওপাশে কাঠের তক্তায় ঘেরা মাঠ। পানওয়ালা দয়ানন্দ কাছে এসে শুধিয়ে গেল। না, পান সিগারেট সে জীবনে ছোঁয়নি। বাদামওয়ালা যাচ্ছিল তাকেই ডাকল।

কটা বাজল? দয়ানন্দ ঘড়ি ব্যবহার করে না, ঘাড় ফিরিয়ে, চৌরঙ্গীতে মেট্রোপলিটনের বাড়ির গম্বুজের ঘড়িতে সময় দেখতে চেষ্টা করল। ঠিক বোঝা গেল না, বোধ হয় আড়াইটে। সময় দেওয়া আছে তিনটায়।

এলে এইদিক দিয়ে আসতে হবে। শেয়ালদা থেকে ধর্মতলা, তারপর হাঁটতে হাঁটতে এখানে। একটু দূরেই হয়ে গেল। তবে জায়গাটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা।

বাদাম খেতে ভাল লাগছে না। গলা শুকিয়ে টান ধরছে। দয়ানন্দ চা-ওয়ালার খোঁজে চারধারে তাকাল। একটু দূরে, টেবলে সোডা লিমনেডের বোতল সাজান দোকান। গিয়ে খেয়ে এলে হয়। ইচ্ছে সত্ত্বেও দয়ানন্দ উঠল না। শরীরটা আলগা লাগছে। দেহের ভিতর ঝন ঝন করে হাড়ের জোড়গুলো খুলে পড়ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে আবার সময় দেখতে চেষ্টা করল। আড়াইটে যেন মনে হচ্ছে। পাঁচিলের উপরে, দুধারে হেঁট মাথা দুই সৈনিক। কুচকুচে কালো রং পোশাকেরও। দেহের সামনে দুটি হাত, তালু জমির দিকে ফেরান। মুখ নামান রাইফেলের বাঁট ধরা ছিল ওই তালুতে। দুজনেই অস্ত্রহীন। রাইফেল দুটো কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে।

ফুরফুরে হাওয়া আসছে গঙ্গার দিক থেকে! আজ আর আলোয়ান সঙ্গে নেই। খোলা রোদে হাওয়া এখন মন্দ লাগছে না। ছেলেদের এবং দ্রুত বাঁক ফেরা মোটর টায়ারের ক্বচিৎ চিৎকার ছাড়া স্থানটিতে কোন কোলাহল নেই।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটি ছেলে চাতালে বসল। বল লেগেছে। ট্রানজিস্টর হাতে এক পথিক মাঠ পেরোচ্ছে। রাজ্যপাল ভবনের ফটকে পিস্তলধারী পুলিশ আনমনে আকাশে তাকিয়ে। বহুদূর থেকে একবার সম্মিলিত উল্লাসধ্বনি ভেসে এল, কোন মাঠে কেউ হয়ত আউট হল।

চোখ বুজে এসেছিল দয়ানন্দর। খট-খট, আওয়াজে চোখ মেলল। পিছন দিকের চাতাল দিয়ে কেউ আসছে। আড়ষ্ট হয়ে সামনে তাকিয়ে রইল সে। আওয়াজটা কাছে এসে থামল। আর সেই মুহূর্তে দয়ানন্দর মনে হল, কি দরকার ছিল চিঠি দেবার, কি দরকার ছিল বিজ্ঞাপন দেওয়ার; বেশতো দিনগুলো এক রকম করে কেটে যাচ্ছিল। বেশতো কেটে যাচ্ছিল। লোভী, কামুক, ঠিকই হয়েছে।

নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে মরীয়া হয়ে দয়ানন্দ চোখ ফিরিয়ে তাকাল। শুকনো আলুর খোসার মত দোমড়ান মুখ এক যুবক, হাতে সেল্‌স্‌ম্যানদের ব্যাগ্‌, দাগধরা সাদা প্যান্ট, সবুজ সার্ট, দয়ানন্দকে তাকাতে দেখে সেও তাকাল। অত্যধিক ধূমপানে ঠোঁট কালো, বাঁ হাতের উল্কিতে নামের আদ্যক্ষর। মাথায় প্রচুর চুল। দয়ানন্দর কাছে ধুলোর ওপরই বসল। পা দুটো ছড়িয়ে বাগটা মাথায় দিয়ে আধশোয়া হল। চোখ বুজল।

দয়ানন্দ হাল্কা হয়ে গেল। গোটা শরীরই জমাট বেঁধে গেছল, এবার ঝুর ঝুর করে ভেঙে পড়তে শুরু করল। একটা বল চাতালে পড়ে লাফাতে লাফাতে আসছে। দয়ানন্দ পা এগিয়ে দিল আটকাবার জন্য। আটকাল না, জুতো ঘেঁষে স্তম্ভের গায়ে ধাক্কা দিল। সেল্‌স্‌ম্যান চোখ খুলল।

"কটা বাজে আপনার ঘড়িতে?"

লোকটা হাত তুলে দেখে বলল, "তিনটে পাঁচ।"

দয়ানন্দ চারপাশে তাকাল। রাস্তা পার হবার জন্য দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। এদের মধ্যে কেউ কি? না, ওপারে ইডেন গার্ডেনে যাচ্ছে। আর একটি মেয়ে একা মন্থরগতিতে চলেছে।

ওই কি?

"এ বছরে কোন টেস্ট ম্যাচ নেই।"

সেল্‌স্‌ম্যান কথা বলছে। দয়ানন্দ মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল।

"তাই বুঝি?"

ছোকরা অবাক হল যেন। ভারিক্কি সুরে বলল, "প্রত্যেক বছরই দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে, এক বছর বাদ গেলে কেমন যেন লাগে।"

দয়ানন্দ রাস্তার ওপারের মেয়েটিকে লক্ষ্য করছিল। হাঁটতে হাঁটতে দূরে চলে গেল।

"খারাপ লাগে?"

ছোকরা হাসল। "সেই ফর্মটি এইটে গডার্ডের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টীম থেকে দেখছি। মারাত্মক নেশা। দেখুন না, কাজকম্মো নেই, পাদুটো ঠিক মাঠে টেনে আনল।" ছোকরা সেল্‌সম্যানই বটে। গায়ে পড়ে বকবক শুরু করেছে। এক বিহারী পরিবার ছোকরাটির কাছ ঘেঁষে বসল। শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে ফিরছে। এত কাছে বসাটা ওর খুব অপছন্দ লেগেছে, তাই দয়ানন্দর দিকে কিছুটা সরে এল।

"অদ্ভুত ভাইটালিটি। ট্যাঁকে বাচ্চা নিয়ে যাদুঘর থেকে চিড়িয়াখানা পর্যন্ত গোগ্রাসে দেখে বেড়াবে। আমরাও ছোটবেলায় এরকম ছিলাম।"

"সব দেখা জানা হয়ে গেলে সময় কাটানোটা যে কি বিশ্রী ব্যাপার।"

এতক্ষণে দয়ানন্দ কথা বলল। অনুমোদনের ভঙ্গিতে ছোকরা ঘাড় নাড়ল।

"বিশেষতঃ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে।"

এবার দয়ানন্দ ঘাড় নাড়ল। বিহারী পরিবারের কনিষ্ঠ সভ্যটি চীৎকার শুরু করছে। কর্তাটি ওকে থামাতে কোলে নিয়ে লিমনেডের রঙীন বোতলের সারি দেখিয়ে ব্যস্ত রাখছে। অবশেষে ঝালমুড়িওয়ালাকে ডাকল।

"অবশ্য যাঁরা ফ্যামিলিম্যান, ছেলে মেয়ে, ঘর-সংসার করে তারা সময় কাটিয়ে দেয়।" দয়ানন্দর এই মন্তব্যের কোন জবাব এল না, ছোকরা হাতঘড়ি দেখে পা দুটো ছড়িয়ে দিল।

একটু যেন শীত করছে। ইডেনের দেবদারুর ছায়া লম্বা হয়ে ছুঁতে আসছে। পথচারীদের সংখ্যা বাড়ছে না। ময়দানের এই দিকে বেশি লোক বেড়াতে আসে না।

"কটা বাজে।"

ছোকরা শুনতেই পেল না। স্থির দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে কিছু ভাবছে। মেট্রোপলিটনের ঘড়ি দেখার জন্য দয়ানন্দ ঘাড় ফেরাতে গিয়েই—হাসপাতালের আউটডোরে ঝিমোয় বা মিছিলের শ্লোগানে গলা দেয় বা ফেরিওয়ালার কাছ থেকে ধার ক'রে জিনিস কেনে, এমনি এক পরিচিত চেহারা দেখতে পেল। জাম রঙের পাট ভাঙা তাঁতের শাড়ি, হাতে ঝোলানো পশমের স্কার্ফ, খাটো হাতের ব্লাউজ। কখন এসে দাঁড়িয়েছে কে জানে। এক দৃষ্টে কিশোরদের এলেবেলে ক্রিকেট খেলা দেখছে। ঘড়ি দেখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। দয়ানন্দ বুঝতে পারল এ সেই। এমন ভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে যেন কেউ জিজ্ঞাসা করলেই বলবে এই তো এই মাত্র। অদ্ভুত শব্দ করে সেলস্‌ম্যান ছোকরা হাই তুলল, মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

"বাস ট্রামের ভিড়টা বোধ হয় এখন কমেছে, শনিবার তো।"

"হুঁ"

ছোকরা নির্লজ্জ। দয়ানন্দ সামনে তাকাল।

কিছুক্ষণ পরে ডানদিকে। চোখাচোখি হতেই মেয়েটি খেলা দেখতে শুরু করল। দয়ানন্দ আর খেই পাচ্ছে না, এবার কি করা উচিত। কাছে গিয়ে কি বলবে আমিই সেই বিজ্ঞাপন দাতা, আপনাকে আসতে বলেছি। নাকি ও নিজেই এসে বলবে, আমিই সেই, যাকে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু ও আমাকে চিনবে কি করে? আমারই যাওয়া উচিত। কিন্তু একটা অপরিচিত মেয়ের কাছে গিয়ে কথা বললে এই ছোকরা কি ভাববে?

বলটা কিছুদূর দিয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছিল। ছোকরা লাফিয়ে উঠে গিয়ে ধরল। একদল ছেলে চীৎকার করছে, "এদিকে ছুঁড়ে দিন, আমাদের বল।" বলটা ও ছুঁড়ল। দূরে ঘেরা মাঠের কাঠের বেড়ায় গিয়ে বলটা লাগল। শব্দটা পাওয়া গেল মুহূর্ত কয়েক পরে। একটি ছেলে বল আনতে ছুটল, আর একজন জোরে গালি দিল।

"উপকার করলুম কি না, তাই ধন্যবাদ জানাল। আজকালকার ছেলেদের বেচারটা দেখলেন তো।"

দয়ানন্দ লক্ষ্য করল ছোকরার কথায় মেয়েটি মুখ টিপে হাসল।

"কি উপকারটা করলেন? এমনই ছুঁড়লেন যে বল কুড়োতে ওদের আবার ছুটতে হল।"

দয়ানন্দর কথায় ছোকরা অপ্রতিভ হল। ভাবটা কাটিয়ে উঠতে ঝুঁকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল "আপনার ডানদিকে লক্ষ্য করেছেন?"

দয়ানন্দ মুখ ঘুরিয়ে মেয়েটিকে দেখল একবার। ঠায় এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে।

'ব্যাপার বুঝেছেন?'

দয়ানন্দ মাথা নাড়ল। ছোকরা আর একটু কাছে সরে এল।

"এসব হল পার্টিশানের ফল। আগে কিন্তু এসব দেখিনি। সেই ফর্টি-এইট থেকে তো ময়দানে যাতায়াত করছি। ময়দানে আর ভদ্রলোকদের আসার উপায় নেই।"

"ঠিক বুঝলাম না কি বলতে চাইছেন।" দয়ানন্দ যা শুনল তার অর্থ পরিষ্কার, তবু মুখ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে এল।

ছোকরা অল্পবিস্তর আহত বোধ করেছে। এমন সোজা ব্যাপার না বুঝতে পারায় দয়ানন্দকে সে আস্ত নির্বোধ ঠাওরে বলল, "ভদ্র মেয়েদের পোশাক কি এই রকম হয়? ভাল করে তাকিয়ে দেখুন।"

চোখে চোখ রেখে দয়ানন্দ বলল, "পরিষ্কার করে বলুন।"

স্বরে কাঠিন্য ছিল।

ছোকরা ভ্রূ তুলল, কাঁধ ঝাঁকাল।

"এও যদি না বুঝতে পারেন, তাহলে আর কিছু বলার নেই। তবে আমি নিঃসন্দেহ। যদি প্রমাণ চান তাও দেখিয়ে দিতে পারি।"

দয়ানন্দ চমকে উঠল। ব্যাপারটা কোন পর্যন্ত গড়াতে পারে তা বুঝে ভয় পেল। মেয়েটি সম্পর্কে যতটুকু কথা হয়েছে, তাতেই ওকে যথেষ্ট অপমান করা হয়েছে। দয়ানন্দর মনে হল, অপমানের অধিকার তো তাদের নেই। ছোকরা কিছু করতে চায়। কত সহজে বলল, দেখিয়ে দিতে পারি। খারাপ কিছু করার ক্ষমতা আমরা কি সহজেই না পেয়ে গেছি।

এসব কোথা থেকে আমরা পেলাম ?

"কি দাদা, চুপ রইলেন যে।"

"কিন্তু আপনার ধারণাই যে অভ্রান্ত, বুঝলেন কিসে ?"

দয়ানন্দর গলা কেঁপে গেল। শরীরের ভিতরটা কাঁপছে। ছোকরাকে কিছু করা থেকে নিরস্ত করতে হবে, এইটুকুই সে বুঝেছে।

"দেখুন সেজেগুজে, একা এই রকমভাবে কি আমার আপনার বাড়ির মেয়েরা দাঁড়াতে পারে ? যদি বেড়াতে এসে থাকে, বেড়াচ্ছে না কেন ? কেন এইভাবে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে ?"

উত্তেজিত হয়ে ছোকরা গলা চড়াল। দয়ানন্দ আরও ভয় পেল। চট করে দেখল, মেয়েটি ওদের দিকে পিছু ফিরে একদৃষ্টে সামনে তাকিয়ে।

"কিন্তু এমনও তো হতে পারে ও অপেক্ষা করছে, কারুর জন্য। এই খানেই তার সঙ্গে দেখা করার কথা।"

"কার সঙ্গে দেখা করতে ?"

"আমি কি হাত গুনতে জানি যে বলব।"

"নিশ্চয় প্রেমিক-ট্রেমিক।"

"হ্যাঁ, হতে পারে।"

"হাসালেন মশায়, এসব ক্ষেত্রে প্রেমিকরাই দু-ঘন্টা আগে এসে পায়চারী করত। আপনার যদি এরকম হত ?"

কথায় কথায় যেন ছোকরা অনেকটা থিতিয়ে এসেছে। এইভাবে কথার জালেও যদিও ধরা দেয়, দয়ানন্দ ভাবল, তাহলে আটকে রাখা যায়। ততক্ষণে মেয়েটিও নিশ্চয় চলে যাবে। এখন ওর চলে যাওয়াই ভাল।

"আমার হলে ? ধরুন বাইরে থেকে আসছে ট্রেন লেট করল, এটা মোটেই আন্‌ন্যাচারাল ব্যাপার নয়। তাছাড়া অ্যাক্‌সিডেন্ট ঘটতে পারে। কে জানে, যার জন্য অপেক্ষা করছে সে হয়ত এখন হাসপাতালের এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে পড়ে আছে।"

'কোয়ায়েট ন্যাচারাল, কিন্তু এ সবই অনুমান।'

দয়ানন্দ রেগে উঠল। "আমারটা অনুমান আর আপনারটাই যথার্থ, না ?

আমাদের টি'কে থাকার মত এতবড় একটি সত্যি ব্যাপার, সেটাও কি অনুমানের উপর নির্ভর করে নয়? সব ব্যাপারই যে আমরা জেনে গেছি বা আমাদের চোখের সামনে ঘটবে এমন কোন কথা নেই। অনুমানে বুঝতে হয়, আর তাইতেই প্রমাণ হয় আমরা কে কতটা শিক্ষিত, সভ্য।"

ঠকঠক করে দয়ানন্দর বাইরের শরীর কাঁপছে। আরো অনেক কথা ভিতরে দাপাদাপি করছে। ফলে দুই চোখ বিস্ফারিত, কপালে চিটচিটে ঘাম।

"ভাল কথা, কার অনুমান ঠিক হাতে নাতে প্রমাণ হয়ে যাক।"

কথা শেষ করেই ছোকরা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে চোখমেরে তীক্ষ্ণ শিস দিল।

"এসব কি, এসবের মানে কি?" দয়ানন্দ ওর কাঁধদুটো ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল। ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে ছোকরা অত্যন্ত নিস্পৃহ স্বরে বলল, "অশিক্ষিত, অসভ্য অনেক কিছুইতো বললেন, তাহলে ওকেই জিজ্ঞাসা করি।"

"কি জিজ্ঞাসা?"

জবাব না দিয়ে ছোকরা উঠে দাঁড়াতে গেল।

"না।"

চীৎকার করেই দয়ানন্দ ওর মুখে সজোরে চড় মারল। পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল ও। শুধু দপ্‌দপ্‌ করছে রগের পেশী। "আমি" দয়ানন্দ উঠে দাঁড়াল, "আমিই যাচ্ছি।"

ওকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দয়ানন্দ মেয়েটির দিকে এগোল।

চীৎকার শুনে মেয়েটি তাকিয়েছিল। চড় মারতে দেখে দু-এক পা এগিয়েছিল। দয়ানন্দকে আসতে দেখে থমকে দাঁড়াল।

"আপনি," হাঁপাচ্ছে দয়ানন্দ। "আপনি এখানে কি করতে দাঁড়িয়ে আছেন?" মেয়েটির চোখে মুখে বিস্ময় ফুটল।

"এভাবে এসব জায়গায় খারাপ মেয়েরা দাঁড়ায়।"

"একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা। তিনিই আমাকে এখানে আসতে বলেছেন। কিন্তু আপনি গায়ে পড়ে এসব কী বলছেন?" ঝাঁঝালো স্বরে মেয়েটি বলল।

"এই রকম জায়গায় যে দেখা করতে বলে, তার মতলব মোটেই ভালো নয়। আপনি বদমাসের পাল্লায় পড়েছেন। ওই যে ছোকরাটি, যাকে চড় মারলাম, ওই আপনাকে আসতে বলেছে। ওকে আমি চিনি। এইভাবে ও অনেক মেয়েকে ভুলিয়ে সর্বনাশ করেছে। আপনি এখনি চলে যান।"

শুনতে শুনতে মেয়েটির মুখে ভয় ফুটল। চারপাশে তাকিয়ে ইতস্তত করল। দয়ানন্দর মুখের দিকে বারেক তাকাল। তারপর হন্‌হন্‌ করে রওনা

হল। দয়ানন্দ পিছন থেকে দেখল ওর কনুইয়ের কাছে আঁচড়ের খড়ি ওঠা দাগ। কোন এক সময়ে চুলকে ছিল।

সেল্‌সম্যান ছোকরা ব্যাগটা হাতে নিয়ে দয়ানন্দর পাশে এসে দাঁড়াল। ওর মুখের উপর চোখ মেলে বোবা হয়ে রইল দয়ানন্দ।

"কে ঠিক?"

জবাব না দিয়ে ভূতে পাওয়ার মত দয়ানন্দ ফিরে এল যেখানে বসেছিল। পাশে তাকাল, বিহারী পরিবারটি কখন উঠে চলে গেছে। ইডেনের দেবদারু থেকে বাদুড় উড়ল। জাহাজ ভোঁ দিচ্ছে। রাজ্যপাল ভবনের ফটক দিয়ে গুর গুর শব্দে মোটর বাইক বেরোল। যা ঘটল এর জন্য একজনই দোষী। দয়ানন্দর মাথা নুয়ে পড়ল। একজনই মাত্র দায়ী। আমার মনে কোথাও পচ ধরে আছে। নয়তো বুক ফুলিয়ে বলা যেত আমিই সেই, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, হিন্দু, আত্মীয়স্বজনহীন যে কোন জাতীয় মেয়েকে বিবাহেচ্ছু পাজী, বদমাস, জোচ্চোর।

"আপনার ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

টেনে টেনে টেনে দয়ানন্দ মাথাটাকে তুলল। দৃষ্টি জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই ছোকরা। গালে হাত বুলোতে বুলোতে মুচকি হাসছে। কিলবিল করে নড়ে বেড়াচ্ছে সিগারেটের ধোঁয়া। ধীরে ধীরে ধীরে মাথাটাকে আবার নুইয়ে দয়ানন্দ বলল, "আমাকে ক্ষমা করুন।"

নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান

ধূসর অ্যাম্বাসাডারটা ফ্যালাকে লক্ষ্য করেই ষোল হাত চওড়া রাস্তাটায় থামল। ড্রাইভারের আসন থেকে প্রশ্ন হল, "এটাই কি ঘোষপাড়া লেন ?"

বিমূঢ় হয়ে ফ্যালা উঠে দাঁড়াল। প্রশ্নকারী জানলা থেকে মুখটাকে একটুখানি বার করেছে। ফ্যালার আর কোন সন্দেহ রইল না। অবশ্য কন্ঠস্বরেই আধখানা চিনেছিল। ঘাড় নেড়ে পাশের গলিটাকে আঙুল তুলে দেখাল।

"থ্যাঙ্ক য়্যু।"

মোটরটা আধখানা ফিরে তাক করতে লাগল গলির মুখটাকে। রিক্সা বা ঠেলাগাড়ি-চালক হলে এত সময় নিত না। ঘোষপাড়া লেনের প্রবেশ মুখ সাত হাত চওড়া। ফ্যালার ইচ্ছে করল, হারকিউলিস হয়ে দু'হাতের চাড়ে বাড়ি-গুলোকে ঠেলে, জায়গাটাকে সতের হাত করে দিতে।

তা যখন সম্ভব নয়, ফ্যালা ষোল হাত চওড়া রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ব্যাকুল-ভাবে বন্ধুদের খুঁজল। কেউ নেই, দোকানে দোকানী, রাস্তায় পথিক। রাস্তাটায় যদিও মাঝে মাঝে প্রাইভেট মোটর আসে, কিন্তু কৌতূহলী হয়ে এখন একবারও কেউ মুখ তুলে দেখছে না যে গাড়িটা কে চালাচ্ছে। কিংবা দেখেও চিনল না।

সুতরাং ফ্যালা কিছু বিরক্ত হল, কিছু লজ্জা পেল। সর্বসাধারণের এই উদাসীনতা দোষ স্খালনের জন্য এগিয়ে গিয়ে বলল, "ক নম্বর বাড়ি খুঁজছেন ?"

"তিন। সুনীতি ভট্চায। কর্পোরেশন স্কুলের হেডমিস্ট্রেস।"

"অঃ, একটুখানি গিয়ে ডানদিকে রকওলা বাড়ি, তার পরেরটা।"

গাড়িটা কষ্টেসৃষ্টে ঢুকে গেল। বেশিদূর যেতে পারবে না, কারণ মাসদুয়েক আগে কর্পোরেশন থেকে রাস্তায় একটি টিউবওয়েল বসান হয়েছে। ওখানে গাড়িটাকে রেখে হেঁটে যেতে হবে। ফ্যালা ঘাড় কাত করে থাকল যাবতীয় ব্যাপার লক্ষ্য করার জন্য।

টিউবওয়েলে স্নান করছিল গোবিন্দ দত্ত। গাড়িটা ওর পিছনেই থামল। জলটা ঠাণ্ডা, তাই মাথায় জল ঢেলে থাবড়ে থাবড়ে আমোদ করছিল গোবিন্দ। ভোর ছটায় বেরিয়ে সন্ধ্যা ছটায় ফেরা। এ সময় তিন নম্বর বাড়িটা

কোথায় জিজ্ঞাসা করলে, ও যে জল ঢালা থামিয়ে কথার জবাব দেবে না, প্রশ্নকারী তা কেমন করে জানবে। সুতরাং দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করে গোবিন্দর দাঁত খিঁচুনি দেখে আর কথা বাড়াল না।

ফ্যালা ছুটে এসে গোবিন্দকে চাপাসুরে ধমকাল, "ও কে জান, অমন করে যে কথা বললে?"

গোবিন্দ হকচকাল। ঘাড়ের কাছেই গাড়িটা, ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকিয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে বলল, "কে?"

"কি ভাবল বলতো, আমাদের পাড়া সম্পর্কে।" ফ্যালা তাকিয়ে রইল তিন নম্বর বাড়ি পর্যন্ত চোখ পেতে। বাড়ির দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে আসতে পারত, কিন্তু কিরকম লজ্জা করল। তবে তিন নম্বরের সদর দরজাটা রাস্তার ওপরেই, নম্বরটাও স্পষ্ট দেখা যায় রাস্তার আলোয়। তিনের এক কি তিনের দুই হলে নিশ্চয়ই সঙ্গে যেত।

শেফালীদের বাড়িটা একতলা, ছাদে পাঁচিল নেই। সন্ধ্যার পর সে ছাদের ধারে বসে থাকে, রক থেকে ওদের ছাদটা দেখা যায়। ফ্যালারা ওকে বলে শাঁকচুন্নী। বাত্রিশে পড়লেও বিয়ে হচ্ছে না। শেফালী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছাদের কিনারে বসে থাকে। পাড়ার মেয়েরা রাস্তা দিয়ে গেলে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় গেছলে গো, সিনেমা? ছোটছেলেরা খাবারের ঠোঙা নিয়ে ফিরলে বলে, কে এসেছে রে? পাশের বাড়ির বৌ, শোবার ঘরের জানালাটা ওর জন্যই সন্ধ্যা থেকে বন্ধ করে দেয়।

শেফালী আগাগোড়া সব দেখেছে। যদিও ফ্যালা পাড়ার ছেলে, বয়সে দু'বছরের ছোট তবু কথাবার্তা বিশেষ বলে না, এখন বলল, "এই ফ্যালা কাদের বাড়িতে রে?"

"সেই মাষ্টারনী, কুকুরকে যে বিস্কুট কিনে খাওয়ায়।"

শেফালী এইটুকু শুনেই ইলাবৌদির বন্ধ জানালায় কিল বসাতে শুরু করল।

বরুণ মিত্র পাড়ায় মাস ছয়েকের ভাড়াটে, কারুর সঙ্গেই মেশে না। ফিরছিল অফিস থেকে, ফ্যালা তাকেই বলল, "কার গাড়ি বলতে পারেন?"

বাড়িগুলো কলিচটা; বালি বেরিয়ে পাণ্ডুর বর্ণ। ওর মধ্যেই কালীবাবুর বাড়িটা সদ্য কলি ফেরান, ফলে মনে হয় গলিটার শ্বেতী হয়েছে। তেইশ নম্বরের ভাঙা ট্যাঙ্কের পাশে অশথ গাছটা বাড়তে চাইলেই লাঠি পিটিয়ে ডালগুলো ভেঙে দেয় ও-বাড়ির সত্যচরণ। ফলে গাছটা ছোট্ট রয়ে গিয়ে ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে। বৃষ্টি-জলের পাইপগুলো শিরার মত দেওয়াল বেয়ে রাস্তা পর্যন্ত নামান, কিন্তু রবারের বল খেলার ধকল সইতে না পেরে, তলার অংশ

অধিকাংশেরই ভাঙা। জানালাগুলো লটপটে বুকপকেটের থেকেও অর্থহীন, ঝড় বৃষ্টিতে কাজে আসে না। গলিতে দাঁড়িয়ে আকাশে তাকালে প্রথমেই মনে হবে, চিরকুট শাড়ি ফেঁসে গিয়ে বিব্রত কোন গৌরাঙ্গীর দেহ। গলিতে ঢোকার সময় মানুষজন মুখ তুলে তাকায়, বেরোবার সময় আড়ে আর একবার।

টিউবওয়েলটা বসানোর ব্যাপারে অনন্ত সিংগীর সঙ্গে বাসুদেব নাগের প্রচণ্ড একচোট হয়ে গেছল। কুমার চৌধুরী কাউন্সিলর হয়েছে তারই কৃপায়, এরকম একটা ধারণা সিংগীমশাই বরাবরই পোষণ করে আসছেন। সুতরাং কর্পোরেশনের টিউবওয়েলটা তার বাড়ির সামনে বসবে না কেন? বাসুদেবের যুক্তিগুলো অবশ্য পাবলিক বেনিফিটের কথা ভেবেই বলা। তাছাড়া সিংগী-মশাইয়ের বাড়ির দেওয়ালে রাস্তার ইলেক্ট্রিক আলো বসেছে, টিউবওয়েলটাকেও কি তিনি নিজের সম্পত্তি করতে চান? পাড়ার পাঁচজনের কাছেই বাসুদেব গলা ফুলিয়ে প্রশ্নটা তুলেছিল। ফলে দুভাগ হয়ে যায় পাড়াটা।

সিংগীমশায়ের বাড়ির সামনেই টিউবওয়েল বসেছে, মধ্যস্থতা করেছেন কালীবাবু। টিউবওয়েলের খ্যাচ্যাং খ্যাচ্যাং শব্দটা তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। তাছাড়া রাস্তাটাও দিনরাত কাদা হয়ে থাকবে। তাই যুক্তি দিলেন: ধর হঠাৎ কারুর রান্নার জল ফুরিয়ে গেল, বাড়িতেও তখন কোন পুরুষ বা ছোট ছেলেপিলেও নেই যে এক-বালতি জল এনে দেয়, তখন কি বৌঝিরা রাস্তার মোড়ে গিয়ে কল থেকে পাম্প করে জল আনবে? বরং পাড়ার ভেতর দিকেই কলটা বসান ভাল, দেখতেও ডিসেণ্ট হয়। বেপাড়ার লোকেরা এসে কলটা খারাপ করে দিতে পারবে না।

বাসু নাগ সেই থেকে কালীবাবুর উপর চটা। বাড়ি সারাবার সময় কালীবাবু দোতলায় বেআইনী একটা পাইখানা করে, বাসুগিন্নী খবরটা যোগাড় করে আনে, বাসুদেব সেটা কর্পোরেশনে জানিয়ে কালীবাবুর কিছু খসিয়ে দেয়। রাগটা তাতে অনেকখানি কমে গেছে।

ধুসর অ্যাম্বাসাডারটা সিংগীমশায়ের দরজা আগলে দাঁড়িয়ে। বাড়ি থেকে বেরোতে গিয়ে তিনি আর পথ খুঁজে পেলেন না। সুতরাং চীৎকার করলেন, "গাড়ি কার, অ্যাঁ, রাখবার কি জায়গা পেল না; এটা লোকের বেরোবার পথ, এ কি অন্যায়।"

"কি হল, চেঁচাচ্ছেন কেন?"

ফ্যালা ছুটে এল। সিংগীমশায়ের মেয়ে হাসি রেডিও থেকে গান তুলছিল, সে নেমে এল। সামনের বাড়ির ভবদেব অর্থাৎ ভোম্বলও জানালা থেকে উঁকি দিল।

এদের দেখে ফ্যালা কিছুটা ভারিক্কী হয়ে বলল, "অচেনা লোক, আমিই বললুম এখানে রাখুন। তা নয় একটু ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছি।"

ফ্যালার নির্দেশে গাড়িটা রাখা হয়েছে, এবং ফ্যালা দিনকয়েক আগেই বেপাড়ার একটা ছেলেকে গলির মধ্যে টেনে এনে ঠেঙিয়ে লাট করেছে। সিংগীমশাই চুপ করে রইলেন। বেনেটোলায় তাঁর 'গন্ধেশ্বরী ভাণ্ডার' নামে একটা দোকান আছে। বাড়িওলাটা হুজ্জুত শুরু করেছে, সিংগীমশায়ের মনোগত বাসনা ফ্যালাদের দিনকয়েক ঘুরিয়ে আনবেন। সুতরাং ফ্যালাকে চটালেন না বরং হাত লাগিয়ে তিনিও সাহায্য করলেন।

গাড়িটা দু'হাত এগিয়ে রাখা হল। বাসুদেব অফিস থেকে ফিরছিল। সিংগীমশায়ের বাড়ির সামনে গাড়ি দেখে বিস্মিত হয়ে তাকাল। তাই দেখে সিংগীমশায় ডান পা'টা পিছনের বাম্পারে তুলে দিয়ে শ্লথ ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন। গাড়িটা যেন কোন আত্মীয়ের এবং এতই নিকট যে পা পর্যন্ত তুলতে পারেন। বাসুদেব ঈর্ষাচ্ছন্ন হলেন। ফ্যালা দাঁত কিড়মিড় করে ভাবল, শালার ঠ্যাংটা ভেঙে দোব নাকি।

ভবদেব অর্থাৎ ভোম্বল, ঘোষপাড়া লেনের অত্যন্ত মানী ছেলে। বর্তমান বয়স চব্বিশ। স্কুলের ম্যাগাজিনে ধর্ম সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে, পাড়ার মাতব্বরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কলেজের ম্যাগাজিনে প্রগতিশীল কবিতা লিখে বড়দা, মেজদা এবং সেজদার দুশ্চিন্তা, ক্রোধ এবং বিরক্তি উৎপাদন করে। বর্তমানে সে এই পাড়ার একমাত্র যুবক যে গ্র্যাজুয়েট, একটি লাইব্রেরীর সদস্য, রকে আড্ডা দেয় না, বড়দের সামনে সিগারেট ফোঁকে না, মেয়েদের দিকে মুখ তুলে তাকায় না, এবং তিনশো প'চাত্তর টাকা মাইনের চাকুরিয়া। এ পাড়ার পিতারা সন্তানদের প্রতি হতাশা প্রকাশ করার সময়, ভোম্বলকে পুত্ররূপে না পাওয়ায় আক্ষেপ করে থাকেন। ফলে ভোম্বলের সমবয়সীরা তাকে অপছন্দ করে।

ভোম্বল ছেলেটি বড় ভাবুক, তাই কম কথা বলে। সিংগীমশায়ের দোরগোড়ায় একটি মোটরগাড়ি দেখে সে ভাবল, কার হতে পারে। ফ্যালাকে জিজ্ঞাসা করলেই ল্যাঠা চোকে। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ কম কথা বলার জন্য তার স্বভাবে একপ্রকার জড়ত্ব এসে গেছে। বাসুদেবের জ্যেষ্ঠ কন্যা মণীষা অর্থাৎ মানু এইবার তিনবছর ডিগ্রী কলেজে ভর্তি হয়েছে। বাড়িতে সে মেজবৌদির সখীস্থানীয়া। প্রায়ই আসে। ভোম্বলের সাধ হয় ওর সঙ্গে হাস্য-পরিহাসের, কিছুক্ষণের সান্নিধ্য উপভোগের। কিন্তু গত দুই বছরে ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে 'এই যে' বলা ছাড়া আর কিছুই বলা হয়ে ওঠেনি।

লুঙ্গির উপর গেঞ্জী চড়িয়ে ভোম্বল দোর গোড়ায় এসে দাঁড়াল। সত্যচরণ গামছা পরে বালতি হাতে এল। ওর স্ত্রীর বাতিকের জন্য জল একটু বেশী দরকার হয়। ভোম্বলকে দেখে বলল, "হ্যাঁগা গাড়িটা কার ?"

সত্যচরণকে ভোম্বল পছন্দ করে না। তাই স্বল্প কথায় উত্তর দিল, "কি জানি।"

সত্যচরণ ডিঙি মেরে কিছু একটা অতিক্রম করে, টিউবওয়েলের চৌহদ্দিতে পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। "যত রাজ্যের গু-মুত চাকায় চাকায় এবার পাড়ার মধ্যে ঢুকতে শুরু করল।"

চেঁচিয়ে বলেছিল যাতে ভোম্বল শুনতে পায়, মোড় থেকে ফ্যালা ছুটে এল।

"কেন, চাকায় আসে আর লোকের পায়ে পায়ে আসে না? রাস্তাটা কি আপনার ঠাকুর ঘর?"

সত্যচরণ গভীর মনোযোগে বালতি ধুতে শুরু করল। ভোম্বল কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞাসাটা করেই বসল, "ফ্যালা গাড়িটা কার?"

"বৌ, অ-বৌ কোথায় গেলি? খোকাকে বলিস কিন্তু কচুরমুখী আনতে। অ-বৌ বাজার যাবার সময় খোকাকে মনে করে বলিস কিন্তু! বড়ি দিয়ে ঝাল করিস।"

থুত্থুড়ে শাশুড়ী, দালানের এক কোণায় সকাল-সন্ধে উবু হয়ে বসে থাকে। হামা দিয়ে নর্দমা পর্যন্তও যেতে পারে না। চোখে দেখে না, কানে কম শোনে।

"অ-বৌ খোকা ফিরেছে?" এরপর বিরক্ত হয়ে, "আঁটকুড়ীর গেরাহ্যি নেই। মর তুই, খোকার আবার বিয়ে দোব, দেখি তোর দেমাক থাকে কোথায়।"

বুড়ি এখন ঘণ্টা খানেক এইভাবে কথা বলবে। কিন্তু যাকে শোনাবার জন্য সে তখন দোতলার ভাড়াটে বাসন্তীর রান্নাঘরের দরজায়।

আচমকা ধাক্কাটা সামলে উঠে বাসন্তী বলল, "বলিস কি পারুল, সত্যি? ওগো শুনছ আমাদের পাড়ায়—" বলতে বলতে বাসন্তী পাশের ঘরে ঢুকল।

"শুনেছি।" মেঝেয় চীৎ হয়ে গোয়েন্দা উপন্যাস পড়তে পড়তে রবীন জবাব দিল। বাঁ হাতটা যন্ত্রের মত ঘুমন্ত ছেলের মাথা চাপড়ে যাচ্ছে।

পারুল বলল, "আমাকে ওবাড়ির শেফালি এসে বলল, ও দেখেছে। ঠিক ওদের বাড়ির সামনেই গাড়ি রেখে নামল। তারপর হেঁটে তিন নম্বর বাড়িতে গেল।"

বাসন্তী বলল, , "আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে?"

পারুল বলল, "তা না তো আর যাবে কোদ্দিয়ে। রোজই তো বাপু এই সময় জানালার ধারে বসে এটা করি ওটা করি, কেউ গেলে চোখে পড়েই। আর আজকেই বরাত এমন, মাথার ঠিক কি আর আছে, বিকেল থেকে শাশুড়ী খালি খাবো খাবো করে যাচ্ছে।"

অন্য সময় হলে পারুলের শাশুড়ীর বিষয়ে শোনার মত সময় হত বাসন্তীর। এখনি হাঁসফাঁস করে বলল, "ওগো দেখে এস না একবার।"

"কেন?"

"যদি রাস্তা দিয়ে দেখা যায় তা'হলে আমরাও গিয়ে দেখব।"

"রাস্তা থেকে?" রবীন মুখ থেকে বই নামাল। "বাড়ির বৌয়েরা রাস্তায় নেমে, আজেবাজে লোকদের গা ঘেঁষে অন্যের জানালায় উঁকি দেবে?"

অপ্রস্তুতে পড়ল দুজনেই। পারুল তো রেগেও উঠল। নিজের বৌকে ঠেশ দিয়ে তাকেও তো শোনান হল। শাসন করতে হয় নিজের বৌকে কর, সভ্যতা শেখাতে হয় তো নিজের বৌকে শেখাও। দুচারটে কথা পারুলের ঠোঁটেও এসে গেছল কিন্তু কয়েকটা ব্যাপারের কথা ভেবে ঢোক গিলল। ব্যাপারগুলি হল ঃ রবীনের অফিসে নব্বই টাকার একটা চাকরি খালি হয়েছে, ভাইয়ের জন্য পারুল কালকেই কথাটা পেড়েছে। এবাড়ির ছাদ ব্যবহারের একমাত্র অধিকারী দোতলার ভাড়াটে, যেহেতু ভাড়া বেশি দেয়। যে কোন মুহূর্তেই একতলার লোকদের ছাদে যাওয়া বন্ধ করে দিতে পারে। এছাড়াও বাসন্তী মৃতবৎসা দোষ কাটানোর অব্যর্থ মাদুলীর হদিশ জানে।

"আহা আমরা কি আর ঠেলাঠেলি করতে যাচ্ছি। যদি চলতে চলতে দেখা যায় তাহলে নীরুদের বাড়ি যাবার নাম করে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নেব। ওতে তো দোষ নেই।"

দরজার পাশ থেকে উঁচু গলায় পারুল বলল, "সেদিন দক্ষিণেশ্বর যেতে কি রকম ঠেলাঠেলি করে বাসে উঠতে হল।"

সেদিন রবীন ওদের নিয়ে গেছল। এবং বাড়ি ফিরেই স্ত্রীর কাছে খোঁজ নেয়, যে-লোকটা বরাবর বাসে ওদের পিছনে দাঁড়িয়েছিল তার স্বভাবটা কেমন? ফলে বাসন্তী ঝগড়া করে, না খেয়ে, আলাদা শয্যা নেয়।

উঠে পড়ল রবীন। পাঞ্জাবিটা ঘাড়ে ফেলে হনহনিয়ে ঘর থেকে বেরোল। সিঁড়িটা অন্ধকার। মুখস্থ থেকেও ভুল হয়ে গেল। দুটো সিঁড়ি একসঙ্গে টপকে তালগোল পাকিয়ে পড়ল। প্রথমে ছুটে নামল পারুল। হতভম্বের মত রবীন তখনো বসে। পারুল বগলের নীচে হাত দিয়ে টেনে তুলতে গেল। পিছন থেকে শান্তগলায় বাসন্তী বলে উঠল, "আমি দেখছি, তুমি সরোতো।"

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল রবীন। ওঠার সময় পারুলের বুকে কনুইটা এত জোরে লাগল যে পারুলকে 'আঃ' বলে উঠতে হল।

দালানের কোণ থেকে শাশুড়ী বলল, "অ-বৌ কি পড়ল রে।"

"ঠিক এইখানটায় আমি দাঁড়িয়ে, আর গাড়িটা ওইখানে।" হাতদুয়েক দূরে রাস্তার একটা জায়গা দেখিয়ে ফ্যালা বলল, "মাত্র এইটুকু ডিস্টেন্স থেকে কথা হল।"

জনা ছয়েক ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। তারা সবাই চুপ করে থাকল, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে গলিতে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটাকে দেখল।

"ওর আর একটা গাড়ি আছে। সেটা আনলে গলিতে ঢুকত না।" একজন বলল।

সকলে গলির মুখটাকে লক্ষ্য করল।

"কে জানত বাবা গলির মধ্যে মোটর ঢুকবে, তাহলে চওড়া করেই তৈরি করত।" আর একজন বলল।

"শালার বাড়িগুলো ভেঙে না পড়লে আর গলি চাওড়া হবে না।" ফ্যালা বলল।

"হ্যাঁ সব বাড়িগুলো মাঠ হয়ে যাক শুধু উনিশের বি-টা বাদে।"

এবার সবাই চাপা হাসল। উনিশের বি-তে বরুণ মিত্তির থাকে। সম্প্রতি ওর দূরসম্পর্কের এক বোন এসে রয়েছে। ফ্যালা তাকে ভালবেসে ফেলেছে এবং ধারণা নমিতাও যে দরজার কাছে মাঝে মাঝে দাঁড়ায়, একমাত্র তাকেই দেখার জন্য।

কথাটা শুনে ফ্যালা স্বভাবতই লাজুক হয়ে পড়ল। খুশিও হল। তাই মোড়ের ঠাকুরের পানের দোকানে গিয়ে হাঁকল, "এক প্যাকেট ক্যাপস্টান।"

ঠাকুর একবার আড়ে তাকিয়ে পান সাজায় ব্যস্ত রইল। তাড়া দিল ফ্যালা। শুনেও শুনল না যেন। সাধারণত যা করে থাকে, ফ্যালা নিজেই সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিতে গেল। ঠাকুর ওর হাত চেপে ধরল। বিস্ময়ে ফ্যালা স্তম্ভিত।

"তিনমাস ধরে তো দেবে দেবে কচ্ছেন। আর ধারে হবে না।"

আত্মসম্বরণ করে, গম্ভীর স্বরে ফ্যালা বলল, "ঠিক আছে সামনের হপ্তায় শোধ করে দোব।" ঠাকুর নিজ হাতে প্যাকেট এগিয়ে দিল।

ইতস্তত করে ফ্যালা নিল। কানের ডগাদুটো ঝাঁঝাঁ করছে।

"কত টাকা বাকি?" স্বরটা কেঁপে উঠল।

"ছ'টাকা বারো আনা।"

ফ্যালা আসতেই ওরা ছোঁ দিয়ে প্যাকেটটা কেড়ে নিল।

"ওরে ব্বাস ক্যাপস্টান!"

"কাল ছাতে উঠেছিল। মালা সিনহা একদম মাইরি, মাইরি।"

"কেন, মুখের আদলটাও ঠিক, হুবহু।"

"ওব দাদার সঙ্গে ভাব করে নেনা, লোকটা কনজারভেটিভ নয়। অফিসের বন্ধুদের নিয়ে তাস খেলে, বৌ-ও তাদের সঙ্গে খেলে।"

কোঁতপেড়ে গিলে ফুকফুক করে ওরা ধোঁয়া ছাড়ল। ফ্যালা রেগে উঠল আপন মনে। কিন্তু রাগটা প্রকাশ করার কোন মওকা আপাতত পাচ্ছে না। জোরে জোরে টান দিয়ে সিগারেটটাকে নিঃশেষ করে রাস্তায় আছড়ে ফেলল।

"কিছু টাকা যোগাড় করতে হবে।"

ওরা ফ্যালার দিকে তাকাল। কেউ কিছু বলল না।

কালীবাবু পাঁচ বছর অন্তর বাড়ির কলিফেরান। দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে এখন ঝাড়া হাত-পা। চারুশীলা ওরফে শীলার সঙ্গে ঝগড়া করা ছাড়া, বায়ান্ন বছর বয়সে তার আর কোন সখ নেই। অবশ্য নিয়মিত রেডিওর থিয়েটার শোনেন আর সত্যচরণকে মাঝে মাঝে রাজনীতি বুঝিয়ে থাকেন। চারুশীলার জ্বালা ঝিয়েদের নিয়ে। ওরা আসে হতকুচ্ছিত চেহারা নিয়ে। তারপর কেমন যেন পরিপাটি হয়ে যায় চারুশীলার নজরে। চুলে তেল, গায়ে ব্লাউজ, মুখে পান, ঢলানি ঢলানি ভাব। কালীবাবুও সকাল সকাল অফিস থেকে ফিরে উঠোনের ধার ঘেঁষে জানালায় বসে রেডিওয় কীর্তন শোনেন নয়তো খবরের কাগজ পড়তে শুরু করেন। তখন বাধ্য হয়েই চুক্তি ভঙ্গ করে দুয়ের জায়গায় তিনটি পোড়া বার করে দেয় চারুশীলা। তুলকালাম ঝগড়া বাধে। ঝি বরখাস্ত হয়ে যায়। রাত্রে পারুল-বাসন্তী ও বাড়ির কর্তা-গিন্নীর ঝগড়া শুনে মুখটিপে হাসে, আর ফিসফিস্ করে।

ওরা যে কি অত ফিসফিস করে চারুশীলা তাও জানে। অনিলের মা এখন আর অতটা আঁটসাট নেই, ওদের বাড়িতে কাজ করার সময় যতটা ছিল। অনিলের ছোট দুই ভাই নাকি চারুশীলার দুই মেয়ে ভূতি আর টুনুর মত হুবহু দেখতে। কেন হল? এ বিষয়ে পারুলের গবেষণার ফলাফল চারুশীলা শেফালী মারফৎ জেনেছে। এবং চারুশীলার মতামত পারুলকে সযত্নে জানিয়ে গেছে শেফালী।

কালীবাবু আজ বাড়ি ফিরলেন সন্দেশের বাক্স হাতে। স্ত্রীর পিসতুতো ভাইয়ের নতুন জামাইয়ের রাত্রে নেমন্তন্ন। ছেলেটি বিলেতফেরৎ, সাহেব কোম্পানিতে আটশো টাকায় ঢুকেছে। খুব বড় ঘরের ছেলে, বাপ রায়-বাহাদুর।

বাড়ি ঢোকার মুখেই কালীবাবুর মনে পড়ল, ইসবগুলের ভূষি ফুরিয়েছে। এখনই না কিনে রাখলে রাতে কেনার কথা মনে নাও থাকতে পারে। অতিথিকে ফেলে মুদি-দোকানে ছোটা উচিত হবে না। এইসব ভেবে কালীবাবু নিজের বাড়ির দরজা থেকেই আবার ফিরলেন। বাসুদেববাবুর বাড়ির কাজ সেরে অনিলের মা-ও তখন ফিরছিল।

মুদির দোকানটা, ষোল হাত রাস্তার উপর বস্তির গলিটার মুখেই। সুতরাং দুজনের গন্তব্যই একমুখী। কালীবাবু যখন ইসবগুল কিনছেন তখন অনিলের মা-ও কাপড়কাচা সোডা কিনতে ও'র পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ফ্যালা সেইমাত্র বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। নজরে পড়ল কালীবাবু

যেন ফিসফিস করে অনিলের মাকে কি বললেন। অতঃপর ভূষি কিনে কালীবাবু বাড়িমুখো হলেন।

চারুশীলা এটুকু লক্ষ্য করেছে, বাড়িতে পা দিয়েই কালীবাবু বেরিয়ে গেলেন। ফেরা মাত্রই সে কারণটা জানতে চাইল। এতে কালীবাবু হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, "অত খোঁজে দরকার কী, কোথায় যাই বা না যাই?"

চারুশীলা কথা বাড়াল না। ব্যাপারটা পরে জেনে নেওয়া যাবে, এখন ময়দা মেখে বেলে রাখতে হবে। হাতের কাজ সেরে না রাখলে জামাইয়ের সঙ্গে গপ্পো করার সময় পাওয়া যাবে না।

আঙুর অর্থাৎ অনিলের মা দশটা টাকা চেয়েছে। আজকেই চাই। কালীবাবু বলেছেন, রাত্রে গিয়ে দিয়ে আসব। চারুশীলার দাদার জামাই আসবে একটু পরেই, তার সঙ্গে বসে ভ্যাজ-ভ্যাজ করতে হবে। খেয়ে দেয়ে বিদেয় হতে হতে রাত দশটা। অত রাতে বস্তীতে ঢুকলে যদি কেউ দেখে ফেলে? বকাটে ছোঁড়াগুলো তো ওখানেই গুলতানি করে, তাহলে কেলেঙ্কারীর শেষ থাকবে না। কমপক্ষে চারমাস আঙুরকে স্পর্শ করা হয়নি। থলথলে, দলমলে মাংসের স্তূপে আঙুল ডুবিয়ে—ভাবতে ভাবতে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলেন কালীবাবু। গোটাকতক ভারী নিশ্বাস পড়ল। নানান ধরনের যৌন-ছবি মাথার মধ্যে ফুটে উঠছে আর তখনই ঘরের আলো জেলে চারুশীলা খনখনে স্বরে বলল, "এইমাত্র চাদর ভেঙে পাতলুম, আর ময়লা কচ্ছ। নীচের ঘরে গিয়ে বস না। আসার সময় তো হল।"

কালীবাবু উঠে বসে বললেন, "শরীরটা কি রকম ম্যাজম্যাজ করছে। শীলু এককাপ চা করে দাওনা।"

বাসু নাগ বাড়ি ফিরেই পাইখানা যান। এটা তাঁর বাইশ বছরের অভ্যাস। পালন করতে গিয়ে টের পেলেন প্যানের মধ্যে কিছু একটা পড়ে বুজে রয়েছে। বলাই বাহুল্য এতে তিনি চটলেন। ধকলটা গিয়ে পড়ল স্ত্রীর উপর। তিনি সাত চড়ে রা কাড়েন না।

"তোমরা জেনেশুনেও চুপ করে মজা দেখছিলে। আগে বললে বাঁ হাত দিয়ে তুলে নিতুম। এখন তুলি কি করে?"

অতঃপর ছোটছেলে নালুকে তিনি বেধড়ক কয়েক ঘা দিলেন। হতচ্ছাড়াটার পড়াশুনা নেই, দিনরাত শুধু বল খেলা আর বল খেলা। এখন এই বল তুলবে কে? স্ত্রী পরামর্শ দিলেন একটা ধাঙ্গড় ডেকে আনলেই সমস্যাটা মিটে যায়।

সন্ধ্যার পর ধাঙ্গড়রা পাইখানা থেকে বল তোলার জন্য নিশ্চয় বসে নেই,

স্ত্রীকে এই কথাটা জানিয়ে বাসু নাগ কয়েক বালতি জল ঢেলে বলটিকে তুললেন এবং পাছে নালু সেটিকে হস্তগত করে, তাই রাস্তায় বেরোলেন পরিত্যাগ করে আসতে। বল আর বেড়ালে কোন তফাৎ নেই, যেখানেই ছেড়ে এস না কেন ঠিক বাড়ি ফিরে আসবে। তাই গলির বাইরে বড় ডাস্টবিনে ফেলার উদ্দেশ্যে বাসু নাগ রওনা হলেন।

অনন্ত সিংগীর বাড়ির দোরে মোটরটাকে দেখতে পেয়ে বাসু নাগ এগোলেন না। ভাবলেন, বেটা নিশ্চয় এখনো দাঁড়িয়ে আছে। ওখান দিয়ে গেলেই দেখিয়ে দেখিয়ে গাড়িতে পা তুলে দাঁড়াবে। গাড়িটা কি কিনল? অসম্ভব, হারামজাদার পয়সা আছে বটে তবে কিপ্‌টে, তাছাড়া মুখ্যুও।

বাসু নাগ বাড়ি ফিরে সটান ছাদে উঠলেন। বলটা প্রাণপণে ছুঁড়ে দেবেন যেদিকে খুশি। কিন্তু কোনদিকে ছোঁড়া যায়? নজর পড়ল অনন্ত সিংগীর ছাদের ঘরটা। ওটা ঠাকুর ঘর। দরজাটাও খোলা রয়েছে। বাসুনাগ রাগ করে বলটা ছুঁড়ে দিলেন।

মনীষা অর্থাৎ মানু এসেছে। মেজবৌদি বাপের বাড়ি গেছে সকালে, এখনো ফেরেনি। বড়বৌদি ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাশায়ী। দাদারা বাড়ি নেই। ভোম্বল যে কি করবে ভেবে পেল না। তাই যথারীতি বলল, "এই যে।"

মনীষা হাসল।

"পাড়ায় ওটা কার গাড়ি ভোম্বলদা? শুনলুম নাকি—"

থেমে গেল। তারপর বুকের আঁচল ঠিক করে একটু আদুরে গলায় 'ওপরে আপনার ঘর থেকে তো দেখা যায়। রাস্তায় বেরোলে দেখব।"

ভোম্বলের মুখে রা নেই। মানুর পিছু পিছু ঘরে এল।

"সিনেমায় অনেকবার দেখেছি। এমনি চোখে তো দেখিনি। কেমন দেখায় তাই দেখতে এলুম। এত সুন্দর ন্যাচারাল পার্ট করে না! জানেন ও কিন্তু মেয়েদের খুব ফেভারিট।"

ভোম্বল হাসল। মানুকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু অস্বস্তি লাগছে বাড়িতে কেউ নেই। মেজবৌদিও যদি থাকত। যদি এই নিয়ে কথা ওঠে? বড়বৌদি অল্পবিস্তর কুচুটে।

"নিচের ঘর থেকে দেখলে হত না?"

"কেন, আপনার ঘরে অসুবিধে কি"

মানুর পাল্টা প্রশ্নে ভোম্বল দিশাহারা হল।

"মানে, কেউ তো বাড়ি নেই, নিচের দরজাটা খোলা।"

"তাতে কি হয়েছে?"

"কেউ যদি কিছু বলে।"

মানু যেন কুপিত হয়েছে এমন মুখভঙ্গি করে বলল, "কেন আমি কি খুব খারাপ মেয়ে যে অপবাদ দেবে ?"

"তা নয়, মানে ।"

রাগ করে মানু বেরিয়ে যাচ্ছে। হায় হায় করে উঠল ভোম্বলের অন্তরাত্মা। একি করে বসল সে, মানু যে চলে যাচ্ছে। প্রায় ছুটে গিয়ে সে মানুর হাত ধরল।

"অপবাদে আমিও ভয় পাই না ।"

মানু হাসল। লাজুক সুরে বলল, "কি যে করেন ।"

হাত ছেড়ে দিয়ে ভোম্বল টুলের উপর বসল। ঘাড় হেঁট করে মানু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু এভাবে চুপ করে থাকা বা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকার জন্য কেউই প্রস্তুত নয়। সুতরাং মানু ঘরের ভিতর এসে বলল, "আপনার ঘরটা খুব টিপ্‌টপ্‌, সাজানো, আপনি খুব গোছানে ।"

ভোম্বল হাসল এবং ভাবল মানুও খুব টিপটপ।

"আচ্ছা আপনি যে অত বই কিনেছেন, এর সব পড়া হয়ে গেছে ?"

ভোম্বলের বুক দুলে উঠল।

"তা না হলে কি অমনি অমনি সাজিয়ে রেখেছি ।" সগর্বে বইগুলোর দিকে তাকিয়ে, "প্রত্যেকটা লাইন পড়া ।"

মুগ্ধ হয়ে মানুও বইগুলোর দিকে তাকাল।

"বাবা বলছিল, এপাড়ায় আপনার মত কোন ছেলে নেই। সত্যি, পাড়ার ছেলেরা যা হয়েছে না, জানেন বরুণবাবুর এক বোন এসেছে না, মেয়েটা ভারী বেহায়া চাল্লুশ। আর পাড়ার যত বকাটে ছেলে ওদের বাড়ির সামনে ঘুরঘুর করবে। ফ্যালার সঙ্গে নাকি এর মধ্যেই ভাব হয়ে গেছে ।"

"তাই নাকি !"

"ওমা, পাড়ার সবাইতো জেনে গেছে ।"

মানু খাটের ওপর বসল। সামনের দেয়ালে আয়না, মুখ দেখা যায়। আয়নার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি তো নামেও ভোম্বল, কাজেও ভোম্বল ।"

"বটে, তাই নাকি ! আমিও অনেক খবর রাখি তা জানো ?"

মানু সচকিত হল। চুলের একটা গুচ্ছ কপালের ওপর ঝুলিয়ে দিলে কেমন দেখাবে, সেইটা পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছেটা দমিয়ে, ব্যগ্রস্বরে বলল, "কি ? কিসের খবর ।"

মানুর চোখে খানিকক্ষণ চোখ রেখে ভোম্বল বলল, "মনীষা বলে একটা মেয়ে এ-পাড়ায় আছে সে খুব সুন্দরী, তা জানো ?"

বুঝতে একটু সময় লাগল। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে কুঁজো হয়ে মানু বলল, "কি অসভ্য ।"

মুখটা তোলার সময় মানু আঙুল দিয়ে চুলের গুচ্ছটা চট করে কপালের উপর টেনে ফেলল। ভোম্বল দেখতে পেল না। মুখোমুখি বসে থাকতে লজ্জা করল তার। উঠে জানালায় গেল। ফিরে এল। বসল। আয়না দেখল। ভোম্বলের দিকে তাকাল। বলল, "মেজবৌদি কখন আসবে?"

"সময় তো হয়ে গেছে।"

আবার চুপচাপ।

"মেজবৌদি বলছিল একদিন প্ল্যানেটরিয়াম দেখতে যাবে! কেউ না নিয়ে গেলে বাবা যেতে দেবে না। ওসব দিকে যেতেও কেমন যেন লাগে! গড়ের মাঠটা এমন না, কোথায় যে বাস থেকে নামতে হবে?"

"সামনের রোববার চল না, যাবে?"

"আমি কি জানি, মেজবৌদি যদি যেতে চায় তবেই তো।"

"তোমার বাড়িতে কিছু বলবে না?"

ঘাড় নাড়ল মানু। "আপনি তো সঙ্গে থাকবেন।"

টুল থেকে উঠে খাটে বসল ভোম্বল।

শেফালি এসে বলল, "অ বৌদি দেখতে যাবে?" পারুল বিছানায় শুয়ে। কপালে হাত। চোখ বন্ধ। মাথা নেড়ে বলল, "মাথা ছিঁড়ে পড়ছে ভাই, ভীষণ ধরেছে।"

বলেই মুখভঙ্গি করল যন্ত্রণায়, তাই দেখে শেফালি কথা না বাড়িয়ে সিঁড়ির পথ দেখল।

বাসন্তী শাড়ি বদলে, চুল আঁচড়াচ্ছে। শেফালি বলল, "বৌদি, তারকদা'দের গলির মধ্যে একতলা একটা বাড়ি আছে, তার নিচের ভাড়াটেদের ঘর থেকে কিন্তু মাস্টারনীর ঘরের খানিকটা দেখা যায়, যাবে?"

বাসন্তী থ'। এত বড় একটা খবর পেয়ে কি যে করবে সে।

"ঠিক জানো? দেখা যায়? একটুখানি, একবার হলেই হবে।"

"ছোটবেলায় ওবাড়িতে যে খুব যেতুম। তখন যে ভাড়াটে ছিল তাদের একটা মেয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। আমি জানি, উঠোনের ডানদিকের ঘরটায় একটা ছোট্ট জানলা আছে।"

"পারুলকে ডেকে বলে নাও। আমি দরজায় তালা দি।"

"নিচের বৌদির মাথা ধরেছে, যাবে না।"

"সে কি!"

বাসন্তী দরজায় তালা দিয়ে, চাবি হাতে নামল।

"ওঠ ওঠ দেখতে যাবি তো চ এইবেলায়।" পারুলকে ঠেলা দিল

বাসন্তী। যন্ত্রণায় মুখ বেঁকিয়ে পারুল বলল, "সত্যি বলছি, ভয়ঙ্কর মাথা ধরেছে।"

সাধাসাধি করতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। চাবিটা পারুলকে দিয়ে বলল, "ছেলেটা রইল কাঁদলে দেখিস. আমি এখুনি আসছি।"

শেফালির সঙ্গে বাসন্তী বেরিয়ে গেল। দালানের কোণ থেকে বুড়ি বলল, "অ বৌ, তোর কি হয়েছে?"

রাস্তার আলোর নিচেই গাড়িটা। একটা বেড়াল বাচ্চা গুটিগুটি এসে গাড়ির নিচে ঢুকল। অনন্ত সিংগী বৈঠকখানা থেকে তা লক্ষ্য করে, উঠে এসে হাঁকডাক শুরু করলেন। ওঁর ভাবভঙ্গিতে সেই জিনিসটিই প্রকট, যার দ্বারা অন্যের এই ধারণা হয়, গাড়িটির অভিভাবক তিনিই। বেড়াল বাচ্চাই হোক আর একটা মাছিই হোক, কাউকেই তিনি রেয়াৎ করবেন না।

"এ সবই হচ্ছে ডেঞ্জারাস, চুপচাপ রয়ে গেল কেউ জানল না। তারপর গাড়ি স্টার্ট দেওয়ামাত্রই চটকে গেল। অযথা একটা প্রাণী হত্যা। দেখেছি যখন, তখন বার করে দেওয়াই ভাল।"

"নিশ্চয়।" সত্যচরণ বলল, "মরলে তো রাস্তাটাই নোংরা হয়ে গেল। কাক এসে ঠুকরে নিয়ে এখানে ওখানে উড়ে বসবে। আপনি ঠিকই বলেছেন।"

উবু হয়ে সত্যচরণ হুশ হুশ শুরু করল। বেড়াল বাচ্চা ভয়ে সিঁটিয়ে দেয়াল ঘেঁষে বসে রইল। ফ্যালা মোড় থেকে দেখল গাড়ির নিচে সত্যচরণ কি খোঁচাচ্ছে। ছুটে এল সে।

"দেখতো ফ্যালা ওটাকে বার করা যায় কিনা, গাড়ি চললেই তো চাপা যাবে।" সিংগীমশাই বললেন।

"তাই ওটাকে বার করে দিচ্ছিলুম।" সত্যচরণ কৈফিয়ৎ দিল।

ফ্যালা নিচু হয়ে দেখল। দেখে বলল, "স্টার্টের আওয়াজ শুনলেই ব্যাটা সটকান দেবে। আছে থাক।"

নিচু হয়ে যখন দেখছিল, তখন একটা ব্যাপার ফ্যালার চোখে পড়ল। গাড়ির পিছনে মাল রাখার ক্যারিয়ারের চাবিটা ভাঙা। ডালাটা একটু ফাঁক হয়ে রয়েছে।

"তাই বলে চীনারা মহান জাতি, চীনাদের প্রতি কোন বিদ্বেষ নেই! নেহরু এই যে সব বলেন, এটা কি বলা ঠিক হয়েছে? অ্যাজ এ প্রাইম মিনিস্টার অব ইণ্ডিয়া ওঁর তো ভেবেচিন্তে কথা বলা উচিত।"

"কি এমন অন্যায় বলেছে নেহরু।" পিসতুতো শালার বিলেতফেরত জামাই গম্ভীর হবার চেষ্টা করল। কালীবাবু নার্ভাস বোধ করলেন।

"চীনেরাই তো আমাদের অ্যাটাক করেছে।"

"তা করেছে।"

"ওরা তো এনিমি।"

"নিশ্চয়।"

"তবে কেন ওরা মহান ?"

উরু চাপড়ালেন কালীবাবু। জামাই কি একটা বলতে যাচ্ছিল, থামিয়ে দিয়ে দুলতে দুলতে বললেন, "মানি নেহরু খুব শিক্ষিত কালচার্ড। আমরা তার সমকক্ষও নই। কিন্তু ইনিই তো বলেছিলেন সুভাষ যদি আসে তো তরোয়াল নিয়ে তাকে রুখব। কি, বলেছিল তো ?"

জামাই কিছু বলতে যাচ্ছিল, কালীবাবু হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "কাশ্মীরে যখন ইণ্ডিয়ান আর্মি মোচোরমানদের ঠেঙাতে ঠেঙাতে পগারপার করছিল তখন যুদ্ধ বন্ধ করে ইউ এন ও-তে মামলা করার কি দরকার ছিল ? পনেরো বছরেও তো মামলা মিটল না। বুঝলে বাবু শুধু শিক্ষা, কালচার দিয়ে একটা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। এজন্য দরকার ডিক্টেটার। চাবুক হাতে নিয়ে দেশ শাসন করতে হয়। হিটলার করেছিল, স্ট্যালিন করেছিল তবেই না চড়চড় করে ওরা বড় হতে পারল।"

বাবাজী রীতিমত ঘায়েল। সত্যচরণ থাকলে কি অবাকটাই না হত। কালীবাবু দুলে দুলে আফসোস মেটাতে লাগলেন। জামাই অস্ফুটে বিড়বিড় করে দেয়ালে টাঙান চারুশীলার সূচিশিল্পের নমুনা দেখতে লাগল।

প্রথম রাউণ্ড জিতে কালীবাবুর উৎসাহ বেড়েছে। দ্বিতীয় রাউণ্ড শুরু করলেন।

"আচ্ছা তোমার কি মনে হয়, ইণ্ডিয়ার নন অ্যালাইণ্ড থাকা উচিত ?"

জবাবের জন্য কালীবাবু উদ্‌গ্রীব। জামাই তখনও চারুশিল্পে মগ্ন। ঠিক সেই সময়েই দপ করে আলো নিভে গেল। লোডশেডিং। ঘোষপাড়া লেন এলাকায় আজ অন্ধকার নামল।

"আঃ আবার। এই এক জ্বালা হয়েছে রোজ রোজ।"

চারুশীলা ছুটে এল নিচ থেকে। কালীবাবুকে ঘরের বাইরে ডেকে বলল, "মোমবাতি আনতে বলেছিলুম, এনেছ ?"

"এই যাঃ"। বলেই দুড়দুড় করে নেমে তিনি রাস্তায় পড়লেন। গোটা অঞ্চলটাই মিশমিশে। এখন দশচক্ষু হয়েও কেউ কাউকে চিনতে পারবে না।

"কে বলেছে ওটা আমার ছেলের বল ?"

রবারের বলটা বাসু নাগের মুখের সামনে তুলে অনন্ত সিংগী বলল, "বলটা তবে কার ?"

"কার তা আমি কি করে বলব। উইদাউট এনি প্রুফ, বললেই হোল ?

ওরকম বল হাজার হাজার থাউজেণ্ড অ্যাণ্ড থাউজেণ্ড ছেলের কাছে পাওয়া যাবে। আমি জানতে চাই, আই ডিমাণ্ড, আমার ছেলেকে কেন, কিসের ভিত্তিতে দায়ী করা হচ্ছে যে সে বলটা আপনার ঠাকুর ঘরে ছুঁড়েছে ?"

বাসু নাগ গামছা পরে সদর দরজায় চীৎকার জুড়েছে। আশপাশের বাড়ি থেকে অনেকেই বেরিয়ে এসেছে। লোকজন দেখে তার চীৎকার বাড়ল।—"স্রেফ আহম্মকী। গায়ে পড়ে ঝগড়া। অবশ্য কারণটাও জানি।"

"কি কারণ, কি জান ?" সিংগীমশাই রুখে উঠলেন।

"গরম, পয়সার গরম। ওরকম পয়সা ঢের ঢের দেখেছি। বুঝলেন, গাড়ি এক সময় আমাদেরও ছিল। গাড়ি দেখাতে আসবেন না। পয়সা আজ আছে কাল নেই কিন্তু বনেদীবংশের শিক্ষাদীক্ষা চিরকাল রক্তে থেকে যায় বুঝলেন।"

সত্যচরণ এই সময় বলল, "ব্যাপারটা কি ? বাসুদা চটলো কেন গা।"

"আর বলিস কেন ভাই, ইনি এসে বলেছেন এই বলটা নাকি আমার ছেলে ওঁর ছাদে ঠাকুর ঘরে ছুঁড়েছে। কোন প্রুফ নেই, কোন উইটনেস নেই। একেবারে চড়াও হয়ে এসে হম্বি তম্বি।"

"আলবৎ তোমার ছেলের বল এটা। এই যে ফুটো, টিপলে চুপসে যায়।" বলটা বাসুর মুখের সামনে ধরে সিংগী মশাই টিপলেন। হাওয়াটা বাসুবাবুর মুখে লাগতেই তিনি আঁতকে পিছনে লাফ মারলেন।

"হোয়াট ইজ দিস, অ্যাঁ, নোংরা বলের হাওয়া মুখের উপর ?" রাগে ঠকঠক করে বাসু নাগ কাঁপতে থাকলেন। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, "আই উইল কল পুলিশ, পুলিশ ডাকব। তেল বার করে ছাড়ব।"

"ডাক তোর পুলিশ আমিও দেখে নোব, তোর বনেদীপনার তেল কত। বুঝলে সত্য, যত রাজ্যের মেয়েলী পরচর্চা, পরনিন্দে হল এই লোকটার পেশা। ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে কি বলেছে জান ? বলেছে, ইলার মা নাকি অনন্ত সিংগীর বিয়ে করা বৌ নয়। মুদির কাছে কি বলেছে জান, নোটজালের কারবারীদের সঙ্গে আমার দোস্তি আছে ! আরে বাবা নিজের চরকায় তেল দিয়ে তারপর কথা বলতে আসুক ! মাসের মধ্যে দশদিন তো উনুন ধরে না।"

"আমার উনুন ধরে কি ধরে না, তা দিয়ে কার বাপের কি।" বাসু নাগ রাস্তায় লাফাতে শুরু করলেন। অনন্ত সিংগী একটু পিছিয়ে গিয়ে বললেন, "খবরদার বাপ তুলবে না, তাহলে রক্তারক্তি হয়ে যাবে বলছি।"

"তোমরা শুনে রাখ, আমায় থ্রেটন করল। আমাকে খুন করবে বলল।"

"মিথ্যে কথা, খুন করব বলিনি। সত্য তুমিই বল ?"

সত্যচরণ ফাঁপরে পড়ল, এখনো সে মনস্থির করতে পারেনি কার পক্ষ নেবে। সিংগীমশাইকে কোণঠাসা হতে দেখে বাসু নাগের দেহমনে মত্তহস্তীর বল দেখা দিল। গামছাটাকে মালকোঁচা করে এগিয়ে গেলেন।

"বাপের বেটা যদি হোস তো আয়, খুন কর দেখি, চলে আয়।"

অনন্ত সিংগীর ভাই বসন্ত সদ্য বাড়ি ফিরে ব্যাপার শুনেই সেইমাত্র এসে হাজির হয়েছে। বসন্ত রগচটা লোক। বাসু নাগের আহ্বানে সে এগোল। আর ঠিক সেই সময়েই অন্ধকার নামল ঘোষপাড়া লেনে।

শুয়ে রয়েছে পারুল। সিঁড়ি দিয়ে উঠছে রবীন। উপরে গিয়ে দেখবে তালাবন্ধ। চাবি নিয়ে পারুল উঠল।

"অ বৌ, কোথায় চললি। খোকা ফিরল? অ বৌ সাড়া না দিয়ে যাচ্ছিস কোথা?"

"যমের বাড়ি।" দাঁতে দাঁত ঘষে পারুল।

বুড়ির মুখের সামনে চড় তুলল। বুড়ি দেখতে পেল না, পারুল বেড়ালের মত উপরে উঠে গেল।

"সেই মাথাধরার ওষুধটা আছে?"

বন্ধ দরজার সামনে রবীন দাঁড়িয়েছিল। পারুলকে দেখে এবং বাসন্তীকে না দেখে জড়োসড়ো হয়ে পড়েছে। তোতলার মত বলল, "কিসের ওষুধ, কোন্ ওষুধ।"

"আঃ! আপনাকে দু'বার করে না বললে কিছুই বোঝেন না। মাথাধরার ওষুধ, মাথাধরার। ছিঁড়ে পড়ছে মাথাটা।"

দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে দু'হাতে চেপে ধরল কপালটা, অস্ফুটে যন্ত্রণার আক্ষেপধ্বনি তুলে মাথা ঝাঁকাল।

"ওষুধতো বহুদিন আগে একটা কিনেছিলুম, মলম। এখনো আছে কিনা—"

"জানেন না।" পারুল ধমক দিল যেন, "বাড়িতে এমন একটা কেউ নেই যাকে বলব মাথাটা টিপে দিক। আপনাকে বলা তো বৃথা। বৌ বাড়িতে নেই, এখন তো আমার দিকে তাকাতেও সাহস পাবেন না।"

"কেন, আমি কি ভীতু, এই তো তাকাচ্ছি।"

সাহস বোঝাবার জন্য রবীন চোখ দু'টা বিস্ফারিত করল। পারুল মুখ টিপে হাসল। রবীন সে হাসি দেখল।

"সাহস বোঝা গেছে, তখন যেভাবে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়লেন।" পারুল আঁচলটা মুখে চাপল হাসি লুকোতে এবং মুখ লুকোতে। কুঁজো হয়ে পড়ল। "শেষে বৌয়ের উপর রেগে আমাকেই একঘা দিয়ে দিলেন। আমি কি আপনার বৌ?"

"মোটেই আমি মারিনি।" রবীন ব্যাকুল হয়ে পড়ল। মুখ থেকে আঁচল নামিয়ে পারুল গলা খাটো করে বলল, "যাক আর মিথ্যে কথা বলতে হবে না।

এখনো ব্যথা করছে জায়গাটা। একে মাথার যন্ত্রণা তার ওপর আপনার যন্ত্রণা। বক বক করিয়ে আরো বাড়িয়ে দিলেন, দিন না বাপু মাথাটা টিপে।"

রবীনের হাতটা ধরে পারুল হ্যাঁচকা টান দিল। উভয়ের ব্যবধানটুকু তাতে ঘুচে গেল। হাতটা কপালে রেখে পারুল বলল, "বৌকে অত ভয় করেন কেন।"

আর ঠিক সেই সময়েই, ঘোষপাড়া লেনে দপ করে অন্ধকার নামল।

"সত্যি বলছি রোজ জানলার কাছে সেই জন্য অপেক্ষা করি। ঘুম ভাঙা ফোলা ফোলা চোখ, সকালের বাতাসে চুলগুলো কপালের ওপর ফুরফুর করে ওড়ে। যতদূর পর্যন্ত দেখা যায় তোমাকে দেখি। ইচ্ছে করে বেরিয়ে পড়ে তোমার পিছু পিছু কলেজ পর্যন্ত যাই। তারপর ভাবি, নাঃ চ্যাংড়া ছেলেরা এ সব করে। তুমি হয়তো আমাকে তাই ভাবতে পার।"

শুনতে শুনতে নুয়ে পড়ল মানুর মাথা। নিজের কোলের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, "আপনার সম্বন্ধে এই রকম ভাবব, তাই বা আপনি ভাবলেন কি করে? আপনি কি আর সবায়ের মত।"

মানুর স্বরে ক্ষোভ, অভিমান যেন। ভোম্বল ভাবল, এর দ্বারা কি এই বোঝায় যে মানু তাকে মোটেই চ্যাংড়া ভাবে না। তাহলে কি ভাবে?

"আচ্ছা যদি তোমার কলেজ পর্যন্ত যাই, অনেকটা পিছনেই থাকব অবশ্য কেউ বুঝতেই পারবে না. তাহলে তুমি কি রাগ করবে?"

মানুর মাথা আবার নুয়ে পড়ল। ভোম্বল বাক্যহারা, পলকহীন। মানু একবার চোখে চোখ রাখার চেষ্টা করে হার মেনে, জানলার কাছে উঠে গেল। মাথাটা কাৎ করে, ট্যারচা চোখে দেখল ধূসর মোটর গাড়িটা দাঁড়িয়ে।

"এখনো বেরোয়নি, শুনেছি নিজের পিসি হয় মাস্টারনী।"

"আমাদের সঙ্গে এক ইয়ারেই বি,-এ পাস করেছে। আমি সিটি ও স্কটিশ।" ভোম্বল উঠে গিয়ে তাক থেকে একটা বই পেড়ে নিল। বড় বৌদির বাচ্চা ছেলেটা এইমাত্র দরজায় উঁকি দিয়ে গেল। নিশ্চয় মার কাছে রিপোর্ট করবে, তিনি হয়তো একবার এসে ঘুরে যাবেন।

"পড়াশুনোয় এমন কিছু ছিল না, তবু দেখ হাজার হাজার টাকা কামাচ্ছে, শুধু চেহারার জন্য। ওর পার্ট তোমার ভাল লাগে?"

মানু এইবার চোখে চোখ রাখল। বড় করে মাথা নেড়ে বলল, "মাগো, কেমন যেন মেয়েলী মেয়েলী।" খুশিতে হাসল ভোম্বল।

"ওকে দেখার জন্য মেয়েরা কেন যে এত ব্যস্ত হয়।"

বইয়ের পাতা উল্টোতে শুরু করল সে। মানু জানলা থেকে পা-পা করে করে সরে এল। দরজার দিকে তাকাল ভোম্বল! গলা খাঁকরি নিয়ে নিচু গলায় বলল, "কই বললে না তো সে কথার জবাব।"

"কিসের !"

"ওই যে বললুম।"

মাথা নুয়ে পড়ল মানুর। পায়ের নখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কি বলব ?"

"বাঃ, সেটা কি আমি বলে দেব।"

"জানি না।"

"এড়িয়ে যাচ্ছ।"

দুজনেই চুপ। দূর থেকে একটা চেঁচামেচির আভাষ আসছে।

"অনেকেই তো আসে। কলেজের অনেক মেয়ের সঙ্গেই তো আসে। পেঁছে দিয়ে যায়। একসঙ্গে পাশাপাশি গল্প করতে করতে আসে।" মানুর কণ্ঠস্বর যেন মেঝেয় মিশে যাচ্ছে। "ওরা কিন্তু খুব ভদ্র। আমাদের ক্লাসের সুলেখা আলাপ করিয়ে দিয়েছে একজনের সঙ্গে। রোজ আসে। ওর সঙ্গে সুলেখার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে।"

শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে গেল ভোম্বল। কারণ সে ভাবতে শুরু করেছে, এতদ্বারা মানু কি এই বোঝাতে চায় যে, যদি বিয়ে করো তাহলেই কলেজ পর্যন্ত সঙ্গে যেতে পার ! কিন্তু মানুকে রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে দেখাটা মিথ্যে নয়। ওর সঙ্গে গল্পকরা বা একসঙ্গে পথচলার ইচ্ছাটাও সত্যি। অতএব ভোম্বল আর ভাবনা চিন্তা না করে বলল, "একদিনেই তো আর ওরা বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়নি, তার আগে—" বলেই ভোম্বল থেমে গেল।

মানু চোখ তোলেনি ! হঠাৎ প্রাণপণে কিছু বলার চেষ্টায় মুখটা তুলেই সবটুকু ক্ষমতা যেন ওর ফুরিয়ে গেল।

"বাবা সামনের বছর রিটায়ার করছে। আমায় বলেছে খবরের কাগজে কর্মখালির কলম যেন রোজ দেখি। আমিই তো বড়।" আবার প্রাণপণে ও ক্ষমতা সংগ্রহ করল, "আমার বিয়ে করলে চলবে কেন।"

ভোম্বল দেখছিল মানুর ঠোঁট কেমন থরথর করে কাঁপছে। ও তখন ভাবতে যাচ্ছিল,—আর সেই সময়েই দপ্ করে ঘোষপাড়া লেন অন্ধকার হয়ে গেল।

উঠোনটা অন্ধকার, ভিজে। সাবধানে পেরিয়ে দরজার কাছে ওরা দাঁড়াল। টিমটিমে বাল্ব জ্বলছে ঘরে। বাসন্তী কনুই দিয়ে শেফালীকে খোঁচাল।।

"ওই কোণের জানলাটা।" ফিসফিস করে শেফালী বলল। বাসন্তী আবার খোঁচা দিল।

বারো-তেরো বছরের একটি মেয়ে পিছু ফিরে বসে বাটিতে কিছু একটা গুলছে। ছেঁড়া কাগজ কুচিয়ে ভাগা দিচ্ছে একটি বাচ্চা। আর একটি

মেঝে থেকে খুঁটে খুঁটে মুড়ি খাচ্ছে। বছর দেড়েকের বাচ্চাটি তক্তায় উঠতে গিয়ে পড়ে কেঁদে উঠল।

তক্তায় এদের মা শুয়ে, চোখ বোজা। হাতদুটি এলান। ব্লাউজের বোতাম খোলা। ছোটটি বোধ হয় মাই খাবার জন্য তক্তায় উঠতে চায়। মায়ের কাপড় অসম্ভব ময়লা। পায়ের আঙুলে হাজা। মুখটি হাঁ করা। সম্পূর্ণ চেহারাটি দেখলে মনে হয় বহুকালের বিসর্জিত প্রতিমাকে জল থেকে টেনে তুলে শুইয়ে রাখা হয়েছে। শেফালীর মনে হল, মরে পড়ে আছে।

বাচ্চাগুলো ওদের দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে তাকাল। বড় মেয়েটি টের পেল। সে ফিরে তাকাল।

এবার একটা কিছু বলতে হয়। যেহেতু এদের মধ্যে বয়স্ক তাই বাসন্তীই বলল, "কি হয়েছে?"

"অসুখ।" ঠান্ডা, নিরুদ্বিগ্ন স্বরে কথাটি বলে সে বাটিতে কিছু একটা গুলতে থাকল।

"কি অসুখ।" শেফালী বলল। চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে পা রাখল।

"এমনি অসুখ, অনেকদিনের।" মেয়েটি ফিরে পর্যন্ত তাকাল না।

"ডাক্তার দেখে না?" এবার বাসন্তী।

"হাসপাতালে যেত। এখন বাবা গিয়ে ওষুধ আনে।"

ওরা দুজন ঘরের ভিতর ঢুকল।

"তোমার মা কথা বলতে পারে?"

"কাল থেকে খুব জ্বর, অজ্ঞানের মত হয়ে আছে।"

বাসন্তী জানলাটার দিকে তাকাল। বন্ধ রয়েছে।

"জানলাটা খুলে দাও, ঘরে হাওয়া চলাচল করুক।" বলে সে নিজে এগোচ্ছিল জানলাটা খুলতে।

"না।"

মেয়েটির ঠাণ্ডা গলার স্বরে বাসন্তী জমে গেল।

"পাশের বাড়ির ওরা খুব বিরক্ত হয়। এরা তো গোলমাল চীৎকার করে। বাবা তাই সব সময় বন্ধ রাখতে বলেছে।"

শেফালী বলল, "বাচ্চা ছেলেপুলে থাকলে গোলমাল তো হবেই। তাই বলে অসুস্থ মানুষটার কথাও তো ভাবতে হবে। খুলেই দাও, বলুক ওরা যা বলার।"

"না, বাবা বারণ করেছে।" ঠাণ্ডা গলায় আপত্তি জানাল মেয়েটি। বাসন্তী আর শেফালী মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তাহলে আর থেকে লাভ কি, চলে যাওয়াই ভাল।

কিন্তু কেমন যেন বাধবাধ লাগছে। এভাবে এসেই চলে যাওয়াটা ভাল দেখায় না। বাসন্তী বলল, "ওকে হাসপাতালে দিলেই তো হয়।"

জবাব পেল না। খুঁটে খাচ্ছিল যে বাচ্ছাটা তাকে টেনে নিয়ে বাটিতে গোলা জিনিসটি খাওয়াতে থাকল। বছর দেড়েকের বাচ্চাটা হামা দিয়ে শেফালীর পায়ের কাছে বসে মুখ তুলে তাকাল। মজা দেবার জন্য শেফালী চোখ দুটো বড় করে, জিভ বার করল। বাচ্চাটা ধীরে ধীরে হেসে উঠল।

"রান্না করে কে, তুমি ?"

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল। বাসন্তী আবার বলল, "সংসারের ঝামেলাতেই সদা ব্যস্ত। এসে যে দেখে যাব তার সময় কোথা ?" এমন ভাবে বলল যেন এরা বহুকালের চেনা। এতদিন না আসায় কৈফিয়ৎ একটা দেওয়া দরকার।

"কাচ্চাবাচ্চার সংসার আমাদেরও তো।"

"তোমার বাবা কখন ফিরবে ?" শেফালী অনেকক্ষণ চুপ রয়েছে; তাই বলল।

"রাত দুটো-আড়াইটে হয়।"

"এতক্ষণ ?"

"ইভনিং ডিউটি থাকলে রাত হয়। মর্নিং ডিউটি হলে দুপুর দুটো-আড়াইটেয় ফেরে।"

"কি কর অতক্ষণ ?"

"কিছু না।"

তক্তা বাদ দিয়ে যতটুকু মেঝে, শুঁয়োপোকার মত ছেলেগুলি নড়াচড়া করছে। বাচ্চাটি হামা দিয়ে তক্তা ধরে দাঁড়াল। মায়ের একটা পা ধরে টানতে শুরু করেছে। হঠাৎ চোখ খুলল। হাত মুঠো করে, মুখ দিয়ে শ্বাস টানছে। দৃষ্টি কড়িকাঠে ঠায় হয়ে রয়েছে। ঘরের কাউকেই দেখছে না।

বাচ্চাটি পেচ্ছাপ করেছে। মেয়েটি ন্যাতা আনার জন্য উঠোনে বেরোল। সে সময় বাসন্তী বলল, "চলো, চলে যাই এবার।"

"মেয়েটি আসুক।" বলে শেফালী তক্তার দিকে তাকাল। মরামানুষের দৃষ্টির মত তার মুখেই ঠায় তাকিয়ে। মাথাটা ঘোরায় নি। চোখের মণিদুটো কোণে সরে গিয়ে সাদা অংশটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। দাঁতগুলো ফাঁক ফাঁক। তাতে হলুদ ময়লা।

'বৌদি এবার চল।"

শেফালী কথা শেষ করা মাত্রই ঝুপ করে ঘোষ পাড়া লেনে অন্ধকার লাফিয়ে পড়ল। শিউরে কাঠ হয়ে গেল শেফালী। কে কঠিন ভাবে তার হাতটা আঁকড়ে ধরেছে। ঘরটা স্তব্ধ। কে যেন ভারী হয়ে শ্বাস টানছে।

প্রথমে কেঁদে উঠল ছোট বাচ্চাটা, তারপর একে একে বাকিরা।

বড় মেয়েটি অন্ধকারেই ঘরের মেঝেয় ন্যাতা বোলাল। বাসন্তী বলল, "মোমবাতি কি হ্যারিকেন এসব কিছু নেই।"

"না।"

ফিসফিস করে শেফালী বলল, "আমার আঁচলে একটা সিকি আছে। খুলে নিয়ে ওকে দাও। মোমবাতি আনুক।"

অন্ধকার কঠিন ভাবে ওর হাত ধরে রয়েছে। প্রথমে দেখে মনে হয়েছিল, মরে গেছে।

বস্তির গলিটা দিয়ে প্রায় ছুটছিল ফ্যালা। হাতে মোটরের চাকা। মোটর গাড়ির পিছনের ক্যারিয়ারে বাড়তি যেটা থাকে সেই জিনিস। অন্ধকারে ধাক্কা লাগল সামনের একজনের সঙ্গে। টায়ারটা হাত থেকে পড়ে গেল। লোকটা বলল, "আস্তে চলুন না, দেখছেন না কি অন্ধকার।" ফ্যালা জবাব দিয়ে কথা বাড়াল না। লোকটা কালীবাবু।

•

রাস্তায় উবু হয়ে বসে ফোঁপাচ্ছেন বাসুদেব নাগ। ছেলেমেয়েরা গোল হয়ে ঘিরে। স্ত্রী মাথায় জল ঢালছে। সামনের বাড়ির একজন লম্পো হাতে দাঁড়িয়ে। বাসুবাবুর মাথা ফেটেছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তিনি বললেন, "সব তোমার জন্য, এ সব তোমার জন্য। ছেলেমেয়ে সংসার সব ফেলে রেখে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব। বুঝবে, কি করে সংসার চলে। কত অপমান সয়ে চলতে হয়।"

বাসুবাবুর স্ত্রী সাত চড়ে রা করেন না। তিনি জল ঢালতে লাগলেন।

মানু বলল, "আমি এখন যাই।"

ভোম্বল বলল, "কেন যেতে তো বলছি না।"

মানু বলল, "না অন্ধকারে আমাদের দুজনের থাকা উচিত নয়।"

ভোম্বল বলল, "কথা উঠবে, অপবাদ দেবে?"

মানু বলল, "হ্যাঁ, তাতে আমাদের দুজনেরই ক্ষতি হবে।"

দুজনেই চুপ করে থাকল। ভোম্বল হাত বাড়িয়ে মানুর হাত চেপে ধরল। মানু বলল, "ছেলেদের অনেক সুবিধে, বিয়ের পর বাপের বাড়ি ছেড়ে যেতে হয় না। যদি ছেলে হতুম।"

"তাহলে তোমায় দেখবার জন্য কষ্ট করে জানলায় দাঁড়াতুম না। অবশ্য তুমি যদি চাও তাহলে এবার থেকে মেয়ে হিসাবে তোমায় আর ভাবব না।"

"কেন, আমি কি সেকথা বলেছি।" বলতে বলতে গলা বুজে এল মানুর।

বেড়ালের মত নেমে এসে পারুল বিছানায় শুয়ে পড়ল। মাথা ধরা সেরে গেছে। ঘুম পাচ্ছে। বুড়িটা চেঁচাচ্ছে, বলে ছেলের আবার বিয়ে দেব।

দিয়ে দেখ না, সেও আঁটকুড়ি থাকবে। পুজো মানত মাদুলি কত কি তো হল, তাতে কি ফল ফললো ? যত্তোসব ধাপ্পা। বাসন্তীর ছেলে হয়েছে। পারুল ভাবল, তাহলে আমারই বা হবে না কেন ?

একসময় ঘোষপাড়া লেনে আবার আলো জ্বলে উঠল। ইতিমধ্যে ধূসর রঙের সেই মোটর গাড়িটা কখন চলে গেছে। বেড়াল বাচ্চাটা চটকে পড়ে রয়েছে।

একমাত্র সত্যচরণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবল, মৃত-দেহটার সদগতি না করলে কাল সকালেই তো কাক আর কুকুরে মিলে সারা রাস্তাটাকে নোংরা করবে।

হাত ব্যাগ থেকে কাগজপত্তর বার করে কণিকা এগিয়ে ধরল। সমন আর পিটিশনের নকল।

"আজ দুপুরে বেলিফ এসে কলেজেই আমায় সার্ভ করে গেছে।"

উকীল কথা না বলে পড়তে শুরু করেছে। কণিকা স্থির দৃষ্টিতে ওর মুখভঙ্গি লক্ষ্য করে যাচ্ছে। চোখ ভ্রূ বা গালের পেশীতে কোন পরিবর্তন ঘটছে না। তাতে অবশ্য আশ্বস্ত বোধ করল না। পড়া শেষ করে উকীল বলল, "এক হপ্তা সময় আছে, কোর্টে হাজিরা দেওয়ার।"

কণিকা তা জানে, সমনেই লেখা আছে।

"তারপর সময় নিয়ে, আপনার আপত্তি অর্থাৎ বক্তব্য ফাইল করতে হবে।"

"হ্যাঁ।"

"আপনি নিশ্চয় স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চান না।"

"না।"

"নিশ্চয় তার কারণ আছে।"

"আছে, বলছি আপনাকে।"

প্রফেসরস রুমে বসে সারা দুপুর কণিকা ব্যাপারটা ভেবেছে। উকীল জিজ্ঞাসা করবেই এবং সব কথা তাকে বলতেই হবে। শুরু করল সে এইভাবে—

"বিয়ের ন'বছর পর আমি আলাদা হই। সে আজ প্রায় এগারো বছরের কথা। এতদিন পর যে এই রকম ব্যাপার ঘটবে, সত্যিই ভেবে পাচ্ছি না।"

"বিয়ের সময় আপনার বয়স কত ছিল?"

"তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ি, কুড়ি বছর বয়স ছিল। ওর সঙ্গে আলাপ তার এক বছর আগে ক্লাসের একটি মেয়ের বাড়িতে।"

"আপনার স্বামী দেখতে তখন কেমন ছিল? কি করত?"

কণিকা বুঝতে পারল উকীল কোনদিক থেকে খোঁজ চালাতে চায়। হেসে বলল, "খুব স্মার্ট ছিল, দেখতে ভালই। আলাপের অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের হৃদ্যতা হয়। ও-খুব ভাল গীটার বাজাত। খরচও করত যথেচ্ছ।

বাড়ি বলেছিল বরিশালে, তখনো পাকিস্তান হয়নি। সেখানে অনেক জমি-সম্পত্তি আছে, টাকা নাকি সেখান থেকেই আসে।"

"বিয়েতে আপনার বাপের বাড়ি থেকে আপত্তি হয়নি?"

"আমার বাড়ি থেকে শুধু আপত্তিই নয়, বাবা বলেছিলেন তা হলে আর মুখ দেখবেন না। দেখেনওনি। আজ তেরো বছর হল স্বর্গে গেছেন।"

কণিকার গলা ভারী হয়ে থেমে গেল। স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে নিস্পৃহ স্বরে উকীল বলল, "বিয়ে তা হলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে করেন?"

"হ্যাঁ।"

"হিন্দু মতে, মানে অগ্নি সাক্ষী করে?"

"হ্যাঁ।"

উকীলের ভ্রূ-কুটি এতক্ষণে নড়ে উঠতেই, কণিকা থেমে গেল। উকীল পেন্সিল দিয়ে একটা কাগজে আঁকিবুকি কাটছে, কণিকা কথা বলে ওর চিন্তায় ব্যাঘাত না করার জন্য চুপ রইল।

"তারপর?" উকীল হঠাৎ যেন ঘুম থেকে উঠল, "তারপর আপনারা স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করতে লাগলেন?"

ঝাঁ করে কণিকার মাথা গরম হয়ে গেল। স্বামী-স্ত্রীর মত মানে? স্বামী-স্ত্রীই তো। মত আবার কেন?

"হ্যাঁ, আমার স্বামীর সঙ্গে আহিরীটোলায় এসে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে সংসার পাতলাম।" প্রতিটি শব্দে বেশ জোর দিয়ে কণিকা বলল। উকীল তা লক্ষ্য করল কিনা সেটা অবশ্য বোঝা গেল না।

"এই লোকটি কি করেন বা তখন কি করতেন?"

"আমার স্বামীকে চাকরি করতে, আমি অন্তত দেখিনি। দেশ থেকে টাকা আসত। আর গীটারের টিউশানি করতেন। তখন অবশ্য দেড়শো দুশো টাকায় বেশ ভালভাবেই দু-তিনজনের সংসার চলে যেত।"

"তৃতীয় জন কে?"

"একজন ঝি ছিল। বিধবা অল্পবয়সী—নাম গীতা। আমি বি-এ পাস করে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই। গীতাই রুনুকে, অর্থাৎ আমার মেয়েকে দেখাশোনা করত। পরে অবশ্য ওকে ছাড়িয়ে একজন বুড়িকে রাখি।"

"কেন?"

"গীতাকে খুব সুবিধের মনে হল না। তা ছাড়া আমার স্বামীর প্রতি মেয়েদের কেমন যেন একটা আকর্ষণ হয় লক্ষ্য করেছি। গীতাও ব্যতিক্রম নয়। দুটি মেয়ে বাড়িতে এসে গীটার শিখত। তাদেরও এইরকম হতে লক্ষ্য করেছি।"

"আপনি স্বামীকে সন্দেহ করতেন?"

কণিকা এবার ইতস্তত করল। সন্দেহ করি বললে নিশ্চয় ধরে নেবে হীন বা কুচুটে। কিন্তু উকীলের কাছে কিছু গোপন করাও উচিত নয়। বিশেষত যা সত্যি।

"সন্দেহ করার কারণটা বলুন।"

অত্যন্ত সাদামাটা কণ্ঠস্বর। কুণ্ঠাবোধ করার মত কিছু তাতে নেই। কণিকা অসুবিধা বোধ করল। রুচির মান বজায় রেখে এসব বিষয় বিবৃত করা, বেশ কঠিন। কোথা থেকে কিভাবে শুরু করবে ভেবে না পেয়ে সে বলল, "সন্দেহ তো গোড়া থেকেই ছিল। বিয়ের আগে থেকেই। যে মেয়েটি মারফত ওর সঙ্গে আলাপ হয়, তার সঙ্গেই অ্যাফেয়ার ছিল। তা ছাড়া বিয়ের পরও দেখেছি মেয়েদের সম্পর্কে কেমন ছোঁক-ছোঁকে ভাব। এতে বেশ বিরক্তই বোধ করতাম। গীতাকে তাড়ালাম। ওর সঙ্গেও ঝগড়া হল। কিন্তু ও নির্লজ্জ নির্বিকার রয়ে গেল। বলল, পুরুষ মানুষ এরকম হয়ই, নয়তো পুরুষ আবার কিসের। তাই শুনে নিজের উপর ঘেন্না ধরল, এই লোকটাকে কিনা পছন্দ করে বিয়ে করেছি। এম-এ পাস করে একটা স্কুলে চাকরি নিই। তারপর আসি কলেজে। রুনু বড় হয়েছে, ইতিমধ্যে ওকে স্কুলে ভর্তি করে দিই। আমরা দুজন একসঙ্গেই বেরোতাম। একদিন কি কারণে যেন রুনুর স্কুল হাফ-হলিডে হয়ে যায়, ও বাড়ি ফিরে দেখে সদর খোলা আর শোবার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ধাক্কা দিতেই ওর বাবা বেরিয়ে আসে। ওকে ধমকায় তারপর বসবার ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। দরজার তক্তায় ফাটা ছিল। রুনু দেখে শোবার ঘর থেকে গীতা বেরিয়ে যাচ্ছে। রাত্তিরে চুপিচুপি রুনু ঘটনাটা আমায় বলে। তখন আমি ভাবলাম, রুনু বড় হচ্ছে, বয়স সাত পেরিয়েছে, একদিন না একদিন এই ঘটনার অর্থ ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন নিশ্চয় ভাববে, একটা আনফেথফুল স্বামীর সঙ্গে কি করে তার মা দিনের পর দিন কাটিয়েছে। বিন্দুমাত্র শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব, রুচি কি তার ছিল না! তখন ও আমায় ঘেন্না করবে, আমার মনে হল রুনু হয়ত এমন প্রশ্ন কোনদিন করে বসবে যার কোন জবাব দিতে পারব না। আমার জীবনে রুনু ছাড়া আর কিছু নেই, তখন ছিল না, এখনও নেই। ওই আমার সব কিছু। মনে হল, এইসব ঘটনা বা দৃশ্য ওকে কলুষিত করবে। যে কৌতূহলে সেদিনকার ব্যাপারটা আমায় বলেছিল, ওর বয়সের পক্ষে সেটা স্বাভাবিকই, কিন্তু রাগে দুঃখে ইচ্ছে করছিল খুব করে ওকে পেটাই। এইসব নোংরা জঘন্য স্মৃতি আমি ওর মন থেকে মুছে দিয়েছি। তার জন্য এগারো বছর ধরে চেষ্টা করেছি। আর দেখুন কি শয়তানি, আমাকে অপদস্থ করতে এই মামলা করেছে। আমি সিঁথিতে সিঁদুর দিই না, বিধবার মত থাকি। রুনু জানে তার বাবা মৃত। যদি স্বামীর কাছে ফিরে যেতে হয়, তা হলে

মেয়েকে কি বলব? ওর বয়স হয়েছে, ডিগ্রি ক্লাসে পড়ছে। কত সাবধানে ওকে এত বড়টি করে তুলেছি। সব ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমায় ফিরে যেতে হয়।"

উকীলের মুখে কোন ভাবান্তর নেই। কিন্তু কণিকার দুই চোখ ছলছল। গলা বসে গেল শেষ দিকে। দেয়াল ঘড়িতে আটটা বাজছে। উকীল টাইপ করা কপিটা তুলে নিয়ে আবার পড়তে লাগল।

কণিকা টেবলে ঝুঁকে নিচু গলায় বলল, "আমার তরফ থেকে বক্তব্য কি হবে তা আপনিই বলুন।"

"এ কেস কি আমায় দিয়ে করাবেন ?"

উকীল এখনও মুখ তুলল না। কণিকা বলল, "নিশ্চয়। তাইতো আপনার কাছে এলাম।"

উকীল কাগজটা রেখে কণিকার দিকে তাকাল। "আপনার স্বামী এখন কি করেন? কোন মেয়েছেলের সঙ্গে বসবাস বা গীতার সঙ্গে তার কোন রকম সম্পর্ক···অর্থাৎ ব্যভিচারের সম্পর্ক আছে কি না, তাকি জানেন ?"

"আমি কিছু জানি না। আলাদা হবার পর ও নিয়ে কোন মাথা ঘামাইনি, খোঁজ নিইনি। তবে শুনেছিলাম সেই বাসা ছেড়ে তালতলার দিকে উঠে গেছে। আমাদের খোঁজও কোনদিন করেনি।"

"আপনার স্বামীর ব্যভিচার প্রমাণ করতে পারবেন ?"

কণিকা এইবার হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। তাই দেখে উকীল বলল, "জজের কাছে প্রমাণ দিতে হবে তো, আসলে তাকেই বোঝাতে হবে কেন স্বামীকে ত্যাগ করেছেন, তার কাছে আর কেন যেতে চান না।"

"কিভাবে প্রমাণ হয়?" কণিকা অসহায় বোধ করল, উকীল তখন ফোন তুলে কার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে, কণিকা সেই অবসরে ভাববার চেষ্টা করল। উকীল ফোন রাখতেই বলল, "আমি বলব ব্যভিচার করেছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি, নয়তো কেন আলাদা হব বলুন !"

উকীল হাসল। "আপনার কথা জজ বিশ্বাস করবে কেন? কোন রকম চিঠিপত্তর দেখাতে পারবেন, লাভ-লেটার যাতে বোঝান যায় সে অন্য মেয়ের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত।"

কণিকা মাথা নাড়ল।

"কোন রকম ছবি, আপনার স্বামীর সঙ্গে অন্য কোন মেয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বোঝায় এমন পোজে ?"

এবারও কণিকা মাথা নাড়ল। "না। একবার বিয়ের আগে পিকনিকে গেছলাম। অন্য কয়েকটি মেয়েও ছিল। ছবিও তোলা হয় কিন্তু সেসব ছবি তো ওঁর কাছে।"

"কেউ সাক্ষী দিতে পারবে, ব্যাভিচার করতে দেখেছে এমন কেউ ?"

কণিকার প্রথমেই মনে পড়ল রুণুকে। সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল। অসম্ভব, সেই নোংরা ব্যাপার খুঁচিয়ে আবার ওর মনে জাগিয়ে তোলা অসম্ভব। উকীল এক দৃষ্টে তাকিয়ে। কণিকা মাথা নাড়ল।

"আপনার মেয়ে দেখেছে।"

"না, না উকীলবাবু।" কণিকা হুমড়ি খেয়ে পড়ল টেবলে। "আমি পারব না ওকে সাক্ষী করতে। বরং আমি হেরে যাব।"

"অর্থাৎ স্বামীর কাছেই ফিরে যাবেন ?"

কণিকা ধীরে ধীরে চেয়ারে বসল। স্থির দৃষ্টিতে টেবলের পায়ার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল। কিন্তু কোন ভাবনাই স্পষ্ট নয়, আবছা মনের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

"মামলা জেতার জন্য আমায় চেষ্টা করতেই হবে। সেজন্য যে পথ অবলম্বন করা দরকার, আমি তাই বললাম। এখন আপনার ইচ্ছে। আপনি বরং ভেবে ঠিক করুন। এখনো তো যথেষ্ট সময় আছে।"

কণিকা মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল। কাগজগুলো নিয়ে যাবে কিনা একবার ভাবল তারপর নমস্কার করে বেরিয়ে এল।

বাড়ি ফিরে দেখল রুণু নেই। ঝি জানাল কলেজ থেকে ফিরে বিকেলেই বেরিয়ে গেছে। এ রকম সে যায় কিন্তু রাত ন'টা পর্যন্ত বাইরে থাকে না। কণিকা বিরক্ত হয়ে চিন্তিত হল। রুণুর পড়ার ঘরে এসে টেবলের কাগজগুলো খুলে দেখতে শুরু করল। কিছু নেই। স্তূপ করা বইগুলো দেখতে দেখতে একটা বই খুলে তার শরীর হিম হয়ে গেল। যৌন বিজ্ঞানের বই। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল কণিকা। একটার পর একটা সমস্যা। উকীল বলেছে হয় রুণুকে দিয়ে সাক্ষী দেওয়ান নয় তো ফিরে যাওয়া। আর রুণু এদিকে গোল্লায় যেতে বসেছে। চোখ ফেটে জল এল তার। বালিশে মুখ চেপে সে কাঁদল।

কিছুক্ষণ পর তার মনে হল, এ বই রুণু পেল কোথা থেকে। লাইব্রেরী, -নাকি ক্লাশের কোন মেয়ের থেকে ? লাইব্রেরীর ছাপ আছে কিনা দেখার জন্য উঠে গিয়ে বইটার মলাট ওলটাতেই দেখল সূচিপত্রের নিচের দিকে লেখা একটা নাম ঃ পরিমল ভট্টাচার্য।

কাঁপতে কাঁপতে কণিকা ফিরে এল। ন'টা বেজে গেছে রুণু ফিরছে না। ওর টেবলে খারাপ বই। তাতে একটা পুরুষের নাম লেখা। বইটা কি ও পড়েছে ? আজ সকালেও, কণিকার যতদূর মনে পড়ছে, বইটা ওখানে ছিল না। বোধ হয় বিকেলেই পেয়েছে। তাড়াহুড়োয় লুকিয়ে রাখতে ভুলে গেছে।

আবার উঠল বিছানা থেকে। দ্রুত ও ঘরে গিয়ে বইটা নিয়ে এসে, চেয়ার টেনে তার উপর উঠে রুনুর বাঁধানো ছবিটার পিছনে লুকিয়ে রাখল।

একটা সমস্যা মিটল। কিন্তু ন'টা যে অনেকক্ষণ বেজে গেছে। জানলায় দাঁড়াল কণিকা। রাস্তার অনেকখানি দেখা যায়, কোথাও রুনুর চিহ্নও নেই। ঝি এসে জানতে চাইল খাবার ঢাকা দিয়ে রাখবে কিনা।

"খাব না, শরীর ভাল নেই।"

"দিদিমণির ঢাকা দিয়ে রাখি?"

"জানি না।"

কণিকা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। একটা কালো মোটর এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল। রুনু নামল। শুনতে পেল গাড়ির মধ্য থেকে কে যেন বলছে, "মাসিমাকে কি তাহলে বলে আসব যে আমার জন্যই তোর এত রাত হল, ওকে বকবেন না।" রুনু জবাব দিল, "না না মা মোটেই ওরকম নন। তোকে আর নামতে হবে না, আচ্ছা চলি।" "বাই বাই।"

গাড়িটা চলে গেল। কণিকা নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগল। ঝি দরজা খুলে দিয়েছে। রুনু ঘরে এল। দেখল গভীর মনোযোগে কণিকা মোটা একটা বই পড়ছে বিছানায় কাত হয়ে। কথা না বলে সে আলনা থেকে কাপড় নিয়ে বদলাতে শুরু করল।

"জানলাটা বন্ধ করে দাও রুনু পাশের বাড়ির ছাদের কোণ থেকে দেখা যায়।" কণিকা বই থেকে চোখ না সরিয়েই বলল। জিভ কেটে রুণু তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করল।

"তুমি দিন দিন যেন কিরকম হয়ে যাচ্ছ রুনু।" কণ্ঠস্বর বইটার মত মোটা করে কণিকা বলল।

এখনো পর্যন্ত সে ফিরে তাকায়নি! তার দরকারও বোধ করল না, কেন না সে জানে রুনুর মুখের ভাব এখন কেমন এবং কি ভঙ্গিতে সে দাঁড়িয়ে আছে।

"আমি যেতে চাইনি। হেনা জোর করে নিয়ে গেল। কলেজ থেকে এক সঙ্গে বাড়িতে এসেছে। এখানেই গাড়ি এসে আমাদের নিয়ে গেল।"

"কার গাড়ি?"

"ওর দাদার বন্ধুর। বোম্বাইয়ে অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনে বড় চাকরি করেন। গাড়ি করেই কলকাতায় এসেছেন, বেড়াতে।"

"কোথায় গেলে তোমরা?" কণিকা বারবারই আলটপকা ভঙ্গিতে বলে যাচ্ছে। যেন জবাব না পেলেও তার কিছু এসে যায় না। রুনু কিন্তু চুপ রইল।

"আগে কিন্তু তুমি এমন ছিলে না রুনু।"

"আমরা সিনেমায় গেলাম তারপর একটা চীনে রেস্টুরেণ্টে।"

"কে কে ছিল ?"

"আমি হেনা ওর দাদা আর দাদার বন্ধু।"

"তা হলে খাবে না ?"

রুনু চুপ। কণিকা আড়চোখে দেখল মাথা নিচু করে পায়ের আঙুল মেঝেয় ঘষছে। অত্যন্ত মায়া হল। কিন্তু শুধু স্নেহ নয় শাসনও দরকার এই ভেবে সে একটু রুক্ষ স্বরে বলল, "এইভাবে কে চুলবেঁধে দিল, কতদিন বলেছি না বাঁকাসিঁথি কাটবে না !"

"হেনা বেঁধে দিয়েছে।" রুনু ভয়ে ভয়ে বলল।

"কোথায় সিনেমা দেখতে গেছ'লে ?

"মেট্রোয়।"

কণিকা বইটা ধীরে বন্ধ করে পাশে রাখল। বাঁ হাত কপালে রেখে চোখবন্ধ করে বলল, "আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ো। আমার শরীর খারাপ লাগছে।"

ঘরটা অন্ধকার হতেই কণিকা অস্ফুট আর্তনাদ করল। রুনু বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে তাড়াতাড়ি কাছে এসে দাঁড়াল।

"শরীর খারাপ মা ?"

"না। কোথায় যাচ্ছ ?"

"বাথরুম।"

"চটি পরে যাও। পাশ ফিরে শুল কণিকা। ইংরিজি বই দেখে এসেছে রুনু। কথাগুলো নিশ্চয় বুঝতে পারেনি, কিন্তু ইংরিজি বইয়ে যা ঘটে তাতো অন্ধকার ঘরে চোখ দিয়ে দেখেছে! পাশেই ছিল দুটো পুরুষ! হায় ঠাকুর! কণিকার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল! অশ্লীল দৃশ্য রুনু দেখেছে, অসভ্য বই পড়েছে বা পড়ার জন্য এনেছে।

প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে কণিকা উকীলের বাড়ি পেঁৗছল সকালেই। দু' তিনজন মক্কেল বসে। উকীল ব্রিফ পড়ছে।

"উকীলবাবু আপনি অন্য সাক্ষী দেখুন। রুনুকে দিয়ে সাক্ষী দেওয়াতে পারব না।"

উকীল স্পষ্টই বিরক্ত হল। কণ্ঠস্বরে তা গোপন না করে বলল, "আমি সাক্ষী দেখব কি, আপনি নিয়ে আসুন!"

"কাকে আনব ?" কণিকা উদ্বিগ্নতার চূড়া থেকে কথা বলল। কথা না বলে উকীল ব্রিফে ডুব দিল। অপ্রতিভ হয়ে কণিকা ভাবল এইভাবে কাজের মধ্যে আসা অন্যায় হয়েছে, চলে যাওয়াই উচিত। উঠে দাঁড়াতেই উকীল বলল, "আপনি একটি মেয়ের নাম করেছিলেন, যাকে নিয়েই গোলমালটা বাধে।"

"গীতা।"

"সে কোথায় ?"

"জানি না।"

"তাকে খুঁজে বার করুন। তাকে রাজি করান। সে যদি সাক্ষী দেয় সবচেয়ে ভাল।"

এই বলে উকীল ব্রিফ পড়তে শুরু করল। কণিকা আর কথা বলার ভরসা পেল না।

সেইদিনই কলেজে গিয়ে কণিকা এক মাসের ছুটি নিল। রুনুকে জানাল, কলেজ ছুটির পর সোজা বাড়ি চলে আসবে। পরীক্ষার আর বেশি দেরি নেই। এবার পড়ায় মন দাও। আমার শরীর খারাপ ছুটি নিয়েছি এক মাস।

কথাগুলো বলেই এমনভাবে একটা বই নিয়ে পড়তে শুরু করল যে রুনু আর কথা বলার ভরসা পেল না। ও বেরিয়ে যেতেই কণিকা ঘরের কোণে গিয়ে ডিঙ্গি দিয়ে দেখল, ছবির পিছনে বইটা ঠিকমতই রয়েছে।

পরদিন দুপুরে কণিকা বেরোল আহিরীটোলার উদ্দেশ্যে। প্রায় এগারো বছর পর এদিকে আসা। যে বাড়িটায় থাকত তার সামনে কাঠা দুয়েক জমি ছিল। বাড়ি উঠেছে চারতলা। পুরনো ভাড়াটেরা যাতে না দেখে সন্তর্পণে কণিকা দোতলায় উঠে এল। পূর্ণবাবু এবং তার বৌ জয়া ছিল পাশের ভাড়াটে। জয়া খুব খুশি হল ওকে দেখে। নানান কথার পর কণিকা জানতে চাইল গীতার খবর।

"ওম্মা, সে তো কবে বিয়ে করেছে। তার কাণ্ড জানেন না বুঝি! আপনারা তো ছাড়িয়ে দিলেন, তারপর এ পাড়ার চব্বিশ নম্বর বাড়িতে কাজ নিল। সে বাড়ির মেজছেলের সঙ্গে শুরু করল ঢলাঢলি। দিল সেখান থেকেও খেদিয়ে, তারপর কাজ নিল একটা চায়ের দোকানে। আজকাল তো অনেক চায়ের দোকানেই মেয়েরা কাজ করে। উনিই একদিন অফিস থেকে ফিরে বললেন, জানো ট্রামে যেতে যেতে সেই গীতাকে দেখলাম ধর্মতলার কাছে একটা পাঞ্জাবীর দোকানে খদ্দেরদের চা দিচ্ছে। মা ভাই বোন সব বস্তিতে থাকত। আপনি তো তা জানতেনই, ওই যে গঙ্গা যাবার রাস্তায় পোস্টাপিসের কাছে। তা শুনলুম একদিন, ওখান থেকে উঠে গেছে। চটক তো কম ছিল না, রোজগারপাতি বোধহয় ভালই হচ্ছিল। তারপর একদিন উনি এসে বললেন, সেই দোকানটায় আর ওকে দেখছেন না কদিন ধরে, বোধহয় ছেড়ে দিয়েছে কি অন্য কোথাও কাজ নিয়েছে।"

জয়ার কাছ থেকে তার স্বামীর অফিসের ঠিকানা নিয়ে কণিকা তখুনি বেরিয়ে পড়ল ডালহৌসির দিকে। এক সরকারী অফিসের তিনতলার বিরাট একটা ঘরে পূর্ণকে সে খুঁজে পেল। দেখামাত্রই কণিকাকে সে চিনল, যখন শুনল গীতার খোঁজ নেবার জন্য তার কাছে এসেছে, পূর্ণ অপ্রতিভ হয়ে বলতে শুরু করল, "ধর্মতলার দিকে একবার গেছলাম সে অনেক দিন আগে, এখনও

আছে কিনা অবশ্য" ইত্যাদি। কণিকা ধরে নিয়েছিল নিশ্চয় প্রশ্ন করবে হঠাৎ গীতার ঠিকানা চান কেন। তাই নিজে থেকেই বলল, "ওর হাত দিয়ে আমার সাড়ে চার ভরির সোনার হার বাঁধা দিয়েছিলুম। যত টাকা লাগুক হারটা এখন ছাড়াতে চাই। আমার শাশুড়ির দেওয়া, তিনি পেয়েছিলেন তাঁর শাশুড়ির কাছ থেকে। ওটা আমার মেয়ের বিয়েতে যৌতুক করব। কিন্তু গীতা না হলে তো ওটা ছাড়ান যাবে না, দোকানটা কোথায় বলুন ?"

পূর্ণ ওকে সঙ্গে করে সেই দোকানে নিয়ে গেল। মালিক জানাল, গীতা নামে কেউ কাজ করত কিনা মনে পড়ছে না। আট-নবছর আগের কথা। তবে খাতা দেখে বলতে পারবে। দু-তিন দিন পরে আসুন।

তিন দিন পর কণিকা হাজির হল। মালিকের কাছ থেকে মানিকতলার একটা ঠিকানা পেয়ে সে তখুনি রওনা দিল। ঠিকানা মত বাড়ি খুঁজে বার ক'রে দেখল সেখানে গীতার মা-ভাই থাকে। তারা জানাল, গীতা আজ প্রায় আট বছর বিয়ে করে ঘর-সংসার করছে। থাকে বেলগাছিয়ায়। কণিকা ঠিকানা নিয়ে পরদিন খুঁজে বার করল গীতার বাড়ি।

"বৌদি!" গীতা ভীষণ অবাক হয়ে গেল। এত বছর পর কণিকার আবির্ভাব অনেক প্রশ্ন ও কৌতূহলের সমাবেশে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার মত। কিন্তু গীতা বেশ শক্ত মেয়ে। তাড়াতাড়ি কণিকাকে ঘরে এনে বসাল। কণিকা আগেই ঠিক করে রেখেছিল কি কি বলবে।

"তোকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে গীতা। আমারই বয়সী তো অথচ আমায় দেখ!"

"কি যে বল তার ঠিক নেই, তোমার নখের যুগ্যি নাকি।"

এবার কণিকা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। গম্ভীর হয়ে গেল। চোখ ছলছল করছে।

"স্বামী-সংসার, ছেলেপুলে নিয়ে যে রয়েছে তার সঙ্গে কি কোন তুলনা হয়!"

গীতা গম্ভীর হয়ে গেল। লক্ষ্য করে কণিকা আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোর ছেলেমেয়ে কটি ?"

"চারটি। বড়ছেলে স্কুলে গেছে সাত বছরের। পরের দুটি মামারবাড়ি। আর ছোটটি আট মাস, বাইরে দোলনায় ঘুমুচ্ছে।"

কণিকা ঘরটা নজর করল। শস্তা জিনিসে সাজানো; কিন্তু অসম্ভব পরিপাটি। ঘরের মেঝে তকতকে, বিছানায় বালিসগুলো সাজানো, ওয়াড় পরিষ্কার; সিলিং পাখা বা তাকে রেডিও ছাড়া হীটারও দেখা যাচ্ছে। কণিকা অনুমান করল গীতা ভালভাবেই আছে। একদা যে ঝি-এর কাজ করত তা বোঝা যায় না।

"চা করেদি।" গীতা ব্যস্ত হয়ে উঠল। কণিকা যতটুকু আপত্তি করা দরকার করল। চা-করা দেখতে দেখতে কণিকা শুরু করল, "বর কি করে?"

"ঠিকেদারি। সেই ভোরে বেরোয়, ফিরতে রাত আটটা নটা। শুধু রোববারটাই যা সারাদিন বাড়ি থাকে।"

"শ্বশুর-শাশুড়ি?"

"কেউ নেই।"

গীতার বলার ভঙ্গিতে কণিকা বুঝল না থাকাতে সে খুশিই। সেও বলল, "ভালই। শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে ঘর করা যা ঝামেলা। মনে আছে আইরিটোলার ব্যানার্জিবাবুর বৌকে। শেষে বেচারা কাপড়ে আগুন লাগিয়ে জ্বালা জুড়োল।" বলতে বলতে কণিকা ঘরে নজর বুলোচ্ছিল। আলমারির মধ্যে একটা চ্যাপ্টা বেঁটে শিশি দেখে তার মনে হল মদের। নিশ্চয় গীতার স্বামী খায়।

"তোর বর কেমন হয়েছে তাই বল।"

"বলব কেন। নিজে এসে বরং একদিন দেখে যেও।" চায়ে চিনি দিয়ে চামচ নাড়ছে গীতা। কণিকা এবার নজর করল গীতার দেহে। গা-গতর বেশ ভারী। গলায় হাতে কম করে ছ' সাত ভরি সোনা।

"তোমার খবর কি। রুনু কতবড় হয়েছে? পড়ে?"

চায়ে চুমুক দিয়ে কণিকা বুঝল অন্তত ত্রিশ টাকা কিলোর চা।

"রুনু এবার ডিগ্রি পরীক্ষা দেবে। আমি একা, মেয়ে বড় হয়েছে। এতদিন সামলে তো চালালাম। এবার ওর বিয়ে দিতে হবে। তোর মত ভাগ্য করলে আজ কি আমায় মেয়ে পড়িয়ে পড়িয়ে বেড়াতে হয়, না রোজগারের ধান্দায়—" কণিকার গলা থেকে আর স্বর বেরোল না।

"কেন তুমি তো ভাল আছ।" মৃদু স্বরে গীতা সান্ত্বনা দিল। "পরের হাত তোলা নও, নিজের ইচ্ছে মত চলাফেরা কর।"

কণিকা গুম হয়ে বসে রইল। গীতা ওর ডানহাতটা নিজের হাতে নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে লাগল।

"আজ এগারো বচ্ছর যে কিভাবে কেটেছে। কত অপমান, গঞ্জনা কত বদনাম যে সয়েছি তবু একটুও টলিনি, মাথা নোয়াইনি। আর আজ সব ব্যর্থ হতে বসেছে। গীতা তুই আমাকে বাঁচা।" কণিকা ওর দুটি হাত জড়িয়ে ধরল। "গীতা, ও আমাকে ফিরিয়ে নিতে মামলা করেছে। একমাত্র তুই জানিস কেন আমি আলাদা হয়েছি। আর আমার পক্ষে ফেরা সম্ভব নয়। মেয়ে বড় হয়ে গেছে সে কি ভাববে?"

গীতার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। শূন্য দৃষ্টিতে কণিকার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে কণিকা বলল, "এর মূলে তুই। তোর

জন্যই এসব ঘটেছিল। আজ তুই স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখে আছিস আর আমায় কি সেই শয়তানটার কাছে ফিরে যেতে হবে ?"

গীতা দাঁড়িয়ে উঠল, "এসব কথা আজ আর তুলো না বৌদি। তুমি বরং চলে যাও।"

থমথম করছে মুখ। গীতা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কণিকা হাত টেনে ধরল। "আজ আমার এই অবস্থার জন্য দায়ী কে, গীতা তুই বল, কে দায়ী ?"

"অতশত বুঝি না, তুমি এখন যাও।" মোচড় দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গীতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কণিকা কিছুক্ষণ বসে থেকে ঘরের বাইরে এসে চারধারে তাকাল। সদর দরজা খোলা। গীতা সম্ভবত বেরিয়ে গেছে। কণিকা বুঝল অপেক্ষা করা বৃথা, সে চলে না যাওয়া পর্যন্ত গীতা ফিরবে না।

ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে কণিকার। বাড়ি এসে শুয়ে পড়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙ্গল একটা স্বপ্ন দেখে। চেয়ারের উপর উঠে রুনু ছবির পিছন থেকে বইটা পেড়ে চুপিচুপি বেরিয়ে গেল বাইরের ঘরে, দু-তিনটি পুরুষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল বাইরের ঘর থেকে। একজন বলল, "চল সিনেমায় যাই।" রুনু বলল, "মা রাগ করবেন।" অন্যজন বলল, "তোমার মা এত চোখেচোখে রাখেন কেন তোমায় ?" রুনু বলল, "মা ঠকেছিলেন কিনা, তাই চান না আমি ঠকি।" ওরা সমস্বরে বলল, "না না আমরা তোমায় ঠকাব না। চল বেড়াতে যাই, বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।" রুনু যাবে না বলায় ওরা পীড়াপীড়ি শুরু করল। শেষ রুনুকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাবার উপক্রম করতেই, ওদের বাধা দেবার জন্য কণিকা ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসল।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ নেমেছে। ঘর অন্ধকার। বাইরের ঘরে আলো জ্বেলে রুনু পড়ছে। নিঃশব্দে কণিকা ওর পিছনে এসে দাঁড়াল। চমকে উঠেই রুনু হেসে ফেলল, "কি ভয়টাই পেয়েছিলুম।"

কণিকা হাসল মাত্র। ঘরে এসে আলো জ্বেলে, ডিঙ্গি দিয়ে দেখল ছবির পিছনে বইটা একভাবেই রয়েছে। তখন সে ভাবতে লাগল উকীলের বাড়ি যাবার জন্য কাপড়টা বদলাবে কিনা।

রবিবারের বিকেল শুরু হচ্ছে, তখন কণিকা হাজির হল গীতার বাড়ি। দরজা খুলে যে লোকটা অবাক হয়ে কিন্তু কিন্তু করতে লাগল, সে যে গীতার স্বামী তাতে কণিকার সন্দেহ রইল না। খালি গা, পরনে লুঙ্গি কোলে বাচ্চা। বয়স ষাটের কাছাকাছি, টাক অর্ধেক মাথায়। মুখের আকৃতি এবং তাতে যেসব আঁচড় পড়েছে দেখলেই মনে হয় লোকটি নিষ্ঠুর, পরিশ্রমী এবং অশিক্ষিত।

"আমি আর একদিন এসেছিলাম, গীতার বৌদি হই।"

কণিকার উচ্চারণ, বলার ভঙ্গি এতই মার্জিত লোকটি অসহায় ভাবে পিছনে তাকিয়ে কিছু একটা অবলম্বন খুঁজল। পায়ে পায়ে দরজা থেকে পিছিয়ে গিয়ে বলল, "ভেতরে আসুন।"

গীতা গম্ভীর হয়ে গেল। সেই একই ঘরে কণিকা বসল। লোকটা ইতিমধ্যে একটা শার্ট পরে ফেলেছে। ফিসফিস করে গীতার সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে, কণিকার অনুমান খাবারের দোকানে। গীতা ঘরে এসে চাপা সুরে বলল, "এসেছ যে!" কণিকা ওর দু-হাত জড়িয়ে ধরল। "তোকে কিচ্ছুটি করতে হবে না গীতা, শধু একবার কোর্টে দাঁড়িয়ে বলবি যা ঘটেছিল। মিথ্যে কথা বলতে হবে না। যা সত্যি তাই বলবি।"

"পাগল হয়েছ বৌদি। আজ আমার মান ইজ্জত নেই? আমি ওই হাটের মাঝে দাঁড়িয়ে বলব আমার কলঙ্কের কথা! আমি খারাপ মেয়ে ছিলুম তা তুমি নয় জানো, কিন্তু ছেলে বড় হচ্ছে সে জানলে আমার কি অবস্থা হবে, উনি জানলে আমি কোথায় দাঁড়াব।"

"আমি কোথায় দাঁড়াব আর আমি কোথায় দাঁড়াব!" হঠাৎ ফেটে পড়ল কণিকা, "কোথায় দাঁড়াবি সেটা তখন মনে ছিল না যখন আমার সব্বোনাশ করেছিলি। আজ আমার এই বিপদ তোর জন্যই, তোকে কোর্টে যেতে হবেই।"

সিঁটিয়ে গিয়ে গীতা দেখছিল কণিকার শরীরটা গুড়ি মেরে লাফিয়ে পড়ার জন্য তৈরী হচ্ছে। পিছিয়ে গেল সে। মাথা নাড়তে লাগল, "না না বৌদি, আমার সব্বোনাশ আমি করতে পারব না।" বলতে বলতে গীতা আগের দিনের মত বেরিয়ে গেল। কণিকা একা ভাবতে লাগল, এবার কি করা যায়।

গীতার স্বামী ফিরেছে। রান্নাঘরের মধ্যে গীতা। কণিকা হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরোল। "একি শালাজ ঘরে একা বসে আর নন্দাই বৌয়ের আঁচল ধরে রান্নাঘরে।" কণিকা হাত বাড়িয়ে বাচ্চাকে কোলে নিল।

"গীতা দেখছি খুব পোষ মানিয়ে ফেলেছে।"

কণিকা হাসছে আর প্রায় ষাট বছরের লোকটা শরীরটাকে পাক দিয়ে লাজুক স্বরে বলল, "আপনার ননদ খুব ভাল মেয়ে।"

গীতা উনুনে হাওয়া করে যাচ্ছে। হাত পাখার খটখট শব্দ ছাড়া তার কাছ থেকে কিছু শোনা গেল না।

"ভাল মেয়ে মানে! আপনার বহু ভাগ্যি তাই এমন বৌ পেয়েছেন।" লোকটা ঘাড় নামিয়ে হেঁ হেঁ করছে দেখে বলল, "কম সম্বন্ধ তো আসেনি। সবই ও রিজেক্ট করে দেয়। শেষে মালা দিল আপনার গলাতেই।" কণিকা ঠিক করে ফেলেছে দু-চারটে ইংরিজি শব্দ বলবে, নয়তো খাতিরটা বাড়ে না।

"আর যা দিনকাল, ভাল মেয়ে পাওয়াই দায়।" বাচ্চাটার গাল টিপতে টিপতে কণিকা কথা চালিয়ে যেতে থাকল। লোকটা এতক্ষণ বাদে যেন বলার মত কিছু একটা খুঁজে পেল। "ভেজালের যুগ পড়েছে।"

বিরাট রসিকতা যেন, কণিকা শব্দ করে হেসে উঠল। উৎসাহ পেয়ে লোকটা বলল, "আমি তো অ্যাদ্দিন আইবুড়ো ছিলুম ওই জন্যই। কোনদিন কোন মেয়েকে পর্শ করিনি, চোখ তুলে পর্যন্ত তাকাইনি। আমাদের যা বিজনেস, বুঝলেন বৌদি, একটা লোকও ভাল থাকে না। ঘুষ, মদ, চুরি, মেয়েমানুষ এইসব নিয়েই জীবন কাটে। আমি গোড়াতেই ঠিক করি ও সব লাইনই ধরব না! কপিলহাটের হালদারদের নাম শুনেছেন তো?"

কণিকা চোখ বড় করে বলল, "ওমা সে তো বিরাট বনেদী বংশ।"

গর্বে গলে পড়ার মত অবস্থা লোকটার। "বুঝুন, আমার পক্ষে ও লাইনে যাওয়া কি সম্ভব? ইমপসিবল। বংশের নামডোবান ইমপসিবল। গুরুবল আর বাপ-মার আশীর্ব্বাদে চরিত্র আমি রক্ষে করে গেছি। ওটাই তো দুনিয়ার সব থেকে বড় জিনিস, তাই নয়?"

"নিশ্চয়। তাই তো ভগবান এমন বউ পাইয়ে দিয়েছেন।" কণিকা আড়ে দেখল গীতা তার দিকে তাকিয়ে চোখে চাপা ভয়। কণিকা প্রসঙ্গ বদলে ছেলেদের পড়াশুনোর কথা তুলল।

বাড়ি ফিরে দেখে রুনুর বন্ধু হেনা তার জন্য বসে। "মাসিমা একটা খুব দরকারী কথা ছিল।" হেনা উৎসাহে টগবগ করছে। কণিকার সঙ্গে সে শোবার ঘরে এল। "দাদার বন্ধু, আড়াই হাজার টাকা মাইনে পায়, থাকে বোম্বাইয়ে। তার খুব পছন্দ হয়েছে রুনুকে।"

"কি নাম তার, পরিমল ভটচাজ?"

রুক্ষস্বরে কণিকা জিজ্ঞাসা করতেই হেনার ঝকমকে বুদ্ধিদীপ্ত মুখটা মুহূর্তে নির্বোধ হয়ে গেল। "নাতো, সুহাস ঘোষাল নাম।"

কণিকা বিন্দুমাত্র মোলায়েম না হয়ে তীক্ষ্ন চোখে কিছুক্ষণ হেনার দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল, মিথ্যা বলছে কিনা। তারপর আবার প্রশ্ন করল, "রুনুকে কোথায় দেখল, কিভাবে আলাপ হল? তোমাদের বাড়িতে?"

হেনা ঘাড় নাড়ল। তার নির্বোধ হয়ে যাওয়া মুখটা এতক্ষণেও স্বাভাবিক হয়নি।

"ছেলের কে কে আছে? বাবা মা ভাই বোন?"

"গৌহাটিতে মামারা আছে। বাবা-মা নেই।"

"ওহ্।" শুধু একটি শব্দেই কণিকা আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা করে ঘরমোছা হয়নি কেন, ঝিয়ের কাছ থেকে সেই কৈফিয়ৎ চাওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হেনার চলে যাওয়াটা সে দেখেও দেখল না। ঘণ্টাখানেক পর রুনু বাড়ি ফিরল

থমথমে মুখে। কণিকা তা লক্ষ্য করল। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে শুনল রুনু ফুঁপিয়ে কাঁদছে। শুনতে শুনতে বিষণ্ণ বোধ করল কণিকা। ইচ্ছে করল ওকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে। তারপরই ভাবল, দুর্বলতা দেখান উচিত হবে না।

পরদিন সকালে কণিকা উকীলবাড়ী গেল। সেখান থেকে ডাক্তারের কাছে গেল সার্টিফিকেট নিতে। ছুটি আরও এক মাস বাড়াতে হবে। বাড়ি ফিরে দরখাস্ত লিখতে বসেছে তখন রুনু পাশে এসে দাঁড়াল। কলেজ যাবার জন্য সে তৈরী। কণিকা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই বলল, "মা বইটা দাও।"

কণিকা ঘাড় তুলে তাকিয়ে থাকল, রুনুকে অবিশ্বাস্য ঠেকছে।

"বইটা হেনার কাছ থেকে নিয়েছি তুমি রেখে দিয়েছ।"

তর্ক করা বৃথা এবং রুনুর অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের আড়ালে বিদ্রোহ লুকিয়ে আছে তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। ঘৃণা থেকেই বিদ্রোহের উৎপত্তি, কণিকার মাথায় শুধু এই কথাটাই খেলতে লাগল, চুপ করে সে বসে রইল।

"তাড়াতাড়ি দাও আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

ভর্ৎসনা, ধমক মিশিয়ে রুনুর কণ্ঠস্বর বীভৎস হয়ে উঠেছে। কথা না বলে কণিকা চেয়ারটা টেনে নিয়ে গেল ছবির নিচে! বইটা পেড়ে রুনুর হাতে দিতেই সে দ্রুত বেরিয়ে গেল। ধীরে ধীরে এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল কণিকার চিন্তাগুলো। প্রচণ্ড একটা রাগ শুধু দাপাদাপি করে যাচ্ছে তার ভিতর যার তাড়নায় সে ঘরে পায়চারি শুরু করল। হঠাৎ থেমে আধলেখা দরখাস্তটা ছিঁড়ে ফেলে নতুন কাগজে সে লিখতে শুরু করল ঃ গীতা তোমাকে সাক্ষী দিতে যেতে হবে ২০শে মার্চ। সকাল দশটায় ট্যাক্সি নিয়ে আমি যাব। যদি না আস তাহলে……

ট্যাক্সি হাজির হওয়া মাত্র গীতা আট মাসের বাচ্চাটাকে নিয়ে বেরিয়ে এল। ট্যাক্সিতে উঠতেই কণিকা বাচ্চাকে নিজের কোলে নিয়ে হেসে বলল, "জামিন রইল।"

গীতা পাথর-মুখ করে বসে। কণিকা এক সময় বলল, "যা-যা বলতে হবে বলে লিখে দিয়েছিলুম মনে আছে?" গীতা ঘাড় নাড়ল।

কোর্টঘরের বাইরে লম্বা বারান্দায় কণিকা বাচ্চাকে নিয়ে পায়চারি করছিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে উকীলের সঙ্গে গীতা ওই ঘরে ঢুকেছে। কয়েকবার ঘরের দরজার কাছে গিয়েও সে ফিরে এসেছে, উঁকি দিতে সাহস হয়নি। বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা বেঞ্চে জায়গা পাওয়া মাত্র সে বসে পড়ল। বসে থাকতে থাকতে তার ঝিমুনি এল। চোখ বুজে আসছে, প্রাণপণে খুলে রাখার চেষ্টা

করল। কোর্টঘর থেকে উকীলের সঙ্গে গীতা বেরোচ্ছে। উকীলের মুখে হাসি, গীতা ফ্যাকাসে। উকীল ইসারায় কণিকাকে ডাকল।

"খুব ভাল সাক্ষী দিয়েছে।"

"রুনুকে আর দরকার হবে না ?"

"না। আপনি বরং কাল কি পরশু সন্ধেবেলা আসবেন। মনে হচ্ছে আপনাকে আর স্বামীর কাছে ফিরে যেতে হবে না।"

কণিকা শুকনো হাসল। শরীরের প্রতি জোড় খুলে আসছে। হুড়মুড় করে হয়তো ভেঙে পড়বে এখানেই, আবার সে জিজ্ঞাসা করল, "উকীলবাবু রুনুকে এইসব ব্যাপারে দরকার হবে না তো ?"

"এর সাক্ষীতেই হবে বলে মনে হচ্ছে।"

কণিকা তাকাল গীতার দিকে। ঘুমন্ত বাচ্চাকে কোলে নিয়ে সে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে।

ওকে বাড়ি পেঁছে দিয়ে ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে গেল। পড়ার ঘরের টেবলে বইগুলো অগোছাল। ধুলো জমেছে টেবলক্লথে। কণিকা চেয়ারে বসে দু' হাতে কপাল টিপে ধরল। এইভাবেই বসে থাকল সে। এক সময় ঝি এসে বলল, "খাবার ঢাকা দিয়ে রাখব ?" মাথা নাড়ল। ঝি চলে যেতে উঠে এসে দাঁড়াল জানলায়। একটা কালো মোটর আসছে দেখে নিঃশ্বাস বন্ধ করে সে গরাদ আঁকড়ে ধরল। মোটরটা অদৃশ্য হতে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

সামান্য জীবন

বাজার যাবার পথে বস্তিটা পড়ে।

সেখানকার এক বাসিন্দা পাগল হয়ে বৌ-ছেলেমেয়েকে মারধর করছে, ঘরের জিনিস ভাঙছে, কাপড় ছিঁড়ছে। উৎপাতে বস্তির লোকে অতিষ্ঠ। চিকিৎসার পয়সা নেই। পাগলা গারদে পাঠাবার উপায়ও তাদের জানা নেই। তাই ওরা পরামর্শ করে ঠিক করেছে পাগলাকে চোর বানিয়ে থানায় দিয়ে আসবে। তারপর পুলিশ যা করার করবে—হয়তো পুলিশই পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে। ওদের এই পরিকল্পনা দু-চারজন জেনেছিল, তার মধ্যে আমিও।

একদিন বাজারে যাবার পথে দেখলাম চোরকে পেটানো হচ্ছে। নির্মম অকথ্য সেই প্রহার। অনুষ্ঠান বহু লোক দাঁড়িয়ে দেখছে। পাগলের মুখ রক্তে ভরা, গায়ে লাঠির দাগড়া, সে শুধু ফ্যালফ্যাল করে সকলের মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর অনুযোগের স্বরে বলছে, "আমার লাগছে, আমার লাগছে।"

এই সময় ছোট্টখাট্ট, শীর্ণ এক বৃদ্ধ অপ্রত্যাশিত বিকট হুঙ্কার দিয়ে ভিড়ের মধ্য থেকে এগিয়ে এসে পাগলকে আড়াল করে দাঁড়াল। সেইদিন থেকেই ওর সঙ্গে আলাপ। বললেন, "পাড়ায় নতুন এসেছি, আগে থাকতাম সিঁথিতে। উল্টোডাঙ্গায় একটা প্রাইমারি স্কুলে তিরিশ বছর পড়াচ্ছি। আমিই তার হেড মাস্টার।" পাগলকে পুলিশে দেওয়া যায়নি। কিন্তু হেড মাস্টারকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে সেদিন বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

বাজারে রোজ রোজ দেখা হয় হেড মাস্টারের সঙ্গে। শান্ত ধীর নম্র স্বরে উনি কুশল জিজ্ঞাসা করেন। দাঁড়িয়ে দু-চার কথা বলি। একদিন উনি বললেন, "আসুন না আমার বাসায় এ ভাবে কি বাজারে দাঁড়িয়ে আলাপ হয়।"

আন্তরিক ভাবেই বললাম, "নিশ্চয় যাব।"

শুনে হাসলেন। ওর সামনের দুটি দাঁত নেই। হাসলে ওকে ভাল দেখায় না।

গড়িমসি এবং সময়াভাবে যাওয়া হচ্ছিল না। দেখা হলেই উনি ঘাড় কাত করেন আর আমি বলি, "নিশ্চয় যাব।"

অবশেষে এক ছুটির সন্ধ্যায় ওর বাসায় গেলাম। প্রাইমারি স্কুলগুলির দুর্দশা নিয়ে শহরের কাগজে একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহই ছিল আমার যাওয়ার উদ্দেশ্য।

একতলার তিনটি ঘরে তিনটি ভাড়াটে পরিবার। একটিতে থাকেন হেড মাস্টার। ঘরে ধূপ জ্বলছে, কম্বলের আসনে বসে উনি একটা কাঠের ডেস্কের উপর ঝুঁকে লিখছেন। এক মহিলা পাশে বসে ওকে হাত পাখায় বাতাস করে যাচ্ছে। তকতকে ঘরে এমন এক স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য বিরাজ করছে, মনে হল হেড মাস্টার যেন পুজোয় বসেছেন।

"আসতে পারি।" দরজা থেকে বললাম।

ওরা দুজনেই অবাক হলেন। হেড মাস্টার সমাদরে ঘরে এনে তক্তপোশে আমাকে বসালেন। বললাম, 'লিখছিলেন, বিরক্ত করলাম।"

উনি বললেন, "আরে ও কিছু নয়। রোজই লিখি।"

"রোজ লেখেন ? উপন্যাস নাকি ?" উনি লাজুক স্বরে বললেন, 'উপন্যাস নয়, আত্মজীবনী।"

"আত্মজীবনী !" অবাক হলাম।

উনি ডেস্কের ডালাটা তুললেন। থরে থরে প্রায় ১৫-২০টি খাতা, প্রতিটিতে ১-২-৩ নম্বর দেওয়া। বললাম, "এতো লিখেছেন ?"

"সামান্য জীবন, লেখার কিইবা আছে। শুধু বাল্য কৈশোর যৌবন আর প্রৌঢ়ত্বের কিছু ঘটনা।"

হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে পড়লাম। বললাম, 'আপত্তি না থাকে তো একটু পড়ে শোনাবেন ?"

মহিলাটি, ওর স্ত্রী, কখন যেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন। দরজার বাইরে থেকে তিনি বললেন, "সাত নম্বরটা শোনাও না।"

হেড মাস্টারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, "আমার যৌবনের খাতা। ওর শুনতে খুব ভাল লাগে।"

তারপর উনি পড়তে শুরু করলেন।

"যৌবন কাহাকে বলে আমি তাহা জানি না। কখন সে আসিল এবং কখনই বা চলিয়া গেল আমি টের পাই নাই। ছয়টি টিউশনি করিয়া কুড়ি টাকা উপার্জন করি। ম্যাট্রিক পাশ নহি যে হাই স্কুলে শিক্ষকতা করিব। আমার ইংরাজি জ্ঞান নাহি কিন্তু হাই স্কুল শিক্ষকদিগের অপেক্ষা বাংলা ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিত বেশিই, এই গর্ব করিতে পারি। সারাদিন পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত দেহে গৃহে ফিরিয়া আমার স্ত্রী লাবণ্যময়ীকে দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যাইত। সে পরমা সুন্দরী, তাহার পাশে নিজেকে বড়ই কুশ্রী দেখাইত। তাহার বয়স অল্প, সে নানারূপ সাধ আহ্লাদের জন্য বায়না ধরিত, কিন্তু

আমি সামর্থ্যের অভাবে তাহা মিটাইতে পারি নাই। প্রেম ভাষণেও আমি অপটু। লাবণ্যময়ী একদিন পাড়ার এক যুবকের সহিত গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। আর ফিরে নাই। এজন্য আমার মনোকষ্ট হয়। তাহার স্মৃতি আজিও ভুলিতে পারি নাই।"

হেড মাস্টার থেমে গিয়ে বললেন, "এটা থাক বরং ১৩ নম্বরটা পড়ি। কেমন?"

দরজার দিকে তাকিয়ে উনি সম্মতি চাইলেন। ঘোমটা দেওয়া একটা মাথা হেলে পড়ল। হেড মাস্টার শুরু করলেন—

"মধ্য রাত্রে ক্রন্দন শুনিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইলাম। দেখি গিন্নীমার পরিচারিকা প্রীতিবালা সিঁড়িতে বসিয়া কাঁদিতেছে। ১৫ দিন হইল সে কাজে যোগ দিয়াছে। আমি এই গৃহে দুই বছর গৃহশিক্ষকরূপে আছি। অনাথা যুবতী প্রীতিবালা কুরূপা তদুপরি খঞ্জ। তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া জানিলাম, গৃহকর্তা দাস মহাশয় এইমাত্র তাহার কৌমার্য গ্রহণ করিয়াছে। শুনিয়া ক্রোধ হইল। পরদিন সকালে দাস মহাশয়কে ভর্ৎসনা করিলাম। তিনি বলিলেন এ ব্যাপারে আমার নাক গলাইবার প্রয়োজন নাই। আমি বলিলাম, আছে, কারণ তিনি বলপূর্বক এই কুমারীর দেহ কলুষিত করিয়াছেন। ইহা পাপ, ইহা অন্যায়। তখন দাস মহাশয় দারোয়ান দ্বারা আমাকে প্রহারে জর্জরিত করাইলেন, দুইটি দাঁত ভাঙিয়া গেল। অবশেষে গলা ধাক্কা দিয়া আমাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। আমি চলিতে শুরু করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পর পিছনে তাকাইয়া দেখি পরিচারিকা প্রীতিবালা আমাকে অনুসরণ করিতেছে।"

হেড মাস্টারের স্ত্রী দরজার বাইরে থেকে বললেন, "ওনাকে চা-টা আগে এনে দিই।"

তাকিয়ে দেখি উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে যাচ্ছেন। আগে লক্ষ্য করিনি উনি খুঁড়িয়ে হাঁটেন।

"নিশ্চয় বিষণ্ণ লাগছে এইসব সামান্য কথা শুনতে।" লাজুক স্বরে হেড মাস্টার বললেন আর অপ্রতিভের মত হাসলেন। আমি তখন দেখলাম ওর ভাঙা দুটো দাঁতের জায়গায় দুটো জীবন গজিয়ে উঠেছে।

চতুর্থ সীমানা

"তাকিয়ে দেখ, সমুদ্র তাই না ? মনে হচ্ছে যেন আকাশটা গড়িয়ে পড়েছে।"

রুবি স্বামীর কথা অনুসরণ করে চোখটাকে আকাশ বরাবর উত্তর-দক্ষিণ করিয়ে ঘাড় নাড়ল। রাস্তা সোজা চলে গেছে। মাঝখানে খানিকটা উঁচু হয়ে থাকায় এবং তার ওপারে গাছপালা বাড়ি ইত্যাদি না থাকায় সত্যিই মনে হয় আকাশটা মাটির দিকে নেমেছে।

"যেখানে আকাশটা মাটি ছুঁয়েছে ওখানেই জমিটা।" বেসরকারী বাস ওদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে। ওরা রাস্তা পার হবার আগে এই নতুন কলোনিটার দিকে তাকিয়ে এই সব বলে মুগ্ধ হয়ে রাস্তা পার হল।

কাঁচা ড্রেনের উপর সিমেন্টের সেতু। পার হয়ে কলোনির সদর। সোজা রাস্তাটাই রাজপথ, কলোনিকে দুভাগ করে 'এ' এবং 'বি' ব্লক তৈরি করেছে। বাস চলাচলের রাস্তার ধার থেকেই বাড়িগুলো তৈরি হতে হতে পিছু হটেছে। প্রায় আধাআধি বাড়িতে ভরে গেছে। পিছন দিকে এখনো মাঠ। মাটি পড়ছে জমি ভরাট হচ্ছে। দুচার বর্ষা না গেলে আর বাড়ি উঠবে না।

বাঁ হাতে কোঁচাটা একটু তুলে নিখিল ছোট্ট একতলা বাড়িটাকে থুতনি দিয়ে দেখিয়ে বলল, "ইউনিভারসিটির প্রফেসারের বাড়ি। ওর মত ইকনমিস্ট ইণ্ডিয়াতে খুব কম আছে।"

রুবি বাড়িটার দিকে তাকিয়ে সমীহভরে বলল, "বড়লোক ?"

"খুব নয়, তবে দিল্লীতে প্রায়ই ডাক পড়ে।"

ওরা পাশাপাশি হাঁটতে থাকল। রুবির জুতোটা নতুন। এখনো খাপ খায় নি। নিখিল সিগারেট ধরাতে দাঁড়াল। রুবি বাড়িগুলো দেখতে দেখতে বলল, "ফাঁকা ফাঁকা ঘেঁষাঘেঁষি নয়।" দুটো কাঠি নিভেছে, তৃতীয়টা জ্বালাতে অপেক্ষা করছে বাতাস পড়ে যাওয়ার সুতরাং নিখিল জবাব দিল না।

কয়েকজন গৃহিণী গল্প করতে করতে বড় রাস্তায় নামল কাছেরই একটা বাড়ি থেকে। তারা একবার পিছু ফিরে তাকালও। গৃহিণীদের পিছনে রুবি এবং নিখিল হাঁটতে শুরু করল।

"এরা সব এখানকারই ?"

"নয়তো কোথাকার হবে !"

রুবি হোঁচট খেল। ভ্রু কুঁচকে নিখিল দেখল রাস্তার খোয়াটাকে। গৃহিণীরা কি কথায় যেন খুব হাসছে।

"ওরা রোজ বেরোয় বোধহয়।"

"বেরোবে না কেন, বেড়াবার এমন রাস্তা রয়েছে, বেশি গাড়ি চলে না, ভিড়ও নেই।"

"দোকান পাটও তো কম।"

"নতুন জায়গা, একি কলকাতার মত পুরনো? সবই হবে, আস্তে আস্তে সব হবে। লোকজন আরও আসুক।"

বড় রাস্তাটা থেকে দুধারে ছোট ছোট সমান্তরাল রাস্তা বেরিয়ে গেছে। রাস্তার ধারে সিমেণ্ট বাঁধান খোলা ড্রেন, ইলেকট্রিকের খুঁটি। লুঙ্গীপরা এক মাঝবয়সী লোক বাড়ির সামনের ড্রেন খোঁচাচ্ছে বাখারি দিয়ে। ছাতে বাচ্চা কোলে বৌ। বাজারের থলি হাতে একজন পাশের রাস্তা থেকে বেরোল, একটু ব্যস্ত। গৃহিণীরা তাকে কি জিজ্ঞাসা করতেই লোকটি বলল, নিখিল রুবি তখন তাদের অতিক্রম করে যেতে যেতে শুনল, "হঠাৎ এসে পড়েছে, আজকেই গৌরীকে নিয়ে যাবে।"

"ওমা সেকি, এই তো সবে বাপের বাড়ি এল।"

একটু পরেই কয়েকটা চাপা হাসির মধ্য দিয়ে কথা ফুটল, "বেচারা, দুদিন জিরোতে এসেও শান্তি নেই।"

"বেশ রোগা হয়ে এসেছে।"

"হবে না যা টানের বহর।"

গৃহিণীরা একটা রাস্তায় ঢুকে পড়ল। আড়ে তাকিয়ে নিখিল লক্ষ্য করল রুবির ঠোঁট হাসিতে কোঁচকান। নতুন একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। এখন শেষ পর্যায়ে। আজ ছুটির দিন, বাড়িতে মিস্ত্রি লাগে নি। মোটরে কর্তা গিন্নি দেখতে এসেছে, সঙ্গে ঠিকাদার। গিন্নি মেঝের দিকে হাত নেড়ে কিছু একটা বলছে, গভীর মনোযোগে কর্তা ও ঠিকাদার শুনছে।

"বেশ পয়সাওলা।"

জবাব দিল না নিখিল। বাড়ির মাথায় খোঁচা খোঁচা কংক্রীট থামের শিক। জানলায় গ্রীল। দক্ষিণে পোর্টিকো। গ্যারেজ ঘর। দরজাগুলো সেগুনের। সিঁড়িতে মোজাইক।

"লাখের কম নয়।"

"এত লাগে!"

"লাগবেই প্রায় পাঁচ কাঠা জমি।"

"আমাদের তো তিন কাঠা মোটে।"

"মোটে মানে? তাই কটা লোকের আছে?"

নিখিলের স্বরে কিছুটা ঝাঁঝ ছিল। ক্ষুণ্ণ হয়ে রুবি বলল, "তা বলছি না, খরচ আমাদের কমই হবে। তিনটে লোকের জন্য এত বড় করে তো আর আমাদের দরকার নেই।"

"তিন কোথায় চারজন তো।"

"মা আর কদিন বাঁচবেন।"

ওরা ক্রমশ ফাঁকা অঞ্চলের দিকে এগিয়ে আসতে থাকল। বাড়ির সংখ্যা কমছে, তৈরি শুরু হওয়াদের সংখ্যা বাড়ছে। কলোনির প্রায় মাঝামাঝি ওরা এসে পড়েছে।

সাজগোজ করে একটা পরিবার বাস ধরতে চলেছে। তার মধ্য থেকে একটা বাচ্চা ছুটে গেল রাস্তার ধারের বাড়িটার দিকে। নিচু লোহার বেড়া, একটুখানি বাগান। তার মধ্যেই দুটি চেয়ারে ধূসর হয়ে বসে রয়েছে স্বামী-স্ত্রী! বাচ্চাটি ফুল চাইল। ওরা ঘাড় নাড়ল। বাচ্চাটি হাত বাড়িয়ে একটি সাদা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে ছুটে পরিবারের মধ্যে ফিরে এল। ঘাড় বেঁকিয়ে যতক্ষণ দেখা যায় দেখতে দেখতে স্বামী-স্ত্রী হেসে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করল।

নিখিল এবং রুবি সবটাই দেখতে দেখতে এগোল। একবার শুধু রুবি মন্তব্য করল : "নিঃসন্তান বোধ হয়।"

"বুড়ো বয়সে এদের খুব কষ্ট হয়।"

রুবি ঘাড় নেড়ে সমর্থন করল। "আমার এক মামারও ঠিক এই অবস্থা। কেউ তাদের কাছে গেলে যা খুশী হয়। যাবে একদিন?"

এর জবাবে নিখিল আঙুল দিয়ে দেখাল : "ওইটে হচ্ছে পার্ক। ভেতরে পুকুরও আছে।"

রুবি সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। ফ্রক পরা কয়েকটি কিশোরী ভারিক্কী চালে গল্প করতে করতে পুকুর ধারে ঘুরছে। দুজন যুবক বেঞ্চে ঘেঁষাঘেঁষি বসে একটা বই পড়ায় ব্যস্ত। গুটিকয় শিশু ছুটোছুটি করছে।

"পুকুরটা ঘেরা নয়। বাবুলকে একা ছেড়ে দেওয়া যাবে না।"

"না যাবে না।"

দুজনের স্বরেই দুশ্চিন্তার প্রকাশ।

"তবে ওদিকে একটা খেলার মাঠ আছে, বড়দের জন্য।"

"বড়দের খেলার মধ্যে গেলে, লেগে-টেগে যাবে!"

"পুকুরটাকেই ঘেরাও করার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ওতো আর এক্ষুনি চলা-ফেরা শিখছে না।"

নিখিল আশ্বস্ত করল রুবিকে। তারপর আঙুল তুলে দেখাল, "ওই যে বিরাট ফাঁকা জায়গা, ওইখানে জমিটা।"

"কোন খানে?"

"চল দেখাচ্ছি। ওরই মধ্যে একজায়গায়।"

ওরা চলতে শুরু করল। দুধারে জমি। কোন কোনটায় সীমানা-চিহ্ন দেওয়া। সিমেন্টের তৈরি চৌকো ঢিবি, তার ওপর আঁচড় কেটে প্লট নম্বর লেখা। কিছুদূর গিয়ে রাস্তাটা অসমাপ্ত অবস্থায় রয়ে গেছে। দরকার পড়েনি কারণ ওদিকে আর বাড়ি ওঠেনি। ইলেকট্রিক খুঁটিও নেই।

কলোনির লোকালয় ছাড়িয়ে ওরা অনেকদূর এসে পড়েছে। সামনে ধু ধু মাঠ তারপর অস্পষ্ট গ্রাম। দুপাশে অনেক দূরে বাড়ি। সেগুলি অন্য কলোনির।

"এমন ফাঁকার মধ্যে!"

রুবির বক্তব্যটা ঠিক পরিষ্কার হল না। নিখিল মুগ্ধ হয়ে সামনে তাকিয়ে বলল, "এই তো ভাল, লোকালয়ের কোলাহল থেকে দূরে, শান্ত নির্জন পরিবেশে মানুষ তো এই ভাবে বাঁচতে চায়।"

"দোকান, বাজার বাস থেকে দূরে হয়ে গেল!"

"দোকান বাজার তো চব্বিশ ঘণ্টা করতে হবে না, একবারই, বাসেও একবার অফিস যাওয়া আর আসা। তোমাকে তো কলোনির প্ল্যানটা দেখিয়েছি, এখন যে জায়গাটায় আমরা দাঁড়িয়ে এখানে একটা রাস্তা হবে আড়াআড়ি; এর ওপারে 'সি' আর 'ডি' ব্লক। পয়সাওয়ালা লোকেরা এই দিকটায় জমি কিনেছে।"

"ওদেরি পোষাবে, গাড়িতে করে তো যাতায়াত করবে।"

কথাটা যেন শুনতে পেল না নিখিল। রাস্তা থেকে পাশের জমিতে নেমে হাঁটতে শুরু করল। বর্ষার কাদায় চটচটে। বুনো গাছ আর লম্বা ঘাসে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে যাচ্ছে। থেমে পিছু ফিরে নিখিল বলল, "এই জায়গাটায় এলে মনে হয় যেন মাঝ সমুদ্দুরে এসেছি, অবশ্য মনে হওয়াটা নেহাতই আন্দাজি ব্যাপার সমুদ্রই কখনো চোখে দেখিনি।"

"কিসে মনে হল যে জায়গাটা সমুদ্রের মত?"

"এমনিই। মাঝে মাঝে মনে হয় না কি এরকম? কোন কোন লোক দেখলে যেমন মনে হয় পাহাড় দেখছি। কাউকে অরণ্য, কাউকে নদী, বন্যা, উদ্যান; সেই রকম, সবকিছু মিলিয়ে একটা। তাই না?"

ভ্রু তুলে রুবি শুনল। মন্তব্য না করে চারধারে তাকাতে তাকাতে বলল, "আমাদের জমিতে পিলার দিয়েছে?"

"নিশ্চয়।"

"এখানে বেশিক্ষণ না থাকাই ভাল। বর্ষার সময় সাপখোপ থাকতে পারে।"

"হ্যাঁ, তা পারে।"

এক প্রবীণ গ্রামবাসিনী ওদের কাছ দিয়েই গ্রামের দিকে চলে গেল। একবার শুধু তাকিয়ে ছিল। রুবি তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। বেশ জোরে হাঁটছে। দূরে দূরে আরও কিছু লোক চলাচল করছে। আকাশে ভেসে চলেছে মেঘ। বাতাসে আঁচল খসে পড়ল। তুলে নিয়ে রুবি বলল, "এটা ভাদ্দর মাস।"

"এইটে আমাদের জমি।"

"কই ?"

"এই তো।"

সন্তর্পণে শূন্যে হাত বুলোল নিখিল।

"পিলার কই।"

হঠাৎ রুবি আর্তনাদ করে উঠল।

"পিলার !"

চমকে উঠে বুনোগাছ আর লম্বা ঘাস মাড়িয়ে নিখিল ছুটে গেল। উবু হয়ে গুপ্তধন পাওয়ার মত জমি আঁচড়াতে থাকল। নেই। হামা দিয়ে কিছুটা এগোল। নেই। দুহাতে ঘাসের চাপড়া টেনে তুলতে শুরু করল। নেই। উঠে ছুটে গেল আর এককোণে।

রুবিও পা চেপে চেপে খুঁজতে শুরু করল। কাদা লাগছে শাড়িতে। হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে তুলল। ঝুঁকতেই আঁচলটা মাটিতে পড়ল। বুকের কাছে দুহাতে জড়ো করে আরও নিচু হল।

"কোথায় জমি ?"

মুখ তুলে ফ্যালফ্যাল চোখে নিখিল তাকাল। চারপাশে চোখ বুলিয়ে বিড়বিড় করে কি বলল।

"কোথায় জমি ?"

চীৎকার করল রুবি। নিখিল আরও একটু সরে গিয়ে খুঁজতে শুরু করল। কাঁটাগাছ ওপড়ানোয় আঙুলে রক্ত ঝরছে। আঙুল মুখে দিয়ে নিখিল দাঁড়াল।

"ওরা তো বলেছিল করে দেবে।"

রুবি শুনতে পেল না। প্রায় মাটি শুঁকতে শুঁকতে সে এগোচ্ছে। হঠাৎ থমকালো। দুহাতে ঘাস সরিয়ে অস্ফুটে বলল, "এই তো।"

"পেয়েছ ?" ছুটে এল নিখিল। রুবির পাশে বসে মুখটা মাটির কাছাকাছি এনে বলল, "পঁচিশ ! আমাদের প্লট নম্বর পঁচিশই তো, না চব্বিশ ?"

"পঁচিশ।"

"ঠিক মনে আছে ?"

ঘাড় নেড়ে রুবি বলল, "রেজিস্ট্রির দিনই তো তুমি বললে, পঁচিশে ডিসেম্বর যীশুর জন্মদিন। পঁচিশে আগস্ট প্রমোশনের চিঠি পেয়েছি, পঁচিশে মে বাবুল জন্মেছে। মনে নেই ?"

"বাকি তিনটেও তাহলে আছে।"

প্রথমটির থেকেও কম সময় লাগল বাকি পিলার খুঁজে বার করতে। তার মধ্যে একটি ভাঙা, ইঁটগুলো চুরি হয়ে গেছে। নিখিল অস্বস্তি বোধ করল। চারদিকে চারটে না থাকলেও জমির মালিকানা স্বত্ব নষ্ট হবে না, তবুও সাবধান হওয়া ভাল, কালই ব্যবস্থা করব এই ভেবে তিন পিলারের মাঝে দাঁড়িয়ে নিখিল হাসল। বলল, "এই হল জমি।" বুক ভরে নিশ্বাস নিল। উদ্ধত ভঙ্গিতে গ্রীবা তুলে চারধারে তাকাল। পাশের স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ্য করে হাসল।

"এতক্ষণে স্বস্তি পাওয়া গেল।" চারপাশের পৃথিবীতে চোখ ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে রুবি আঁচল রাখল কাঁধে, "যা ভয় ধরেছিল।"

"ভয়, ভয় কিসের? টাকা দিয়েছি, দলিলও আছে। জিনিসটা লোপাট হবার মত নয়। জমি হচ্ছে আবহমান কালের, থাকবেও চিরকাল। তবে একটা ভয় রয়েছে পাশের জমির মালিক হয়তো খানিকটা ওই ভাঙা পিলারের দিক থেকে চুরি করে দখল করতে পারে। এ পাশের জমিটা কিনেছে এক আই. এ. এস. আর এইটে ব্যারাকপুর কোর্টের মুন্সেফের। পেছনেরটা বায়না করে রেখেছে এক সাব-এডিটার। সব খোঁজ নিয়ে রেখেছি।"

"তবু নজর রাখা ভাল।"

"নিশ্চয় মাঝে মাঝে এসে দেখে যেতে হবে।"

দূরে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে, বোধ হয় জমি দেখতে এসেছে। কয়েকজন যুবক বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় বসল। একটা লরী এসে থামল, ইঁটে বোঝাই। লাউডস্পীকারে কোথাও রেকর্ড বাজছে, অস্পষ্ট শোনা যায়। একটা চিল মাটিতে ছোঁ মেরে কি তুলে নিয়ে গেল। কুকুরটা যেতে যেতে থমকে চিলটাকে দেখল। তারপর সবুজ ধান চারার মাঠ লক্ষ্য করে দুলকি চালে এগিয়ে গেল।

"এখানে সাপ থাকতে পারে, সরে এস।"

নিখিল সরে এল। "কোথাও যদি বসার মত একটা জায়গাও থাকত।"

দুজনে চারধারে তাকিয়ে খুঁজে পেল না। তাই উবু হয়ে বসল জমির কিনার ঘেঁষে।

"এখন মাটি আলগা, জলে কিছুটা বসবে, রোদ খেয়ে শক্ত হবে।"

"তখন ভিৎ খোঁড়া হবে?"

স্মিত হাসল নিখিল। বাতাসের বিরুদ্ধে চোখ রেখে নিমীলিত করল। পাঞ্জাবিটা বুকের সঙ্গে লেপটে গেছে। উঁচু হয়ে উঠেছে মনিব্যাগ।

"দোতলার ভিৎ করে প্রথমে একতলা তুলতে হবে। কেন জান? পরে দরকার হলে দোতলা তুলে একতলাটা ভাড়া দেওয়া যাবে। ধর আমি মরে গেলুম, তখন তুমি ভাড়ার টাকায়—"

"আহা, কথার কি ছিরি।"

স্মিত হাসি, নিমীলিত চোখে নিখিল আবার বলল, "ইন্সিওরের টাকাতেই দোতলা তুলতে পারবে।"

"থাক খুব হয়েছে।"

"প্ল্যানটা সেই ভাবেই করব। সিঁড়িটা এমনভাবে হবে যাতে একতলার সঙ্গে দোতলার কোন সম্পর্ক না থাকে তাহলে ভাড়াটেদের সঙ্গে কোন গোলমাল হবার চান্স থাকবে না।"

"এখানে বাড়ি ভাড়া কেমন?"

"তা পুরো একতলা, অবশ্য আমাদের মত ছোট বাড়ির, দুশো টাকা তো হবেই।"

শুনে রুবিও বাতাসের বিরুদ্ধে চোখ রাখল। কিছুক্ষণ পরে বলল, "হাওয়ায় কি রকম সোঁ সোঁ আওয়াজ হয় দেখেছ। ঠিক কানের গোড়াতেই।"

"বলেছিলাম না, মনে হয় সমুদ্রে এসেছি। কি খোলামেলা, যতদূর ইচ্ছে তাকাও, যত বড় ইচ্ছে নিশ্বাস নাও, মনে হয় যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছি।"

"রান্নাঘরে যাতে হাওয়া আসে সে ব্যবস্থা কিন্তু রাখতেই হবে।"

খড় খড় করে উঠল ঘাস। কিছু একটা চলে যাচ্ছে।

ওরা ভয় পেল। নিখিল বলল, "এবার যাওয়া যাক।"

"পিলারের কাছের ঘাসগুলো পরিষ্কার করে দিলে হত।"

"পরে হবে, আর একদিন রোদ থাকতে থাকতে আসা যাবেখন।"

আসার সময় ওরা একটা খালি ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে তাকাল। ট্যাক্সিটা তাই দেখে আস্তে হয়ে পড়ল। নিখিল হাত নেড়ে না করে দিল।

"এক পয়সা, দু পয়সা করেই টাকা জমে। কষ্ট হবে হোক। পরে দেখবে সেই কষ্টের ফল ভোগ করতে কেমন লাগে। অন্তত তিরিশ হাজার টাকা না হলে বাড়ি তৈরিতে নামা চলে না। মাল মশলার দাম যা বাড়ছে দিন দিন।"

"এমনিই তো কত খরচ কমিয়ে দিয়েছি।"

জোরে হেঁটে এসে ওরা বাসে উঠল। সন্ধ্যা উতরে গেছে। ছুটির দিন বলেই শহরতলীর বাসে ভিড়। নিখিল বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুঁকে পড়ে কলোনিটার দিকে তাকাল।

বাস থেকে নেমে মিনিট চারেক হাঁটতেই কলকাতার মধ্যে চলে এল। এবার ট্রামে উঠল। নেমে দুমিনিট হেঁটে বাড়ি। বাড়ির পথে রুবি বলল, "বাবুলের বিস্কুট ফুরিয়েছে কিনবে?"

"অভ্যেসটা ছাড়াও, এক বছরের ছেলেকে ওসব না খাওয়ানোই ভাল।"

'তোমার গেঞ্জী ছিঁড়েছে।"

"এখনো কটা দিন চলবে।"

"মার কাল একাদশী।"

"আঃ এই তো তোমার দোষ। একটু আগে বললে না কেন, তাহলে আসার পথে নেমে কিনে নিতুম। এই তো তোমার দোষ। এখন কে আবার যাবে? কালকে বরং কাউকে দিয়ে আনিয়ে নিও।"

একতলা ভাড়াটেদের বৌ-এর সঙ্গে সিঁড়িতেই রুবির দেখা হল। দাঁড়িয়ে পড়ল।

"তোমার ছেলে কি দুরন্তই না হয়েছে। এসেছিল আমাদের ঘরে। এটা টানে, ওটা হাঁটকায়। এই মাত্তর ঘুমোল, তা কেমন দেখলে?"

"বিরাট কলোনি, আর কি ফাঁকার উপর। হু হু করছে হাওয়া, মনে হয় যেন সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছি। ফিরতেই ইচ্ছে করে না।"

"এখনই এতখানি, বাড়ি হলে না জানি কি হবে।"

"তাই তো ভাবছি, না জানি কি হবে। বিরাট বিরাট বাড়ি, কেউ ম্যাজিস্ট্রেট, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ প্রফেসর ওর মধ্যে আমাদের মত মানুষ গিয়ে কি করে বাস করবে, তাই ভেবে এখনই তো বুক কাঁপছে। পাশের জমিটাই এক জজের।"

ঝকমক করছে রুবির মুখ। কথায় আধো আধো ভাব।

"তোমার ছেলে একপাটি জুতো ফেলে গেছে নিয়ে যাও।"

জুতো নিয়ে রুবি দোতলায় এল। দুখানি ঘর। বাইরের লোক এলে সামনের ঘরে বসে। রাত্রে নিখিলের বুড়ি মা শোয়। ভিতরেরটি বড়। খাট, আলমারি আছে। রান্নাঘর, বারান্দার ধারে টিনের চালাটা।

বছর পনেরোর একটি ছেলে বাইরের ঘরের চেয়ারে বসে। শীর্ণ হাত-পা, ড্যাব ড্যাবে চোখ। চেয়ারের হাতল ধরে পা বেঁকিয়ে মাথা নিচু করে রয়েছে। রুবি ভিতরের ঘরে গেল। নিখিল জামা ছেড়ে লুঙ্গি খুঁজছে।

"মন্টু, ছোট কাকার ছেলে, ওকে বোধ হয় তুমি দেখনি।"

"কি জানি ওরা তো অনেক ভাইবোন। কি জন্যে এসেছে?"

"একটা চিঠি এনেছে, দেখ তো কি লেখা।"

থুতনি নেড়ে টেবিল দেখাল নিখিল। রুবি চিঠিটা তুলে পড়তে শুরু করল।

"কি লিখেছে?"

লুঙ্গিটা মাথার উপর দিয়ে গলিয়ে দাঁতে চেপে সাবধানে, কাপড়ের পাট রক্ষায় নিখিল ব্যস্ত ছিল হঠাৎ চমকে উঠল, "কি বললে? ছোটকাকীর কি হয়েছে?"

"খুব অসুখ, বাড়াবাড়ি যাচ্ছে।"

"তা আমি কি করব ?"

রুবি চিঠি থেকে আবৃত্তি করল—

"এদিকে আমি তো অকর্ম্মণ্য, পঙ্গু।"

"মাতলামি করে গাড়ি চাপা পড়েছিল।"

"সুবোধ মাসে ষাট টাকার বেশি সংসারে দিতে পারে না।"

"ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ে বখামি শুরু করে, এখন বুঝি মোটর কারখানায় ঢুকেছে।"

"প্রবোধ ঈশ্বরের দয়ায় স্কুল ফাইন্যাল পাশ করিয়া নাইট কলেজে পড়িতেছে। দুইটা টিউশানিও করে।"

"এ ছেলেটা ওদের মধ্যে তবু ভাল।"

"সোনা এবং মোনার জন্য পাত্র খুঁজিতেছি কিন্তু উহারা লেখাপড়া জানে না, দেখিতেও ভাল নয়। বুঝিতেই পারিতেছ আজকালকার বিবাহের বাজারে উহাদের পার করিবার মত সঙ্গতিও আমার নেই। তাহার উপর তোমার কাকীমার ভীষণ অসুখ, বোধহয় বাঁচিবে না।"

"ও বাড়িতে ওই একটি মাত্র মানুষ, সারা জীবন দুঃখে দুঃখে কাটল, তবু মুখ ফুটে একটা কথা বলে নি। মুখে সর্ব্বদাই হাসি। আমায় খুব ভালবাসত।"

"ডাক্তার একরূপ জবাবই দিয়েছে। বাঁচাইতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন তা আমার নাই। তোমার কাকিমা সর্ব্বদাই তোমার কথা বলে। তুমি তাহাকে যেরূপ ভালবাস, তাহার গর্ভের সন্তানও সেরূপ ভালবাসে না। একথা সে প্রায়ই বলে। তোমার পিতা মারা যাওয়ার পর যে মনোমালিন্য দেখা দেয়, তা তোমার কাকিমার চেষ্টাতেই বেশীদূর গড়াইতে পারে নাই। তোমার হয়তো এখনো ধারণা থাকিতে পারে, সম্পত্তি ঠকাইয়া লইয়াছি, কিন্তু রাধারমনের নামে দিব্যি করিয়া বলিতে পারি, এক কানাকড়িও ঠকাই নাই। বসত বাড়িটিও বাঁধা পড়িয়াছে এতগুলি সন্তানের মুখে অন্ন যোগাইবার জন্য। কিন্তু আজ বাঁধা দিবার মতও আর কিছু নাই। তুমি বংশের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান। ভাল চাকরী কর, আয়ও শুনিয়াছি ভালই হয়। তোমার কাকিমাকে সুস্থ করিয়া তোলার জন্য আমাদের থেকে তোমার দুশ্চিন্তাই বেশি হওয়া স্বাভাবিক। তাই সুনীলকে পাঠাইতেছি যদি—"

"টাকা।"

রুবি একবার তাকিয়ে নিঃশব্দে চিঠির বাকি অংশটুকু পড়ে নিয়ে ঘাড় নাড়ল।

"সেই রকমই বোধ হচ্ছে।"

লুঙ্গিটা পরা হয়ে গেছে। নিখিল গম্ভীর হয়ে খাটে বসে পড়ল। ওঘর থেকে কথার শব্দ আসছে। মণ্টুর সঙ্গে মা কথা বলছে।

চিঠিটা ভাঁজ করে রেখে রুবিও নিখিলের পাশে বসল। দুজনে পাশাপাশি সামনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল। ঘাড় ফিরিয়ে আলমারির আয়নায় দুজনের চোখাচোখি হল। তারপর দুজনেই ঘাড় শক্ত করে বসে থাকল। দরজার কাছে গলা খাঁকারির শব্দে রুবি উঠে দাঁড়াল, শ্বাশুড়ী।

"অনেকক্ষণ এসেছে, প্রায় ঘণ্টা দুই।" অস্ফুটে নিখিলের মা বললেন।

মেঝের দিকে তাকিয়ে নিখিল বলল, "তা কি করব ?"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, "দুদিন ধরে নানা জায়গায় ঘুরেছে, মামার বাড়ি গিয়ে পায় নি। পিসীর বাড়িতেও নয়, শেষে এখানে এসেছে।"

"তাতো বুঝলুম, কিন্তু আমি কি করতে পারি।"

অসহায়ের মতো নিখিল অগত্যা রুবির দিকে তাকাল। সেও তারই দিকে তাকিয়ে। দরজার কাছ থেকে আবার অস্ফুটে উনি বললেন, "মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে, থাইসিস হয়েছে। অদ্দেক দিনই তো না খেয়ে থাকত।"

"মা বাবুলের দুধ গরম করে রেখেছেন ?" ধড়মড় করে রুবি বলে উঠল। নিখিলও সচকিতে তাকাল।

"রেখেছি।"

আশ্বস্ত হয়ে রুবি বলল, "মণ্টুকে কিছু খেতে দেওয়া উচিত।"

নিখিল উঠে পড়ল। পাঞ্জাবিটা হাতে নিতেই রুবি বলল, "খাবার আনতে চললে ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে মার জন্যেও কিছু এনো।"

মণ্টুর সামনে দিয়েই বেরোতে হবে। নিখিল বেরোতে গিয়ে ওর সামনে দাঁড়াল। "কাকিমা এখন কেমন আছে ?"

উঠে দাঁড়াল মণ্টু। "ভাল আছে।"

ভ্রূ কোঁচকাল নিখিল "ভাল আছে ?"

মণ্টু থতমত হল। ঢোক গিলে বলল, "কাল রক্ত পড়ে নি।"

"কদিন এমন হয়েছে ?"

"দু-তিন মাস। কাউকে বলেনি, লুকিয়েছিল।"

"জানার পর কি হল ?"

মাথা নামিয়ে মণ্টু চেয়ারের হাতল আঁচড়াতে শুরু করল।

"খোকা শোন্।"

মার ডাকে নিখিল ভিতরে এল।

"ওকে এখন আর কিছু জিজ্ঞেস করিস নি। মুখটা শুকিয়ে আছে কিরকম। ছোট ছেলে ভাবনা চিন্তা ওরও হয়। খাওয়া-দাওয়া বোধহয় হয় নি।"

কথা না বলে নিখিল হন হন করে বেরিয়ে পড়ল। গলি দিয়ে যাচ্ছে এমন সময় কে ওকে চীৎকার করে ডাকল। ফিরে দেখে অমিয়। পাড়ারই ছেলে, পেশায় ড্রাফটস্‌ম্যান।

"আপনার প্ল্যানটা আজই শেষ হল। পারলাম না, হাজার চল্লিশ লাগবেই।"

"কেন, আমি যে ভাবে বললুম তাতে তো অত লাগার কথা নয়।"

অমিয় ছোট্ট করে হাসল। "আপনি তো বলেই খালাস, দোতলা বাড়ির ভিৎ, জমি তিন কাঠা, মেটিরিয়ালস কি রকম দেবেন তা আপনিই ঠিক করবেন। তবে যাই দিন না কেন, আমার তো মনে হয় না ওর কমে হবে। দু'বছর আগে হলে হত। আইডিয়া আছে বটে আপনার। অফিসে একজনকে আপনার করা প্ল্যানটা দেখিয়েছিলাম, খুব তারিফ করলেন।"

"অনেক ভেবেচিন্তে করা।" অস্ফুটে প্রায় আপন মনেই বলল, নিখিল।

"কবে শুরু করবেন?"

"কি জানি।"

"সেকি এই তো সেদিন বললেন, তাড়াতাড়ি চাই, ইমিডিয়েট স্টার্ট করবেন।"

"টাকা চাই তো। ত্রিশ হাজার পর্যন্ত লোন পেতে পারি গবরমেন্টের কাছ থেকে। ভেবেছিলাম ধার নেব না কিন্তু······"

অধৈর্যের ভঙ্গিতে নিখিল যাবার জন্য ঝুঁকল। অমিয় সহানুভূতি জানানোর মতো করে বলল, "আসল প্ল্যানটাই হল টাকা জোগাড়। প্ল্যান হলে তখন স্যাংশান করাতেই প্রাণান্ত। নানান বায়নাক্কা, একে ঘুষ তাকে ঘুষ। দিতে দিতে ফতুর।"

বেশ বড় করে অমিয় হাসল। তারপর বলল, "দাঁড়ান আপনার প্ল্যানটা নিয়ে আসি।"

অমিয় প্ল্যান আনতে চলে গেল।

তখন নিখিলের সামনে থেকে গলিটা এবং বাড়িগুলো অদৃশ্য হতে শুরু করল। হু হু হাওয়া বইতে লাগল, সমুদ্রের গর্জন অস্ফুট হয়ে ভেসে আসছে। প্রবল অন্ধকার চতুর্দিকে আর সে তার তিনকাঠা জমির মাঝে দাঁড়িয়ে। জমির তিনকোণে তিনটে পিলারের মাথা উঁচু হচ্ছে ক্রমশ। চতুর্থটির দিকে তাকাতেই দেখল ছোটকাকী পিলার হয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। তারপর কাঁদতে শুরু করল: "বড় কষ্টরে নিখিল, আমাকে সারিয়ে তুলবি?" নিখিল অস্ফুটে বলল,

"ছোটকাকী এইটে আমার জমি এখানে আমি বাড়ি করব। আমি সুখে থাকতে চাই।" শোনামাত্র চতুর্থ পিলারটা মাটির মধ্যে আগাছার মাঝে বসে যেতে শুরু করল। তাই দেখতে দেখতে ভয়ে আঁতকে উঠল নিখিল: "না না, ছোটকাকী যেও না, আমার জমির সীমানা তাহলে হারিয়ে যাবে।"

নিখিলকে হাত বাড়িয়ে থাকতে দেখে অমিয় প্ল্যানটা এনে দেবার সময় বলল, "খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন মনে হচ্ছে। যদি বলেন তাহলে যাতে আরও কমে হয় এমন প্ল্যানও করে দেওয়া যায়।"

ক্লান্ত কণ্ঠে নিখিল বলল, "বোধহয় নতুন প্ল্যানই করতে হবে। বাড়ি করা খুব শক্ত কাজ।"

পাষাণভার

ধর্মতলার মোড়ের স্টপটা তুলে দেওয়ায় অনিলের মতো অনেকেই এখন চলন্ত ট্রাম থেকে লাফিয়ে নামে। লাল আলো থাকলে অবশ্য ট্রামকে দাঁড়াতেই হয়, তখন লাফানোর দরকার হয় না। বহুদিনই অনিল ভেবেছে, দরকার কি এইভাবে নামার, মোড়টা পার হলেই তো টার্মিনাস। পঞ্চাশ-ষাট মিটার পথ বাঁচাবার জন্য নিজেকে মৃত্যু-সম্ভাবনার সম্মুখীন করা কেন! দুচার দিন সে নামলও ধর্মতলা টার্মিনাসে ট্রাম থামার পর। কিন্তু অন্যান্যদের টপাটপ নামা দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারে না। শুধু মনে হয়, আবার এতটা পথ হেঁটে ফিরব! পঞ্চাশ-ষাট মিটার অর্থাৎ এক মিনিট দেরি করার ধৈর্যও অনিলের নেই।

সেদিন ট্রামটা ধর্মতলার মোড়ের কাছাকাছি, কিন্তু সবুজ আলো জ্বলছে। একটা লোক নামার অপেক্ষায়। লোকটাকে মাসে অন্তত বারো-তেরোদিন অনিল ট্রামে দেখে। কাছাকাছিই কোথাও চাকরি করে, হয়তো ইলেকট্রিক বা ইনকাম ট্যাক্স বা এল-আই-সি অফিস বা কোনো দোকান-টোকানে। তার পাশে আর একটা লোক, হাতে জীর্ণ একটা ফোলিও, ট্রাউজারসটা ঢলঢলে, গায়ে ঘেমো গন্ধ, নামার জন্য ইতিউতি পথের দুধারে তাকাচ্ছে। বোঝা যায় ভরসা পাচ্ছে না। অনিল বিরক্ত স্বরে বলল, "নামবেন যদি নামুন, নয়তো সরে দাঁড়ান।"

"হ্যাঁ নামি।" লোকটি ব্যস্ত হয়ে নামামাত্র পিছলে তালগোল পাকিয়ে গেল। পিছনেই একটা ডবল-ডেকার বাস আসছে। ঘাড় ফিরিয়ে অনিল দেখল বাসের একটা চাকা লোকটার পিঠের উপর উঠছে।

"কি কথাই বললেন দাদা!" অনিল চমকে দেখল তার সামনের লোকটি, যার সঙ্গে মাসে অন্তত বারো-তেরো দিন ট্রামে দেখা হয়, কথাটা বলল। অনিল তৎক্ষণাৎ টুক্ করে চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে ধর্মতলার ভিড়ে মিশে গেল।

সারাদিন অনিল কাজে মন বসাতে পারল না। লোকটি তার কথাতেই নেমে বাস-চাপা পড়ল। হয়তো মরে গেছে। বাসের চাকায় কতটা ওজন থাকতে পারে তাই নিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে বহুক্ষণ আলোচনা করল। বাসের নিজস্ব ওজন এবং অন্তত একশো যাত্রীর ওজন মোটামুটি হিসেব করে একজন

জানালেন, কম করে আড়াইশো মণ। অনিল নিশ্চিত হয়ে গেল, লোকটি আর বেঁচে নেই। এই মৃত্যুর জন্য পরোক্ষভাবে সেই যে দায়ী তা আর কেউ না জানলেও · অনিল ভাবতে ভাবতে থমকে গেল। আর সেই লোকটি জেনে গেছে। শুধুই কি জানা, অভিযোগ পর্যন্ত করেছে—"কি কথাই বললেন দাদা!"

সুতরাং দুটি চিন্তায় অনিল কাতর হয়ে পড়ল। একটা মৃত্যু সে ঘটিয়েছে অতএব সে অপরাধী। মুশকিলের কথা, ব্যাপারটা সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। যতই ভাবে ততই নিজেকে খুনী বলে মনে হচ্ছে। অন্যটি—তার এই অপরাধের একজন সাক্ষী রয়ে গেছে। হয়তো লোকটির সঙ্গে আর জীবনে সাক্ষাৎই হবে না, কারণ অনিল ইতিমধ্যেই ঠিক করে ফেলেছে ধর্মতলা স্ট্রীটের কোনো ট্রামেই আর জীবনে উঠবে না। কিন্তু সবসময় কি মনে হবে না একটা লোক তাকে ফাঁস করে দিতে পারে? একটা পাষাণভার কি সর্বদা বুকের মধ্যে থেকে যাবে না?

এই দুটি চিন্তা এমনই জাঁকিয়ে বসল যে, সে ভেবে দেখল একমাত্র আত্মহত্যা ছাড়া রেহাইয়ের কোন পথ নেই। আর নয়তো অপরাধ কবুল করে শাস্তি নেওয়া। অনিল লেখাপড়া জানা, বি.এ পাস। বয়স সাঁইত্রিশ, অবিবাহিত এবং বোধহয় বিবাহ করবে না। বছর পনেরো আগে একটি মেয়েকে মনে মনে প্রেম দেওয়া এবং মেয়েটির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর চাকরির দরখাস্ত এবং ইন্টারভ্যু দেওয়া—এই দুটি কাজ ছাড়া এ পর্যন্ত উদ্যোগী হয়ে সে আর কিছু করেনি।

সমাধানের দুটি উপায় অর্থাৎ আত্মহত্যা নয়তো কবুল। এর প্রত্যেকটিই অনিল যাচাই করল অফিস ছুটির পর গড়ের মাঠের ঘাসে চিত হয়ে শুয়ে। প্রথমে চিন্তা করল আত্মহত্যাপ্রসঙ্গ—যদি মরে যাই তাহলে কেউ কি কোনভাবে উপকৃত হবে? লোকটি কি বেঁচে উঠবে? তার পরিবারবর্গ, নিশ্চয়ই বৌ-ছেলেমেয়ে আছে, তারা কি উপকৃত হবে? হওয়ার কোনো কারণ অনিল খুঁজে পেল না। বরং দ্বিতীয় উপায়টাই ভাল ঠেকল তার কাছে। কবুল করলে পাষাণভারটা মন থেকে নেমে যাবে, যা শাস্তি দেবে তাইতে প্রায়শ্চিত্তও হয়ে যাবে।

সন্ধ্যা উতরে রাত অনেক এগিয়ে গেছে। অনিল দুর্ঘটনার স্থানটিতে হাজির হল। ভেবেছিল রাস্তায় থকথকে রক্ত দেখবে। দেখল কিছুই নেই—শুক্‌নো খটখটে। ফুটপাথের কলমসারাইওয়ালাকে সে জিজ্ঞাসা করল "সকালে এখানে একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল না?"

"কখন?"

"এই দশটা নাগাদ।"

"বাস-চাপা?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। কি হল লোকটার?"

"সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল। অ্যাম্বুলেন্স এল, পুলিস এল। ড্রাইভারটাকে পাবলিক খুব মারল সেও হাসপাতালে গেল।"

অনিলের আর শোনার স্পৃহা রইল না। অপরাধের বোঝা আরো বাড়াল বাসের ড্রাইভারটা। বেচারার মার খাওয়ার, কতটা খেয়েছে কে জানে, মূল কারণ কেউ না জানলে কি হবে, তাতে পাষাণভার যে আরো বেড়ে গেল, অনিল ক্রমশ অনুভব করছে।

"পুলিস কি করল ?"

"কি আর করবে। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করল, আমাকেও। বললুম, চলন্ত ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গেল, বাসটা আসছিল, ব্রেককষার আগেই চাপা গেল।"

"আপনি ওকে ট্রাম থেকে নামতে দেখেছিলেন ?"

"আরে মশাই অতশত···" কথা শেষ না করে কলমসারাইওয়ালা আগন্তুক খদ্দেরে মন দিল।

অনিল ভাবল, একটি নিহত ও একটি আহত হওয়ার পিছনে আমারই অবিমৃষ্যকারিতা রয়েছে। এর জন্য শাস্তি না নিলে সারাজীবনই দগ্ধে মরতে হবে। হয়তো কবুল করলে, সকাল দশটার আগে মনের যে ওজন ছিল তা ফিরে পাওয়া যাবে। সুতরাং এখুনি থানায় যাওয়া দরকার।

থানায় ঢুকেই সামনের টেবিলে মোটা একটা খাতা নিয়ে যে লোকটি বসে অনিল তাকেই জিজ্ঞাসা করল, "সকালে ধর্মতলার মোড়ে যে লোকটি বাস-চাপা পড়েছে সে কি মারা গেছে ?"

"কেন ?"

"আমি তার ঠিকানাটা চাই।"

"কেন ?"

"দরকার, মানে তার বাড়িতে যেতে চাই। কিছু বলার আছে।"

"তাহলে বাড়ির ঠিকানা কেন, স্বর্গের ঠিকানা দিতে হয়।"

"মারা গেছেন!" অনিল ব্যাপারটা পাকাপোক্তভাবে জেনে বিমর্ষকণ্ঠে বিড়বিড়িয়ে বলল, "ইস, আমার জন্যই মারা গেলেন!"

শোনামাত্র পুলিসটি লাফিয়ে উঠে তার বড়বাবুর ঘরে অনিলকে নিয়ে গেল। "স্যার, আজ সকালের অ্যাক্সিডেন্টটার জন্য ইনিই দায়ী।"

"কোনটে ?"

"বাসচাপার-টা।" চেয়ারটায় বসা উচিত হবে কিনা ঠিক করতে না পেরে অনিল দাঁড়িয়েই বলল, "ওঁকে ট্রাম থেকে নামার জন্য আমি তাড়া দিতেই ব্যস্ত হয়ে নামতে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটল। যদি তাড়া না দিতুম তাহলে উনি নামতেন না, মারাও যেতেন না।"

বড়বাবু কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে খুব বিরক্ত হয়েই বললেন, "এই আপনাদের দোষ। একটুও ধৈর্য ধরতে পারেন না। কেন, তাড়া দেবার কি ছিল? যদি এক মিনিট কি পাঁচ মিনিটও দেরি হয় তাতেই বা কি এমন ক্ষতি হত? একটা লোকের প্রাণ তাহলে বাঁচত। যান, আর কখনো এমন করবেন না। ধৈর্য ধরতে শিখুন।"

"কিন্তু স্যার, আমি এজন্য শাস্তি নিতে প্রস্তুত। আপনি আমাকে জেলে দিন।"

"আমি কি জেল দেবার মালিক? হাকিম দেবে। সেজন্য মামলা তৈরি করতে হবে, সাক্ষী-সাবুদ-প্রমাণ লাগবে, সে অনেক হাঙ্গামা ঝামেলা। বরং ওই যা বললুম, এবার থেকে ধৈর্য ধরে চলতে শিখুন। ভবিষ্যতে আর যেন কেউ আপনার জন্যে না মরে, কেমন?"

অনিল বুঝল এ লোকটিকে ব্যাপারটির গুরুত্ব ঠিক বোঝানো যাবে না। হয় এ ফাঁকিবাজ, নয়তো তাকে বিকৃতমস্তিষ্ক ঠাউরেছে। তার পাষাণভার হালকা করতে এরা কোন সাহায্যই করবে না। অনিল ভেবে দেখল, বরং মৃত লোকটির বাড়িতে গিয়ে তার ছেলে-বৌ বা নিকটস্থ আত্মীয়দের কাছে কবুল করাই ভালো। তারা উত্তেজিত হয়ে নিশ্চয়ই শাস্তির ব্যবস্থা করবে। মৃতের ঠিকানা চাইতেই পাওয়া গেল, অবশ্য অনিলের ঠিকানা এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্যও থানা লিখে রাখল।

হাঁটতে হাঁটতে অনিল ভাবল, বোধহয় বাড়াবাড়ি হচ্ছে। নামতে বললেই অমন বিপজ্জনকভাবে কি কেউ নামে? নিশ্চয় লোকটিরও দোষ ছিল। আমি শুধু নিমিত্তের ভাগী মাত্র। অন্য লোক হলে কি বলামাত্র নামত? নিশ্চয় না। অনিল নিজে যে নামত না, তাতে সে নিশ্চিত। এখন তার প্রধান ভাবনা—কেন যাচ্ছি এবং না গেলেই বা কী হয়?

অনিল তখন একটা সিনেমা-বাড়ির সামনে এসে পড়েছে। সস্তার টিকিট পাওয়া যাচ্ছে দেখে, চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেতে ঢুকে পড়ল। ছবিতে একটা ব্যাপারে তার মজা লাগল, একই গায়ক তিনজনের বকলমে গান গাইছে। অন্তত তিনজন গায়ককে নিযুক্ত করা উচিত, এইটাই তার মনে হলো।

ছবি দেখে বেরিয়ে মিনিট দশেক হাঁটার পর তার মনে হলো মৃতলোকটির বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে। পাষাণভারটা খুব বেশি আর ঠেকছে না, বোধহয় ছবি দেখার ফলেই নেমে গেছে। ভাবল, তবু এত কাছে যখন এসে গেছি বাড়িটার সামনে দিয়ে একবার ঘুরে যাই। আবার ভাবল, না গেলেই বা কি হয়? এই ধরনের টানা-পোড়েন মিনিট দুয়েক তার মধ্যে চলল। শেষে ঠিক করলো ব্যাপারটা আজকেই চুকিয়ে দেওয়া ভালো। পরে ঘটনাটা মনে পড়বেই তখন দগ্ধে মরতে হবে। বরং কৃতকর্মের ফলাফলটা চাক্ষুষ দেখে

রাখলে দণ্ডখানির মাত্রা ঠিক থাকবে। হয়তো লোকটির এমন কেউ নেই যে বিপন্ন হয়ে পড়বে, হয়তো ভীষণ একটা পাজী লোক যার মৃত্যুতে অন্যে উপকৃত হলো, এসব তথ্য জানা থাকলে অনুতাপ নাও হতে পারে।

এই ধরনের যুক্তির বশবর্তী হয়ে অনিল মৃতলোকটির বাড়ির সামনে উপস্থিত হলো। কিছু লোক রকে গম্ভীরমুখে বসে। অনিল তাদের কাছে গিয়ে বলল, "এখনো আসেনি ?"

"না, মর্গ থেকে ছাড়তে দেরি করছে।" একজন বলল। আর-একজন বলল, "দেরি তো হবেই। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই মনে হয় এসে পড়বে।"

ভিতর থেকে ক্ষীণ কান্নার আওয়াজ আসছে। কণ্ঠস্বর যথোচিত বিষণ্ণ ও বিস্মিত করে অনিল বলল, "ইস, জলজ্যান্ত মানুষটা ! আজ সকালেও দেখা হলো অফিস যাবার পথে, ব্যাপারটা ঘটার প্রায় পাঁচমিনিট আগেই।"

"নিয়তি আর কাকে বলে। কাল রাতেই আমায় বলল, দাদা গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধার দাও। বললুম, আজ হাতে নেই কাল নিও। প্রায়ই নেয়, ঠিক শোধও দেয়। বড় সৎলোক ছিল। প্রায় কুড়ি বছর ধরে দেখছি তো। আটটা ছেলেমেয়ের সংসার, কুলোয় তো আর না। আজ সেই টাকাটাই দিলুম ওর সৎকারের জন্য।"

কেউ মাথা হেঁট করল, কেউ চুক চুক শব্দ। অনিলের মনে হলো এরা পাড়ার লোক।

"তবু কিন্তু বুদ্ধি ছিল, ইনসিওরের প্রিমিয়ামটা ঠিক দিত ! বলত, যদি মরে যাই ছেলেমেয়েগুলো তো তবু কিছু টাকা পাবে। টো টো করে ব্যাগ হাতে ঘুরি, কখন রাস্তায় মরব তার ঠিক কি। আর দেখ, সেই রাস্তাতেই মরল।"

একজন ফিসফিস করে বলল, "ইদানীং তো সংসার আর চলছে না। ইনসিওরের টাকাটা পেলে তবু কিছু কাল চলে যাবে।"

"বৌটাও বেঁচে গেল। বাচ্চা হয়ে হয়ে শরীরের তো আর কিছু নেই !"

সবাই দীর্ঘশ্বাস ফেলার জন্য ঘাড় নামিয়েছে, অনিল সেই ফাঁকে হনহনিয়ে স্থান ত্যাগ করল। পরদিন সে অফিস যেতে ট্রামেই উঠল। ধর্মতলার মোড়ের কাছে ট্রামটা আসতেই দরজায় এসে দাঁড়াল। এক ছোকরা নামবার জন্য ঠেলেঠুলে এগোচ্ছে, বিরক্ত হয়ে অনিলকে বলল, "হয় নামুন, না হয় পথ দিন। এখানে পথ জুড়ে রয়েছেন কেন ?"

অনিল একটুও নড়ল না। ছোকরা রেগে উঠল।

"আরে মশাই, নামুন না।" ছোকরা অনিলকে বেশ জোরেই ঠেলা দিল। তাতে অনিল রেগে বলল, "কেন, এটা কি ট্রাম স্টপ ? নামি আর গাড়ি চাপা যাই।"

ছোকরা তখন অনিলের পা মাড়িয়ে নামতে গেল। ধাক্কা দিল অনিল। এতে ছোকরাটি ঘুষি মারল অনিলকে। ট্রাম ততক্ষণে ধর্মতলার মোড় পার হয়ে স্টপে দাঁড়িয়েছে। ভিড় জমে গেল। দোষটা কার, এই নিয়ে তর্ক শুরু হলো।

"কালকেই এখানে একজন ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে বাসচাপা পড়ে মরেছে। আমি যে ওকে নামতে দিইনি সেটা কি খুব অন্যায় করেছি?" অনিল গলা চড়িয়ে বলল।

"আমি যদি চাপা যাই তো তোমার কি?" ছোকরাও গলা চড়াল।

"আপনি মরলে আমি কি দায়ী হতাম না?"

"কেন হবেন?"

"আপনার মৃত্যু হতে পারে জেনেও বাধা দিইনি বলে।"

জনতা অনিলকে তারিফ করে নিশ্চয় নিশ্চয় বলে সমর্থন করতেই ছোকরা থতমত খেল। "তা কেন, আপনি কেন দায়ী হবেন?" এই বলতে বলতে হাঁটা শুরু করছিল, অনিল হাত চেপে ধরল।

"জবাব দিন। আপনার যদি পাঁচটি ছেলেমেয়ে থাকে, আপনার রোজগারের উপরই যদি ভরসা করে থাকে সংসার, তাহলে আমি কি অপরাধী হতাম না?"

ছোকরা অধৈর্য হয়ে বলল, "না হতেন না, কারণ আমার বিয়েই হয়নি। কেউ আমার রোজগারের ভরসায়ও নেই। তা ছাড়া ওরকম ভাবে কোন লোক বলামাত্র ট্রাম থেকে নামতে পারে না যদি না আত্মহত্যার মতলব থাকে।"

জনতা সায় দিয়ে মাথা নেড়ে যে যার কাজে চলে গেল। তখন অনিল অফিস যেতে যেতে বোধ করল পাষাণভারটা একদমই নেই। তার মনে হলো এজন্য ছোকরাটিকে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত। তবে এটাও ঠিক, আমি মরলে ছোকরা সেটা আত্মহত্যা বলে নিশ্চয় চালাবে, তাহলে সেটা খুবই অন্যায় হবে।

কালশিট

গুরুদাস ঘোষের টেবিলে বেয়ারা যখন খামটা রেখে গেল, তখন সে পে-শীটের উপর হুমড়ি খেয়ে প্রায় সাড়ে তিনশো লোকের বেতনের হিসাব কষায় ব্যস্ত। এক সময় খামটায় চোখ পড়তে, অবাক হয়ে সে ভাবল, আমাকে আবার কে লিখল। অফিসের ঠিকানায় ব্যক্তিগত চিঠি তার সাত বছরের চাকরিতে এই প্রথম।

খাম ছিঁড়ে এক চিলতে কাগজ পেল গুরুদাস। তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—"যতবার তোমার দিকে তাকাই, কেন জানি, তোমাকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হয়। মাঝে মাঝে যখন অন্যমনস্ক হয়ে জানলার বাইরে তাকাও তখন কেমন একটা চাপা দুঃখ তোমার চাহনিতে ফুটে ওঠে। তাই দেখে আমার মন বিষণ্ণতায় ভরে যায়। বোধহয় তোমার মত আমারও কোন দুঃখ আছে। তাই কি তোমায় জানতে আমার এত ইচ্ছে করে?" লেখার নিচে স্বাক্ষর, ঠিকানা বা তারিখ নেই।

গুরুদাস সুদক্ষ কর্মঠ করণিক। ওর কাজে ও ব্যবহারে কর্তৃপক্ষ থেকে দারোয়ান পর্যন্ত সবাই সন্তুষ্ট। দিনে পাঁচটি সিগারেট খায়, রাত্রে ছাদে কুড়িটি ডন ও পঞ্চাশটি বৈঠক দেয়। ট্রামে সেকেণ্ড ক্লাসে ছাড়া ওঠে না, এক বছর আগে বাবা-মায়ের মনোনীত মেয়েটিকে বিয়ে করেছে। নেতাজীর প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে প্রগাঢ় আশাবাদী। সুতরাং চিঠিটিকে সে ক্ষণিকের জন্য ঝাপসা দেখবে এবং চারপাশের চাপা গুঞ্জন, জমাট একটা বিস্ময়ধ্বনির মত আঘাত করে তার মাথার মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, এ কথা বলাই বাহুল্য। সামনের তেত্রিশজন কেরানী, বেয়ারা ও আটজন অফিসারের দিকে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে গুরুদাস একবার থরথরিয়ে কেঁপে নিজেকে বলল, 'কেউ পেছনে লেগেছে আর কি! নয়তো আমাকে লেখা কেন?'

অতঃপর গুরুদাস ভাবল, মেয়েলি হাতে লেখা এই চিঠিটি অবশ্যই প্রেমপত্র এবং খামটা ভুল করে তার কাছে এসেছে। কিন্তু ঠিকানায় ইংরাজীতে স্পষ্ট তারই নাম। জি. পি. ও. থেকে পোস্ট করা। সেকশানের নামেও কোন ভুল নেই। তখন ভাবল, নামের আদ্যক্ষর 'জি' দিয়ে এমন কেউ মেটাল সেকশানে

আছে কিনা। হয়তো তার নাম লিখতে ভুল করে গুরুদাসের নাম লিখে ফেলেছে। মনে করে দেখল একমাত্র জ্ঞান মুখুজ্যে ছাড়া আর কেউ নেই। কিন্তু তিনি দেড় বছর পরই রিটায়ার করবেন। জ্ঞানবাবুর চাপা দুঃখ জানার জন্য উৎসুক কোন স্ত্রীলোক আছে, গুরুদাস কোনক্রমেই তা বিশ্বাস করতে পারল না। এরপর সে তার সেকশানে 'ঘোষ' পদবীযুক্ত মাত্র একজনকেই খুঁজে পেল। প্রদীপ, যার কাছে এক গ্লাস জল চাইলে দশ মিনিটের এবং সিগারেট আনতে দিলে পনেরো মিনিটের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। প্রদীপের ভিতরে নিঃসঙ্গতা বলে যদি কিছু থাকে, গুরুদাস ভেবে দেখল, তাহলে চাঁদেও জীবন আছে।

এটা আমাকেই লেখা এবং এখানকারই কোন মেয়ে আমাকে নাচাবার জন্য লিখেছে, গুরুদাস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে, চটে উঠে কিছুক্ষণ কাজ বন্ধ করে রইল। সেই সময় তার মনে একটি প্রতিজ্ঞা খুবই ধারালো হতে হতে তাকে শেষ পর্যন্ত বিঁধে ফেলল। সে ঠিক করল—দুষ্কৃতকারীকে বার করবে এবং শাস্তি দেবে।

এই উদ্দেশ্যে প্রথমে সে হাতের লেখাটিকে মন দিয়ে নিরীক্ষণ করল। তেত্রিশ জন কেরানীর মধ্যে এগারোজন মেয়ে। এই এগারোজনের কেউ বা কয়েকজন মিলেই যে কাজটা করেছে, গুরুদাসের তাতে কোন সন্দেহ নেই। এগারোজন বসেছে ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে। সে একে একে প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে ছয়জনকে খারিজ করে দিল সঙ্গে সঙ্গে। এদের দুজনের বিয়ে হয়েছে গত চার মাসের মধ্যে। একজনের স্বামী গুরুদাসের পিছনেই বসে। নিঃসঙ্গতা বা চাপা দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর ওদের কারুরই নেই। আর একজন প্রতিদিনই স্বামী পুত্র-কন্যা বাস কণ্ডাক্টর গৃহশিক্ষক পুরোহিত বড়বাবু ঠিকেঝি এবং গবরমেন্টের কাজের বিভিন্ন গলদ ও ফাঁকির তালিকা পেশ করাতে এত আনন্দ পায় যে, গুরুদাস ভেবে পেল না চাপা দুঃখে বা নিঃসঙ্গতায় এই মহিলা আদৌ পীড়িত হবার যোগ্য কিনা। আর একজন চারতলার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড সেকশানের লম্বা ঝুলফিওলা কৃশকায় এক যুবকের স্মার্ট চলনে বলনে সম্প্রতি বুঁদ হয়ে রয়েছে। দুজনে ছুটির পর গড়ের মাঠে হাওয়া খায়। একেও সে সন্দেহ থেকে বাদ দিয়েছে। আর দুজনের মধ্যে একজন চতুর্থবার অন্তঃসত্ত্বা (সাত মাস) সুতরাং গুরুদাসের নিঃসঙ্গতা নিয়ে এর মন কেমন করার উপায় নেই। অন্যজন পাশের টেবিলেই। চর্বির চাপে পিঠের কাছে ব্লাউজটা বেলুনের মত ফুলো। বছর দুয়েক আগে গুরুদাস ওকে নিয়মিত ব্যায়াম করার পরামর্শ দিয়েছিল। তারপর থেকে বাক্যালাপ বন্ধ। তবে মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত প্রয়োজনীয় বাক্য বিনিময় ঘটে, রুক্ষস্বরে।

বাকি পাঁচজন সম্পর্কে পরে তদন্ত করবে ঠিক করে খামটি ড্রয়ারে রেখে দিয়ে

গুরুদাস হাতের কাজ সারায় নিজেকে নিযুক্ত করল। ছুটির পর বাড়ি ফেরার জন্য বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকার কালে ওর মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। ওই পাঁচজনের বাংলা হাতের লেখা পরখ করে দেখলে কেমন হয়। বিশেষ করে নিঃসঙ্গতা আর চাপা দুঃখ এই শব্দগুলোকে চিঠির সঙ্গে মিলিয়ে নিলেই বোঝা যাবে। হাতের লেখার টান-টোনগুলো তো আর চেপে রাখা যাবে না।

বাড়ি ফিরে গুরুদাস স্নান করল, তারপর কয়লার দোকানে গিয়ে এক মণ কয়লা পৌঁছে দিয়ে আসতে বলে লাইব্রেরীতে গিয়ে বই পালটাল। একটা মোটা ঐতিহাসিক উপন্যাস পেয়ে সে খুবই খুশি হয়ে রেস্টুরেণ্টে এককাপ চা খেল, ফুটপাথের দোকানীর কাছে কাপ-ডিশ এবং সায়া দর করল, সিনেমা-বাড়ির বাইরে টাঙানো ছবিগুলো খুঁটিয়ে দেখে, বাবার জন্য পাঁউরুটি ও বৌয়ের জন্য দুটি মিঠে পান কিনে লণ্ড্রী থেকে কাচা ধুতি-পাঞ্জাবি নিয়ে বাড়ি ফিরেই ছাদে উঠে প্রাত্যহিক ব্যায়াম সেরে সে উপন্যাস পড়তে শুরু করল। এই সময় যখনই ওর স্ত্রী কোন কাজে ঘরে আসছিল, গুরুদাস বই থেকে আড়চোখে তাকাল ঈষৎ মুগ্ধ চাহনিতে। সবাই বলে, বৌ খুব সুন্দরী। গুরুদাস তাই স্ত্রীকে খুব ভালবাসে। কাল রাতেও গা ছুঁয়ে দিব্য করেছে ও মরে গেলে আবার সে বিয়ে করবে না। স্ত্রীর কাছে কিছুই সে গোপন করে না কিন্তু আজ অফিসে পাওয়া চিঠিটির কথা বলতে পারল না। ওর মনে হল এটা না বললে দোষের কিছু নেই। বললে অহেতুক সন্দেহের বীজ বপন করা হবে।

রাত্রির দ্বিতীয় যামে গুরুদাস তার স্ত্রীকে বিশ্রাম দিয়ে গভীর নিদ্রার পর ভোরে উঠে বাজার সেরে খবরের কাগজ পড়ে দাড়ি কামিয়ে ফেলল এবং ঠিক দশটায় অফিস পৌঁছল। মিনিট পনেরো পর সে অঞ্জনা আচার্যের টেবিলে গিয়ে বলল, "আমার খুড়তুতো ভাই কাল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিল। মিনিস্ট্রি অব ইনফরমেশনের চাকরি। অনেক রকমের প্রশ্ন দিয়েছিল তার মধ্যে একটা ছিল বানান শুদ্ধ করে লেখা। প্রশ্নটা টুকে এনেছি। গুরুদাস একটা কাগজ রাখল অঞ্জনার সামনে। পারেন এটাকে শুদ্ধ করে লিখে দিতে? আমি পেরেছি তবে অভিধান দেখে।" অঞ্জনার কৌতূহল-কুঞ্চিত ভ্রূ ধীরে ধীরে পূর্বের সমতায় প্রত্যাবর্তন করল চার লাইনের লেখাটি পাঠ শেষে। "এ আর এমন কি শক্ত, ক্লাস সিক্সের মেয়েও পারবে। নিঃসহায়-এ দীর্ঘ ঈ হবে না সঙ্গবিহীন-এ প্রথমটা হ্রস্ব ই, পরেরটা– "

"না না, মুখে বললে হবে না লিখে দেখান, মুখে অনেকেরই কারেক্ট হয় লিখতে গেলেই দেখা যাবে ভুল করেছে।" গুরুদাস একটা কাগজ অঞ্জনার সামনে রেখে কলম এগিয়ে ধরল। অতি অবহেলায় অঞ্জনা ঘস ঘস করে নির্ভুল বানানে লাইন চারটি লিখে দিল। গুরুদাস তারিফভরা চাহনিতে ওর দিকে তাকিয়ে

বলল, "বাঃ, প্রত্যেকটাই কারেক্ট হয়েছে! আমার এক বন্ধু খবরের কাগজের রিপোর্টার তাকেও দিয়েছিলাম এটা।"

"নিশ্চয় পারেনি।" অঞ্জনা নিশ্চিন্ত স্বরে বলল।

"না না, পেরেছে। শুধু দুঃখেতে একটা য-ফলা লাগিয়ে ফেলেছিল পরে অবশ্য নিজেই কেটে দেয়।"

গুরুদাস এর পর লক্ষ্মী বসাক কল্পনা চক্রবর্তী অরুন্ধতী চৌধুরী আর প্রীতি দাশগুপ্তকে দিয়েও লিখিয়ে নিল একই কথা বলে। নিজের চেয়ারে বসে পাঁচটি লেখার সঙ্গে আসলটির হাতের লেখা মিলিয়ে দেখতে গিয়ে সে হতভম্ব হয়ে গেল। নিঃসঙ্গতা বা চাপা দুঃখ বা ইচ্ছে ইত্যাদি শব্দগুলো পাঁচজনের লেখাতে হুবহু আসলটির ভঙ্গিতেই ফুটে রয়েছে। মনে হচ্ছে যেন একজনের হাতেই সব ক'টি লেখা। এটা কি করে সম্ভব হয়! ভেবে ভেবে কিনারা পেল না গুরুদাস। শুধু ছমছম করে উঠল একবার বুকটা আর রাগ হলো। কেউ একজন নিশ্চয় তাকে নিয়ে খেলাতে চাইছে আড়াল থেকে মজা দেখবে বলে। 'আমি কি এমনই যে এইভাবে মজা করা যায়?'—সে বারংবার নিজেকে প্রশ্ন করল।

অতঃপর গুরুদাস স্থির করল সেও পালটা খেলবে। তবে আগে খুঁজে বার করতে হবে পত্রলেখিকাটিকে। এজন্য আর একটা চিঠি পাওয়া দরকার নয়তো কোন ক্লু পাওয়া যাবে না। তাই টোপ হিসাবে সে জানলার বাইরে অন্যমনস্কের মত তাকিয়ে থাকতে শুরু করল এবং নিঃসঙ্গতা ও চাপা দুঃখ যাতে তার চাহনিতে ফুটে ওঠে সেজন্য খুবই যত্নবান হলো। এই সময় সে মনে মনে দেখত—একজন পুরুষের সঙ্গে তার স্ত্রী পালিয়ে যাচ্ছে বা রিটায়ারমেণ্টের নোটিশ টেবিলের উপর পার্সোনেল সেকশানের বেয়ারা রেখে গেল বা ঠাকুমাকে মনে করার চেষ্টা করত, যিনি কুড়ি বছর আগে বলেছিলেন—গুরুর যা মাথা, হাইকোর্টের জজ হবে।

কিন্তু দিনদশেক পর কোন চিঠি না পেয়ে গুরুদাস হাল ছেড়ে দিল। ভেবে দেখল, যদি তাকে নাচাবার উদ্দেশ্যেই কেউ লিখে থাকে তাহলে তো একটা চিঠি লিখেই বন্ধ করে দেওয়ার কথা নয়। আর যতদিন না ব্যাপারটার কোন কিনারা করতে পারছে অদ্ভুত একটা ভার তার মনের উপর চেপে থাকবেই। যদি সিরিয়াসলিই কেউ লিখে থাকে।

গুরুদাস ক্রমশ হাঁফিয়ে উঠতে শুরু করল, ব্যাপার কি, একটা লিখেই বন্ধ করে দিল কেন? অবশেষে বেপরোয়া হয়ে স্থির করল, সন্দেহভাজন পাঁচজনকে সে ঠিক ওই কথাগুলো দিয়ে ওইভাবেই নাম-ঠিকানাবিহীন চিঠি দেবে। পরদিনই বাজার থেকে ফেরার পথে পাঁচটি খাম কিনল এবং অফিসে বসে পাঁচটি চিঠি লিখে টিফিনের সময় নিজ হাতে রাস্তার ডাকবাক্সে ফেলে এল।

পরদিন সে উদ্‌গ্রীব হয়ে ক্রমাগত পাঁচজনের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে যেতে লাগল। বেয়ারা চিঠি বিলি করছে। ওই পাঁচজনের কোন চিঠি আসেনি। তাহলে কাল ডেলিভারি হবে, এই ভেবে গুরুদাস কাজে মন দিল। পরের দিন দূর থেকেই সে বেয়ারার হাতে খামগুলো চিনতে পারল। দুজন তার দিকে মুখ করে বসে বাকি তিনজনের পিঠ সে দেখতে পাচ্ছে। বেয়ারা ওদের টেবিলে খামগুলো রেখে যাচ্ছে। উত্তেজনায় গুরুদাসের মাথা ঝিমঝিম করছে, কিছুটা ঝাপসাও দেখতে শুরু করল। মাথায় জল দেবার জন্য সে প্রায় ছুটে গেল ওয়াটার কুলারের দিকে।

মেঝের দিকে তাকিয়ে সে চেয়ারে ফিরে এল এবং ভীষণ অনুতপ্ত দুটি চোখ তুলে দেখল লক্ষ্মী বসাক থমথমে মুখে চিঠিটা সামনের বিজন ঘোষের হাতে তুলে দিচ্ছে। কল্পনা চক্রবর্তী দিশাহারার মত চার ধারে তাকাচ্ছে আর ক্রমশ ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। অরুন্ধতী, প্রীতি আর অঞ্জনার পিঠগুলো কাঠের মত।

এ-টেবিল থেকে ও-টেবিল এবং পনেরো মিনিটের মধ্যেই তেত্রিশজন কেরানী, বেয়ারা ও আটজন অফিসার ধিক্‌কার দিয়ে, লজ্জা পেয়ে এবং ক্রোধে অশান্ত হয়ে অপরাধীকে খুঁজে বার করতে উদ্যোগী হলো। গুরুদাসকে তার পাশের সহকর্মী বলল, "শুনেছেন ব্যাপার? কেলেঙ্কারি, রীতিমত কেলেঙ্কারি! পাগল ছাড়া আর কেউ এ কাজ করতে পারে না।" তারপর গলা নামিয়ে বলল, "আমার মনে হয় ব্যাচিলার কোন ছোকরার কাজ, আপনি কি বলেন?"

গুরুদাস বলল, "হতে পারে। কিন্তু ম্যারেডদের মধ্যে থেকেই যে কেউ লেখেনি, তাই বা বলি কী করে?"

"ম্যারেডরা কেন লিখতে যাবে, তাদের কী প্রয়োজন? আপনিও তো ম্যারেড, তাই বলে কি এরকম কাজ আপনি করতে যাবেন না আমি করতে যাব? তাহলে বিয়ে করা কেন?"

"হয়তো মজা করার জন্য কিংবা নিঃসঙ্গ বোধ করে কেউ লিখেছে।"

"তাহলে একজনকেই লিখবে, চারজনকে সে লিখতে যাবে না।"

গুরুদাস প্রচণ্ড বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলল, "চারজন। সে কী, পাঁচজন নয়?"

"লক্ষ্মী বসাক কল্পনা চক্রবর্তী অরুন্ধতী চৌধুরী আর অঞ্জনা আচার্য এই চারজনই পেয়েছে। চারটে চিঠিই একই হাতের লেখা।"

গুরুদাসের অনিবার্যভাবেই প্রীতি দাশগুপ্তের পিঠের উপর নজর পড়ল। কুঁজো দেহটি আরো কুঁজো করে প্রীতি একমনে কাজ করছে। সরু কাঁধের উপর হাড়দুটো পেরেকের মাথার মত ঠেলে উঠেছে। ঘাড় থেকে মেরুদণ্ড বরাবর পেরেক যেন নেমে গেছে ব্লাউজের মধ্যে। কনুইয়ে পোড়া রবারের মত

চামড়া। একমুঠো খোঁপা তেকোণা গড়নের মাথাটিতে আটকানো। গুরুদাস চোখ সরিয়ে কাজে মন দেবার চেষ্টা করল।

ঘন্টাখানেক পর টেবিলের সামনে তিনজন পুরুষ সহকর্মী এসে দাঁড়াল। "গুরুদাসবাবু, এইটে কপি করে দিন। আমরা একটা কমিটি করেছি কালপ্রিটকে খুঁজে বার করার জন্যে। সকলকে দিয়েই কপি করাচ্ছি, বেয়ারা বা অফিসাররাও বাদ যাবে না। আমরা হাতের লেখা মিলিয়ে দেখব, দরকার হলে এক্সপার্টের কাছে যাব। এ রকম পারভারশান কোনক্রমেই টলারেট করা যায় না। আমাদের সকলেরই লজ্জার কারণ হয়েছে ব্যাপারটা, তাই আমরা সন্দেহের মধ্যে থাকতে চাই না।"

গুরুদাস বিনা বাক্যব্যয়ে চিঠিটি দ্রুত কপি করে দিল। একটুও হাত কাঁপল না। ছুটি হবার আধঘন্টা আগে চাপা উত্তেজনা টেবিলে-টেবিলে ছড়িয়ে পড়ল। অনেকে দোতলায় সহকারী জেনারেল ম্যানেজারের ঘরের দিকে ছুটে গেল। ওই ঘরে বসেই হাতের লেখা মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। অবশেষে গুরুদাসের সহকর্মীটি হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এসে চাপাস্বরে বলল, "পাওয়া গেছে, কালপ্রিট ধরা পড়েছে। হুবহু মিলে গেছে হাতের লেখা। এইবার ওরা আসবে!"

গুরুদাস চেয়ারে সিধে হয়ে বসল। টেবিলের ফাইলগুলো গুছিয়ে জলের গ্লাস পিনকুশন এবং লাল-নীল পেন্সিলটা ড্রয়ারে রেখে রুমালে মুখ মুছে প্রস্তুত হলো। এখন আর তার ভিতরে কোন কম্পন নেই, পাথরের মত জমাট হয়ে গেছে। সরু কাঁধ থেকে ঠেলে-ওঠা দুটো হাড়ের মাঝখানে দৃষ্টি নিবন্ধ করে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

কমিটির তিনজন লোককে দেখামাত্র দপ করে স্তব্ধ হয়ে গেল বিরাট ঘরটা। তারা একবার সারা ঘরে চোখ বুলিয়ে গম্ভীর মুখে এগোল। গুরুদাসের টেবিল অতিক্রম করে তারা লঘুপায়ে জ্ঞান মুখুজ্যের সামনে এসে দাঁড়াল। চাপা বিস্ময়ধ্বনি বৃদ্ধের মুখ থেকে বেরোন মাত্র গুরুদাসের সহকর্মী নিচুগলায় বলল, "জ্ঞানবাবুকে ম্যারেড বলা উচিত হবে না, পনেরো বছর আগে ওর বৌ মরে গেছে। বেঁচে থাকলে, এ ধরনের কাজ নিশ্চয় উনি করতেন না।"

কমিটির লোকেরা ফিসফিস করে জ্ঞানবাবুকে কিছু বলল, তারপর বিমূঢ় বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে তারা দোতলায় উঠে গেল। সহকর্মীটি গুরুদাসকে বলল, "লাইফের এই পিরিয়াডটাতেই অনেকে সামলাতে পারে না। জ্ঞানবাবু ছাড়া নাকি আর কারোরই হাতের লেখার সঙ্গে মেলেনি!" গুরুদাস অস্ফুটে বলল, "কিন্তু উনি কি খুব নিঃসঙ্গ?"

ছুটির পর গুরুদাস ট্রামস্টপে দাঁড়িয়ে দেখল, প্রীতি দাশগুপ্ত কুঁজো হয়ে সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। তাকে দেখে গভীর বিষণ্ণ চাহনি মেলে একবার শুধু হাসল। গুরুদাস তখন নিজেকে বলল, 'আমরা কেউ একজন ঠকলাম।'

"কি ?"

উপরওয়ালাকে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে বড়বাবু ফোনটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন। পরিমল চট্টোপাধ্যায়—সাকুল্যে চারশো আঠাশ টাকার কেরানী, অবিবাহিত - পকেট থেকে মানিব্যাগ এবং তার থেকে একটি ফটো বার করল।

"দেখুন তো পছন্দ হয় কিনা।" পরিমল ফটোটি টেবিলের উপর রাখল। বড়বাবু চশমার প্লাস-পাওয়ারের অংশ দিয়ে সেটিকে কয়েক লহমা দেখে মাইনাস মারফত দণ্ডায়মান পরিমলকে বিস্মিত চোখ দেখালেন।

"পাত্রী," আনুগত্য দেখাবার জন্য চাঁদিতে হাত বোলাতে বোলাতে "মা কদিন থেকেই রোজ", একটু তোতলাবার চেষ্টা করে, "কি বলব ভেবে পাচ্ছি না—" পরিমল বলল।

"আমি পছন্দ করব কেন ?"

"আমাদের পারিবারিক অবস্থা তো জানেনই। কি ধরনের মেয়ে ঠিক মানিয়ে চলতে পারবে, আপনি তো সাত বছর ধরে আমায় দেখছেন, ঠিক আমার মত সিরিয়াস টেমপারামেণ্টের ছেলের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারবে কিনা, ফটো দেখেই আপনি তা আঁচ করতে পারবেন—আচ্ছা, ওরা বলেছে সতেরো, উনিশও যদি ধরা যায়, তাহলেও আমার সঙ্গে ডিফারেন্স হচ্ছে বারো বছরের। একটু বেশি হচ্ছে না ?"

"ভালই তো। আজকালকার সম-বয়সের বিয়ে যত হচ্ছে খোঁজ নিয়ে দেখো তো তারা হ্যাপি কিনা। আমার সঙ্গে ওয়াইফের বয়সের ডিফারেন্স কত বলতো ?"

বড়বাবু কতখানি 'হ্যাপি' এইবার তা পরিমলকে বলতে হবে। সাত বছর ধরে ওকে সুখী করতে চাইছে পরিমল, এখন সেই মুহূর্তে সে এসেছে। ব্যবধানটা কত বছরের করা যায় !

"পনেরো।"

বড়বাবু মাথা নাড়লেন। তাইতে ঝিকমিক করে উঠল প্লাস-মাইনাস টেবিল-ল্যাম্পের আলোয়। পরিমল ঘাবড়াল। বেশি বলা হলো কি ?

"শী ওয়াজ ওনলি নাইন হোয়েন আই ম্যারেড হার, তখন আমার উনত্রিশ এখন ফিফটি-ফাইভ !"

দ্রুত অঙ্ক কষে পরিমল জেনে ফেলল বড়বাবুর বৌয়ের এখন পঁয়ত্রিশ।

"তাই বলুন, এখনো এ রকম ইয়ং কি করে যে রয়েছেন এইবার বুঝতে পারছি।"

"বয়সের ডিফারেন্স থাকা ভাল। দেবে-টেবে কেমন ?"

"মোটামুটি। আট ভরি সোনা, হাজার দুই নগদ, এছাড়া যা-যা দেয়—খাট-বিছানা, ঘড়ি, আংটি, আলমারি-রেডিও, বাপ নেই, চার দাদা চাকরি করে।"

"লেখাপড়া ?"

"স্কুল ফাইনাল দেবে, গানও শেখে।"

"তা শিখুক, আমার ওয়াইফও গান জানত। গেরস্ত ঘরে দরকার খাটিয়ে মেয়ের, বেশি লেখাপড়া দিয়ে কি হবে, সংসারে অশান্তি হয় কি করে জান ? বৌকে যদি লাই দিয়ে মাথায় তোল !"

"না-না—তা কেন দেব। আমার টেমপারামেণ্ট জানেনই তো। তাহলে বলছেন, এখানেই রাজি হয়ে যাই।"

"সেকি, আমি আবার বললুম কখন!" বড়বাবু ফাইলের উপর থেকে ফটোটিকে দ্রুত টেবিলে নামিয়ে দিলেন। "যখন খুঁত বেরোবে তখন তো বলবে, এই ব্যাটাই বলেছিল বিয়ে করতে। না বাপু। তোমাকে তো অফিসে শুধু ক'টা ঘণ্টাই দেখি তারপর রেস খেল কি মদ খাও জানি না। মেয়েটারও মাথা খারাপ কিনা জানি না। আর শুধু ফটো দেখেই বলে দেব বিয়ে কর! স্টেটমেণ্ট অব অ্যাকাউণ্টসে যোগ না মিলিয়ে কখনো আমাকে সই করতে দেখেছ ?"

বড়বাবুর হঠাৎ বিগড়ে যাওয়ার কারণ এখনই সন্ধান করা উচিত হবে কিনা ভাবতে ভাবতে পরিমল—"আজ্ঞে তা দেখিনি", ওর পূর্ণ সম্মতি বিনা বিয়ে করা উচিত হবে কিনা ভাবতে ভাবতে "ঠিকই বলেছেন", ওর সঙ্গে কিছুতেই তর্ক করা উচিত নয় ভেবে বলল, "বিয়ের আগে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করানোর কথা তো বলা যায় না।"

"করলেও, বাঁজা কিনা তাতো আর বিয়ে না করে জানতে পারছ না।"

বড়বাবুর স্বরে তিক্ত করুণ অসহায় ধ্বনি-সমবায় পরিমলের কান এড়াল না। এইবার তার মনে পড়ল, বড়বাবু নিঃসন্তান। হাতে গলায় নানাবিধ মাদুলি তার আকাঙ্ক্ষাকে বিজ্ঞাপিত করছে।

"বিয়ে করবে তুমি আর আমি করব পছন্দ! আচ্ছা লোক তো হে তুমি।" এই বলে বড়বাবু গ্লাসের মধ্য নিয়ে ফাইলে ডুব দিলেন।

নিজের চেয়ারে বসে পরিমল ভেবে ঠিক করল, সুখীজন কাউকে ধরে এবার জিজ্ঞাসা করবে। সকলকে লক্ষ্য করতে করতে সে মাঝবয়সী নন্দিতাদিকে বেছে নিল। কৌটোয় টিফিন আনে অথচ চাইলে দেয়, আলজিভ দেখিয়ে হাসে কিন্তু শব্দ হয় না, মিছিলে হাঁটে তবু হরতালে বিরক্ত হয়, যদিও ক্যাজুয়াল লিভ খরচ করে না, তাহলেও বড়বাবুর ধমকে চোখ ছলছলায়, যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষ, কেননা বাপের বাড়ি গরীব, অতএব পরিমল মেয়েদের ক্যান্টিনের দরজা থেকে ডাকল, "নন্দিতাদি! একবারটি শুনুন।"

আলু ছেঁচকির লঙকাটা হাতে নিয়ে নন্দিতাদি বেরিয়ে এল।

"একটা জিনিস দেখাব, আপনার মতামত চাই।"

ফটোটি দেখামাত্র নন্দিতাদি বলল, "কার, আপনার জন্য ?"

বলার ভঙ্গিতে পরিমল ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। ব্যক্তিত্ব সংগ্রহের উপায় হিসাবে কণ্ঠস্বর মোটা করে বলল, "আমার এক বন্ধুর জন্য!"

"অ!"

কিছুক্ষণ দেখে নন্দিতাদি বলল, "এমন আর কি দেখতে, রঙ তো বেশ ময়লাই, বড্ড রোগা, মুখটি আর একটু ছোট হলে ভাল হত, বয়স কত ?"

"সতেরো, স্কুল ফাইন্যাল দেবে।"

"বন্ধুটি করে কি ?"

"আমার মতই কেরানী।"

"আচ্ছা, আপনারা চাকরে মেয়ে বিয়ে করেন না কেন ? আজকাল দুজনে রোজগার না করলে কি চলে ? আমরা চার বোন, চারজনই চাকরি করি। বন্ধুটির জাত কি ?"

"তিলি।"

"আজকাল অবশ্য জাতটাত অত আর কেউ মানে না। দেখুন না বন্ধুটি চাকরে মেয়ে বিয়ে করে যদি। এরা দেবে-থোবে কেমন ?"

"পনেরো ভরি সোনা, নগদ দু হাজার—"

"খাট-বিছানা, ঘড়ি, আংটি, রেডিও, আলমারি।"

পরিমল ঘাড় নাড়ল। নন্দিতা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, "বন্ধুর ঠিকানাটি দিন।"

"সেকি, কেন ?"

"আরে দূর, আপনার বন্ধুর বয়স তিরিশ-বত্রিশ তো হবেই, এইটুকু বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে ঘর করবে কে! দাঁড়ান ডায়রিটা আনি।"

নন্দিতা ক্যান্টিন ঘরের ভিতর ছুটে গেল। পরিমল বুঝল, সে ফাঁপরের মধ্যে পড়ে গিয়েছে। এখন সত্যি বলা ছাড়া উপায় নেই।

"বলুন।"

কলমের ক্যাপ খুলতে খুলতে নন্দিতা তাকাল, "নাম কি ?"

"পরিমল চাটুজ্জে।" পরিমল বলল।

"ঠাট্টা হচ্ছে।"

"সত্যি বলছি, আমার জন্যই।"

"আহাহা।"

"বিশ্বাস করুন, সত্যিই।"

নন্দিতা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বিশ্বাস করল, কলমে ক্যাপ লাগাল, ডায়রি বন্ধ করে বলল, "দেখুন না আমার বোনগুলোর জন্য, মেজ সেজো স্কুলে পড়ায় বি-টি, এক-একজন প্রায় হাজার পাঁচেক করে জমিয়েছে, বছর পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হলেই ভাল, দেখুন না।"

"দেখতে কেমন ?"

"আমারই মত, তবে ফিগার দুজনেরই ভাল। মেজ বেশ লম্বা, খুব ভাল রান্নাও করে। নিজের বোন বলে বলছি না খুব খাটিয়ে। পরেরটিকে ওরাই তো লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করল। আজকাল এরকম মেয়ে দেখা যায় না। আমি তো কিছুই করিনি ওদের জন্য।"

অনুশোচনায় নন্দিতাদি একটু নুয়ে পড়লেন। দেখে পরিমলের সহানুভূতি জাগল। বলল, "আপনিও তো কম করছেন না। ওদের বিয়ের জন্য চেষ্টা করছেন।"

"করছি তো ভাই, হচ্ছে কই ? মুখে সবাই সাহায্যের কথা বলে। আপনিও বলছেন, তারপর অন্যদের মতই ভুলে যাবেন।"

"না না, আপনি তো জানেন আমি সিরিয়াস টেম্পারামেণ্টের লোক। যা বলি তা করি !"

"তাহলে আমার মেজো বোনকে আপনিই নিন্ না। করুন না বিয়ে, করবেন ? আপনার এই মেয়ের থেকে অনেক অনেক ভাল হবে। স্কুলে পায় আড়াইশো, দুটো টিউশনি থেকে আরো একশো। আপনাদের দুজনের আয় তাহলে সাতশোর মত দাঁড়াবে। করবেন ?"

পরিমলের থুতনিটা একটু একটু করে ঝুলে পড়ল, এক কদম পিছিয়ে গেল, স্বরনালিতে কিছু শব্দ আটকে গেল। খাঁকারি দিয়ে বলল, "টাকাটাই তো বড় কথা নয় !"

"নয় কি বলছেন ? আমার দুধই তো মাসে লাগে পঁচাত্তর টাকার। সংসার করে দেখুন বুঝবেন, খালি খরচ আর খরচ। পাগল হয়ে যাবেন। উনি তো মাসের শেষে বলেন—" নন্দিতাদি থমকে, "যাকগে ওসব কথা," হেসে "আমার মেজো বোন খুব হিসেবী, এই ক-বছরেই পাঁচ হাজার জমিয়েছে, ফ্যাশান-ট্যাশান নেই, বাজে খরচ করে না, করতেও দেয় না। একবার দেখুন না ওকে। দেখবেন ?"

"কিন্তু আমার মা ভীষণ গোঁড়া সেকেলে। তিনি বয়স্কা মেয়ে একদম পছন্দ করেন না। আর ওঁকে দুঃখ দিতে আমি পারব না।"

"না না, তা দেবেন কেন। আসুন না আমাদের বাসায়, আলাপ করবেন বোনের সঙ্গে। বাইশের একদিনও বেশি বয়স যদি মনে হয়তো কান কেটে ফেলব।"

"কিন্তু আমার মাকে আপনি জানেন না, ঠিক ধরে ফেলবে।"

"কুষ্ঠি করিয়ে দেব। এই যে ফটো দেখালেন এর বয়স কি সতেরো? পঁচিশের একদিনও কম নয়। আপনাকে চায়ের নেমন্তন্ন করছি, কালই আসুন, বন্দিতাকেও খবর দি। দুজনে আলাপ করুন। তাতে তো আর দোষ নেই।"

চেয়ারে বসে পরিমল মুহ্যমান হয়ে পড়ল। দোষী করল নিজেকেই। কেন যে ফটোটা দেখাতে গেল। চায়ের নেমন্তন্নে যাওয়া মানেই মায়া দয়া করুণা প্রভৃতি বোধগুলোকে একটি বিয়ে-না-হওয়ার দুঃখে কাতর, সংসারে উৎসর্গীকৃত প্রাণ কুমারীর খপ্পরে তুলে দেওয়া। সে বিষণ্ণ চোখে কিংবা নন্দিতাদির নির্দেশে, উজ্জ্বল চোখে তাকাবে। মরিয়া হয়ে রবীন্দ্র-সংগীত গাইবে, দন্ত্য-স-কে মূর্ধন্য-ষ এর মত উচ্চারণ করবে, হিন্দি ফিলমের নিন্দা করবে কিংবা কিছুই না করে দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে বসে-বসে ঘামবে।

নানাবিধ ছবি মনে মনে এঁকে পরিমল জর্জর হয়ে পড়ল। চায়ের নেমন্তন্ন একটা ফাঁদ এবং একবার গেলে বেরিয়ে আসা কঠিন এটা সে বোঝে। একমাত্র নিজেকে কঠিন করে প্রত্যাখ্যান করতে পারলে রেহাই পাওয়া সম্ভব। নন্দিতাদি আমার মতই কেরানী, বড়বাবু তো আর নয়। কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। তাছাড়া একটা পাত্র যদি খুঁজে দি, তাহলেই তো ঝামেলা চুকে যায়!

পরিমল চল্লিশ বছরের আশপাশে বিবাহযোগ্য পাত্রের সন্ধানে ভাবনা করে যাচ্ছে, তখন পিওন এসে জানাল বড়বাবু ডাকছেন। পরিমল হাজির হওয়া মাত্র বললেন, "তোমার বাড়ির ঠিকানাটা দাও তো, কাল-পরশু আমার দাদা যাবে তোমার মার সঙ্গে কথা বলতে। ওর মেজো মেয়ে এবার প্রি-ইউ দেবে, আমাকে বলে রেখেছিলো পাত্রের খোঁজ পেলে জানাতে। এইমাত্র ফোনে তোমার কথা বললুম, পছন্দ হয়েছে। ঠিকানাটা দাও।"

শুনতে শুনতে পরিমলের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল, মাথায় হাতুড়ি পড়ল, টেবিলে হাত রেখে ঝুঁকে,—"কিন্তু মা যে এখানে প্রায় ঠিকই করে ফেলেছেন।"

"ওরকম ঠিক অনেক হয় ভেঙেও যায়, ওসব তোমায় ভাবতে হবে না। পাওনা-থোওনা এরা যে দেবে, দাদাও তাই দেবে। ওরও বয়স সতেরো, রঙ এর থেকেও ফরসা, আর লক্ষ্য করেছ কিনা জানি না, এ মেয়েটি একটু ট্যারা, গালে মেচেতার দাগ, আর কেমন যেন কালচারের অভাব আছে মুখে। স্বাস্থ্য দেখে তো মনে হয় খুব অভাবের মধ্যে মানুষ হয়েছে, চোখে হ্যাংলা হ্যাংলা

ভাব। এ-সব মেয়ের চরিত্র-টরিত্রও খুব সুবিধের হয় না। সব থেকে বড় কথা জান, তোমার বাবা নেই, তাই এমন একজন শ্বশুর তোমার চাই যে সেই স্থান পূরণ করবে। এইটাই হবে তোমার সেরা লাভ। দাদা পুলিস কোর্টের উকীল, কত গুণ্ডাবদমাস যে ওর হাতের মুঠোয়।"

প্লাস-মাইনাসের নিচে বড়বাবুর হাসি পরিমল সাত বছরে এই প্রথম দেখল। এবং তাইতে ওর বুক শুখিয়ে এল। বড়বাবুকে সুখী করাই ছিল উদ্দেশ্য, কিন্তু এতটা সুখী করা নয়।

"কিন্তু গুণ্ডাবদমাস তো আমার দরকার নয়। আমার দরকার—" পরিমল থেমে গিয়ে বাক্যটি বড়বাবুর বিবেচনার উপর ছেড়ে দিল।

"কে বললে দরকার নেই। আজকেই পকেটমার হয়ে পুরো মাইনে খোয়াতে পার, কালই বাড়ি লুঠ হতে পারে, পরশুই ব্ল্যাকে চাল কেনার দরকার হবে, তারপর দিন তোমার বোনের হাত ধরে রাস্তায় কেউ টানল—আর তুমি বলছ গুণ্ডাবদমাসের হেলপ দরকার নেই? একটা গুণ্ডা এসে যদি তোমার টেবিলের সামনে দাঁড়ায়, যে কেসটা ছ মাসে ডীল করতে, সেটা ক-মিনিটে করবে বলতো?"

পরিমল অনুভব করল শাঁখের করাতের নিচে পড়েছে! কিলবিলিয়ে উঠল সর্বাঙ্গ। বড়বাবু থাকতে এ অফিসে গুণ্ডার নির্দেশে দ্রুত কাজ সম্ভব, এটা কি এখন স্বীকার করা উচিত হবে? নিজেকে কি কাপুরুষ ঘোষণা করা উচিত হবে? অথচ বড়বাবু চাইছেন—"কিন্তু গুণ্ডার পক্ষে কি এখানে হামলা করা সম্ভব" এবং খুবই বিনীতভাবে, "ছ-মাস সময় তো কোনো কেসেই আমি নিইনি।" সব দিক বাঁচিয়ে পরিমল উত্তর দিল।

"জানি জানি।" বড়বাবুর তৃপ্তকণ্ঠে পরিমলকে আবার কিলবিলিয়ে দিয়ে বলল, "তাই তো তোমার নামটাই রেকমেণ্ড করলাম দাদার কাছে!"

নিজের চেয়ারে বসে চোখ বুজল পরিমল। ছোরা হাতে একটা গুণ্ডা-লোক পাশেই দাঁড়িয়ে। এই রকম একটা বোধ সর্বাঙ্গে হেঁটে বেড়ানো শুরু করতেই চোখ খুলে দেখে নন্দিতাদি আসছে।

"তাহলে কাল। একসঙ্গেই অফিস থেকে বেরোব, কেমন?"

"কিন্তু নন্দিতাদি, একটা কথা কি ভেবেছেন, যা হালচাল যেকোনো সময় যে কোনো লোকই মারা যেতে পারে? গাড়িচাপা পড়েই হোক কি গুণ্ডার ছোরায়।"

"নিশ্চয় তা তো হতেই পারে, উনিও এই একই কথা বলেন। তাইতো আমি চাকরি ছাড়িনি। কখন কি হয়ে যায় কে বলতে পারে, তখন সংসার চালাবো কি করে! তাইতো বলছি চাকরে মেয়ে বিয়ে করুন, একেবারে অথৈ জলে পড়বে না যদি—" নন্দিতাদির নিশ্চিন্ত কণ্ঠ পরিমলকে বিষণ্ণতায় ডোবাতে

ডোবাতে হঠাৎ থেমে গিয়ে, আবার, "তার জন্য ভাববেন না, আমাদের বোনে-বোনে খুব ভাব। কেউ বিপদে পড়লে সবাই বুক দিয়ে পড়বে।"

নন্দিতাদি চলে যাবার পর চেয়ারে বসে পরিমল নানান বিষয় ভাববার চেষ্টা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। পাঁচটা বাজতেই অফিস থেকে বেরিয়ে ট্রামে ওঠার চেষ্টা করতে করতে অবশেষে ট্রামে উঠল। ট্রাম থেকে নেমে মিনিট দুয়েকের পথ। কড়া নাড়তে দরজা খুলে বেরোল এক বিধবা।

"আমি তারক চ্যাটার্জি লেন থেকে আসছি, শোভনার দাদা। আপনারা ওর একটা ফটো চেয়েছিলেন, এনেছি।"

"বাইরে কেন ভেতরে আসুন।"

অন্ধকার উঠোন পেরিয়ে পরিমলকে তিনি ঘরে এনে বসালেন। একখানি শোবার ঘর আর রান্নাঘর নিয়ে সংসার।

"অফিসের বন্ধুদের দেখাবে বলেই খোকা চেয়েছে, নয়তো পিসিমার পছন্দের উপর ও কোনোদিন কথা বলেনি, বলবেও না। নিজের ভাইপো বলে বলছি না, দাদা-বৌদি গত হওয়ার পর ওকে অ্যাত্তোটুকু থেকে মানুষ করছি তো, সাত চড়ে রা কাড়ে না, একদিনের জন্যও অবাধ্য হয়নি। আমার বয়স হয়েছে, চিরকাল তো আর থাকব না। তোমার বোনটিকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে বাবা, নরম-সরম লক্ষীছিরি আছে বয়সও কম।"

এই সময় ব্যাগ থেকে ফটোটি বার করে পরিমল এগিয়ে দিল।

"চার ভাইয়ের এক বোন! ভগ্নীপতি আমাদের ভাইয়ের মত হবে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে স্কুল ফাইন্যাল পাস করে শোভার আরও পড়ার ইচ্ছে। আমারও মনে হয়—" সর্বাঙ্গ হঠাৎ কিলবিলিয়ে ওঠায় পরিমল থেমে গেল।

"ভালই তো। পড়া বন্ধ করা খোকারও মত নয়। যা দিনকাল পড়েছে! তুমি বাবা কি বলো?" ছেলের পিসিমা মেয়ের দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল? শোভার মুখটা মনে পড়ছে পরিমলের আর সঙ্গে সঙ্গে টের পাচ্ছে তার ভিতরে নন্দিতাদি এবং বড়বাবু নিজেদের মধ্যে প্রবল ঝগড়া শুরু করেছে, কে আগে তার গলা দিয়ে কথা বলবে। তারপর ঝগড়া থামিয়ে দুজনেই এক-সঙ্গে হাতছানি দিয়ে ডাকল ছোরা হাতে ষণ্ডা চেহারার একটা লোককে। লোকটা ছুটে এসে পরিমলের হৃৎপিণ্ডটা ছোরা দিয়ে খোঁচাতে শুরু করল। তখন পরিমল হেসে উঠল, বলল, "আমি আর কি বলব, যা বলার বা করার সে তো গুণ্ডারাই আজকাল বলছে বা করছে।"

ছেলের পিসিমা অবশ্য এই অর্থহীন খাপছাড়া উত্তরের কারণ বুঝলেন না। কুটুম্বিতার আয়োজন করতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

বাড়ি ফেরামাত্রই মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শোভার ফটোটা দিয়ে এসেছিস? ছেলে দেখল? কি মনে হল?"

পরিমল ক্লান্তস্বরে সবগুলোর জবাব দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকল ঘরের আলো নিভিয়ে। ঘণ্টাখানেক পর খেতে বসে সে এই বলে, "আজ অফিসে খুব মজা হলো একজনকে নিয়ে। সম্বন্ধ হচ্ছে, তাই পাত্রীর ফটো এনেছে দেখাতে। বিয়ের খুব ইচ্ছে কিন্তু তাকে সবাই এমন ভয় দেখাল, বোধহয় বেচারা আর বিয়েই করবে না," হাসতে শুরু করল পরিমল।

"কিসের ভয়," মেজ ভাই বলল, "সুন্দরী ?"

"না ও সব নয়, আসলে লোকটার মাথায় ছিট আছে। ওর হাতে পড়ে একটা মেয়ের জীবন নষ্ট হবে কেন, তাই সবাই ষড় করে—" পরিমল তারপর ষড়যন্ত্রের বিবরণ দিতে শুরু করল।

জীবনযাপন প্রণালী

ঠিক দশটায় অফিসে নিজের চেয়ারে বসেই প্রদ্যোত লক্ষ্য করল, চাপা উত্তেজনা আর চাহনি নিয়ে এ ওর সঙ্গে কথা বলছে। জ্যোতিভূষণ পাশের চেয়ারের লোক। তিনি এখন রমেনদের টেবিলের জটলায় গিয়ে একমনে আলোচনা শুনছেন। প্রদ্যোত ড্রয়ার থেকে জলখাবার গ্লাস, পেপারওয়েট, লাল-নীল পেনসিল, পিন-কুশন ইত্যাদি বার করতে করতে ভাবল, জেনারেল ম্যানেজারেরর ঘরের সামনে কি আজও আবার ডিমনস্ট্রেশন আছে? মিসেস চক্রবর্তীর পাঁচ সপ্তাহের মেডিক্যাল লীভ শেষ হতেও তো দিন দশ বাকি! তরুণ দত্তের অফিসার গ্রেড 'সি'-তে ওঠা হলো না, সেটাও তো দু' সপ্তাহ আগে সবাই জেনে গেছে। তা হলে?

"কাশীনাথ, জল দিয়ে যা।" হাঁক দিল প্রদ্যোত। ওর গলার আওয়াজে জ্যোতিভূষণ ফিরে তাকালেন এবং ব্যস্ত হয়ে ফিরে এসে উত্তেজিতস্বরে বললেন, "শুনেছ? মৃত্যুঞ্জয় লটারীর সেকেণ্ড প্রাইজ পেয়েছে! চল্লিশ হাজার টাকা!"

শোনামাত্র প্রদ্যোতের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "টাকাগুলো পেয়ে ও কী করবে?"

জ্যোতিভূষণ একটু অপ্রস্তুতে পড়লেন। ভেবেছিলেন প্রদ্যোত বলবে,—অ্যাঁ! কিংবা শুধুই; ওর চোখ দুটো বেরিয়ে আসতে আসতে চোয়ালটা ঝুলে পড়বে! কিন্তু এই রকম কিছু না হওয়ায় কিঞ্চিৎ অবাক হয়েই জ্যোতিভূষণ বললেন, "কি আবার করবে, ব্যাঙ্কে রাখবে সুদ পাবে।"

পিছন থেকে বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত চাপাস্বরে বলল, "প্রদ্যোতদা, জানেন এই টাকাটা আমিই পেতুম!"

প্রদ্যোত ঘুরে বসে বলল, "কি রকম?"

"দারোয়ান খুশিরাম আমার কাছে যখন টিকিট বেচতে এসেছিল মৃত্যুঞ্জয় তখন দাঁড়িয়ে। আমিই ডেকেছি ওকে পান আনতে দোব বলে। পকেটে ছিল একটা পাঁচ টাকার নোট আর আনা ছয়েক পয়সা। ভাবলুম, নোটটা ভাঙালেই তো খরচ হয়ে যাবে, তাই খুশিরামকে বললুম, কাল এসো। ও তখন বই থেকে টিকিট ছিঁড়ে ফেলেছে। মৃত্যুঞ্জয় হঠাৎ পকেট থেকে একটা টাকা বার

করে কিনে ফেলল টিকিটটা। অথচ কোনদিন কোন লটারীর টিকিট এর আগে ও কাটেনি আর আমি চার বছর ধরে কেটে যাচ্ছি। যদি তখন নোটটা ভাঙিয়ে কিনেই ফেলতুম—"

প্রদ্যোত দেখল অসহ্য যন্ত্রণা যুবকটির সারা মুখ কুঁপিয়ে যাচ্ছে। সেটা বন্ধ করার জন্য তাড়াতাড়ি সে বলল, "টাকা পেলে করতে কী?"

বিশ্বনাথ তাই শুনে মৃদু হেসে ঝুঁকে একটা ভারী লেজার বই টেনে পাতা ওলটাতে শুরু করল। তারপর যখন বুঝল উত্তরের আশায় প্রদ্যোত তখনো তাকিয়ে, সে রাগত স্বরে বলল, "এখনো তিনটে বোনের বিয়ে আমাকেই দিতে হবে। টিপে টিপে খরচ করি, শখটখ শিকেয় তুলে দিয়েছি। কিন্তু আমি কেন ওদের জন্য সাফার করব বলতে পারেন? বাবা তো ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে সটকে পড়ল।"

প্রদ্যোত ঘুরে বসে নিজের কাজে হাত দেবার আগে বিশ্বনাথের হতাশ এবং ক্রুদ্ধ মুখটিকে মন থেকে মুছে ফেলার জন্য জ্যোতিভূষণের সঙ্গে কথা শুরু করল।

"মৃত্যুঞ্জয়কে দেখছি না যে, অফিসে আসেনি?"

"কে জানে।" তাচ্ছিল্যভরে জ্যোতিভূষণ বললেন, "সারা জীবন পিওনের চাকরি করে যে টাকা পেত না, শুধু এক টাকা খরচ করেই ব্যাটা তা পেয়ে গেল। এ সব হচ্ছে স্টারস অ্যাণ্ড প্ল্যানেটসের কারচুপি। নয়তো ওর মত একটা লোকের অতগুলো টাকা পেয়ে যাওয়ার কোন মানে হয়?"

"কেন মানে হয় না? ওর নিশ্চয় চাহিদা আছে, টাকা দিয়ে এবার সেগুলো পূরণ করবে।"

"চাহিদা! মৃতুঞ্জয়ের?" জ্যোতিভূষণ বিস্ময়ের চাপে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। "জানেন কি, ওর ঘরভাড়া কত লাগে? সারাদিনে খাওয়ার জন্য কত খরচ করে? বছরে জামাকাপড়ে কত খরচ? ওর ফ্যামিলি মেম্বার কজন?"

প্রদ্যোত নঞর্থক মাথা নাড়ল।

"তাহলে বলেন কি করে যে ওর চাহিদা আছে? আপনার আমার স্ট্যাণ্ডার্ড দিয়ে বুঝলে তো হবে না। ওর কাছে চল্লিশ হাজার, আমাদের স্ট্যাণ্ডার্ডের দশ লাখ।"

"দশ লাখ পেলে আপনি কি করবেন?"

প্রশ্নটায় জ্যোতিভূষণ বিব্রত হয়ে পড়লেন। সেই সময় প্রদ্যোতের পিছনে বিশ্বনাথ গুনগুন করে উঠল—"লাক্, বুঝলেন প্রদ্যোতদা, জীবনে একবারই আসে। আমার কাছেও এসেছিল। বাট আই অ্যাম অ্যান ইডিয়ট, ফুল, রাস্কেল, সোয়াইন, বাস্টার্ড। আর আসবে না। আর টিকিট কিনে পয়সা নষ্ট করব না।"

জ্যোতিভূষণ বললেন, "একটু ভেবে বলতে হবে। অনেকগুলো টাকা তো।"

কাজ করতে করতে প্রদ্যোতের মনে হল—যদি চল্লিশ হাজার টাকা পাই তাহলে আমিই বা কি করব? কিছুক্ষণ আজেবাজে চিন্তা করে হাল ছেড়ে সে কাজে মন দিল। এক সময় কে. বি মুখার্জির টেবিল থেকে দারুণ হাসির আওয়াজ আসতে প্রদ্যোত তাকাল। মুখার্জি নিজের টাক মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলছে, "আমি যদি পেতুম তাহলে একটি হেয়ার রিসার্চ ইন্সটিটিউট করে সব টাকা তাতেই দান করে দিতুম। আঠারোটা সম্বন্ধ ভেঙে গেছে ভাই।" করুণা গুহ তাই শুনে ছোপধরা দাঁতগুলো মেলে ধরে বলল, "চল্লিশ হাজার টাকা দেখলে আচ্ছা আচ্ছা মেয়েও তোর পায়ে লুটিয়ে পড়বে রে শালা।"

প্রদ্যোত এই পর্যন্ত যাবতীয় ব্যাপার দেখে ও শুনে আবার কাজে মন দিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তার মনে হলো, একটা প্রশ্ন যেন মাথার মধ্যে বিঁধে খচখচ করছে। সেটাকে উপড়ে না ফেলা পর্যন্ত বোধহয় স্বস্তি পাবে না। আমার চাহিদা কী? এই প্রশ্নটার সম্মুখীন বাইশ বছর চাকরি করার পর হতে হবে, প্রদ্যোত তা জানত না। এই ব্যাপারটা নিয়ে সে ভাবল কাজ করতে করতে, বাড়ি ফেরার কালে বাসের মধ্যে দমবন্ধ হওয়া অবস্থায়, হায়ার সেকেণ্ডারী পড়া ছোটছেলেকে একই অঙ্ক বারংবার বোঝাবার ফাঁকে এবং স্ত্রীর পাশে শুয়ে। অবশেষে সে সিদ্ধান্তে পৌছল, লটারীর একটা ফার্স্ট বা সেকেন্ড প্রাইজ না পাওয়া পর্যন্ত বোঝা সম্ভব নয় তার চাহিদাটা কী। কেননা, এখন তার মনে হচ্ছে, জেনারেল ম্যানেজার পদ, সুশ্রী বুদ্ধিমতী স্ত্রী, প্রতিভাবান পুত্র, স্বাস্থ্য, মনোবল প্রভৃতি যেসব জিনিসের কথা সে ভেবেছে তার কোনটিই লটারীর টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করা যায় না। নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা হাতে এলে তবেই সেই অনুযায়ী চাহিদাটা নির্দিষ্ট একটা চেহারায় হয়তো ফুটে উঠবে। এইসব চিন্তার পর প্রদ্যোত স্থির করল, একটা লটারীর টিকিট এবার সে কিনবে।

পরদিন খুশিরামের কাছ থেকেই প্রদ্যোত চুপিচুপি একটা টিকিট কিনল। সাত-আট রকমের লটারীর টিকিট ওর কাছে রয়েছে। প্রদ্যোত বিন্দুমাত্র মাথা না ঘামিয়ে যেটা কিনল, তার ফার্স্ট প্রাইজ তিন লক্ষ টাকার। খুশিরাম হেসে বলল, "আগে বাবুদের কাছে গিয়ে, কত ভুলিয়ে ভালিয়ে টিকিস গছিয়েছি আর এখন বাবুরাই যেচে আমার কাছে আসছে টিকিস কিনতে। আমি পয়মন্ত আছি পরমান হয়ে গেছে কিনা। মিরতুনজয় আগে কোনদিন লটারী খেলে নাই, পরথম কিনল আর পাইয়ে গেল।"

শুনেই প্রদ্যোতের মনে হল, বোধহয় আমিও পাব। আমারও তো প্রথম টিকিট কেনা আর খুশিরামের কাছ থেকেই। এরকম যোগাযোগ তো ঘটতেই পারে যে, ওর কাছ থেকে যারাই প্রথম কিনবে তারাই পাবে। এক সময়

কথায় কথায় সে বিশ্বনাথকে বলল, "তুমি কার কাছ থেকে প্রথম লটারীর টিকিট কিনেছিলে?"

সেকেণ্ড পাঁচেক ভেবে বিশ্বনাথ বলল, "আমার মাসতুতো ভাইয়ের এক বন্ধুর কাছ থেকে।" তারপর কণ্ঠস্বর বদল করে, "এ পর্যন্ত ছাত্রিশটা টিকিট কেটেছি পাঁচ বছরে, সব লেখা আছে আমার ডায়েরিতে।"

জ্যোতিভূষণ মনে করতে পারলেন না প্রথম কার কাছ থেকে টিকিট কেনেন, তবে খুশিরামের কাছ থেকে এবারই প্রথম কিনলেন। মঞ্জুশ্রী চৌধুরীকে খুশিরামের খোঁজ করতে দেখে প্রদ্যোত জিজ্ঞাসা করল, "ওর কাছ থেকে কিনলেই বুঝি প্রাইজ পাবেন ভেবেছেন?"

মঞ্জুশ্রী থতমত খেয়ে বলল, "আমিও জানেন, তাই ভাবছিলাম। একজন পেলেই যে সবাই পাবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু রাধাদি বলল, ওর নাকি এমন ইন্সট্যান্স্ জানা আছে, একই লোক তিনটে ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়া টিকিট বেচেছে। কি করি বলুন তো, কিনব?"

"আপনার নিজের যা মনে হয়েছে তাই করুন, কারুর কথায় কান দেবেন না।"

মঞ্জুশ্রী হাঁফ ছেড়ে চেয়ারে ফিরে গেল। প্রদ্যোত দুদিন ধরে নানাভাবে খোঁজ নিয়ে জানল, এ অফিসে সেই একমাত্র লোক যে জীবনে এই প্রথম লটারীর টিকিট কিনল। খেলার তারিখটা তার মুখস্থই আছে তবু চুপিচুপি শোবার ঘরের দেয়ালে, খাটে শুয়ে চোখ থেকে এক হাত দূরত্বের মধ্যে পেনসিল দিয়ে লিখে রাখল। টিকিটটা রেখেছে সে অফিসের ড্রয়ারে।

কয়েকদিন পর মৃত্যুঞ্জয় অফিসে এল। ওকে দেখে কেরানীবাবু এবং দিদিরা সোরগোল তুলল। কেউ কেউ বলল, খাইয়ে দাও একদিন। কয়েকজন পরামর্শ দিল, টাকাগুলো কি করা উচিত। একজন বলল, নিরাপদ কোন ব্যবসায়ে খাটাও। আর-একজন আপত্তি করে বলল, কোন ব্যবসাই আজকাল নিরাপদ নয় বরং সেভিংস সার্টিফিকেট কিনুক। তারপর ওরা তুমুল তর্কে প্রবৃত্ত হলো। অনেকে বলল, বাড়ি-জমি-সোনা ইত্যাদি কিনে রাখলে ভবিষ্যতের জন্য ভাবনা থাকবে না।

মৃত্যুঞ্জয় তার স্বভাবসুলভ বিনয়সহকারে সকলের কথাতেই ঘাড় নাড়ল। প্রদ্যোতের কাছে এসে নমস্কার করে একগাল হেসে দাঁড়াতেই প্রদ্যোত বলল, "এবার তুমি কি করবে, অনেকগুলো টাকা তো পেলে।"

"ভগবান দিয়েছেন তাই পেলাম।" মৃত্যুঞ্জয় হাতজোড় করে উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল।

"কি করবে টাকা দিয়ে?"

"বিশ্রাম করব।"

ওর স্বাভাবিক বিনয়ী কণ্ঠকে প্রদ্যোতের যেন ইয়ার্কি মনে হলো। ক্ষুন্ন হলো সে। মৃত্যুঞ্জয় অর্থবান হলেও এখনো পিওন বটে। গম্ভীর হয়ে প্রদ্যোত বলল, "কতদিন বিশ্রাম নেবে?"

"আমার তো সংসার খরচ সামান্যই। যদি টেনেটুনে চলি তা হলে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারব। আপনার কি মনে হয়, পারব না?" মৃত্যুঞ্জয় উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

"তুমি কি চাকরি করবে না আর?"

"না। ছেড়ে দোব। শুধু দুবেলা দুমুঠো খাব, আর ঘুমোব। আমার শুয়ে থাকতে খুব ভাল লাগে। এবার থেকে শুধু ইচ্ছে হলে কাজ করব। বুঝলেন প্রদ্যোতবাবু, এই টাকাটা পেয়ে আমার মনে হলো, এত খাটাখাটুনি যে জন্য সেটাই যখন ভগবান পাইয়ে দিলেন, তখন আবার কেন খাটা?"

প্রদ্যোত শুধু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শুনে যাচ্ছে। শুনতে শুনতে সে অনুভব করল ক্লান্ত লাগছে। ক্লান্তিটা ক্রমশ তাকে দীনতায় ডুবিয়ে দিচ্ছে। এই প্রথম সে ঈর্ষা করতে শুরু করেছে মৃত্যুঞ্জয়কে অতগুলো টাকা পাওয়ার জন্য। এখন তার মনে হচ্ছে, এতদিন ধরে রুটিনমাফিক. যন্ত্রের মত শুধু খেটেই চলেছে। আরও অনেক বছর ধরে তাকে খেটেই যেতে হবে। অথচ এই লোকটা কেমন রেহাই পেয়ে গেল!

মৃত্যুঞ্জয় চলে যাবার পর প্রদ্যোত কলম রেখে দিল। পিছন থেকে বিশ্বনাথ চাপাগলায় বলল, "ওর কাছে বিনা সুদে যদি হাজার পাঁচেক টাকা ধার চাই, প্রদ্যোতদা, তাহলে রিফিউজ করার মত মর‍্যাল গ্রাউনড কি ওর থাকতে পারে?"

জ্যোতিভূষণ বললেন, "ধরাকে এখনই সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছে। চাকরি ছেড়ে দেবো! বললেই হলো!"

ছুটির পর রাস্তায় বেরিয়ে ট্রাম-বাসের দিকে তাকিয়ে প্রদ্যোত ক্লান্ত বোধ করল। যেদিকেই সে তাকায় শুধু বিশ্রাম লোলুপতার এবং বিরক্তির ঊর্ধ্বশ্বাস গমনাগমন চোখে পড়ল। যত শব্দ তার কানে এল তাতে কর্কশ দীর্ঘশ্বাসের এবং হতাশ গর্জনের নিরন্তর ওঠানামাই শুধু শুনল। হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে বাড়ি পৌঁছল। ছেলেকে অঙ্ক বোঝাবার সময় প্রদ্যোত ক্লান্ত বোধ করল। রাত্রে স্ত্রীর পাশে শুয়ে তার মনে হলো একমাত্র নিঃসঙ্গতা ছাড়া বিশ্রাম বোধ-হয় পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু নিঃসঙ্গ হবার জন্য কতকগুলো জিনিস দরকার, তার মধ্যে প্রধান জিনিস টাকা। বহু টাকা যা দৈনন্দিন নানাবিধ দায় ও ভবিষ্যতের সর্তসমূহ পালনের আবশ্যকতা থেকে রেহাই দেবে। এবং প্রচুর টাকা, একমাত্র লটারী ছাড়া আর কোন উপায়ে অর্জনের সুযোগ তার নেই।

প্রদ্যোত গভীরভাবে প্রথম পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষায় ডুবে গিয়ে, ঘুমে-পাওয়া স্ত্রীকে বলল, "লটারীর একটা টিকিট কাটলুম।"

"কত টাকার ?"

"কিসের টাকা ?"

"ফার্স্ট প্রাইজ কত ?"

"তিন লাখ।"

"অ—নেক টাকা তো !" এই বলে স্ত্রী ওপাশ ফিরে শরীর 'দ' করে শুল। প্রদ্যোত কিছুটা উৎসাহব্যঞ্জক স্বরেই বলল, "তাহলে চাকরি ছেড়ে দেব।"

"তার মানে !" বিস্ময়ের আঘাতে 'দ' ভেঙে পূর্ণচ্ছেদ হয়ে গেল।

"স্রেফ পড়ে পড়ে ঘুমোব আর ইচ্ছে হলে কাজ করব। টাকা রোজগারের জন্যেই তো খাটাখাটুনি, সেটাই যদি পেয়ে যাই তাহলে আর চাকরি করব কেন ?"

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ! সেজন্য এমন চাকরিটা ছেড়ে দেবে ? এখনো কত টাকা রিটায়ার করা পর্যন্ত রোজগার করবে জান ?"

প্রদ্যোত মনে মনে দ্রুত গুণ করল—৬১৫ × ১২ × ১১ অর্থাৎ একাশি হাজার টাকারও বেশি। এর উপর বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং গ্র্যাচুইটি। সোয়া লাখ টাকারও বেশি হয়ে যাচ্ছে।

"অতগুলো টাকা ছেড়ে দেবে, শুধু শুধু ?"

"কিন্তু আমার ভীষণ ক্লান্ত লাগছে যে !" প্রদ্যোত ম্রিয়মাণকণ্ঠে বিরক্ত উত্তেজিত স্ত্রীকে প্রশমিত করার চেষ্টা করল।

"ক্লান্ত ! তাহলে লক্ষ লক্ষ লোক আপিসে চাকরি করছে কি করে ?"

তারাও ক্লান্ত, এই কথাটি বলার ইচ্ছা দমন করে প্রদ্যোত অতঃপর ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন অফিসে গিয়ে সে প্রবল চাঞ্চল্য দেখল। মৃত্যুঞ্জয় চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। কেউ বলল, ইডিয়ট। কেউ বলল, হয়তো ব্যবসায় নামছে। বেশির ভাগই বলল চাকরিটা ছাড়ার কোন মানে হয় না। চাকরি হলো সিকিউরিটি, এই বাজারে জিনিসটার দাম আছে। কিন্তু সকলের মুখেই কেমন একটা অস্বস্তিকর বিভ্রান্তির ছাপ পড়েছে।

প্রদ্যোত হিসেব করে দেখল, চল্লিশ হাজার টাকার লটারী পেয়ে মৃত্যুঞ্জয় পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি টাকা দামের চাকরিটা ছেড়ে দিল। ওকে অসাধারণ সাহসী মনে করতে এখন তার অসুবিধা হচ্ছে না। বিছানায় চিত হয়ে বুকের উপর হাতদুটি জড়ো করে মৃত্যুঞ্জয় জানলা দিয়ে বাইরের আকাশে তাকিয়ে,—এইরকম একটা ছবি প্রদ্যোতের চোখের সামনে কয়েকবার ভেসে উঠতেই সে ধীরে ধীরে ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে শুরু করল এবং লটারীর ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়ার কামনার দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হলো। তখন তার ইচ্ছা করল মৃত্যুঞ্জয়ের মত সাহস দেখাতে, এই মুহূর্তে চাকরি ছেড়ে দিতে।

সেদিন রাতে সে স্ত্রীকে বলল, "ছেড়েই দেব চাকরিটা যদি লটারীর টাকা পাই।"

"ছেড়ে দিয়ে কি করবে?" কটুকণ্ঠে স্ত্রী জানতে চাইল।

"কিছুই করব না। সেইজন্যই তো ছাড়ব। শুধু শুয়ে থাকব, ঘুমোব, বই পড়ব আর খিদে পেলে খাব।"

"ওইভাবে দিন কাটাতে পারবে? একঘেয়ে বিরক্তিকর লাগবে না?"

প্রদ্যোত কিছুক্ষণ ভেবে বলল. "এখানকার এই একঘেঁয়েমি থেকে ক্লান্তিকর আর কিছু হতে পারে না।"

"কিন্তু চাকরি থেকে যে টাকাগুলো পেতে পার অযথা সেগুলো ছেড়ে দেওয়া কি বোকামি হবে না? ওই টাকা দিয়ে তো আরো বেশী সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানো যেতে পারে?"

প্রদ্যোত চুপ করে রইল। সে জানে, কথা বাড়ালে বহু প্রকারের অকাট্য যুক্তি তার সামনে পাঁচিল তুলে দাঁড়াবে। সেগুলো লঙ্ঘন করা বা ধ্বসিয়ে দেওয়াও আর এক ক্লান্তিকর কাজ। আসলে মনের ইচ্ছাটি এত আগে ব্যক্ত করাই তার ভুল হয়েছে। লটারীর টাকা পেয়েই চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে তারপর চুপচাপ সবরকম কথা শুনে যাওয়াই ভাল। সবাই কিছুদিন খুব বোকা বলবে তারপর এক সময় চুপ করে যাবে। তারপর ভুলে যাবে।

পরদিন থেকে সে গুণতে শুরু করল লটারীর খেলার তারিখটা ঘনিয়ে আসতে কত বাকি। এক-একটি দিন যায় আর সে বর্ধিতহারে চঞ্চলতা বোধ করতে শুরু করে। চটপট বাজার করে ছেলেকে বারবার একই পড়া বুঝিয়ে দিতে দিতে বিরক্ত হয় না, বাসে বা ট্রামে ভিড় থাকলেও ঠেলেঠুলে উঠে পড়ে, বেয়ারার জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই জরুরি ফাইল অফিসারের কাছে পৌঁছে দেয়, পঞ্চমবার মা হওয়া মিসেস চক্রবর্তীকে নিয়ে মেয়েরা মশকরা করলে প্রদ্যোতও এখন মুচকি হাসে, দিন দুয়েক অফিস গেটে ছুটির পর সে শ্লোগানও দিয়েছে "মালিকের দালাল নিপাত যাক" বলে আর প্রতি রাতে ঘরের আলো নেভাবার আগে দেয়ালে একটা নতুন টিক্ দেয় পেন্সিলের। কিছুক্ষণ মাছের কাঁটার মত টিক্গুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে প্রবল উদ্দীপনায় অভিভূত হয়ে সে আবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়—পেলেই চাকরিটা ছেড়ে দেব।

অবশেষে দিনটি এসে গেল। প্রদ্যোত বিছানা থেকে উঠল না, বাজার গেল না, অফিসেও না এবং খবরের কাগজ ছুঁল না। স্ত্রী একবার বলেছিল, আজ একটা লটারীর রেজাল্ট বেরিয়েছে, এটা তুমি কিনেছিলে নাকি? প্রদ্যোত মাথা নাড়ল উপরন্তু বেশ জোর দিয়েই বলল, "না।"

দুপুরে বিছানায় চিত হয়ে হাতদুটো বুকের উপর রেখে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কাটাল। এই সময় কারুর কোন প্রশ্নের জবাব দিতে

তার ইচ্ছা করল না। কোনপ্রকার ভালমন্দ সুখদুঃখবোধ তার হৃদয়ে পৌঁছল না। গভীর রাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে দালানের আলোটি জেবলে সে খবরের কাগজ খুলল। প্রায় আধ পাতা জুড়ে রেজাল্ট ছাপা রয়েছে। প্রথমে সে তলার দিকের নম্বরগুলোয় চোখ রাখল। এগুলো একশো টাকা পাওয়াদের নম্বর। প্রদ্যোত নিজের নম্বর পেল না। তারপর একটু উপরে পাঁচশো টাকা পাওয়াদের নম্বরগুলো খুঁটিয়ে দেখেও যখন পেল না, উত্তেজনায় তার হাতটা কেঁপে উঠল। সে হাজার টাকার নম্বরেও পেল না। দশ হাজার পেয়েছে যে তিনটি নম্বর তার সঙ্গে নিজের সিরিয়ালেরই মিল নেই। পঞ্চাশ হাজারের দুটি এবং তিন লাখের একটি নম্বর এবার বাকি। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ রেখে হঠাৎ সে নিজেকে ভাগ্যের মুখে ঠেলে দিল।

পরদিন প্রদ্যোত আঁফসে কাজ করতে করতে লক্ষ্য করল, বিশ্বনাথ তালগোল পাকান একটা লটারীর টিকিট মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলেছে। জ্যোতিভূষণ তাই দেখে মৃদু হাসল মাত্র। বিশ্বনাথ বিড়বিড় করে বলল, "লাক একবারই আসে। আর পয়সা নষ্ট করব না।" মঞ্জুশ্রী চৌধুরী একসময় বলল, "ধ্যেৎ, প্রদ্যোত-বাবুর সঙ্গে পরামর্শ না করলেই হত। রাধাদির কথামত এবার কিনব।"

ছুটির কিছু আগে খুশিরাম অনেকরকম লটারীর টিকিট নিয়ে বিক্রি করতে করতে প্রদ্যোতের কাছেও এল। "কিনুন এই দু-লাখেরটা। আর পনেরো দিন পরে ড্রোয়িং হোচ্ছে।"

প্রদ্যোত কয়েক মুহূর্ত ভেবে উত্তেজনা চেপে বলল, "ওটা বড্ড অল্পদিনের জন্য। দু-তিন মাস পর ড্রয়িং হবে এমন কিছু থাকে তো দাও।"

একটি পিকনিকের অপমৃত্যু

কথায় কথায় চিত্রা বলেছিল, তার প্রেমিক অরুণ সাহাদের গ্রামের বাড়িটা বাগান-পুকুর সমেত বিশ বিঘের। ফাঁকাই পড়ে থাকে, কালেভদ্রে বাড়ির লোকেরা পিকনিক করতে যায়। তাই শুনে চিত্রার চার বন্ধু অর্থাৎ ইতিহাস অনার্সের শীলা, করুণা, দীপালি আর সুপ্রিয়া ওকে বলে, আমরাও একদিন গিয়ে পিকনিক করে আসব। কিছুদিন পরে চিত্রা ওদের জানাল অরুণ রাজি হয়েছে। সামনের রোববার সে বাড়ির স্টেশনওয়াগানটাও পাচ্ছে, সবাইকে এক জায়গা থেকে তুলে নিয়ে যাবে। কলকাতা থেকে আঠারো মাইল দূরে ওদের গ্রামে যেতে বড়জোর আধঘণ্টা লাগবে। অরুণ খুব জোরে চালায়।

কলেজ ছুটির পর কাছের এক চায়ের দোকানে বসে ওরা কথা বলছিল। শীলা তার সরু গলাটা ঝুঁকিয়ে লিকলিকে হাত দুটো টেবিলে রেখে বলল, "পারহেড কত করে দিতে হবে, সেটা এখনই ঠিক করে নেওয়া ভাল।"

"কাউকে কিচ্ছু দিতে হবে না, সব খরচ অরুণের।" চিত্রা তাচ্ছিল্যভরে বলার খুব চেষ্টা করেও গর্ব লুকোতে পারল না।

"না, তা কেন।" দিপালি আপত্তি করল, "একজনের ঘাড়ে সব খরচ চাপানো উচিত হবে-না।"

"আমাদের পাঁচজনের জন্য ক'টাকাই বা খরচ হবে। ওদের ব্যবসার পাবলিসিটিতেই তো বছরে যায় চল্লিশ হাজার টাকা।" বলতে বলতে চিত্রা নিজেও অবাক হয়ে গেল।

"তাহলেও আমাদের বাধো-বাধো ঠেকবেই। অরুণের সঙ্গে তোর ভাব, তোর খরচ নয় সে দিল। কিন্তু আমাদের কেন দেবে?"

"তোরা আমার বন্ধু।"

"হলেই বা। পিকনিকে সবাই সমান না হলে আনন্দ জমে না। একজনই সব দিলে বাকিদের মনে হবে অনুগ্রহ নিচ্ছি, তাই না?" দীপালি অন্যদের সমর্থন চাইল। শীলা ইতস্তত করল। সুপ্রিয়া ঘাড় নাড়ল। করুণা বলল, "কিন্তু ভাল মনে যদি খরচের সব দায়িত্ব নেয়, তাহলে অবশ্য অনুগ্রহ নিচ্ছি বলে মনে হবে না।"

"হ্যাঁ হবে।" দীপালি হঠাৎ গোঁয়ার হয়ে উঠল। "অরুণের সঙ্গে যেদিন চিত্রা আলাপ করিয়ে দিল, মনে আছে তোর সেই চীনে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়েই তুই কি বলেছিলি?"

শীলা সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, 'কি বলেছিলুম?"

"এত খরচ করছে আর আমরা একপয়সাও খরচ করতে পারছি না, কেমন লজ্জা-লজ্জা করে। বলেছিলি কিনা বল?"

"বড্ড বড়লোক বাপু।" শীলা আত্মসম্মান বজায় রেখে হাসবার চেষ্টা করল, "ফসফস করে যেরকম পাঁচ-দশটাকার নোট বার করছিল। পিকনিকে অবশ্য বড়জোর পাঁচটাকা পর্যন্ত দিতে পারব, কিন্তু তাতে তো পেট্রল খরচও উঠবে না।"

"ট্রেনে যাব।" সুপ্রিয়া বলল।

"এতই যখন তোমাদের মান-সম্মানবোধ, তাহলে বরং না যাওয়াই ভাল।" চিত্রা উঠে দাঁড়াচ্ছিল করুণা আর সুপ্রিয়া টেনে বসাল।

"না, না আমার কাজ আছে।"

"রাগ দেখাতে হবে না আর।" করুণা চিমটি কাটল চিত্রার হাতে। "বাড়িতে তাহলে বলে দোব সব।"

"দে-না। সবাই জেনে গেছে।"

"এসব কথা এখন থাক।" দীপালি বিরক্ত হয়ে বলল, "আগে ঠিক কর যাওয়া হবে কি হবে না। মোট কথা একদম কিছু কণ্ট্রিবিউট না করে যাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই।"

"আমি জানতুম, দীপালি একটা না একটা ফ্যাঁকড়া বার করবেই। অরুণের বাড়িতে যাচ্ছি, সে তো আতিথেয়তা করবেই। সুপ্রিয়া তোর বাড়িতে যদি যাই, বল্, তুই কি অ্যালাও করবি আমাদের পয়সা খরচ করতে দিতে?"

সুপ্রিয়া ঘাড় নাড়ল মাদ্রাজী ঢঙে।

এই সময় একটি ছেলে ঢুকল চায়ের দোকানে। ওদের দেখে লাজুক হেসে দূরের একটা টেবিলে বসল। আদ্দির পাঞ্জাবি পরার জন্য জিরজিরে বুকের পকেটে একটাকার নোট এবং কণ্ঠার হাড় স্পষ্ট। শ্যাম্পু করা চুল ফাঁপিয়ে এলোমেলো। রুমালে সুগন্ধি ঢালে। মেয়েদের ফাই-ফরমাস পাওয়ার জন্য সতত ব্যস্ত। মুখটি কাঁচ দেখায় দাড়ি না ওঠায়। কলেজের মেয়েরা হাসাহাসি করে ওকে নিয়ে।

"শিবুটা এখানেও। জ্বালালে।" শীলা গম্ভীর হয়ে চেয়ারে হেলান দিল বুকটা চিতিয়ে।

"আঃ, আবার!" করুণা কৃত্রিম ধমক দিল শীলাকে।

"দেখুক না, ওটা আবার পুরুষমানুষ নাকি।"

"ওসব কথা থাক।" দীপালি বিরক্ত হয়ে বলল, "কি আমরা দিতে পারি সেটা আগে ফয়সালা হোক।"

শীলা বলল, "টাকাপয়সার কথা বাদ দে। পিকনিক মানেই তো শুধু খাওয়া নয়। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত সময়টাও কাটাতে হবে। সেই রকম কিছু তো আমরা নিয়ে যেতে পারি।"

"আমাদের একটা ট্র্যানজিস্টার আছে।" করুণা উৎসাহভরে বলল।

"অরুণদের তিন-চারটে আছে।"

"দীপালি তুই কি বলিস?"

এরপর পাঁচজন চুপ করে ভাবতে শুরু করল। চা খেতে খেতে শিবু ওদের দিকে তাকাচ্ছে। টেবিলে টোকা দিয়ে একটু গুনগুন করল। খাতাটা খুলে মনোযোগে খানিকটা পড়ল। রাস্তা দিয়ে দুটি মেয়েকে যেতে দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। তারপর ফুরুৎ ফুরুৎ শব্দ করে চা খেতে লাগল।

"পেয়েছি!" শীলা চাপাস্বরে বলল, "শিবুটাকে নিয়ে চল, চমৎকার সময় কাটবে।"

চারজনেই প্রথমে খুব অবাক হয়ে গেল শীলার কথায়। কিছুক্ষণ চাপা স্বরে তর্ক করল।

"পাঁচটা মেয়ে আর একটা ছেলে পিকনিক করবে, কেমন যেন দেখায়। আর একটা ছেলেও চলুক না।"

"পিকনিকে খাটাখাটুনিও তো আছে, করবে কে? ওকে বরং লাগিয়ে দেওয়া যাবে।"

"না না অরুণদের মালি আছে, ওসব কাজ কাউকেই করতে হবে না। বরং ওকে জব্দ করব সারাদিন ধরে।"

"কথা এখন থাক বরং ওকে গিয়ে বল।"

হঠাৎ পাঁচজনকে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে শিবু হকচকিয়ে গেল। ওদের অনুরোধ শুনে তার সারা শরীরটাই দুলে উঠল।

"না না, তোমরা যাচ্ছ, তার মধ্যে আমি কেন!"

"তাতে কি হয়েছে।" চিত্রা বোঝাবার জন্য বলল, "তুমিও তো আমাদের বন্ধু, আমরা তোমায় ইনভাইট করছি। আমাদের সঙ্গে যাওয়া কি তুমি পছন্দ কর না?"

"না না, তাই বলেছি নাকি। তবে যার বাড়িতে যাব তারও তো মতামত নেওয়া দরকার।"

চিত্রা বলল, "তুমি আমাদের গেস্ট, তার নয়। আমরা যাকে খুশি নিয়ে যেতে পারি।"

"শিবনাথ, তাহলে না কোরো না। অরুণ তো আমাদের কাছেও প্রায়

অপরিচিত। অবশ্য চিত্রার অসুবিধে হবে না, কিন্তু আমাদের চেনা একজন পুরুষমানুষ থাকলে স্বস্তি পাওয়া যাবে। ধরো ফট করে কারুর যদি কিছু হয়ে যায়?" শীলা গম্ভীর হয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল।

"নিশ্চয় নিশ্চয়," শিবু জোরে ঘাড় নাড়ল। "আজকাল কখন কি হয় কে বলতে পারে। ধরো পাড়াগাঁয়ের রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গেল।"

"তা কেন হবে! অরুণদের গাড়িটা নতুনই, গতবছর কেনা হয়েছে।"

"চিত্রা তুই থাম্। শিবু ঠিকই বলেছে, ধর্ তেল ফুরিয়ে যায় যদি!"

অতঃপর শিবুর যাওয়া ঠিক হয়ে গেল। পাঁচটি মেয়ে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে কিছু দূর হেঁটে গিয়ে হাসতে শুরু করল। তারপর যে যার বাড়ির দিকে রওনা হল।

দীপালির বাঁ কানের উপর দগদগে পোড়া চিহ্ন। বারো বছর বয়সে অ্যাসিডের শিশি তাক থেকে পড়ে যায় ওর মাথায়। কানটা দোমড়ান, চুলও ওঠেনি। একসঙ্গে কিছু যুবক সামনে দিয়ে আসছে দেখে সে মুখ ঘুরিয়ে ক্ষত লুকোবার চেষ্টা করল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে ওরা দ্বিতীয়বার আর তাকাল না। তবে ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের মধ্যে একজন তাকে পিছন থেকে দেখল। দীপালি জানে, যে দেখল তার মুখ দিয়ে আক্ষেপসূচক ধ্বনি নির্গত হবে, দুই চোখে বিস্ময় ফুটবে। তার সুঠাম দেহ বহুক্ষণ ফিরে ফিরে দেখবে! ওই পর্যন্তই, দীপালি তা জানে। গভীর রাতে মাঝে মাঝে সে কাঁদে।

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে শীলার ভাবনা হল, পিকনিকে যাওয়া তার হয়ে উঠবে কিনা। আবার ভাই কিংবা বোন হবে। কদিন ধরে মা আর নড়াচড়া করতে পারছে না। অতবড় সংসার চালানোর ভার এখন তার ঘাড়ে। অবশ্য তেরোবছর বয়স থেকেই সে মার আঁতুড় তুলছে। কিন্তু একদিনের জন্যও কি এখন বাড়ির বাইরে থাকা চলে? ভাবনায় পড়ল শীলা। তারপর মা বাবা ভাই বোনদের উপর প্রচণ্ড রাগে দপদপ করে উঠে, বাসের অপেক্ষায় না থেকে হাঁটতে শুরু করল।

দ্রুত চলেছে সুপ্রিয়া, টিউশানীতে তার দেরি হয়ে গেছে। কুড়িটাকার জন্য রোজ দুটো বিচ্ছুকে নিয়ে একঘণ্টা বসতে হয়। তার থেকেও সমস্যা ওদের মা-ঠাকুমাকে নিয়ে। রোজ শুনতে হচ্ছে তার মিষ্টিমুখ দেখে নাকি সংসারী হবার সাধ জেগেছে বাড়ির টাকমাথা হোঁৎকা চেহারার প্রৌঢ় ছোটছেলের। প্রায় ছশো টাকা মাইনে পায়। সুপ্রিয়া টের পাচ্ছে হয়তো একেই বিয়ে করতে হবে। কেননা ওরা শিগগিরই তার বাবার কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসবে এবং তা ফেরাবার সাধ্য চার মেয়ের স্কুল-শিক্ষক বাবার নেই। চলতে চলতে সুপ্রিয়ার মনে হলো, সামনের মোড়টা ঘুরলেই কেউ যদি তার মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে দেয়।

মোড় ঘুরে দেখল একটি সুদর্শন তরুণ তাকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সুপ্রিয়ার মন খারাপ হয়ে গেল।

করুণা একা দাঁড়িয়ে চৌমাথার মোড়ে। কাছেই বাড়ি। কিন্তু বাড়ি গিয়ে কি করবে? বৌদি বলবে সিনেমা চলো, বাবা বলবে সেতার বাজিয়ে শোনা, মা বলবে একফোঁটাও দুধ ফেলে রাখা চলবে না, মাস্টারমশাই বলবে ফার্স্ট-ক্লাস পাবার মত মাথা আছে, বাবা বলবে ওকে ফরেন পাঠাব, বৌদি বলবে রোজ স্কিপিং করো, মা বলবে সন্ধেবেলায় শুয়ে থাকতে নেই, মাস্টার মশাই বলবে যে-সব প্রশ্নের উত্তর লিখিয়ে দিয়েছি মুখস্থ করোনি কেন, বৌদি বলবে এখনো কেউ তোমাকে প্রেমপত্র দেয়নি তা কি হয়, বাবা বলবে পছন্দ করে যদি বিয়ে করিস আপত্তি করব না, মাস্টার মশাই বলবে আজকাল আর তুমি মন দিয়ে মোটেই পড়াশোনো না।

করুণা একা দাঁড়িয়ে ভাবল, বাড়ি গিয়ে কি করব?

গাড়ি চালাতে চালাতে অরুণ বলল, "নিন্ সিগারেট খান।"

শিবু ঘাড় নাড়ল।

"সে কি! আপনি তো অ্যাডাল্ট, প্রাপ্তবয়স্ক।" বলে অরুণ ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েদের দিকে চেয়ে হাসল।

"শিবু লজ্জার কি আছে, আমরা কি তোমার মা-মাসি?" করুণা আঙুল দিয়ে শিবুর কাঁধে খোঁচা দিল।

"ইণ্ডিয়ান সিগারেট নয়। খেয়েই দেখো একটা।" চিত্রা গম্ভীর স্বরে বলল।

এরপর সকলের অনুরোধে শিবু খেতে শুরু করল। অভ্যাস নেই। একটু পরেই কাশতে লাগল।

"ও কি, ছেলেমানুষের মত কাশছ কেন? আমি হলে তিন টানে শেষ করে দিতুম।" শীলা ধমক দেবার ভঙ্গিতে বলল, এবং হাত বাড়াল, "দাও দেখিয়ে দিচ্ছি।"

"না না।" শিবু সিগারেটটা সরাতে গিয়ে অরুণের স্টিয়ারিং ধরা হাতে ছ্যাঁকা দিল। অরুণ চমকে উঠতেই গাড়িটা বেটাল হয়ে ধাক্কা দিল পথের পাশে দাঁড়ানো একটা সাইকেল রিকশার চাকায়। চাকাটা দুমড়ে গেল।

হৈ-হৈ করে কোত্থেকে ছুটে এল একদল লোক। গাড়ি ঘিরে তারা উত্তেজিত কথাবার্তা বলতে থাকল। চিত্রা ভয়ে আঁকড়ে ধরল অরুণের হাতটা। অন্য মেয়েরা শুকনো মুখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া শিবুর দেহযন্ত্রের বাকি অংশ মৃতবৎ।

"হয়েছে কি।" অরুণ দরজা খুলে বেরোল। দু-পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে

বুক চিতিয়ে সুন্দর স্বাস্থ্যটা জনতাকে দেখাল। "কেউ তো মরেনি, তবে এত কথা কিসের ?" তার কর্তৃত্বব্যঞ্জক কণ্ঠের দাপটে ওরা থ মেরে গেল। "সারাতে লাগবে ?" পকেট থেকে জাঁদরেল একটা ওয়ালেট এবং তার মধ্য থেকে অনেকগুলো নোট বেরিয়ে আসতে দেখে নিভন্ত অগ্নিস্তূপ থেকে ফুলকির মত কিছু ফিসফাস ছিটকে উঠল।

"পঞ্চাশ টাকা লাগবে।" ওদের মধ্য থেকে একজন বলল।

"সারিয়ে নিতে পঞ্চাশ টাকা ?" ভ্রূ কুঁচকে অরুণ ধমকাল। কতকগুলো নোট একজনের হাতে গুঁজে দিয়ে গাড়িতে উঠল। স্টার্ট দিতেই জনতা পথ ছেড়ে দিল।

মাইলখানেক যাবার পর চিত্রা প্রথম কথা বলল, "ওরা গাড়িটা পুড়িয়ে দিত, না ?"

"কি জানি।" অরুণ শিস দেবার জন্য ঠোঁট সরু করে কি ভেবে, ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েদের দিকে তাকাল! "সব চুপচাপ কেন। আরে ও কিছু নয়, নিন্ গান ধরুন।" বলেই চেঁচিয়ে শুরু করল, "আমরা অদ্ভুত ·।" শুধু চিত্রা ওর সঙ্গে যোগ দিল।

পিছনের সীটের চারজন মেয়ে কাঠের মত বসে। হঠাৎ শিবু প্রাণপণে অরুণের সঙ্গে গলা মেলাতে লাগল। মিহি স্বরকে উদাত্ত করতে গিয়ে স্বর ভেঙে যাচ্ছে, সেটা বুঝতে পেরে খানিক বাদে থেমে গেল।

"থামলেন কেন, চলুক · আমরা ভাঙিগড়ি—"

শিবু বাকি পথটা চীৎকার করতে করতে একা গান গেয়ে গেল। গাড়ি থেকে নেমেই দীপালি চাপা স্বরে শীলা, সুপ্রিয়া, করুণাকে বলল, "ওটাকে না আনলেই হত।"

কিছুক্ষণ পরেই ওরা রান্নার উদ্যোগে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মালি বারো মাইল দূরে তার গ্রামে গেছে। সকালে খবর আসেছে বাঘে তার বাবাকে মেরে, আধ-খাওয়া দেহটা ফেলে রেখেছে। শুনেই সুপ্রিয়া বলল, "বাঘটা যদি এখানে আসে ?"

"কেন শিবু রয়েছে, ভয় কি আমাদের।" তিক্তস্বরে দীপালি বলল।

"বাঘ কিন্তু মানুষ নয়," অরুণ হাসতে থাকল। "টাকা দিয়ে পার পাওয়া যাবে না।"

চিত্রা ছাড়া কেউ উচ্চস্বরে হাসল না। কলকাতা থেকে খাওয়ার সামগ্রী অরুণ এনেছে। শিবু উনুন ধরানোয় ব্যস্ত। কাজের ছুতোয় সে সকলের আড়ালে থাকতে চাইছে। অন্যরা কিছুক্ষণ বাগানে বেড়ালো। বেল এবং কলা ছাড়া আর কিছু ফলেনি। কয়েকটা নারকেল গাছ রয়েছে। অরুণ জুতোজামা খুলে একটা গাছে ওঠার চেষ্টা করল। হাত দশেক উঠে হাল

ছেড়ে নেমে এসে বলল, "বড্ড পিছল। তবে দিন দুয়েক তালিম নিলেই হয়ে যাবে।"

করুণা ফিসফিস করে শীলার কানে বলল, "সব কিছুতেই বাহাদুরির চেষ্টা, না?"

শীলা ঘাড় নাড়ল। চিত্রা লক্ষ করেছে এই কানাকানি। কাছে এসে কারণ জানতে চাইল। শীলা বলল, "করুণা বলছিল তোদের দুজনকে বেশ মানায়।"

চিত্রা উথলে উঠে কি করবে ভেবে না পেয়ে বলল, "শিবুটার এমন মেয়েলি স্বভাব, রান্না ছেড়ে কিছুতেই আসবে না। চল ওকে ধরে আনি।"

করুণা আর শীলাকে টানতে টানতে চিত্রা নিয়ে চলল রান্নার দিকে। তখন সে বলল, "তোদের ভাল লাগছে অরুণকে? খুব চঞ্চল ছটফটে, নারে?"

"সেইটাই তো ভাল, তবে কি শিবুর মত হবে?" শীলা বলল, এবং করুণা ঘাড় নাড়ল।

"ওর সঙ্গে কোন তুলনাই চলে না। খুব ভাল হত যদি অরুণের মত তোদেরও কেউ থাকত।" চিত্রা সমবেদনা জানাল যেন। তাতে দুজনেই হাসবার চেষ্টা করল। তিনজনকে দেখে শিবু বলল, "দেখ তো নুন হয়েছে কিনা।" বাটিতে খানিকটা ঝোল এগিয়ে ধরল। চোখেমুখে উত্তেজনা। চিত্রা চুমুক দিয়ে জানাল নুন কম হয়েছে।

"শিবু, আমরা একসঙ্গে রয়েছি, আর তুমি এভাবে আলাদা হয়ে থাকলে খুব খারাপ লাগবে। চলো।"

"বাঃ, খাওয়া-দাওয়া করতে হবে না বুঝি!"

"হবে। ওসব পরে করলেও চলবে, এখন তুমি বেরিয়ে এস।"

শিবু কিছু আপত্তি করে অবশেষে, "নুন দিয়ে মাংসটা নামিয়েই যাচ্ছি" বলে ওদের বিদায় করল।

পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসে কিছুক্ষণ গল্প করে ওদের আর ভাল লাগল না। তখন অরুণ বলল, সাঁতার কাটা যাক। কেউ সাঁতার জানে না। কস্টিউম পরে অরুণ যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল, ওর জানুদ্বয় ও নাভি এই নির্জন স্থানে মেয়েদের কাছে অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিজেদের মধ্যে আবোল-তাবোল কথা শুরু করল আর অন্যমনস্ক হবার ভান করতে লাগল। অরুণ একাই জলে কিছুক্ষণ ঝাঁপাঝাঁপি করে, জলে নামার জন্য ওদের ডাকতে থাকল। অবশেষে চিত্রা নামল এবং তাকে পিঠে নিয়ে অরুণ সাঁতরাতে শুরু করল।

"বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে।"

"রীতিমত অসভ্যতা। এসব কি! আমরা রয়েছি খেয়াল নেই?"

চারজন মেয়ে এইভাবে কথা বলতে থাকল এবং শিব্ চুপ করে দেখছিল সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে। দীপালি বলল, "সাঁতার জান না, তুমি যে কি একটা।"

লজ্জায় তোতলা স্বরে শিব্ বলল, "একটু একটু পারি।"

"নামো তাহলে।" চারজন একসঙ্গে টানতে টানতে শিব্কে জলে ঠেলে দিল। অরুণ খুবই উৎসাহিত হলো। চিত্রাকে ঘাটে পৌঁছে দিয়ে বলল, "চলুন পারাপার করি।"

"না না পারব না আমি।" প্রায় পঞ্চাশ মিটার লম্বা পুকুরের ওপারে তাকিয়ে শিব্ বলল। "সেই ছোটবেলায় সাঁতার শিখেছিলাম, বছর দশেক হয়ে গেল। তারপর আর কাটিনি।"

কিন্তু সকলের বারংবার অনুরোধে রাজি হয়ে গেল। অরুণ যখন ওপারে ছুঁয়ে এপারের ঘাটে এসে পৌঁছল, শিব্ তখনো ওপারেই পৌঁছয়নি। শুরুতে মেয়েরা হৈ-হৈ করে শিব্কে উৎসাহ দিচ্ছিল। পরে চিত্রা ছাড়া বাকি চারজন চুপ করে গেল এবং ক্রমশ তাদের মুখে কাঠিন্যের জটিলতা এল। সুপ্রিয়া বলল, "ইচ্ছে করছে চুলের মুঠি ধরে ওটাকে চুবুনি দিই।"

"আমারও।" দীপালি বলল। তারপরই একসঙ্গে ওরা চেঁচিয়ে উঠল, "একি! ডুবে যাচ্ছে নাকি?" মাঝ-পুকুরে শিব্ ঘাটের দিকে অসহায় চোখে তাকিয়ে প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ছে, হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছে। ঝাঁপিয়ে পড়ল অরুণ। শিব্ ওকে জড়িয়ে ধরতে যেতেই মুখে ঘুষি মেরে চুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল ঘাটে। অবসন্ন হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে মাথা নামিয়ে শিব্ বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। চিত্রা বলল, "ও কি ডুবে যাচ্ছিল?"

"বোধহয়।" অরুণ কাঁধ ঝাঁকাল।

মাংস ভাত ছাড়া আর কিছু রান্না হয়নি। ঝোলমাখা ভাত মুখে দিয়েই সবাই শিবুর দিকে তাকাল। থু থু করে ফেলে দিয়ে দীপালি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অরুণ উঠে গিয়ে তাকে ধরে আনল, "নুন বেশি হয়ে গেছে হোক না। দই মেখে সন্দেশ দিয়ে ভাত খান।"

"একটা কিছুও যদি পারে।" শীলা চেঁচিয়েই বলল। "খালি বাহার দিয়ে মেয়েদের পিছনে ঘুরঘুর করা।"

শীলাকে চুপ করিয়ে দেবার জন্য অরুণ তাড়াতাড়ি বলে ওঠল, "এমন আর কি নুন হয়েছে, আমার তো বেশ লাগছে। শিবনাথবাবু ওদের কথা একদম বিশ্বাস করবেন না। ওরা না খায় তো না খাক, আমরা বরং ভাগাভাগি করে সাবড়ে দি।" অরুণ ভাতের গ্রাস মুখে দিল।

"আমি একাই খেয়ে ফেলতে পারি সবটা।" শিব্ টেনে টেনে হাসতে শুরু করল।

"থাক্, আর বাহাদুরি করতে হবে না।" শীলা তাচ্ছিল্যভরে বলতেই শিবু মাংসের হাঁড়িটা নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। কেউ ওকে ফিরিয়ে আনল না।

খাওয়ার পর দোতলার বারান্দায় পা ছড়িয়ে সবাই গল্প করছে। অরুণ আর চিত্রা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে, ভ্রূকুটি করছে, জিভ দেখিয়ে ভেংচি কাটছে, কিল দেখাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে গল্পে যোগ দিচ্ছে। হঠাৎ চিত্রা উঠে তিনতলার ছাদে চলে গেল। কিছুক্ষণ উসখুস করে অরুণও উঠল—"কি করছে দেখে আসি" অজুহাত দিয়ে।

চারটি মেয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকল। কিছু পরেই শিবু এল জ্বলজ্বলে চোখে।

"ভেবেছিলে পারব না? সব শেষ করে দিয়েছি।"

"দু-কিলো মাংস খেয়ে ফেললে?"

"বাজে কথা। নিশ্চয় কোথাও ফেলে দিয়েছ কি কুকুরগুলোকে খাইয়ে দিয়ে বাহাদুরি ফলাচ্ছ।"

"মোটেই না। তোমরা চারদিক পরীক্ষা করে দেখতে পার।"

বসে থাকতে ভাল লাগছে না। একটা উপলক্ষ পেয়ে বাগানে বেরিয়ে চারজন চারিদিকে খুঁজতে শুরু করল। একসময় করুণা ছুটতে ছুটতে দীপালির কাছে এসে বলল, "একটা ব্যাপার দেখবি আয়।"

বাগানের একধারে একটা মাটির ঘর। সম্ভবত চেলাকাঠ, ঝুড়ি-কোদাল ইত্যাদি রাখার। দরজা বন্ধ। দীপালিকে টেনে এনে করুণা বলল, "কান পেতে শোন।"

সন্তর্পণে দীপালি দরজায় কান ঠেকিয়ে ফিরে এল পাংশু মুখে। "অরুণ আর চিত্রা।"

"হ্যাঁ ছাদে যাবার ভান করে এখানে!"

"আগে থাকতেই প্ল্যান করেছিল।"

অন্য দুজনকে ডেকে ওরা খবরটা দিল। অবশেষে চারজনেই যখন ফিরে এল শিবু প্রবল উত্তেজনা নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "পেলে?"

"কি পাব?"

"যা খুঁজতে গিয়েছিলে?"

ওরা কেউ জবাব দিল না। নিজেদের মধ্যে এলোমেলো কথা শুরু করল।

"আজকের খবরের কাগজটা পড়ে আসা হয়নি।"

"বাবা বারণ করেছিল আসতে, জোর করে এসেছি।"

"আমার ঠিক উলটো, মা কোন ভোরে ঘুম থেকে তুলে দিয়েছে।"

"বড্ড খিদে পাচ্ছে।"

"পাবেই তো। ভাত না খেলে মনে হয় খাওয়াই হলো না।"

"দেখ্‌না কিছু যদি পাওয়া যায়। দেখেছিস কি সুন্দর ডাব হয়েছে।"

"পাড়বে কে, অরুণ তো উঠতে গিয়ে পারল না। আজ যদি ওদের মালিটা থাকত।"

"তার বাবাকে এই সময়ই বাঘে খেলো।"

"আমি ডাব পাড়তে পারি।" শিবু হঠাৎ বলে উঠল।

ওরা গ্রাহ্য করল না কথাটা। শিবু আবার বলল, "যদি পাড়তে পারি তাহলে কি দেবে?"

"তা হলে?" শীলা চোখ সরু করে বলল, "আমাদের যাকে চাও ওই ঘরে নিয়ে যেতে পারবে।" আঙুল দিয়ে বাগানের মাটির ঘরটা দেখাল। শিবু কথাটার অর্থ বুঝতে না পেরে বলল, "তাহলে আজ সকাল থেকে যা-যা ঘটেছে সব ভুলে যাবে, বলো?"

"হ্যাঁ যাব। কিন্তু যদি না পাড়তে পারো?" দীপালি তৈরিয়া হয়ে এগিয়ে গেল কয়েক পা। একটু ভেবে শিবু বলল, "তাহলে অন্য কলেজে ট্রান্সফার নোব।"

"না, না। তোমাকে পারতেই হবে। এইটে অন্তত পারতেই হবে।" করুণা অদ্ভুত গলায় বলল। শিবু অবাক হয়ে তাকিয়ে উত্তেজিত হিংস্র, এবং কাতর চারটি মুখ থেকে কোন অর্থ বার করতে পারল না।

খালি গায়ে, পাজামাটা উরু পর্যন্ত গুটিয়ে, শিবু প্রায় চারতলা উঁচু একটা নারিকেল গাছে ওঠার চেষ্টা শুরু করল। ওরা গাছটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। কয়েক হাত উঠেই সে নেমে এল।

"পেটে বড্ড চাপ লাগছে।"

"জানতুম এইরকম একটা অজুহাত দেবে।" দীপালি স্থান ত্যাগ করার ভঙ্গি করল।

শিবু কথা না বলে আবার ওঠার চেষ্টা শুরু করল। ধীরে ধীরে সে দোতলার উচ্চতা পার হল। চারটে মুখে বিস্ময় ফুটল। শিবু তিনতলার কাছাকাছি পৌঁছচ্ছে। একজন হাততালি দিয়ে উঠল। শিবু গাছটাকে জড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। দুটো পা পিছলে যাচ্ছে বারবার, আঙুলগুলো বেঁকিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, পারছে না। একটা ইঁটের টুকরো কুড়িয়ে শীলা শাসানি দিল, "শিবু খবরদার। এক ইঞ্চি নেমেছো কি ইঁট ছুঁড়ে মাথা ফাটিয়ে দোব।" এই বলে সে ইঁট ছুঁড়ল। ঠক করে গাছে শব্দ হতেই ধড়ফড়িয়ে শিবু ওঠার চেষ্টা আরম্ভ করল। কয়েকহাত উঠে আবার সে জড়িয়ে রইল গাছটা। শরীর থরথর করে কাঁপছে, নিশ্বাস নিতে হাঁ করল, একটুখানি পিছনে নেমে এল!

সঙ্গে সঙ্গে চারটি মেয়েই ইঁট কুড়িয়ে এলোপাথাড়ি ছুঁড়তে শুরু করল।

"পারতে হবে। পারতেই হবে, নইলে নামতে দোব না।" উন্মাদের মত দীপালি চীৎকার করে উঠল।

"আর একটু বাকি। শিবু চেষ্টা করো, চেষ্টা করো।" করুণা জোরে ইঁট ছুঁড়ল। শিবুর পাশ দিয়ে সেটা এবং এধারে শিবু, একসঙ্গে পড়ল। মাথাটা প্রথমে পাঁচিলে পড়ল সেখান থেকে দেহটা ছিটকে এল হাত পাঁচেক দূরে। বারকয়েক পা দুটো খিঁচিয়ে শিবু মরে পড়ে রইল।

ওরা কেউ কাছে এগোল না। সুপ্রিয়াই প্রথম জড়ানো স্বরে টেনে টেনে বলল, "আমি মোটে দুবার ছুঁড়েছিলাম, অনেক দূর দিয়ে চলে গেছে।"

শীলা শান্ত গলায় বলল, "কারুর ইঁটই ওর গায়ে লাগেনি। বোকার মত ওঠার চেষ্টা করেছিল, এটা অ্যাকসিডেণ্ট।'

তখন ঘুরে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয়া ছুটতে ছুটতে সেই মাটির ঘরের দরজায় আছড়ে, হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। ব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে অরুণ আর চিত্রা বেরোল। তারপর ছুটে এল শিবুর মৃতদেহের কাছে। তখুনি গাড়িতে তুলে ওরা রওনা হল কলকাতার দিকে।

সুপ্রিয়া শুধু একবার বলেছিল, "যদি বাঘটা এখন বেরোয়!" তাছাড়া পথে কেউ কথা বলেনি। সারাপথ ওদের পায়ের কাছে শাড়ি ঢাকা শিবু শোয়ান ছিল।

এবং তারা ফিরে এল

কারখানায় নাইট ডিউটি সেরে প্রথম বাসে ফিরেই ফেলা দত্ত রাস্তার টিউবওয়েলে চানটা সেরে নেয়। তারপর ঘণ্টা-তিনেক ঘুমোয়। টিউবওয়েলের পাশেই আঁস্তাকুড়। পাম্প করতে করতে হঠাৎ তার চোখে পড়ল। ঝুঁকে সে বস্তুটিকে নিরীক্ষণ করছে, তখন বারান্দা থেকে স্কুলমাস্টার অজিত ধরের বৌ তা দেখে স্বামীকে ডেকে আনল। তিনি চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ''অত মন দিয়ে কি দেখছেন ফেলুবাবু ?''

ফেলা দত্ত গম্ভীর মুখে হাতছানি দিয়ে ওকে ডাকল। তখন সরকারী ডিপো থেকে দুধ আনতে যাচ্ছিল সুব্রত মৈত্র। সে ওদের দুজনকে আঁস্তাকুড়ের ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অবশেষে ফেলা দত্ত সাব্যস্ত করল, "মনে হয় এ পাড়ারই কোনো ঘরে কেলেংকারিটা হয়েছে। ছি ছি ছি, পঞ্চাশ বছর বয়স হতে চলল, এ জিনিস পাড়ায় এই প্রথম দেখলুম।"

অজিত ধর মন্তব্য করল, "খোঁজ করে বার করা উচিত। আচ্ছা, পুলিসে খবর দিতে হবে কি ?"

সুব্রত মৈত্র ডি-ফিল পাওয়ার পর থেকে, স্ত্রীর নির্দেশে কথা বলা কমিয়ে দিয়েছে। রুবির ধারণা পণ্ডিত লোকেরা খুব গম্ভীর হয়। ডঃ মৈত্র যথোপযুক্ত গাম্ভীর্য সহকারে অভিমত দিল, 'ধরা না পড়লে পুলিস কি করে বার করবে ? আর এসব ব্যাপার মেয়েরাই ভাল ধরতে পারে। আগে ধরুন, তারপর পুলিসে খবর দিন।" এই বলে তিনি দুধ আনতে চলে গেলেন।

হনহনিয়ে যাচ্ছিল ভেলোর মা। তিনবাড়িতে কাজ, বেশিক্ষণ দাঁড়াবার তার সময় নেই। শুধু বলে গেল, "পাড়ার মেয়ে-বৌদের ধরে ধরে এগজামিন করলেই তো ন্যাটা চুকে যায়।"

খুবই চিন্তিত হয়ে অজিত ধর বাড়িতে ঢুকল। বড় মেয়ে খুকিকে শুয়ে থাকতে দেখেই আঁতকে উঠল সে। "কি ব্যাপার, শুয়ে এখনো ?"

বৌ বলল, "কাল থেকে তো ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো হয়েছে। কেমন গাটা ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করছে।"

"না না," অজিত ধর চাপা চীৎকার করে উঠল, "শোয়াটোয়া এখন চলবে না। বারান্দায় যাক, হাসুক, গান করুক, অসুখটসুখ এখন নয়। বিকেল হলেই সব বাড়ির মেয়েরা যখন ছাদে উঠবে তখন যেন স্কিপিং করে। মোট কথা আমার বাড়ির দিকে কেউ যেন সন্দেহের চোখে না তাকায়।"

খুবই চিন্তিত হয়ে ফেলা দত্ত বাড়িতে ঢুকল। ব্যাপারটা বৌকে বলা মাত্র সে তড়বড়িয়ে বলল, "তোমার সেজোছেলেকে ছাদে ওটা বন্ধ করতে বলো। অজিত মাস্টারের মেয়েটার সঙ্গে তো আজকাল খুব ঠ্যাকার চলে, তারপর কোনদিন একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবেখন। কারখানায় যা হোক একটা কাজে ঢুকিয়ে দাও, কথা তো গেরাহ্যি করো না। হোক একটা লটঘট।"

"কাজ কি বললেই আজকাল পাওয়া যায়।" ক্লান্তস্বরে ফেলা দত্ত বলল, "সবাইকেই তো তেল দিচ্ছি।"

দুধ নিয়ে ফিরেই সুব্রত মৈত্র শুনল, "কি যেন একটা আঁস্তাকুড়ে পড়েছে, ভেলোর মা চাটুজ্জে গিন্নিকে বলছিল শুনলুম?"

রুবির হাসি দেখে ডঃ মৈত্র বুঝল সবিস্তারে কিছু বলতে হবে না। "কোন্ বাড়ির কেলেঙ্কারি বলে মনে হয়?"

"কি জানি, ভেলোর মা তো বলছিল মেয়ে-বৌ সবাইকে এগজামিন করলেই বেরিয়ে পড়বে।"

"বৌয়েদেরও! তাহলে তো তুমিও পড়ে যাও এর মধ্যে। অবশ্য ডিস্টিংশন নিয়েই পাস করবে, ট্যাবলেট কাল পর্যন্ত তো চলবে?"

তাই শুনে হেসে উঠতে উঠতে রুবি ফ্যাকাসে হয়ে গেল। "কাল কেন পরশু না? এখনো তো তিনদিন রয়েছে।"

"সেকি দুটো থাকার তো কথা!"

দুজনে, একুশ দিন ও একুশ ট্যাবলেটের হিসেব কষতে শুরু করল। এবং একসময়ে ফল বেরোল—রুবি কোনো একদিন খেতে ভুলে গেছে। অতঃপর দুজনেই থমথমে মুখ নিয়ে বসে রইল।

ভেলোর মা কাজ সেরে চলে যাবার পরই চাটুজ্জে গিন্নি ছোট বৌয়ের ঘরে এসে ঢুকল।

"শুনেছ তো কি কাণ্ড হয়েছে।"

শুয়ে কাগজ পড়ছিল ছোট বৌ, উঠে বসে আঁচলটা স্ফীত মধ্যদেহের উপর বিছিয়ে দিল। তাইতে চাটুজ্জের গিন্নির ভ্রূ কুঞ্চন ঘটল বারকয়েক।

"আজকাল মেয়েরা তো ছেলেপুলে চায় না তাই কত কি করে। এই দেখ না কোন বাড়ির বৌয়ের কিত্তি আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে গেছে।"

"বৌয়েদের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন কেন মা, বিধবা কি কুমারী মেয়ের কীর্তিও তো হতে পারে।"

"তক্কো করা তোমার এক রোগ বাপু, কাপড় টেনে অত ঢাকাঢুকি দেবার কি আছে, অ্যাঁ, এত লজ্জা কিসের? যাও না, এবাড়ি ওবাড়ি একটু ঘুরে এসে। লোকে দেখুক। সবাই জানে এপাড়ায় তুমিই একমাত্র পোয়াতি। যা সন্দেহ-বাতিক মন পোড়ারমুখো পাড়ার।"

শাশুড়ী চলে যাবার পর ছোট বৌ রাগে গুম হয়ে বসে রইল। সকালের কলেজ থেকে ফেরার পথে থার্ড-ইয়ারের স্নিগ্ধা ছোট বৌয়ের হাতছানি পেয়ে দোতলায় এল।

"এ পাড়ায় আর কার বাচ্চা হবে বলতে পার?"

ভেবেচিন্তে স্নিগ্ধা জানাল, সে বলতে অক্ষম। তবে গৌরীর মার হতে পারে, কেননা প্রতি বছরই তার হয়, আট বছর তিনি বিশ্রাম পান নি।

সকাল থেকেই গৌরীর মা অন্যমনস্ক। ছাদে কাপড় মেলতে এসে পাঁচিলে ভর দিয়ে একদৃষ্টে আঁস্তাকুড়ের দিকে তাকিয়ে রইল সে। গৌরীর বাবা ভাত খাচ্ছিল, তখন সে শুধু একবার বলেছিল, "যেই করুক, বেঁচে গেল।" তাই শুনে গৌরীর বাবা বলে, 'ওইসব করার শখ হচ্ছে বুঝি।" "কেন হবে না, আমি কি পশু, আমি কি একটা বছরও ছাড় পাব না?' "ওরে বাব্বা, তুমি যে খুব আধুনিকা হয়েছ দেখছি, ডিভোর্স করবে না তো?" "উপায় থাকলে করতুম।" এই বলার জন্য এঁটো হাতের চড় খেয়েছে গৌরীর মা। দুপুরে পাঁচিলে ভর দিয়ে আঁস্তাকুড়ের দিকে তাকিয়ে টপটপ করে জল পড়ল তার চোখ দিয়ে।

বিকেলে ছাদে স্কিপিং করতে করতে খুকি টলে পড়ল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। দেয়ালে হেলান দিয়ে অন্য বাড়ির ছাদগুলো লক্ষ্য করতে করতে হঠাৎ তার মনে হল, তিন আর চারের-একের ফাঁক দিয়ে ছবিদের ছাদে কেউ নেই। প্রায়ই তো ছবি ওঠে, তবে নেই কেন আজ? ধীরে ধীরে সিধে হয়ে গেল খুকি উত্তেজনায়। তাহলে কি ওই! সাত-আট বছর আগে সে রোজ বিকেলে যেত ছবিদের বাড়ি। শাড়ি পরার সঙ্গে বাড়ির বাইরে যাওয়া কমে গেল। ছবির বাবার কি কারণে যেন চাকরি গেল, জেল হল। পাড়ায় রটল তহবিল তছরুপ করে ফাটকা খেলতে গিয়ে লোকটার সর্বনাশ হয়েছে। ওদের বাড়ি যাওয়া একদম বারণ হয়ে গেল। একদিন শুনল বাড়িওলা মেরেছে আট মাসের বাকি ভাড়ার জন্য। তারপর মা মারা যেতেই, পাঁচ ভাই-বোনের সংসার ছবির ঘাড়ে

পড়ল! ওর বাবা প্রায়ই বাড়ি ফেরে না। ফিরলে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, মাতাল হয়ে। একদিন পাড়ায় বলাবলি হল, ছবিকে গড়ের মাঠের দিকে সেজেগুজে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে রাত্রে।

জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে খুকির। তবু ছুটে এল সে স্নিগ্ধাদের বাড়ি। গৌরী সমেত আরো তিন-চারটি মেয়ে ছিল। তারা ঘিরে ধরে খুকির কাছ থেকে শুনল। তারপর সাব্যস্ত করল, 'চল্, গিয়ে দেখা যাক।'

"হঠাৎ উটকোভাবে কি যাওয়া যায়, এত বছর যখন যাই নি!"

"যদি গিয়ে দেখি ছবির কেলেঙ্কারি নয় তাহলে আমাদের মুখ থাকবে কোথায়?"

ওরা সবাই মনে মনে প্রার্থনা করল, কেলেঙ্কারি যেন ছবিরই হয়।

"তাহলে গিয়ে বলি, আমরা সবাই রবীন্দ্র-জন্মোৎসব করব, তোকে গান গাইতে হবে। ছবি তো খুব ভাল গান গাইত।'

"কেন, ওর আবৃত্তিও কি সুন্দর ছিল। স্কুলে একবার প্রতিমাদি কি বলেছিল ওর সম্পর্কে, মনে আছে?"

"মাসখানেক আগে ওকে একবার দেখেছিলুম, ইস্, কি রোগা হয়ে গেছে; গালদুটো বসা, চোখ গর্তে ঢোকা, আমায় দেখে কেমন জড়োসড়ো হয়ে হাসল। আগে কিন্তু খুব মিশুকে ছিল।"

"এ লাইনে গেলে এই রকমই হয়ে যায়। আমার তো মনে হয় খুকির আন্দাজই ঠিক?"

"আমারও তাই মনে হয়।"

সকলেই বলল, "আমারও।"

তারপর দল বেঁধে ওরা ছবিদের বাড়িতে হাজির হল। একতলায় একখানি ঘরে ছবিরা এখন থাকে। দোতলা থেকে বাড়িওলা নামিয়ে দিয়েছে। তারা কথাও বলে না, উঁকি দিয়েও দেখে না। ঘরটা অন্ধকার। একটিমাত্র জানলা পগারের দিকে, এখন বন্ধ। দরজাটাও ভেজানো।

ছবির ভাই বোনেদের দেখা যাচ্ছে না। সারা একতলাটা ছমছমে ঠাণ্ডা, ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

"কেউ নেই, চল ফিরে যাই।" ফিসফিসিয়ে একজন বলল।

"দরজায় তালা নেই যখন, কেউ থাকতেও পারে।"

"ঠেলে দেখব?"

"দ্যাখ্।"

অন্ধকার আর ভ্যাপসা গন্ধ প্রথমেই ওদের একপা পিছিয়ে দিল।

"কিছু দেখা যাচ্ছে না যে।"

"আলোটা জ্বাল না।"

একজন ঘরে ঢুকে দেয়াল হাতড়ে সুইচ পেল। টিপতে জ্বলল না।

"বাড়িওলা বোধহয় কানেকশন কেটে দিয়েছে।"

"মনে হচ্ছে কে যেন তক্তায় শুয়ে।"

"ধ্যাৎ, কে আবার এখন এইভাবে শুয়ে থাকবে।"

"সত্যি বলছি, দেখে আয় কেউ।"

খুকি ঘরে ঢুকল। অন্ধকারে ঠোক্কর সামলাবার জন্য দুহাত বাড়িয়ে এগোল। তারপরই প্রচণ্ড ভয় তার চীৎকারটা টিপে ধরল। তক্তায় কেউ শুয়ে। তার কাঁধে খুকির হাত লেগেছে।

বাইরে থেকে তাগিদ এল, "কি হল রে, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?"

খুকি ঝুঁকে হাত বোলাল দেহটায়। ঠাণ্ডা নিথর। নাকের সামনে আঙুল রাখল। নিশ্বাস পড়ছে না। গালে হাত রাখল, চুপসে রয়েছে। ঠোঁট দুটো শুকনো। চোখের পাতা খোলা, কানের পিছনে আঁচিলটাও হাতে ঠেকল।

খুকি বেরিয়ে এসে বলল, "ছবিটা মরে পড়ে রয়েছে রে।" এবং তারা ফিরে এল সন্তর্পণে, দ্রুত পায়ে, নীরবে।

রাত্রে নাইট ডিউটিতে বেরোবার আগে ফেলা দত্ত টিউবওয়েল থেকে খাবার জল আনতে গিয়ে আঁস্তাকুড়ে ঝুঁকে দেখল। ভেলোর মা তখন যাচ্ছিল বলল, "এতক্ষণ কি আর পড়ে থাকে, কাক-কুকুরে হয়তো খেয়ে ফেলেছে, কি ধাঙড়ে নিয়ে গেছে।"

"ইডিয়ট গাড়োল কোথাকার", ডঃ মৈত্র গজরে উঠল। রুবি মাথা নামিয়ে বসে। "ডাক্তার বলল, হতে পারে ওই একদিনের ভুলের খেশারত দিতে হতে পারে। তখন তো নার্সিং হোমে গিয়ে, ওই যা হয়েছে আজ..."

"হয় যদি হবে। রুবি হঠাৎ ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো উদ্ধত হয়ে উঠল।

মাথা নামিয়ে মুচকি হেসে গৌরীর মা বলল, "রাগ করব কেন্, তুমি তো আর পর ভেবে মারো নি। রাগ তো নিজের জনের উপরই লোক করে।"

"তাহলে শাড়িটা পরো, দেখি কেমন মানায়।"

"আগে আলোটা নিবোও বাপু!"

"ছ'মাসও তো বিয়ে হয় নি, এত তাড়াতাড়ি সংসারে আটকে পড়ার কি দরকার ছিল।" চাটুজ্জেদের ছোট বৌ শান্ত গলায় অনুযোগ করল।

"সময় কাটাবার একটা ব্যবস্থা হল, ভালই তো।"

"কেমন, সেজন্য তুমিই তো আছ।"

"আমি তো পুরনো হয়ে যাব এক সময়।"

কিছুক্ষণ পর ছোট বৌ ফিসফিসিয়ে বলল, 'আচ্ছা ওইরকম কিছু একটা ব্যবস্থা করা যায় না।'

সাড়া না পেয়ে বুঝল স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘর

চারটি ভাই এবং তাদের বৌ ছেলেমেয়েরা থাকতেও অমলা জানে পৃথিবীতে তার একটি মাত্র ভরসা অন্ধ বুড়ী মা'টি। ছাদের এই ঘরটিতে সে থাকতে পারছে যেহেতু মাকে দেখাশুনো করার আগ্রহ কারুর নেই, এবং মা বলেই বারান্দায় ফেলে না রেখে আস্ত একটি ঘরে থাকতে দিয়েছে। ছোট ভাই কমলের আজও বিয়ে হয়নি, কারণ আলাদা কোনো ঘর নেই। মা মারা গেলে অর্থাৎ তিন তলার ঘরটি খালি হলে তার বিয়ের উদ্যোগ করা হবে। মেজ বৌয়ের দূর সম্পর্কের আত্মীয়া একটি মেয়েকে পছন্দ করে রাখা হয়েছে।

সিঁড়িতে পিছলে পড়ে মা যেদিন মাথায় চোট পেল সেদিন থেকেই অমলার ভাবনা—মা' তো আর বাঁচবে না, তাহলে কি হবে। একদিন পনের টাকার টিউশনিতে যাবার পথে এই কথা ভাবতে ভাবতেই সে হাজির হল প্রভাসের বাড়ি।

প্রভাস মক্কেলের সঙ্গে কথা বলছিল, অমলাকে দেখে অবাক হল, কেননা গত চব্বিশ বছরের মধ্যে অর্থাৎ প্রভাসের বিয়ে হওয়ার পর পাঁচ-ছবারের বেশি তাদের সাক্ষাৎ ঘটেনি। মক্কেলটি বিদায় নিতেই অমলা গম্ভীর হয়ে বলল, "একটা ব্যাপারে পরামর্শ নিতে এলুম।"

প্রভাস তার পেশাগত গাম্ভীর্য মুখে ছড়িয়ে তাকিয়ে রইল।

"মার অবস্থা তো গত কয়েক মাস থেকেই সুবিধের নয়। মারা গেলে আমি কি করব?"

"কি করবে মানে?"

"আমার ভাইদের তো জান, তখন আমি কোথায় দাঁড়াব? ঘর জুড়ে থেকে কমলের বিয়ে বন্ধ করে আছি, ওর বিয়ের বয়স তো পেরিয়ে যাচ্ছে। মেজ বৌ আমাকে দেখতে পারে না অথচ মেজদাই সংসারের বড় খুঁটি। বড়দা আর সুবল কোনক্রমে দিন চালায়। মা আছে তাই আমিও আছি, কিন্তু মা বেশিদিন আর বাঁচবে না।"

মোটা পেন্সিলটা টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে প্রভাস পেশাদারী পরামর্শ দিল—"তোমার উচিত খোরপোষ দাবি করে মামলা করা, বহুদিন আগেই অবশ্য করা উচিত ছিল।"

"কিন্তু স্বামী তো আমায় ত্যাগ করেনি, আমিই চলে এসেছিলাম।"

"শুনেছি আবার বিয়ে করেছে। তোমায় যখন ডিভোর্স করেনি তাহলে আইনের চোখে সে বিয়ে অবৈধ, তুমিই তার বৈধ স্ত্রী। আর কে কাকে ত্যাগ করেছে সে নয় উকিলে বুঝবে, মোট কথা তোমার ভরণপোষণে সে এখনো বাধ্য।"

অমলা ঘাড় হেঁট করে চিন্তা শুরু করল। প্রভাস নাগাড়ে ঠকঠক করে যাচ্ছে। দেমাক দেখিয়ে যার কাছ থেকে চলে এসেছে এই বাইশ বছর পর তার কাছেই হাত পাততে হবে, এটা ভাবতে অমলার অস্বস্তি হচ্ছে। অন্য কিছু উপায়ে যদি একটা ব্যবস্থা করা যায়!

"কি রাজি নও ?" ভারি গলায় প্রভাস জানতে চাইল।

"তাই তো ভাবছি।"

পরিহাস করে প্রভাস বলল, "মামলা-টামলা না হলে উকিলদেরই বা চলে কি করে, দু চারটে ফী তো খাব।"

অমলা হেসে বলল, "মামলা করার টাকা কোথায় ? ওটা তোমাকেই দিতে হবে।"

গম্ভীর হল প্রভাস, পেশাগত গাম্ভীর্যটা আবার মুখে লাগিয়ে বলল, "আগে তুমি বরং দেখা কর। কি বলে শোন, যদি কিছু করতে রাজী না হয় তখন মামলার কথা ভাবা যাবে। ও কোথায় থাকে তা জানো তো ?"

"বাড়ি জানি না, ভাড়া বাড়িতে থাকে। তবে দোকানটা জানি। মনোহারী দোকান বাগবাজারে।"

"তাহলে আগে সেখানে গিয়েই দেখা করে কথা বল।"

অমলার মনে হল তার থেকে বরং মামলা করাই ভাল। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আমাকে খেতে পরতে দাও বলার মত লজ্জা আর কি থাকতে পারে। কিন্তু মামলার খরচ কে দেবে !

"মামলার খরচ তুমিই দাও না।" অমলার অজান্তে স্বরটা কাকুতির মত শোনাল।

"আমার ফী নয় ছেড়ে দিলুম, কিন্তু কোর্ট খরচ তো আছে।"

"আশ্চর্য," হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল অমলা, "আমার এই অবস্থার জন্য দায়ী কে ? আর কয়েকটা টাকার জন্য সাহায্য করবে না ?"

প্রভাস এমনভাবে তাকাল যেন শেখান সাক্ষীটি বক্সে উঠে উল্টো কথা বলছে। "কে দায়ী, আমি ?"

"তোমার চিঠিগুলোই তো সর্বনাশ করে ওর হাতে পড়ে।"

"সে তো আর তোমায় তাড়িয়ে দেয়নি। এই তো বললে – নিজেই চলে এসেছি।"

"হ্যাঁ, তোমার ওপর ভরসা করেই চলে এসেছিলুম।"

"আমি তো তোমায় চলে আসতে বলিনি, কোন চিঠিতে কি সেরকম কথা ছিল? বোকামি করেছ যেমন তার ফল তো ভোগ করবেই।"

অমলা থিতিয়ে গেল। প্রভাসের মুখে বিরক্তি, অস্বস্তি। শীতকালেও কপালে ঘাম ফুটল, দুটো কাঠি ভেঙে সিগারেট ধরাল।

"চিঠিগুলো কি তোমার স্বামী রেখে দিয়েছে?"

"না।"

"কি বলেছিল?"

"শুধু বলেছিল, একেই কেন বিয়ে করলে না। ওকে বলিনি যে তুমি আগেই বিয়ে করেছ, বড় লোকের একমাত্র মেয়েকে।"

"তাতে কি হয়েছে", প্রভাস জবরদস্ত সাক্ষীর মত রোখা সুরে বলল, "তোমার কি হিংসে হচ্ছে? লীলার বাবা না হলে কি ওকালতিতে দাঁড়াতে পারতাম?"

"আমি ওসব ভেবে বলিনি, তুমি চটছ কেন?" অমলা টেবিলে কনুই রেখে ঝুঁকে পড়ল।

গলার স্বর দ্রুত নামিয়ে প্রভাস সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলল, "চটেছি কে বলল, বয়েস পঞ্চাশ পেরোল, এ সব ব্যাপার নিয়ে চটাচটি করার ইচ্ছেও হয় না। অল্প বয়সে ছেলেমেয়েতে মেলামেশা হয়, বিয়ে থা করে সে সব ভুলে যায়। তুমিই বা ভুলে যাওনি কেন?"

"আমি পারিনি প্রভাস, আমি পারিনি।"

হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল অমলা।

"থাম।" প্রভাস রূঢ় ধমক দিল, "কান্নাকাটি কোরো না। মনে রেখ আমার স্ত্রী ছেলে-মেয়েরা এ-বাড়িতে রয়েছে। তোমার মামলা আমি করে দেব একটি পয়সাও লাগবে না, এখন এসো।"

কান্নার যে ইচ্ছেটা অমলাকে পেয়ে বসেছিল, তা প্রভাসের দ্রুত একটানা কথাতে মুছে গেল। ক্ষীণ স্বরে বলল, "যা সব লিখেছিলে তার সব মিথ্যে ছিল?"

কি যেন বলতে গিয়ে প্রভাস থেমে গেল। টেবিলে গ্লাসভরা জল রয়েছে। এক চুমুকে শেষ করে গ্লাস হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, মুখে মাথায় জল দিয়ে ফিরল।

"আমি যাচ্ছি," অমলা উঠে দাঁড়াল। প্রভাস স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "আমার কাজকর্ম, ভাবনা-চিন্তা সব কিছুরই একটা ছক তৈরি হয়ে গেছে অমু, তা ভেঙে বেরোনোর সাধ্য এখন আর আমার নেই। আমি সুখে আছি, আমায় তাই থাকতে দাও, আমায় কিছু মনে করতে বোলো না।"

অমলা নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে থেকে দেখল, প্রভাসের কেশবিরল মাথাটা নুয়ে

পড়ল টেবিলের উপর। ঘর থেকে বেরিয়ে যখন সে সদর দরজায় পৌঁছেছে, তখন ছুটে এল প্রভাস।

"তোমায় আমি বরং মাসে মাসে কিছু দিয়ে সাহায্য করব, মামলা করে দরকার নেই।"

অমলার মনে হল প্রভাস যেন প্রায়শ্চিত্ত করতেই কথাটা বলল। ওর ভঙ্গিতেও অপরাধী অনুকরণ। দেখে মায়া হয়, সংসার নিয়ে যেমন আছে থাকুক।

"তার দরকার নেই। মনে হবে তোমায় ভয় দেখিয়ে আদায় করেছি!"

অমলা আর দাঁড়াল না। বোকামি করেছি কি? আনমনে ভাবতে ভাবতে সে বাড়ির দিকে চলল। মায়া হয়। প্রভাস এখনো বুকে মোচড় দেয়, ও এখনো অমানুষ হয়ে যায়নি। এর থেকে বেশি আর কি চাইবার আছে। এ বয়সে এ জেনেই সুখ। কিন্তু আমি কি করব এখন? শেষে কি ভিখিরির মত হাত পেতে খোরপোষ নিতে হবে! বয়স প্রায় পঞ্চাশ হতে যাচ্ছে, এখন আর কোনো রকম বোকামি করা চলবে না। প্রভাসের প্রস্তাবটা এক কথায় নাকচ করাটা বোধ হয় ঠিক হল না।

রাস্তা পার হবার জন্যে সে দাঁড়িয়েছে, পিছন থেকে 'দিদিমণি' বলে সরস্বতীবালা ডাক দিল, অমলাদের বাড়িতে কাজ করত। মেজ বৌ মাস তিনেক আগে হঠাৎ ছাড়িয়ে দেয়।

"দিদিমণি বাড়ি যাচ্ছ নাকি, চলো আমিও যাব।"

'কেন গো।'

"হেস্তনেস্ত করব একটা, নয়তো আত্মঘাতী হব। দেখ ছোটবাবু কি সর্বনাশ করেছে আমার।" সরস্বতীবালা দেহের সামনে থেকে আঁচল সরাল।

"কদ্দিন!" অমলা আঁতকে উঠল।

"চার মাস। এখন আমি কি করব বল তো, লোকে সন্দেহ শুরু করেছে। ছোটবাবু বলেছিল আলাদা ঘর ভাড়া নিয়ে আমায় রাখবে।"

চোখে জল নিয়ে কথা শুরু করে গনগনে রাগে শেষ করল সে। অমলা সিঁটিয়ে গেল কেলেঙ্কারির কথা ভেবে।

"আমার একটু কাজ আছে সরস্বতী, আমি যাই।"

বলেই অমলা হাঁটতে শুরু করল। ব্যাপারটা জানাজানি হলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? কমল যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করুক ওর। এসব মেয়েমানুষরা তো টাকা পেলেই খুশি। তবে কমল টাকা পাবে কোত্থেকে। তা যদি থাকত আলাদা বাসা করে বিয়েই করতে পারত। এখন যদি এই ঝিটাকেই বিয়ে করে বসে।

হাঁটতে হাঁটতে অমলা বাগবাজারের দিকে চলে এসেছে। আর কিছুটা

গেলেই প্রফুল্লর দোকান। আজকেই কথা বলে দেখি, মানসম্মান নিয়ে বসে থাকলে এ বয়সে চলে না। তেজ দেখাবার বয়স চলে গেছে, লজ্জা কিসের, বিয়ে তো হয়েছিল, এই ভেবে অমলা দোকানের সামনে দাঁড়াল।

খদ্দের ভেবে এগিয়ে এসে প্রফুল্ল কাউণ্টারে ঝুঁকে বলল, "বলুন।"

বাইশ বছর দেখে না, সুতরাং পরিচয় না দিলে চিনতে পারবে না। নিজের নাম বলতে অমলার সঙ্কোচ হল। "কিছু কিনতে আসিনি।" মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে সে বলল।

চশমার পুরু কাঁচের পিছনে প্রফুল্লর দুটি চোখ বিস্ময় প্রকাশ করতে করতে, হঠাৎ সংবিৎ পেয়ে তীক্ষ্ণ হয়ে গেল। দোকানের আলো মলিন। সামগ্রীগুলোও মলিন। এর মধ্যে দাঁড়িয়ে অমলার যাবতীয় উত্তেজনা স্বাভাবিক হয়ে গেল।

"তাহলে কি চাই।"

স্বরে গাম্ভীর্য পরিমাপ করে অমলা বুঝল, চিনতে পেরেছে।

"কথা ছিল।"

প্রফুল্ল একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ডান গালের আঁচিলটার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেনি, গোঁফটা আগের থেকেও মোটা, জামার কলারে ময়লা, নখগুলো বড়, চামড়া খসখসে। এইসব জিনিস অমলাকে একদা বিরক্ত করেছিল। এখন সে তাই বোধ করল।

"আমার সম্বন্ধে কি ভেবেছ?" স্পষ্ট করে উচ্চারণের জন্য অমলা কেটে কেটে বলল।

"আমার তো ভাবার কথা নয়।"

"স্ত্রীর সম্পর্কে স্বামী ভাববে, এটাই তো নিয়ম।"

"স্ত্রীরও তো নিয়ম মানার অনেক কিছু আছে। তাছাড়া তুমি যে আমার স্ত্রী, কে বললো?"

"আইন।"

"ওঃ আইন দেখাতে এসেছ। বোধহয় তার কাছ থেকেই তালিম পেয়েছ!"

ঝগড়া করার জন্য প্রফুল্লর অবয়ব প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। অমলা ধীরকণ্ঠে বলল, "তার কাছ থেকে তালিম পেলে এখানে না এসে কোর্টেই যেতাম।"

প্রফুল্ল থতমত হল। বিচলিত হয়েছে বোঝা গেল হঠাৎ ঝাড়ন নিয়ে প্লাসটিক ব্যাগগুলো ঝাড়ার বহর দেখে। এই সময় এক খদ্দের এল পাঁউরুটি কিনতে। অমলা একধারে সরে দাঁড়াল। যাবার সময় লোকটি অভিযোগ করল, কালকের রুটি শক্ত বাসি ছিল।

"কোম্পানি যেমন দেয়, আমি কি করব বলুন।"

"কোম্পানিকে জানান।"

লোকটি চলে যেতেই অমলা বলল, "তাহলে কি ? ভাইদের সংসারে আছি। তাদের অবস্থা এমন কিছু ভাল নয়। এই বয়সে রোজগারই বা কি করব। শাড়ি গয়না চাই না, খাইখরচের টাকাটা তো দেবে।"

"কেন, আর কেউ কি দেবার নেই।"

"আর কেউ মানে ?"

প্রফুল্ল চুপ করে রইল। অমলা কাউণ্টারে চাপড় দিয়ে বলল, "তোমাকে দিতে হবে।"

"যদি না দিই।"

"তাহলে মামলা করে আদায় করব।"

"যদি বলি তুমি স্বেচ্ছায় চলে গেছ, আমি বরাবরই তোমাকে আমার কাছে রাখতে রাজী ছিলাম, এখনও আছি।"

"বলব মিথ্যা কথা। বলব প্রমাণ কর যে আমি স্বেচ্ছায় চলে গেছি। বলব, আর একটা বিয়ে করার জন্য আমায় তাড়িয়ে দিয়েছ; বলব, এখনো আমি তোমার কাছে যেতে চাই।"

"এ সবই তো মিথ্যা কথা। তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য কি তোমাদের বাড়ি আমি যাইনি ? কি বলেছিলে মনে আছে কি ?—যখন দরকার বুঝব যাব। দুবছর অপেক্ষা করে তবেই বিয়ে করি। সেই চিঠিগুলো যদি তোমায় ফেরত না দিতাম, তাহলে কি বলতে পারতে প্রমাণ করার কথা ?"

"চিঠিগুলো রাখোনি কেন ?"

"বোকামি করেছি।"

খদ্দের ঢুকতেই প্রফুল্ল থেমে গেল। জুতোর ক্রীম চাইছে। সঙ্গে সঙ্গে নেই বলে দিয়ে কাউণ্টারের ডালা খুলে সে বেরোল। দোকানের দরজার পাল্লা বন্ধ করে মাত্র একটুখানি খুলে রাখল।

"দাঁড়িয়ে কেন, এই টুলটায় বোস।"

অমলা বসল। "কি কাজে লাগবে ভেবেছিলে ?"

প্রফুল্ল কাউণ্টারে কনুই ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "অন্তত ওগুলো দিয়ে বাধ্য করতে পারতে তোমাকে বিয়ে করতে।"

"আমার তো বিয়ে হয়ে গেছল। ওরও হয়ে গেছল। ওসব চিন্তা আমি করিনি, করে লাভ হত না।"

"তোমার না হোক আমার তো হত। তাহলে খোরপোষের কথা আজ উঠত না। এইতো দোকান দেখছ, মাসে কতই বা রোজগার, বড়জোর শ' দুই টাকা। এর থেকে চল্লিশটা করে টাকা যদি দিতে হয়, তাহলে আমার সংসার অচল হয়ে পড়বে। তাছাড়া এখন যদি বলি, তোমাকে নিতে রাজী আছি। আসবে তুমি ? পারবে আমার সংসারে থাকতে ?"

প্রফুল্ল চোখ সরিয়ে গণেশ মূর্তিটার উপর রাখল। অমলা ইতস্তত করে কোনক্রমে বলল, "ছেলেমেয়ে কটি ?"

"বড়টি মেয়ে, আঠারোয় পড়ল। সম্বন্ধ করছি, তবে সকলেরই খাঁই বেশি। পরে চার ছেলে, সবাই পড়ছে। এই আয়ে চালাতে পারি না অমলা, ভিখিরিরও অধম হয়ে থাকি।" করুণভাবে প্রফুল্ল তাকিয়ে রইল। অমলা বাধ্য হল অন্যত্র তাকাতে।

"ওরা কি আমার কথা জানে ?"

"জানে।"

"কি বলে ?"

"তোমায় নিয়ে কোন আলোচনাই হয় না।"

"আর কেউ কিছু বলে না ?"

"গীতা তোমায় শুধু একবার দেখতে চেয়েছিল। আমি বলেছিলুম কিনা তুমি ওর থেকেও সুন্দরী।"

অমলা উঠে দাঁড়াল। প্রফুল্ল ধড়মড়িয়ে সিধে হয়ে বলল, "চললে ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কি করবে ?"

"কি আর করব, আমাকে তো বাঁচতে হবে। তোমরা সবাই বলছ বোকামি করেছি। এখন মনে হচ্ছে সত্যি তাই করেছি।"

"তুমি দাবি করবে ? তা অবশ্য পার। কিন্তু সেটা ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কিছু হবে না। কি করেছ স্ত্রী হিসাবে যে জন্য দাবি জানাতে পার ?"

ফ্যাকাসে মুখে শুনে যাচ্ছিল অমলা, প্রফুল্লের ভাবভঙ্গিতে ভয় পেল। হয়তো ঝাঁপিয়ে গলা টিপে ধরতে পারে। দরজার দিকে এগোতেই প্রফুল্ল দরজা আগলে দাঁড়াল।

"যেতে দাও। নইলে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব।"

"অমলা। আমার সংসারের এই সামান্য আয়ে ভাগ বসিও না। জোড় হাতে মিনতি করছি, ছা-পোষা মানুষ আমি।"

"তাহলে আমি কি করে বাঁচব !" এই বলে ধাক্কা দিয়ে প্রফুল্লকে সরিয়ে অমলা রাস্তায় নেমে এল। ওর সঙ্গে যাবার জন্য কয়েক পা এগিয়ে, দোকান খোলা আছে খেয়াল হতেই প্রফুল্ল দাঁড়িয়ে পড়ল। অমলা ঊর্ধ্বশ্বাসে হেঁটে শীঘ্র দূরে চলে যেতে ভাবল, এমন একটা জায়গা কি কোথাও নেই, যেখানে মাথা কুটে রক্তারক্তি করা যায় !

বাড়ি ফিরে অমলা নিঃসাড়ে দোতলায় উঠল। মেজ-বৌয়ের ঘরের দরজায় তালা, বোধ হয় সিনেমা দেখতে গেছে। বড়-বৌ দালানে বাচ্চার দুধ গরম করছে। ফিসফিস করে অমলা জিজ্ঞাসা করল, 'কেউ এসেছিল ?'

'কে আবার আসবে।' বড়-বৌ কাজে মন দিল। অমলা তিন তলার সিঁড়ি ধরল। যেখানে বাঁক নিয়েছে সিঁড়িটা, একফালি চাতাল বেরিয়ে গেছে। কমল তার ক্যাম্প খাটে শুয়ে আছে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে। ওর পাশ দিয়ে পা টিপে অমলা উপরে উঠে গেল।

মাঝ রাতে অমলার মনে হল, সিঁড়িতে কি যেন একটা হচ্ছে। বিছানা থেকে উঠে পা টিপে সিঁড়ির মাথায় এসে উঁকি দিল। অন্ধকারটা চোখে সয়ে যাবার পর বুঝল, উঁচু মত কিছু একটার উপর দাঁড়িয়ে একটা ছায়ামূর্তি কড়ি-কাঠে কিছু একটা বাঁধছে। কমলকে ধমক দেবার জন্য নিশ্বাস টেনে এবং ওকে ব্যাঘাত না করে বিছানায় ফিরে এসে, অমলা সেই নিশ্বাস ত্যাগ করল।

বয়সোচিত

"এবার তো ছেলেছোকরাদেরই যুগ এসে গেল। আমি যাচ্ছি, তারপর পবিত্র নাগ যাবে। যারা আঠারো কুড়ি টাকা মাইনেয় ঢুকেছিল সব একে একে যাবে। দুঃখ হবে কেন, জায়গা জুড়ে কি চিরকাল থাকা চলে?" মুখ নামিয়ে গুণেন ঘোষ কাজে মন দিল। আর একটা কথাও সেদিন সে বলেনি।

এর চারদিন পরেই ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বেয়ারার কাছ থেকে সবাই জানল, গুণেন ঘোষ সন্দীপবাবুর পা জড়িয়ে কেঁদে পড়েছিল এক্সটেনশন পাবার জন্য। পায় নি। তিনি বলেছেন বুড়োহাবড়াদের আর রাখবেনই না। এখন কোয়ালিফায়েড, স্মার্ট ছেলে অজস্র পাওয়া যায়। এবার থেকে নাকি দরখাস্ত নিয়ে ইন্টারভিউ করে সব চাকরি হবে।

প্রতাপ জানার পক্ষাঘাত হবার পর থেকেই তার ছেলে সন্দীপ কর্তা হয়ে বসেছে। নিজে গাড়ি চালায়, লিফট না পেলে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় ওঠে। প্রতাপ জানা থাকলে গুণেন ঘোষ যে দু-বছর এক্সটেনশন পেত, সে-বিষয়ে কারুরই দ্বিমত দেখা গেল না। এই বিরাট অফিস আর কারখানা তার একার চেষ্টায় গড়ে তোলার, কর্মচারীদের সঙ্গে তার অমায়িক ব্যবহারের, বিপদে-আপদে অর্থ সাহায্যের কথা ইত্যাদি সবই আলোচিত হল সেদিন।

এরপর থেকেই পবিত্র নাগের রাতের ঘুম কমে গেল। গুণেন তার থেকে মাত্র সাত মাসের সিনিয়র। পবিত্রর ছেলে বুড়ো এ-বছরই ডাক্তারি পাস করল। রোজগার করে দাঁড়াতে এখনো বছর তিন-চার। একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে, আরো একটির বাকি। রাতে যতক্ষণ না ঘুম আসে কানে শুধু বাজে গুণেনের কণ্ঠস্বর 'তারপর পবিত্র নাগ যাবে।'

ব্যাপারটা একদিন খুলে বলল স্ত্রী উমাকে। শোনামাত্র ফ্যাকাশে হয়ে গেল উমার মুখ। শুধু বলল, "রিটায়ার হলে চলবে কি করে? কটা টাকাই বা আর পাবে। জয়ন্তীর বিয়েতে তো চার হাজার পর্যন্ত তুলেছ।"

উমা পরামর্শ দিল প্রতাপ জানায় সঙ্গে দেখা করার। পরদিনই অফিস ছুটির পর পবিত্র হাজির হল মালিকের বাড়ি। ওর মনে পড়ল যখন দর্জিপাড়ার

ভাড়াবাড়িতে প্রথম সে প্রতাপ জানার সঙ্গে দেখা করতে যায় পাঁচ বছরের সন্দীপ তাকে বলেছিল, "বসুন, ডেকে দিচ্ছি।"

প্রায় পনেরো মিনিট পর চাকর এসে পবিত্রকে নিয়ে গেল দোতলার ঘরে। দেড় বছরেই দশাসই মানুষটি কঙ্কালসার হয়ে গেছে। বাঁদিক একদম পড়ে গেছে। কথা যা বলেন বোঝা যায় না। ডান হাত কোনোরকমে তুলে ওকে বসতে বললেন। চেয়ারটা খাট ঘেঁষে টেনে পবিত্র বসল।

প্রায় আধঘন্টা চুপ করে বসে পবিত্র বাড়ি ফিরল। উমা ব্যগ্র হয়ে জানতে চাইল, উনি কিছু করবেন বলে কথা দিলেন কিনা। পবিত্র ভারি অসহায় বোধ করল। যার নড়াচড়ার বা কথা বলারই ক্ষমতা নেই তাকে কি এইসব ব্যাপার জানানো যায়। উমার মুখ দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে গেল।

দিন-তিনেক পর রাতে উমা এসে বসল পবিত্রর বিছানায়। ফিসফিস করে বলল, "সন্দীপবাবুর সামনে চটপটে ভাব দেখিয়ে ঘোরাঘুরি করো না। তোমাকে তো খুব বুড়ো আর দেখায় না।"

"তা কি করে হয়। ওতে কি বয়স কমে?"

"কেন হবে না। ওপরের পাঁচুদাসবাবুর তো সব চুল পাকা, বুঝতে পারবে দেখলে? আর কেমন সিধে হয়ে হাঁটে।"

"ওতো এককালে ফুটবল খেলত, স্বাস্থ্যটা এখনো ভালো। তাছাড়া প্যান্ট পরলে অনেক স্মার্ট দেখায়।"

"তুমিও পরবে। বুড়োর প্যান্ট তোমারও হবে। দরকার হলে দর্জির কাছ থেকে ছোট করিয়ে আনবে।"

পরের সোমবারই চুলে কলপ দিয়ে, ছেলের প্যান্ট এবং নতুন বুটজুতো পরে পবিত্র অফিসে এল। দেখে সবাই হাসল, ঠাট্টা করল। দু-একজন ঘুরিয়ে এমন কথাও বলল, রিটায়ারের সময় আসছে বলেই ছোকরা সেজেছে। পবিত্র এ-সবের কিছুই গ্রাহ্য করল না। শুধু খুঁটিয়ে লক্ষ করতে লাগল অল্পবয়সীদের চলাফেরা রকমসকম।

নতুন জুতোর তলায় ভালো করে ধুলোও লাগে নি। এখনো চলতে গেলে পা হড়কায়। তাই পা টিপে টিপে পবিত্র অফিসের সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। হঠাৎ ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে উঠে আসতে দেখে হকচকিয়ে প্রায় ছুটেই সে নামতে শুরু করল। সিঁড়িটা যেখানে ঘুরেছে তার শেষ ধাপের তিনটি সিঁড়ি উপর থেকে পবিত্র লাফ দিল। হাঁটু নুয়ে পড়ছিল, টাল সামলে উঠতে গিয়ে জুতো পিছলে গেল। ম্যানেজিং ডিরেকক্টরই ওকে টেনে তুলল। এবং বেশ সহানুভূতির সঙ্গেই বলল, "সাবধানে নামা-ওঠা করুন। এই বয়সে হাত পা ভাঙলে আর সারবে না!"

শুনে পবিত্র বিমর্ষ হয়ে পড়ল। বহুক্ষণ ভাবল 'এই বয়সে' বলতে কি

বোঝাল ? বুড়ো হয়েছি অর্থাৎ শারীরিক অক্ষমতার ইঙ্গিত দিল কি ? 'এই বয়সে' মানে কি ষাট বছর বয়স ! রাতে উমার কাছে পবিত্র ঘটনাটা বিবৃত করল। ক্ষুব্ধ হয়ে উমা বলল, "নিশ্চয় তোমার বয়সকে ঠেস দিয়েই বলেছে। হয়তো রিটায়ারের সময় এই ঘটনাটার কথাই ওর মনে পড়বে তখন আর চাকরি বাড়াতে চাইবে না। কেন ওভাবে নামতে গেলে ?"

"ওভাবেই তো সুখেন্দুকে নামতে দেখি।"

পরদিনই উমা আঁশবঁটি দিয়ে জুতোর তলা ঘষে দিল। জুতো পরে চেয়ার থেকে পবিত্র বার পাঁচ-ছয় লাফিয়ে নামল। অফিস বেরোবার সময় ফিসফিস করে উমা বলে দিল, "এখন কিছুদিন একদম সামনাসামনি হবে না। ভুলে যেতে দাও। বড় বড় ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় তো, ছোট ব্যাপার আর কদিনই বা মনে করে রাখবে।"

পবিত্র প্রাণপণ করে চলল যাতে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে তার দেখা না হয়। মাসখানেক পর সন্দীপ জানা তাদের ঘরে ব্যস্ত হয়ে ঢুকে বিল-ইনচার্জ প্রভাকরের সঙ্গে টেবিলে হাত রেখে ঝুঁকে কথা বলতে শুরু করল। পবিত্রর টেবিলে তখন চায়ের কাপ আর মুখে টোস্ট। ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে দেখেই বিষম খেল। খকখক করে কাশতে শুরু করল। সন্দীপ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই পবিত্র দম বন্ধ করল কাশি চাপতে। চোখ দুটো ঠিকরে পড়ার দশা, মুখের খাবার গিলবার জন্য কোঁত পাড়ল। ঘরের সকলেই তার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছে। সন্দীপ খুব সহানুভূতির সঙ্গেই বলল, "আপনার কি কাশির অসুখ আছে ? আমাদের ডাক্তারকে দেখিয়ে নিন না।"

পবিত্র জোরে মাথা নাড়তে থাকল।

বাড়ি ফিরে পবিত্র ঘটনাটার কথা উমাকে বলল না, শুধু 'কাশির অসুখ' কথাটা তার মনে পাক খেয়ে ফিরতে লাগল। কি বোঝাতে চাইল ? কাশিটা কি যক্ষ্মারোগীদের মতো ছিল ? এটা কি ও মনে রাখবে ? যদি রাখে তাহলে এক্সটেনশন কি পাওয়া যাবে ?

কিছুদিন পর অফিসে একটা চাপা উত্তেজনা দেখা গেল। স্পোর্টস হবে। ইতিপূর্বে কখনো হয় নি। এক ছোকরা সহকর্মী পবিত্রকে পরামর্শ দিল, "দাদা, বুড়োদের জন্য ওয়াকিং রেস আছে, নেমে পড়ুন। সন্দীপবাবু প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউট করবেন। যদি ফার্স্ট-সেকেন্ড হন, নজরে পড়বেন। আপনি যে ফিজিক্যালি ফিট সেটা তো প্রমাণ হবে।"

কথাটা মনে লাগল। উমাকে বলামাত্রই সে সায় দিল।

"কতটা হাঁটতে হবে ?"

"তা প্রায় আধ মাইল।"

"পারবে না ?"

পবিত্র কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "খুব জোরে হাঁটতে হবে। ফার্স্ট-সেকেণ্ড না হলে লাভ কি ?"

"তা তো বটেই। কাল থেকেই হাঁটা অব্যেস কর। আমি বরং ভোরবেলা তুলে দেব। পার্কে গিয়ে হাঁটবে।"

পবিত্র পরদিন থেকে হাঁটার অভ্যাস শুরু করল। আলো ফোটার আগেই উমা তাকে তুলে দেয়। পার্কে গিয়ে কয়েক চক্কর হেঁটে বেঞ্চে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে বাড়ি ফিরে আসে। একদিন উমা বলল, "চলো আমিও যাই। দেখব তুমি কেমন হাঁটতে পার।"

পার্কের বেঞ্চে উমা বসে রইল। পবিত্র একপাক দিয়ে তার সামনে আসামাত্র বলল, "এ তো বেড়ান হচ্ছে। এভাবে চললে কি ফাস্ট সেকেন হওয়া যায় ?"

পবিত্র চলার বেগ বাড়াল। তিনপাক দেবার পর হাঁফিয়ে উঠে, উমার পাশে এসে বসল।

"আধ মাইল হয়ে গেল !"

"আর পাচ্ছি না।"

"তাহলে হবে কি করে ? বুড়োকে ডাক্তারখানা করে দিয়ে বসাতে হবে ; বাসন্তীর বিয়ে এই বছরেই দেব ; আর বলছ পাচ্ছি না ? ওঠো ওঠো। আর দিন-পনেরো মোটে সময়।"

পবিত্র জোরে আরো তিনপাক হেঁটে এসে বসল। পা কাঁপছে। হাঁ করে শ্বাস নিতে নিতে উমাকে বলল, "এভাবে কি জোয়ান সাজা যায় !"

উমা কথা না বলে সামনে তাকিয়ে থাকল। পবিত্র হাঁটুতে হাত রেখে ঘাড় নিচু করে কিছুক্ষণ হাঁফাবার পর আস্তে আস্তে বলল, "এতখানি বয়েস হল তার আর কোনো দাম রইল না।"

এরপর থেকে রোজই উমা সঙ্গে আসে। পবিত্র চক্কর দিতে থাকে। যখন কাছে আসে উমা গলা এগিয়ে ফিসফিস করে, "জোরে। আরো জোরে।" পবিত্র তাই শুনে হাঁটার জোর বাড়ায়। কখনো কখনো উমাও হাঁটে ওর সঙ্গে। কিছুটা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। পবিত্র চক্কর সম্পূর্ণ করে এলে আবার কিছুটা সঙ্গে থাকে। রাতে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে সে পবিত্রর পা টিপে দেয়।

স্পোর্টসের দিন পবিত্রর সঙ্গে উমাও মাঠে গেল। সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। অ্যামপ্লিফায়ারে গানের রেকর্ড বাজছে। কর্মকর্তারা তদারকিতে ব্যস্ত। পবিত্র আর উমা একধারে দুটি চেয়ারে বসে রইল। বিরাট এক টেবিলে পুরস্কারগুলি সাজানো। উমা বলল, "কোনটা তোমাদের ?"

"কি জানি ! শুনেছি অ্যাটাচি ব্যাগ দেবে।"

"তাহলে বুড়োর কাজে লাগতে পারে।"

পবিত্র মুখ ফিরিয়ে স্পোর্টস দেখতে লাগল। সকাল থেকে উমা কিছু খেতে

দেয়নি। তেষ্টায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। কোকা কোলা বিলানো হচ্ছে প্রতিযোগীদের। পবিত্র উঠে পড়ল। গুটি গুটি এগোতেই উমা পিছু নিল।

"জল খেতে যাচ্ছি।"

"বেশী খেওনা।"

উমা চেয়ারে এসে বসল। পবিত্র দু-বোতল কোকা কোলা শেষ করে তৃপ্তি বোধ করল। ফুরফুরে হাওয়া, রোদটাও মিঠে লাগছে তাই সে ইতস্তত বেড়াতে লাগল। দূরে দূরে ঘেরা ফুটবল মাঠ। মাঝে মাঝে ক্লাবের তাঁবু। অনেক মাঠেই ক্রিকেট খেলা চলছে। এধারে মনুমেণ্ট, ওধারে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। ট্রামগুলো খেলনার গাড়ির মতো। পবিত্র কিছুক্ষণ দূরের ট্রাম-বাসের চলা দেখল। এক জায়গায় অনেক লোক ভিড় করে। এগিয়ে গেল সে। ম্যাজিক দেখাচ্ছে দাঁতের মাজনের ফিরিওলা।

অবাক হয়ে সে মাজনওলার বক্তৃতা শুনছিল। হাতে টান পড়তেই ফিরে দেখে উমা।

"এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি চলবে? সন্দীপবাবু এইমাত্র এল, যাও সামনে গিয়ে দাঁড়াও। কত লোক তো ঘুরঘুর করছে, কথা বলছে।"

গজগজ করতে করতে উমা ওকে নিয়ে ফিরে এল সামিয়ানার কাছে। সন্দীপ জানা হেসে হেসে কথা বলছে, কর্মচারীর ছেলেমেয়েদের পিঠ চাপড়াচ্ছে, গাল টিপছে। পবিত্র ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একজন বলল, "পবিত্রবাবু আজ ওয়াকিং রেসের সব থেকে ভেটারেন কম্পিটিটর।"

"তাই নাকি!" ম্যানেজিং ডিরেক্টর খুব অবাক হল, "তাহলে তো আপনাকে জিততেই হবে। যদি জেতেন আপনাকে আমি একটা স্পেশাল প্রাইজ দেব।"

পবিত্র কাছে আসতেই উমা ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন। "কি, কি বলল?"

"যদি জিতি, স্পেশাল প্রাইজ দেবে আমাকে।" পবিত্রর কণ্ঠে উমার মতো উত্তেজনা নেই।

"তাহলে তো জিততেই হবে তোমাকে। ওঃ রাধামাধব! এইবারটি অন্তত মুখ তুলে চাও। সারাজীবনই তো জ্বালাতন-পোড়াতন হলুম।" উমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ফোঁপানি চাপতে মুখে আঁচল দিল! ম্যাজিকওলাকে ঘিরে এখনো ভিড় জমে আছে। পবিত্র সেইদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

সর্বশেষে ওয়াকিং রেস। মাঠটা গোল হয়ে দুটো চক্কর দিতে হবে। দর্শকরা চেয়ার থেকে উঠে এসে লাইনের ধারে জড়ো হয়েছে মজা দেখতে। প্যাণ্টটাকে হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে পবিত্র প্রতিযোগীদের সঙ্গে দাঁড়াল। অফিস এবং কারখানা মিলিয়ে পনেরোজন। সকলে পঁয়তাল্লিশ বছরের উপরে। দর্শকরা উৎসাহ দিয়ে কথা বলছে। উমা শুধু একধারে ঠায় দাঁড়িয়ে।

পিস্তল ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল হাঁটা। দর্শকদের মধ্যে হৈ-হুল্লোড়। অনেকে প্রতিযোগীদের সঙ্গে লাইনের পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগল চীৎকার করতে করতে। প্রথম চক্করে সিকি পথ পবিত্র সবার আগে! মাঝপথে দেখা গেল তিন-চারজনের পিছনে। চক্করটা শেষ হবার আগেই পিছনের লোকেরা ওকে ধরে ফেলল। দর্শকদের চীৎকারে দূরের পথিকরাও একবার থমকে এদিকে তাকাল।

পবিত্র অসহায় বোধ করল। পাশের লোকটি তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। উমা কোথায়, তাই দেখতে গিয়ে চোখ পড়ল ম্যানেজিং ডিরেক্টর হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে অগ্রবর্তীদের। পবিত্র দমে গেল। খালি পেট মোচড় দিচ্ছে। ঘাড়টা কাত হয়ে পড়েছে। হাত দুটো পাঁজরের দুপাশে গাছের ভাঙা ডালের মতো দুলছে। সামনের লোকেদের সঙ্গে তার ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সে চমকে উঠল উমাকে দেখে। লাইনের পাশে সর্বস্বান্তের মতো দাঁড়িয়ে।

"এইভাবে তুমি ডোবাবে।" উমাও ওর সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেছে আর তিক্ত হতাশ কণ্ঠে বলছে, "সবাই এগিয়ে যাচ্ছে। এগোও। আরো জোরে হাঁটো, আরো জোরে, এই তো, এই তো।"

চিবুক তুলে, নিঃশ্বাস টেনে পবিত্র জোরে হাঁটতে চেষ্টা করল। মাথা নড়ছে ছ্যাকরা গাড়ির টাল-খাওয়া চাকার মতো। দুটো হাত লগবগ করছে। গোটা শরীর আলোড়িত হয়ে হাস্যকর দৃশ্য তৈরি করল। তবে ওর আগের লোকের সঙ্গে ব্যবধান কয়েক মিটার কমল।

উমা তাল রাখতে ছুটতে শুরু করেছে। আর চাপাস্বরে বলে চলেছে, "এই তো, এই তো! সবাই দেখছে, সন্দীপবাবু দেখছে। কে বলে তোমার বয়স হয়েছে? কে বলে বুড়ো হয়েছ?"

মাঠের দর্শকরা এতক্ষণ নাগাড়ে চীৎকার করে যাচ্ছিল। এখন তারা হঠাৎ চুপ করে, পবিত্র আর উমাকে দেখতে লাগল। কথা বলার দরকার হলে ফিসফিস করছে। পবিত্র দ্বিতীয় চক্করের অর্ধেক পার হয়েছে। প্রথমজন ফিতের দিকে এগোচ্ছে।

"সব্বোনাশ হল। পৌঁছে গেছে যে গো।" উমা দাঁড়িয়ে পড়ল। তখন পবিত্র মরিয়া হয়ে হঠাৎ ছুটতে শুরু করল। প্রতিযোগীরা অবাক হয়ে কেউ কেউ থমকে দাঁড়াল। এতক্ষণ সারা মাঠ একটা কিছুর প্রত্যাশায় দম বন্ধ করেছিল। এবার হৈ-হৈ করে চীৎকার, হাততালি আর হাসি শুরু করল। পবিত্র সবার আগে ফিতে ছিঁড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দিকে তাকিয়ে হাসল।

লাউডস্পীকারে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা হচ্ছে। হাততালি পড়ছে। পবিত্র আর উমা তখন অবসন্ন গতিতে ধর্মতলার ট্রাম টার্মিনাসের দিকে হেঁটে

চলেছে। কেউ কথা বলছে না। পবিত্র একটু পিছিয়ে। মাঝে মাঝে মুখ তুলে দু-ধারে তাকাচ্ছে। প্যাণ্টটা তখনো হাঁটু পর্যন্ত গোটানো।

ট্রামে উঠে পবিত্র উমার সীটের পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। উমা তাকে বসতে বলল না।

পরদিন ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, পবিত্র অফিসে গেল। ফিরে এল দুপুরে। উমা বিস্মিত হয়ে তাকাবামাত্র সে বলল, "আর রিটায়ার করাতে পারবে না। রিজাইন দিয়ে এলুম।"

অস্থায়ী পলায়ন

শীতে কলকাতায় ক্রিকেট শুরুর সঙ্গে সঙ্গে অনাদিও সাদা ট্রাউজার্স, সাদা শার্ট আর সাদা কেডস পরে হাতে কিট ব্যাগ ঝুলিয়ে ময়দানে এমাঠ ওমাঠ ঘুরে বেড়ায় আর সুযোগ পেলেই চুরি করে। ওর চাল-চলন বা কথায় কেউ সন্দেহ করে না। সহজভাবে খেলোয়াড় বা কর্মকর্তাদের সঙ্গে মেশে, টেণ্টের মধ্যে ঢুকে যায়। যখন মাঠে খেলা চলে এবং দু-দলের লোকেরা মাঠের ধারে খাটানো সামিয়ানার নিচে, বা টেণ্টের মধ্যে যখন ঢিলেঢালা পাহারা. অনাদি তখন কাজ হাসিল করে। হাতঘড়ি, ফাউণ্টেন পেন, মানিব্যাগ, টেরিলিন শার্ট বা ট্রাউজার্স, দামী ব্যাট, জুতো যা পায় হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়ে।

সেদিন অনাদি ব্যাগ হাতে একটু ব্যস্ততার সঙ্গে মালিকে জিজ্ঞেস করল, "এটা কোন ক্লাবের মাঠ ?"

"ইউনাইটেড ক্লাবের।"

"এ মাঠে আজ হাতিবাগান স্পোরটিংয়ের খেলা না ?"

মালি ঘাবড়ে গেল, তারপর বিরক্ত হয়ে বলল, "কি জানি, বাবুদের জিজ্ঞাসা করুন।" চুনগোলা বালতি নিয়ে মালি মাঠের দিকে চলে গেল। অনাদি লক্ষ করল, টেণ্টের দরজায় দাঁড়িয়ে ধুতির মধ্যে শার্ট গোঁজা, টাক-মাথা এক মাঝবয়সী লোক খুবই উৎকণ্ঠিত হয়ে এধার ওধার তাকাচ্ছে। টেণ্টের মধ্যে বুট পরে সিমেন্টের মেঝের উপর চলাফেরার শব্দ হচ্ছে খড়মড় খড়মড়। ড্রেস-করা একজন ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে টাকমাথাকে কি যেন বলতেই লোকটি রেগে উঠে চেঁচিয়ে বলল, "আসবে কি আসবে না, সেটা ঠিক করে বললেই তো পারত। এখুনি তো টিমের নাম সাবমিট করতে হবে।"

টেণ্ট এবং তার সংলগ্ন কাঠা তিনেক জমি নিচু ফেন্সিং-এ ঘেরা। তার মধ্যে রয়েছে ঘাসে ঢাকা একফালি জমি। কিছু গাঁদাফুলের গাছ। দুটো বেঞ্চ। টিউবওয়েল। অনাদি এগিয়ে গেল টাকমাথা লোকটির দিকে।

"আচ্ছা আজ কি এখানে হাতিবাগানের খেলা আছে।"

"হাতিবাগান!" লোকটি অবাক হয়ে গেল। "ও নামের কোন ক্লাব খেলে নাকি ?"

"তাতো জানি না।" আমতা-আমতা করে অনাদি বলল, "আমার এক বন্ধু বলেছিল কিন্তু খেলাটা যে কোন মাঠে সেটাই ভুলে গেছি। লীগের নয়, এমনি ফ্রেন্ডলি খেলা।"

"তাহলে এতবড় গড়ের মাঠে আর কি করে বার করবেন।" লোকটিকে অনাদির থেকেও বেশী হতাশ মনে হল। "আপনি খুঁজছেন ক্লাব, খেলবেন বলে, আর আমার ক্লাব খুঁজছে তার প্লেয়ারদের! কাল তিনজন এক সঙ্গে বরযাত্রী গেছে রানাঘাটে, বলে গেছে ঠিক সময় মাঠে পৌঁছব। আর এখন দশটা বাজতে···"

টেণ্টের মধ্যে থেকে শাদা-কোট পরা আম্পায়ারকে বেরিয়ে আসতে দেখে টাকমাথা চুপ করে গেল। "আর দু-মিনিট স্যার। আমি আপনার হাতে লিস্ট দিয়ে আসব। জাস্ট দু-মিনিট। বুঝতেই তো পারছেন কি মুশকিলে পড়েছি।"

আম্পায়ার হাতঘড়ি দেখে আবার ভিতরে ঢুকে গেল। লোকটি কিছুটা আপন মনে কিছুটা অনাদিকে উদ্দেশ করে কাতর স্বরে বলল, "সাত সকালে মাংস রান্না করে, হাঁড়ি-কুড়ি, কাপ-ডিস-প্লেট, খেলার ব্যাট-প্যাড—এত লটবহর নিয়ে যদি ইছাপুর থেকে আসতে পারি, আর বাবুরা নেমন্তন্ন খেয়ে · ঘণ্টু ছাড়া তো মোটে ন'জন হাজির হয়েছে, ঘণ্টু-স্কোর লিখবে, আর···ধ্যেৎ এভাবে কি ক্লাব চালানো যায়।"

টেণ্ট থেকে চারটি ছেলে ব্যাট আর বল নিয়ে বেরিয়ে গাঁদাগাছের পাশে খুটখাট প্র্যাকটিস শুরু করল। মাঠের ধারে খাটানো সামিয়ানার পাশে কয়েকজন বল লোফালুফি করছে। পাশের মাঠের সাইট স্ক্রীন বাতাসে খুলে বাঁশে ঝুলছে। পাশের টেণ্ট থেকে ভারী গলায় মালিকে ধমক দেবার শব্দ এল। অনাদির শীত করছে। রোদ্দুরে মাঠের ধারে ঘাসের উপর এখন উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে আরাম।

"বকুদা তাহলে কি হবে?" কাগজ আর কলম হাতে বুটের খড়মড় আওয়াজ তুলে একজন এসে দাঁড়াল। "ইউনইটেড তো অনেকক্ষণ টিম সাবমিট করে দিয়েছে।"

অনাদি এগিয়ে গেছে খানিকটা। টাকমাথা লোকটি অর্থাৎ বকুদা ছুটে এসে ওর হাত ধরল। "কোথায় আর হাতিবাগান স্পোরটিংকে খুঁজে বেড়াবেন, তার চেয়ে আজ আমাদের হয়েই খেলে যান। নামটা কি বলুন তো, লীগে আর কোন ক্লাবের হয়ে খেলেননি তো? আর খেললেই বা কেউ ধরতে পারবে না। বরং একটা ফলস নামেই খেলুন, কেমন?"

অনাদিকে কথা বলার কোন সুযোগ না দিয়ে বকুদা ঘষঘষ করে কাগজে নাম লিখে, "অঞ্জন বিশ্বাস, কেমন? তবু তো দশজন হল।" বলতে বলতে ছুটে টেণ্টের মধ্যে ঢুকল।

ইউনাইটেড ১৫৭ রান তুলল চার উইকেটে। অনাদি প্রথম আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিনটি ক্যাচ ফেলল। প্রথমটি স্লিপে, দ্বিতীয়টি মিড-অনে, তৃতীয়টি ডীপ-স্কোয়ার লেগে। পাড়ার রাস্তায় ক্যাম্বিস বলে ক্রিকেট খেলার বেশি অনাদি আর খেলেনি। এ রকম একটা পরিস্থিতিতে পড়তে হবে কখনো ভাবেনি সে। তার দলের প্রত্যেকের মুখের বিস্ময়, অসহায় বিরক্তিতে রূপান্তরিত হল। মাঠের বাইরে দুটো চ্যাংড়া ছেলে কিছুক্ষণ ওর পিছনে লেগে অবশেষে একঘেয়ে বোধ করে চলে গেল। অনাদিকে কোথায় যে দাঁড় করাবে, ভেবে পাচ্ছে না অধিনায়ক। লং লেগ থেকে লং অন তারপর ডীপ একস্ট্রা কভার, অবশেষে ডীপ থার্ড-ম্যান। উবু হয়ে ভয়ে ভয়ে দুহাতে থাবড়ে বল আটকাতে গিয়ে আটটা বাউণ্ডারী দিল অনাদি। ওর কাছে বল গেলেই ব্যাটসম্যানরা নির্ভাবনায় রান নেয়। মাঠের বাইরে ইউনাইটেডের লোকেরা তখন হৈ-চৈ, হাসাহাসি করে। মাঠের মধ্যে একজন, ওভার শেষে অনাদিকে শুনিয়েই বলল, "বকুদা আর লোক পেল না, একটা পাঁঠাও যে এর থেকে ভাল ফিল্ডিং দেবে।" শুনে হাসি লুকোবার চেষ্টাও করল না বোলারের দিকের আম্পায়ার। একজন ব্যাটসম্যান খুবই সহানুভূতির সঙ্গে উইকেটকীপারকে বলল, "এখন আর কিছু বলবেন না দাদা, তাহলে আরো ঘাবড়ে যাবে।"

এরপর অনাদি ক্ষ্যাপার মত ছোটাছুটি শুরু করল। বুক দিয়ে হাঁটু দিয়ে, এমনকি ঝাঁপিয়ে মাথা দিয়েও বল আটকাল এবং সবাইকে তাজ্জব বানিয়ে রান আউটও করল প্রায় ত্রিশ গজ দৌড়ে এসে, কভার থেকে সোজা উইকেটে বল মেরে। তিন চারজন ফিল্ডার ছুটে এসে ওর পিঠ চাপড়াল, আউট হওয়া ব্যাটসম্যানটিও হেসে "গুড থ্রো" বলে গেল। অনাদি অভিভূত হয়ে বোকার মত হাসল মাত্র এবং পরের ওভারেই অতি সহজ ক্যাচটি ফেলে দিল। মাঠের নয়জনের কণ্ঠ থেকে চাপা একটা আর্তনাদ উঠেই সেটা ক্রুদ্ধ গর্জনে পরিণত হল। ওভার শেষে অধিনায়ক অনাদির কাছে এসে উঁচু গলায় বলল, "দেখি তো, আপনার আঙুলে বোধহয় লেগেছে।" ওর হাতটা তুলে আঙুল পরীক্ষা করতে করতে তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "আমরা ন-জনেই খেলব, আপনি দয়া করে বেরিয়ে যান।"

মাথা নামিয়ে মুখটা কালো করে অনাদি মাঠ থেকে বেরিয়ে এল, সবাই ওর দিকে তাকিয়ে। মুখ টিপে কেউ কেউ হাসল, বকুদা শুকনো স্বরে বলল, "চলে এলেন কেন?"

অনাদি বলল, "আঙুলে লেগেছে, খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।"

বকুদা মুখ ফিরিয়ে মাঠের দিকে তাকাল। অনাদি ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে গেল। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রান আউট হওয়া ব্যাটসম্যানটি এক সুরূপা তরুণীর সঙ্গে হাসাহাসি করছে। একটি বছর দশেকের

ছেলে ওর ব্যাটটি নিয়ে ড্রাইভ করায় ব্যস্ত। অনাদি আর টেণ্টের দিকে গেল না।

লাঞ্চের পর ইছাপুর ব্যাট করতে নামল। চটপট ১৯ রানে তিনটে উইকেট পড়ে যাবার পরই জেতবার আশা ছেড়ে, ড্র-এর জন্য খেলতে লাগল। চতুর্থ উইকেটের দুই ব্যাটসম্যান সওয়া ঘণ্টা কাটিয়ে ৪৩ রান তুলেছে। অনাদির নাম সবার শেষে দশ নম্বরে। ইতিমধ্যে ও ঠিক করে ফেলেছে, চলে যাবে ব্যাট না করেই। লাঞ্চের সময় দেখে রেখেছে একটা সোয়েটার, যার দাম অন্তত আশি-নব্বই টাকা। প্রাকৃতিক কাজের ছুতোয় টেণ্টের মধ্যে বার দুয়েক ঘুরে এসে গাঁদাগাছের ধারে বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করতে করতে অনাদি ভিতরে নজর রাখল। মাঠে তখন লড়াই জমতে শুরু করেছে। কাজ হাসিল করে এইবার পালাতে হবে।

তখন সেই তরুণীটিকে টানতে টানতে বাচ্চা ছেলেটি ব্যাট হাতে হাজির হল। অনাদি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেও কৌতূহলে তাকিয়ে রইল। ওকে দেখে তরুণীটি ঈষৎ বিব্রত হয়ে ছেলেটিকে বলল, "বুলু অসভ্যতা কোরো না। হাত ছাড়ো, বলেছি তো খেলব।"

"আগে তুমি ব্যাট করো।"

তরুণী তার হাতের ব্যাগটি কোথায় রাখবে ভেবে চারিদিকে তাকিয়ে ইতস্তত করছে; ছেলেটি ছোঁ মেরে তার হাত থেকে নিয়ে ছুটে অনাদির কাছে বলল, "দিদির ব্যাগটা রাখুন তো।"

"আমি যে এখুনি যাব ব্যাট করতে।" অনাদি ঝুটঝামেলা এড়াবার জন্য বলল। ছেলেটি ওর কথায় কর্ণপাত করল না। ঘাড় ফিরিয়ে অনাদি খুবই বিরক্ত চোখে ওদের এলেবেলে খেলা দেখতে লাগল। তরুণী ছেলেটির প্রত্যেকটি বলই ফস্কে যাচ্ছে, কুড়িয়ে আনছে, মুখ লাল করে আবার ব্যাট হাতে দাঁড়াচ্ছে। দেখতে দেখতে অনাদি অন্যমনস্কের মত ব্যাগটির ঢাকনার স্প্রিং-এ চাপ দিতেই মুখটা ফাঁক হয়ে গেল। চমকে সে ঢাকনাটা বন্ধ করে এধার-ওধার তাকাল? কেউ দেখছে না তাকে, তবু দুরদুর করে উঠল ওর বুকের মধ্যে। অবশ্য হাতে ব্যাগটা কোলের উপর রেখে অনাদি ওদের খেলার দিকে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরই তার আঙুলগুলো কেঁপে উঠল। ঢাকনার স্প্রিং টিপল সন্তর্পণে। রুমাল, চিরুনী ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তার আঙুল দ্রুত ব্যাগের তলদেশে পৌঁছল। বৃত্তাকার, কঠিন একটি জিনিসের স্পর্শ পেতেই তার মনে হল নিশ্চয় আংটি! দুই আঙুলে সেটিকে চিমটের মত ধরে, তরুণী ও ছেলেটির খেলার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে, টেনে বার করে এনেই ট্রাউজার্সের পকেটে রেখে ব্যাগটি বন্ধ করল। তারপর সতর্ক দৃষ্টিতে চারধারে তাকিয়ে

আশ্বস্ত বোধ করতে করতে উত্তেজনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। খেলার মাঠ থেকে সোরগোলের যে শব্দটা অনাদি এতক্ষণ শুনতে পাচ্ছিল না, ক্রমশ সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

"একি, আপনি এখানে! হন্তদন্ত হয়ে বকুদা হাজির হল। "ছটা উইকেট পড়ে গেছে জানেন না? এখনো প্যাড পরেননি!"

"হ্যাঁ এই যাই," অনাদি ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। "খোকা ব্যাগটা রইল।"

সামিয়ানার তলায় প্যাড পরতে পরতে অনাদি খুব ঝরঝরে বোধ করল। বকুদা ওর পাশে বিড়বিড় করে যাচ্ছে—"আর কুড়ি মিনিট বাকি। কাটিয়ে দাও মদনমোহন। বুঝলেন, রানের কোনো দরকার নেই। কোনো রিস্ক নেবেন না। স্টাম্পের বাইরের বলে একদম ব্যাট ঠেকাবেন না। হে মদনমোহন আর আঠারো মিনিট। অনেকক্ষণ টাইম নেবেন ফিল্ড দেখার জন্য, মাঝে মাঝে প্যাডের বকলেশ ঠিক করবেন, বদলাবার জন্য ব্যাট চাইবেন। আর—" মাঠের মধ্যে হঠাৎ একটা বীভৎস চীৎকার ওঠায় বকুদার কথা থেমে গেল। ইছাপুরের সপ্তম উইকেটটি পড়ল লোপ্পাই ক্যাচ দিয়ে। নবম ব্যাটসম্যান নামতে চলেছে, বকুদা ভগ্নস্বরে বলল, "আর পনেরোটা মিনিট আছে রে।"

অনাদি দেখছিল, আড়ষ্ট পায়ে, ভীত চোখে এধার-ওধার তাকাতে তাকাতে কেমন করে ব্যাটসম্যানটি উইকেটের দিকে চলেছে। ওর হাসি পেল। ভাবল, আমার তো আসল কাজ হয়েই গেছে। উইকেটে যাব আর চলে আসব। হার-জিত নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আসলে ব্যাট করবে তো অঞ্জন বিশ্বাস। স্কোর-বুকে ওই নামই তো লেখা আছে।

"আমার স্পষ্ট মনে আছে, ব্যাগের মধ্যেই রেখেছিলাম।"

অনাদি চমকে উঠল, পিছন থেকে বলা সেই তরুণীর কণ্ঠস্বরে।

"তাহলে যাবে কোথায়!" ভারী একটি পুরুষ কণ্ঠ উদ্বেগ ও বিরক্তি সহকারে বলল, "আর একবার ভাল করে ব্যাগটা দেখ।"

"তিন-চারবার তো দেখলাম।"

"ব্যাগটা কোথায় রেখেছিলিস?"

অনাদি মূর্তির মত বসে। ওর মনে হল, একজোড়া চোখ তার দিকে তাকাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকালেই চোখাচোখি হবে। চোখ দুটো নিশ্চয় তাকে সন্দেহ করছে। এইবার হয়তো বলবে, উঠে আসুন তো আপনাকে আমরা সার্চ করবো। আপনি ছাড়া আর কে নিতে পারে? তারপর ওরা শেষ ব্যাটসম্যানকে যেভাবে ফিল্ডাররা ঘিরে ধরে সেইভাবেই গোল হয়ে ঘিরে ধরবে। তারপর ওদের একজন এগিয়ে আসবে।

পালাতে হবে। এই মুহূর্তে এখান থেকে পালাতে হবে। অনাদির মাথার

মধ্যে শুধু এই কথাটিই পাগলাঘণ্টির মত বেজে চলল। কিন্তু কোন দিক দিয়ে, কিভাবে পালাবে! এতদিন একবারও সে ধরা পড়েনি।

মাঠে আবার একটা হিংস্র উল্লাস ফেটে পড়ল। বকুদা অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে বলে উঠল, "আর বারোটা মিনিট মাত্র।" অনাদি ছিটকে উঠে দাঁড়াল। ব্যাটটা হাতে তুলে নিয়ে, শুধু সামনের দিকে তাকিয়ে, মাঠের মাঝখানে যাবার জন্য সে প্রায় ছুটতে শুরু করল।

ওভারের চারটি বল বাকি ছিল। বুক এবং পেট দিয়ে দুটি বল সে আটকাল এল 'ব ডবলু-র ফাঁড়া কাটিয়ে। তৃতীয় বল ওর ব্যাট ছুঁয়ে দুজন স্লিপ ফিল্ডারের মধ্যে দিয়ে গলে যেতেই অপর ব্যাটসম্যানের নিষেধ অগ্রাহ্য করেই ছুটল এবং অল্পের জন্য রান আউট হওয়া থেকে বাঁচল। চতুর্থ বলটি স্টাম্পের বাইরে ছিল, খেলার চেষ্টা করল না।

এরপরই অবিশ্বাস্য এবং হাস্যকর ব্যাপার ঘটে গেল। অনাদি তেত্রিশ রান করল এই ওভারে। পাঁচটি ওভারবাউন্ডারি ও একটি তিন। পরের ওভারে ত্রিশ রান। পাঁচটি ওভারবাউণ্ডারি। শেষ বলটি ব্যাটে লাগেনি এবং উইকেট-কীপারও ফস্কায়, তাইতে ওরা একটি বাই রান নেয়। খেলার শেষ ওভারে অনাদি আরো দুটি ওভারবাউণ্ডারি মারার পরই দেখল মাঠের বাইরে থেকে ইছাপুরের খেলোয়াড়রা তার দিকে ছুটে আসছে পাগলের মত চীৎকার করতে করতে।

ওরা কাঁধে করে অনাদিকে টেণ্টে আনল। ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় বকুদার চোখ দিয়ে শুধু জল ঝরছে। ইউনাইটেডের খেলোয়াড়রা অবাক চোখে বার বার এখনো তার দিকে তাকাচ্ছে, আর খেলার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে নিজেদের মধ্যে আবোল-তাবোল কথা বলে যাচ্ছে। ওরা এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না ব্যাপারটা! কে একজন বলল, ব্র্যাডম্যানের চব্বিশ বলে সেঞ্চুরী করার রেকর্ডটি নিশ্চয়ই ভাঙতে পারতেন, যদি না উইন হয়ে যেত। আর একজন বলল, এ খেলার গল্প কাউকে করলে বলবে গাঁজায় দম দিয়ে বলছি। ফ্যাণ্টাস্টিক! আজ কার মুখ দেখে যে উঠেছিলুম, সতেরো বলে ছিয়াত্তর রান!

অনাদি চুপ করে বসে আছে। বিরাট এক বিস্ময়ের কেন্দ্র মধ্যে অবস্থান করার অনুভব সে বোধ করছে। এক বিচিত্র ঘূর্ণিতে পাক খাওয়ার আনন্দে তার ভিতরটা দুলছে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, টেণ্টের বাইরে বেঞ্চে তরুণীটি বিষণ্ণ মুখে বসে, পাশে বাচ্চা ছেলেটি। আনন্দের রেশটা ওই বিষণ্ণ মুখ ছিঁড়ে দিচ্ছে। মুখ ফিরিয়ে অন্যত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করেও সে রেহাই পেল না। একটা পাষাণভার ক্রমশই বুকে চেপে বসেছে।

অবশেষে অনাদি তরুণীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পকেট থেকে আংটিটি বার করে এগিয়ে ধরে বলল, "এটা কি আপনার।"

"হ্যাঁ, এই তো !" বিষণ্নতা মুহূর্তে খুশিতে ফেটে পড়ল। "পেলেন কি করে? বাবা বাবা, পেয়েছি" চীৎকার করে উঠল তরুণী।

"এই বেঞ্চের তলাতেই পড়েছিল। তখুনি বলব ভেবেছিলুম, কিন্তু এমন তাড়াহুড়োর মধ্যে ব্যাট করতে যেতে হল যে—"

"ওহ্, কি দারুণ যে ব্যাট করেছেন, ভাবাই যায় না অকল্পনীয়, সত্যি বলছি আংটির কথাটা তখন একদম ভুলেই গেছলাম।"

বাচ্চা ছেলেটি বলল, "কাল কাগজে আপনার নাম বেরোবে, না?"

অনাদি মাথা নামিয়ে মৃদু মৃদু হাসল, তারপর ফিরে এল। বকুদা চায়ের কাপ এগিয়ে ধরে বলল, "সামনের রোববার শোভাবাজারের সঙ্গে খেলা, আসছেন তো?"

অনাদি উত্তর দেবার আগেই একজন ডাকল, "বকুদা একটুখানি আসুন তো, কাগজের জন্য খবরটা কিভাবে লিখব বলে দিয়ে যান।"

ব্যস্ত হয়ে বকুদা স্থান ত্যাগ করতেই অনাদি আপনমনে হাসল। ভেবেছিল সকলের হাতে ধোলাই খাবে, কিন্তু বদলে পাচ্ছে তারিফ আর আপ্যায়ন। এখন নিজেকে একদম অন্য মানুষ বোধ হচ্ছে, সম্পূর্ণ অপরিচিত। নিজেকে অদ্ভুত রকমের ভাল লাগছে তার। আংটিটা ফেরত না দিলে, বিক্রি করে কয়েকটা টাকা পাওয়া যেত বটে, কিন্তু এই অনুভবের মধ্যে মহৎ না হয়ে উপায় কি!

নিজের ব্যাগটা হাতে নিয়ে অনাদি যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। তখন তার কানে এল বকুদার কথাগুলো—"ভালভাবে রিকোয়েস্ট করে বোলো, যাতে অঞ্জন বিশ্বাস নামটা বোল্ড টাইপে ছাপায়।"

শুনে অবাক হয়ে গেল অনাদি। কে অঞ্জন বিশ্বাস? তারপরই মনে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের সম্পর্কে বিস্ময়জনিত যাবতীয় অনুভব থেকে বঞ্চিত হয়ে সে বোকার মত হাসল এবং নিজেকে শুনিয়ে বলল, 'যাচ্চলে, আমার লোকসান করিয়ে মাঝ থেকে সব ক্রেডিট নিয়ে বেরিয়ে গেল ব্যাটা!"

এরপর অনাদি কাউকে কিছু না বলে টেণ্ট থেকে হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল।

বহুদূর ব্যাপ্ত উজ্জ্বলতা

জানতাম না বিজন দত্ত এই স্যানাটোরিয়ামে রয়েছে। স্কুল ছুটির পর, ডাক্তার বসুরায়ের কোয়ার্টারে মাঝে-মাঝে যাই, যদি থাকেন তো গল্প ক'রে সময় কাটাতে। সেদিন উনি বললেন, "তুমি তো ফুটবল পাগল, বিজন দত্তের নাম শুনেছ?"

আমাকে চিন্তায় বিব্রত দেখে বললেন, "ফরটি-এইট লণ্ডন ওলিম্পিকে ইণ্ডিয়ান ফুটবল টিমে নাকি স্ট্যাণ্ডবাই ছিল। আমি অবশ্য বলতে পারব না কথাটা সত্যি কি মিথ্যে তবে কথাবার্তা ফুটবলারদের মতোই রাফ্, মুখে অনর্গল খিস্তি, আর গোঁয়ার। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েস কিন্তু এককালে যে লম্বা-চওড়া দারুণ স্বাস্থ্য ছিল সেটা বোঝা যায়।"

মনে পড়ল, ছোটবেলায় দাদাদের কাছে বিজন নামটা শুনেছি। ও যখন পা ভেঙে খেলা ছেড়ে দেয়, তখনো আমি ময়দানে ফুটবল দেখতে যাওয়া শুরু করিনি। তাছাড়া মোহনবাগান ক্লাবে বিজন দত্ত কখনো খেলেনি। সুতরাং আমার পক্ষে না চেনাই স্বাভাবিক। ওয়ার্ড এবং বেড নম্বর জেনে নিয়ে একদিন বিকেলে আলাপ করতে গেলাম।

ঘরে চারটি মাত্র বেড। দেয়াল ঘেঁষে ওর খাট। তার পাশেই দরজা, বারান্দায় যাওয়া যায়, মাথার নিচে দু হাত রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল। লম্বায় ছ ফুটের বেশি বই কম নয়। চুল কদমছাঁট, অর্ধেক পাকা, মাথাটি ঝুনো নারকেলের মতো দেখাচ্ছে। খাটের পাশে দাঁড়াতেই কৌতূহলটা বিস্ময়ের রূপ নিয়ে ওর ঘন ভ্রূর নিচে জ্বলজ্বল ক'রে উঠল।

"আপনার নাম শুনে আলাপ করতে এলাম।" সঙ্কোচ কাটাবার জন্য হাসতে গিয়ে বুঝলাম এ-লোকের কাছে সৌজন্য দেখানো নিরর্থক।

"কেন, আমি কি ফ্লিম-স্টার না টেস-প্লেয়ার?"

দমে না গিয়ে বললাম, "ফুটবল ভালবাসি, রেগুলার খেলা দেখিও।"

"জীবনে কখনো তো বলে পা দেননি।" কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসতে বসতে বিজন দত্ত বলল, "চেহারা দেখেই বুঝেছি।"

কথাটা নব্বুই ভাগ সত্যি, তাই প্রতিবাদ করার মতো জোর পেলাম না।

"গত বছরই, আপনার মতো পট্‌কা চেহারার এক ছোকরা এল, ফুটবল সেক্রেটারির বন্ধুর ছেলে। আমাকে বলা হল একটু দেখতে।" বিজন দত্ত পিটপিটিয়ে হাসল। "সকালে প্রথম দিন প্র্যাকটিসে আসতেই কুড়ি পাক দৌড়তে বললুম, পাঁচ-ছ পাক দিয়েই বাছাধনের কোমরে হাত। গোলের মুখে উঁচু ক'রে বল ফেলে ওকে হেড করতে বললুম আর আমার স্টপারকেও বলে রাখলুম কোঁতকা ঝাড়তে। প্রথম বার উঠেই পাঁজর চেপে বসে পড়ল। তারপর ট্যাকলিং প্র্যাকটিস। ছোকরার একটা ভালো ডজ ছিল। দুবার আমায় কাটিয়ে বেরলো। থার্ড টাইমে, লাট্টুর মতো পাক খেয়ে সাইড-লাইনের দশ হাত বাইরে ছিটকে পড়ল। পরদিন থেকে আর আসেনি।"

বিজন দত্ত দুই উরুতে চাপড় মেরে পুরনো মোটর স্টার্ট দেবার মতো শব্দ ক'রে হেসে উঠল। দেখলাম নিচের পাটির সামনে দুটি দাঁত নেই।

"ফুটবল পুরুষ মানুষের খেলা। বুঝলেন, সেইভাবেই আমরা খেলেছি। মার দিয়েছি, মার খেয়েছিও। বাঁ হাঁটুর কার্টিলেজই নেই, আর এই পায়ের সিনবোনটা—" বিজন দত্ত লুঙিটা হাঁটু পর্যন্ত তুলে ডান পা ছড়িয়ে দিল। ঘন লোমের মধ্যে দিয়েও কয়েকটা কাটা দাগ দেখতে পেলাম।

"এই পা-টা ভাঙার পরই খেলা ছাড়তে হল।"

কোনোরকম প্রয়াস ছাড়াই আমার মুখে বোধ হয় স্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছিল। বিজন দত্ত কঠিন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি কি করেন?"

"এখানকার স্কুলে পড়াই, সায়ান্স।"

"মাস্টার! আমিও মাস্টারি করি, ফুটবলের। আমার লেখাপড়া ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত।"

"আপনি কি এখন কোচ করেন?"

"শোভাবাজার ইয়ং মেনস। গতবার ফার্স্ট ডিভিশানে ওঠার কথা ছিল, ওঠে নি।" বলতে বলতে বিজন দত্তর মুখ চাপা রাগের আক্রমণে মুচড়ে যেতে লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "বাপ্পোতটা টাকা দিয়ে ম্যাচ কিনল। জানতো খেলে আমার টিমের কাছ থেকে পয়েন্ট নিতে পারবে না।"

"কার কথা বলছেন?"

"রতন সরকার। শালা খেলার আগের দিন একশো টাকা নিয়ে আমার গোলকিপারের বাড়ি গেছে; স্টপারের বৌটা মরো-মরো, হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেবে বলেছে, দুটো হাফব্যাক্‌কে টেরিলিন প্যান্ট দিয়েছে। নয়তো প্রদীপ সঙ্ঘের সাধ্যি ছিল কি চ্যাম্পিয়ান হয়! পাঁচটা ম্যাচ কিনেছে হাজার টাকা দিয়ে। শালা আবার নিজেকে কোচ বলে বড়াই করে! বরাবর, সেই যখন আমরা একসঙ্গে খেলতাম তখন থেকে ওকে জানি, পয়লা নম্বরের জোচ্চর।

হাত দিয়ে কতবার যে গোল করেছে। পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে মাটিতে পড়ে ছটফটিয়ে এমন কাতরাতো যে মনে হতো যেন ওকে দারুণ মেরেছে। এইভাবে অনেক পেনাল্টি আদায় করেছে। গোলকিপার বল ধরতে লাফাচ্ছে, রতন অমনি প্যাণ্ট টেনে নামিয়ে দিল। যত রকমের ছ্যাঁচড়ামো আছে কোনোটাই বাদ দিত না।"

শুনতে শুনতে আমি হেসে ফেলেছিলাম. ওর যত রাগ রতন সরকারের বিরুদ্ধে অথচ নিজের টিমের যারা ঘুষ নিল তাদের সম্পর্কে একটি কথাও বলল না। আমার হাসি দেখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "আপনি কোন ক্লাবের সাপোটার ?"

"মোহনবাগানের।"

অশ্রাব্য একটা খিস্তি ক'রে বলল, "কাঁপে, বঝুলেন ছোট টিমের কাছেও ভয়ে কাঁপে। তিনটে ক্লাবের অফার আছে আমার কাছে। এখনো ঠিক করিনি কোন্‌টা নোব, তবে নোবই। রতনকে এমন শিক্ষা দেব যে খান্‌কির বাচ্চাটা জীবনে ভুলবে না। আর মোন্‌বাগান ইস্‌বেঙ্গলের কাছ থেকে পয়েণ্ট নেব। ইজিলি পয়েণ্ট নেব। একশো টাকা বাজি রাখছি।'

বললাম, "যদি রতন সরকার আবার আপনার প্লেয়ারকে ঘুষ খাওয়ায় ?'

ওর চোখে দপ্‌ ক'রে ওঠা রাগটা ধীরে ধীরে বিচলিত হতে থাকল, তারপর স্তিমিত হয়ে পড়ল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে শুধু বলল, "ও শালা সব পারে, ওর কাছে খেলাটা কিছু নয়, যেনতেন ক'রে জেতটাই বড় কথা।"

ঘড়ি দেখে বললাম, "আমার ট্রেনের সময় হয়ে গেছে, এবার কলকাতা ফিরব। মাঝে মাঝে এসে যদি গল্প করি, বিরক্ত হবেন না তো ?"

"না না, রোজ আসুন না, তা হলে তো বেঁচে যাই, সময় কাটতেই চায় না। বাড়ি থেকে রোজ রোজ বৌয়ের পক্ষে আসা তো সম্ভব নয়।"

চোখে মুখে কাতরতা ফুটে উঠতে দেখে, এই অমার্জিত কিন্তু সরল রাগী উদ্ধত লোকটির জন্য মায়া বোধ করলাম। ঘরের অন্য তিনজনের ভাবভঙ্গি দেখে বুঝলাম কেউই ওকে পছন্দ করে না। করার কথাও নয়। আমিও করতাম না। কিন্তু এমন একটা বন্য প্রাকৃতিক শক্তির বিচ্ছুরণ ওর কণ্ঠস্বর, হাত বা মাথানাড়া, চাহনি এবং মেজাজের দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঘটে যাচ্ছিল, যেটা আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় বোধ হল। বললাম, "বইটই পড়তে চান তো এনে দিতে পারি।"

"বই !" কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মাথা নেড়ে বলল, "নাহ্‌, পড়তে-টড়তে ভাল লাগে না। তবে সেক্সের বই যদি আনতে পারেন,—অবশ্য এসব বই ছেলেদের পড়তে বারণই করি। ফুটবলারদের ভীষণ ক্ষতি করে, শরীর দুর্বল ক'রে দেয়। একবার মোন্‌বাগানের সঙ্গে খেলার আগের দিন রাত্রে—" থেমে

গিয়ে চোখ মেরে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে বলল, "সকালে আর উঠতেই পারি না।

'সেদিন খেলেছিলেন কেমন ?"

"আরে খেলব কি, শুরু হবার দশ মিনিটের মধ্যেইতো ম্যাকব্রাইড আমায় মাঠ থেকে বার ক'রে দিল। সামান্য পা চালিয়েছিলুম, অতি সামান্য, তেমন কিছু লাগেও নি। ফ্রি কিক্ দিয়েছে, বেশ ভাল কথা, কিন্তু সেই সঙ্গে মাঠ থেকে বারও ক'রে দেওয়া ?"

ওর গলায় প্রকৃত ক্ষোভ ফুটে উঠল। আমার দিকে যেভাবে তাকিয়ে, তাতে একটা কিছু মন্তব্য না ক'রে উপায় নেই। বললাম, "রেফারি বোধ হয় নার্ভাস ছিল তাই বেশি কড়া হয়ে নিজেকে সামাল দিতে গিয়ে—"

"না না, ম্যাকব্রাইড খুব ভাল রেফারি, নার্ভাস হবার লোকই নয়। আসলে আমি ঠিক বুঝতে পারি না কোন্ পর্যন্ত গেলে, বুঝলেন, কোথায় নিজেকে আটকাতে হবে, একদমই জানি না। এতে আমার অনেক ক্ষতি হয়েছে। আমি অলিম্পিক যেতে পারলুম না শুধু এই জন্যেই। তেল দিতে পারি না, জিবের আড় নেই। কত্তাদের মুখের ওপরই যাচ্ছেতাই ক'রে খিস্তি করতুম। ভাবতুম খেলা দেখিয়ে টিমে আসব, ব্যাটাদের পা চেটে ব্যাকডোর দিয়ে নয়।"

ধীরে ধীরে বিষণ্ণ হয়ে এল বিজন দত্তের কণ্ঠস্বর। চাহনিতে অনুশোচনার আভাস দেখতে পেলাম। বললাম, "তাইতো উচিত। পুরুষমানুষরা তো তাই করে। এতে আপনার বিবেক চিরদিন পরিষ্কার থাকবে, আপনি মাথা উঁচু ক'রে চলতে পারবেন। আর রতন সরকারের মতো লোকেরা আপনাকে দেখে কেঁচো হয়ে যাবে।"

ওর মুখে চাপা সুখের আমেজ ফুটে উঠতে দেখলাম, সেই সঙ্গে চাপা রাগও। দাঁত চেপে বিড়বিড় ক'রে বলল, "বাঞ্চোতকে একবার পাই···এখান থেকে আগে ফিরি।"

ফেরার সময় ট্রেনে বসে হঠাৎ খেয়াল হল, সারাক্ষণ আমি দাঁড়িয়েই ওর সঙ্গে কথা বলেছি। বিজন দত্ত আমায় বসতে বলেনি। মনে হল, ভদ্রতার অভাব নয়, আসলে ও সৌজন্যের ব্যাপারটা একদমই জানে না।

মাঝেমাঝে যেতাম ওর কাছে। লক্ষ করলাম আমার জন্য বিজন দত্ত অপেক্ষা করে। বিছানা থেকে ওঠার অনুমতি পেয়েছে, বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে। স্যানাটোরিয়াম গেটের কাছে আমায় দেখলেই বারান্দা থেকে হাত নাড়ে। টুলটা টেনে বসামাত্রই শুরু হয় অনুযোগ, কেন দু-দিন আসিনি। আমাকে ওর ভাল লেগে গেছে। আমরা বারান্দায় গিয়ে বসতাম, ও গল্প ক'রে যেত—কুড়ি-পঁচিশ বছর আগের কোনো একটি গোলের, খেলার, খেলোয়াড়দের, দারুণ কোনো

জেতার কিংবা জোচ্চুরির শিকার হয়ে হেরে যাওয়ার। ওর সমস্ত গল্পের মধ্যেই একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠত—তুমি যেমন শক্ত ফুটবলও তেমনি শক্ত আর ফুটবল শক্ত যেহেতু জীবনটাই শক্ত।

একদিন গিয়ে দেখি, বিজন দত্ত বিছানায় শুয়ে, তার সামনে টুলে বসে তাঁতের রঙিন শাড়ি পরা, শ্যামবর্ণ স্থূলকায়া এক মহিলা। মুখখানি গোলাকার, কপালে বড় সিঁদুর টিপ, গলায় ও ঘাড়ে পাউডার, হাতে শাঁখা ও লোহা ছাড়া কিছু প্লাস্টিক চুড়ির সঙ্গে একগাছি সোনার চুড়িও। বুঝলাম, এ বিজন দত্তর স্ত্রী। বেশী বয়সেই বিয়ে করেছে বিজন দত্ত। একটি মাত্র ছেলে, বছর দশেক বয়স। "ব্যাটার পায়ে সট্ আছে, দু পায়েই।"—এর বেশি ছেলে সম্পর্কে কিছু বলেনি। স্ত্রী সম্পর্কে শুধু: "ভাগ্যিস খেলা ছেড়ে দেবার পর বিয়েটা করেছি, নয়তো খেলা শিকেয় উঠত, যা মাল একখানা! বুঝলেন, ভালবাসা-টাসা বলে কিছু আর আমাদের নেই। বিয়ে না করলে এসব বুঝবেন না।"

মহিলার মুখের বিরক্তি আর বিজন দত্তর হাত নেড়ে অসহায় ভঙ্গিতে তাকে বোঝানোর চেষ্টা দেখে মনে হল, ওরা বোধহয় ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপারের ফয়শালায় ব্যস্ত। আমাকে দেখতে পায়নি বিজন দত্ত। ওখান থেকেই আমি ফিরে গেলাম। পরদিন ওর সঙ্গে ঘণ্টাখানেক গল্প করলাম কিন্তু একবারও বলল না, কাল ওর স্ত্রী এসেছিল।

দিন চারেক পর, আমি টুলে বসে আছি, বিজন দত্ত বাথরুমে। দীর্ঘাঙ্গী এক বিধবা মহিলাকে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে দেখলাম। বয়স মনে হল পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। কাঁধে একটি থলি। চোখা নাকের দুপাশে দীর্ঘ চোখ। চাপা গলায় দরজার ধারের খাটে বইয়ে মগ্ন রোগীটিকে কি জিজ্ঞাসা করতেই সে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিল। আমার কাছে এসে মহিলা মৃদুকণ্ঠে বলল, "বিজন দত্ত কি এই বেডের?"

"হ্যাঁ, বাথরুমে গেছেন, আপনি বসুন।" টুল ছেড়ে আমি উঠে পড়লাম। অপরিচিতার সঙ্গে চুপচাপ বসে থাকা অস্বস্তিকর, তাই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। মিনিট দুয়েক পরই বিজন দত্তর হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠ শুনলাম—"আরে মিনু!"

বারান্দা থেকে দেখতে পেলাম মহিলার চোখের সলজ্জ হাসিটুকু ধীরে ধীরে মুছে গিয়ে ব্যাকুলতার দ্বারা গভীর হয়ে উঠল। ফিসফিস ক'রে কি বলতেই বিজন দত্ত দুই উরুতে চাপড় দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "গোলি মারো তোমার অসুখকে। ফাইন আছি।" এরপর ওর কণ্ঠস্বর আর শুনতে পেলাম না। আড়চোখে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখি নিচু গলায় কথা বলে যাচ্ছে অনর্গল, নিঃশব্দে হেসে উঠছে, এক সময় আপেল খেতে দেখলাম আর বিছানার উপর

রাখা মহিলার হাতের আঙুলগুলোকে সন্তর্পণে তুলে চট্ ক'রে চুমু খেতেও দেখলাম।

চলে যাবার জন্য আমি ঘরে ঢুকে ওকে বললাম, "আজ চলি।"

আমার দিকে একবার তাকিয়ে, বিজন দত্ত এমন ভঙ্গিতে মাথাটা হেলিয়ে দিল যেন অনুমতি দিচ্ছে। ফেরার পথে ট্রেনে বসে আজই প্রথম ওর উপর বিরক্ত হলাম। দিন সাতেক আর স্যানাটোরিয়াম-মুখো হলাম না। স্কুল থেকে সোজা স্টেশনে চলে যাই। ওর স্ত্রীকে দুদিন দেখলাম ট্রেন থেকে নামতে। একদিন সঙ্গে ছেলেটিও ছিল। সেই বিধবা মহিলাকে দেখলাম, স্যানাটোরিয়ামের দিক থেকে সাইকেল রিকশায় স্টেশনে এল। টিকিট কিনে, প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কলকাতা থেকে একটা ট্রেন এসে দাঁড়াতেই ঘোমটায় মুখ আড়াল দিল। একদিন ডাঃ বসুরায়ের কোয়ার্টারে গেলাম। তিনি ব্যস্ত ছিলেন কয়েকজন নিকট আত্মীয়কে নিয়ে। চলে আসছি, তখন আমায় বললেন, "তোমার বন্ধু যে খোঁজ করছিল।" আমাকে অবাক হতে দেখে আবার বললেন, "সেই ফুটবলার, বিজন দত্ত। এখন তো ওকে বাইরে বেড়াবার পারমিশন দেওয়া হয়েছে।"

ডাক্তার ও কর্মচারীদের কোয়ার্টারগুলোর পিছনে একটা পুকুর, তার ধারেই এক চিল্‌তে জমি। এখানকার বাচ্চা ছেলেরা তাতে ফুটবল খেলে। পুকুরের কিনারে সীমানা-পাঁচিলের খানিকটা ভাঙা আছে জানি। সেখান দিয়ে বেরোলে মিনিট খানেকের পথ কম হাঁটতে হয়। তাড়াতাড়ি স্টেশনে পৌঁছবার জন্য ওই দিকে যাচ্ছি, হঠাৎ ধমকানো গলার 'বাঁদিক কভার করো, বাঁ দিক' চিৎকার শুনে দেখি কালো হাফ প্যাণ্ট আর গেঞ্জি পরে বিজন দত্ত, বল নিয়ে ধাবমান একটা বছর বারো বয়সী ছেলের পাশাপাশি ছুটছে আর হাত নেড়ে নিজের ডিফেণ্ডারদের নির্দেশ দিচ্ছে। দেখেই আমি কাঁটা হয়ে গেলাম। একটা ধাক্কা দিলেই রোগা ছেলেটা লাট্টুর মতো পাক খেয়ে ছিটকে পড়বে।

বিজন দত্ত পা দিয়ে আঁকশির মতো বলটা টেনে নিয়ে, দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। ছেলেটা কি করবে ভেবে না পেয়ে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকল। "দাঁড়িয়ে কেন, কেড়ে নাও আমার কাছ থেকে, কাম্ অন, চার্জ মী।" ছেলেটি ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে বলে লাথি মারতে যেতেই বিজন দত্ত ঘুরে গিয়ে বলটাকে আড়াল ক'রে দাঁড়াল। "পুশ মী, জোরে, জোরে, আরো জোরে ধাক্কা দাও, ভয় কি ··নাঃ", হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল, "ভয় পেলে ফুটবল খেলা হবে না। যখন পারে না তখন পুরুষ মানুষ কি করে? হয় মারে নয় মরে। তুমি আমাকে মেরে বল কেড়ে নাও। ইজ্জতের খেলা ফুটবল, মরদের খেলা।"

ছেলেরা দাঁড়িয়ে হাঁ-ক'রে ওর কথা শুনছে। এই সময় ও আমাকে দেখতে পেল। হাত তুলে অপেক্ষা করার ইঙ্গিত জানিয়ে, এগোতে এগোতে ছেলেদের

বলল, "এবার তোমরা খেলো। কিন্তু মনে থাকে যেন, যখনই খেলবে জান লড়িয়ে দিয়ে খেলবে।"

সারা মুখ পরিশ্রম ও উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে, হাপরের মতো ওঠানামা করছে বুক, সারা দেহের রোম ঘামে সেঁটে গেছে চামড়ার সঙ্গে। কাছে এসেই বিজন দত্ত বলল, "পারলুম না আর! ঘাস দেখলে গরু মুখ না দিয়ে থাকতে পারে!"

"অন্যায়, আপনি খুবই অন্যায় করেছেন। এখনো পুরোপুরি সেরে ওঠেন নি, অথচ দৌড়ঝাঁপ শুরু ক'রে দিয়েছেন। যদি রিল্যাপ্স করে?"

আমার ধমকটা যেন বেশ ভালই লাগল ওর। হাত নেড়ে বলল, "কিসসু হবে না। আমি সেরেই গেছি। কদিন আসেননি কেন, গার্ল ফ্রেন্ড নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন বুঝি।"

'হ্যাঁ।'

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হোহো ক'রে হেসে উঠল বিজন দত্ত। পুকুরের সিমেন্ট বাঁধানো ঘাটে এসে আমরা বসলাম। একটা কুকুর চাতালে কুণ্ডলী হয়ে ঘুমোচ্ছে। পুকুরের ওপারের ঘাটে কাপড় কাচছে দুজন স্ত্রীলোক। আকাশে মৃদু কোমল রৌদ্রের রেশ। বাতাস ধীরে বইছে। ঘাটের পাশে অজস্র হলুদ সন্ধ্যামণি ফুটে। বিজন দত্ত কপাল থেকে ঘাম চেঁছে ফেলে হাসল। বললাম, "গার্ল ফ্রেন্ডের সঙ্গে আপনার কেমন কাটছে?"

"আমার?" রীতিমতো অবাক হয়ে গেল। "ও তো আমার বৌ!"

"উহুঁ, আর একজন।"

বিজন দত্ত এবার বিব্রত হল। উঠে গিয়ে একটা কঞ্চি কুড়িয়ে কুকুরটাকে খোঁচা দিল। 'ক্যাঁউ' ক'রে উঠে কুকুরটা লেজ নাড়তে নাড়তে কয়েক হাত সরে গিয়ে আবার বসে পড়তেই বিজন দত্ত বাতাসে কয়েকবার জোরে কঞ্চিটা নাড়ল। কুকুরটা বোধহয় এসবে অভ্যস্ত। ভয় পেল না, শুধু অপেক্ষা করতে লাগল। বিজন দত্ত ফিরে এসে বসল। "ওকে আমি বিয়ে করব বলেছিলুম। গোঁড়া বামুন পরিবারের মেয়ে, ওরা তো শুনেই ক্ষেপে গেল। আমি লেখাপড়া শিখিনি, চাকরি করি বলতে গেলে বেয়ারারই। তখন তো ফুটবলাররা দশ-পনেরো হাজার ক'রে টাকা পেত না, গাড়িভাড়া ছাড়া একটা পয়সাও নয়, এখনকার মতো চাকরিও নয়।"

আকাশের আলো দিনের এই শেষবেলায় খুব তাড়াতাড়ি ম্লান হয়। বিজন দত্তকে শীর্ণ এবং অসহায় দেখাচ্ছে। আমি ওর পাংশু মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে না পেরে চোখ রাখলাম জলের উপর আবছা নারকেল গাছের ছায়ার উপর। বিষণ্ণ কণ্ঠে বিজন দত্ত আবার বলল, "ওরা আমাদের পাড়ায়ই থাকত, এরপর উঠে চলে গেল। বলেছিল, আমায় নিয়ে পালিয়ে যাও। আমি

রাজি হয়েও শেষপর্যন্ত কেমন ভয় পেয়ে গেলুম। আজও বুঝতে পারি না, কেন পেয়েছিলুম, কিসের ভয়।"

"আপনার স্ত্রী ওর কথা জানেন না ?'

"আমি কিছু বলিনি, তবে আমাদের বাড়ির কিংবা আশেপাশের বাড়ির কারুর কাছ থেকে নিশ্চয় শুনে থাকবে।"

"এখানে যদি দুজনের মধ্যে দেখা হয়, তাহলে আপনি কি করবেন ?" উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

হেসে উঠে বিজন দত্ত বলল, 'তাহলে ইস্‌বেঙ্গল মোন্‌বাগানের ম্যাচ দেখব।"

প্রসঙ্গটা আমি আর টানলাম না। বললাম, "আর বোধহয় বেশিদিন এখানে আপনাকে থাকতে হবে না।"

"হ্যাঁ, টেম্পারেচার তো কদিন ধরেই অফ-সাইড করছে না। এভাবে বন্দী-জীবন আর ডাক্তারদের হুকুম মেনে আর চলতে পারছি না। মাঝে মাঝে ভাবি, এখানে আমি কি করছি ? একদিনের জন্যও কখনো শরীর খারাপ হয়নি, একদিনের জন্যও নয়। হাসপাতালে গেছি শুধু কার্টিলেজ আর ভাঙা পায়ের জন্য, ব্যাস্।"

"এই অসুখটা বাধালেন কি ক'রে ?"

"কি ক'রে ! ডাক্তার বলেছিল বেশি খাটুনির জন্যই নাকি। অথচ পঁচিশ বছর ধরেই আমি এইভাবে খেটে আসছি। তাতে কি বলল জানেন ? আপনি তো আর আগের মতো ছোকরা রয়ে নেই, বয়স যে বেড়েছে। ঠিক্, কিন্তু আমি বুড়োও হইনি। হয়েছি কি ?"

ওর দিকে তাকিয়ে সেই মুহূর্তে মনে হল, বিজন দত্ত নিজের চোখে বরাবরই তরুণ থেকে যাবে। বার্ধক্যকে স্বীকার করা ওর পক্ষে কখনোই সম্ভব হবে না। "মাসখানেক বড়জোর, তারপরই ফিরে গিয়ে আবার শুরু করব ছেলেদের নিয়ে। ফাস ডিভিশানে সামনের বার উঠতেই হবে। পরশুর কাগজে দেখলুম আমরা সাত গোল খেয়েছি।"

শেষ বাক্যটি বলার সময় মনে হল, ওর মুখটা যন্ত্রণায় কালো হয়ে উঠল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে বলল, "আজকালকার ফ্যাশান হয়েছে হাফব্যাক উঠে গিয়ে গোল দিয়ে আসবে ! আমি কখনো ওদের তা করতে দিই না। উঠতে পারে ঠিকই কিন্তু পাল্টা অ্যাটাক হলেই বাবুরা আর চটপট নামতে পারে না। বোধ হয় তাই করেই গোল খেয়েছে। আমি থাকলে এটা হতো না। একবার চারটে ম্যাচ আমি বসিয়ে রেখেছিলুম আমার স্টপারকে, কথা শোনে নি বলে।"

পরদিন আমি খানিকটা উত্তেজিত হয়েই হাজির হলাম। বিজন দত্ত তখন

সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে। বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে। হ্যাণ্ডবিলটা ওর চোখের সামনে ধরে বললাম, "এই দেখুন প্রদীপ সংঘ পরশু রোববার এখানে এক্সিবিশন ম্যাচ খেলবে লোকাল ইলেভেনের সঙ্গে।"

ক্ষুধার্তের মতো কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে গোগ্রাসে প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত পড়ে বিজন দত্ত বলল, "আমি দেখতে যাব, মাঠটা কতদূরে? টিকিট ওখানে গিয়ে পাওয়া যাবে তো?"

"মাঠ প্রায় মাইল দেড়েক। কিন্তু অত দূর যাওয়া-আসার ধকল সহ্য করার মতো শরীর এখনো তো আপনার হয়নি!"

"আমার শরীরের ব্যাপার আমি বুঝব, তা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।" রুক্ষস্বরে বিজন দত্ত বলল, "রতন নিশ্চয়ই আসবে ওর টিমের সঙ্গে। সকলের সামনে শালাকে অপমান করব।"

ঠিক সেই সময়ই বিধবা মহিলাটি ঘরে ঢুকল। আমার মুখে এসে যাওয়া কথাগুলিকে বহু কষ্টে চেপে রেখে উঠে দাঁড়ালাম। স্যানাটোরিয়াম গেট থেকে বেরিয়েই দেখি ছেলেকে নিয়ে বিজন দত্তর স্ত্রী আসছে। ওকে দেখে মনে অদ্ভুত একটা উল্লাস বোধ করলাম। বাছাধন আজ মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ দেখুক! স্টেশনে এসে দেখি অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে কলকাতার ট্রেনের জন্য। বিধবা মহিলাটি আমার একটু পরেই স্টেশনে পৌঁছল। মুখ বিবর্ণ এবং বিরক্তি মাখানো। আমার দিকে একবার তাকিয়ে প্ল্যাটফর্ম-প্রান্তের বেঞ্চে গিয়ে বসল।

রবিবার ট্রেন থেকে নেমে সোজা মাঠে চলে গেলাম। আসতাম না। প্রদীপসঙ্ঘ এমন কিছু টিম না, যার খেলা দেখার জন্য ছুটির দিন কলকাতা থেকে ছুটে আসব। বস্তুত, ফার্স্ট ডিভিশনে খেললেও, কী ওদের জার্সির রং জানি না। কিন্তু মনে হল, বিজন দত্ত খেলা দেখতে আসবেই আর রতন সরকারের সঙ্গে কিছু একটা বাধবেই। দুজনকে মুখোমুখি দেখবার লোভেই বোধহয় এসেছি।

পৌঁছে দেখি প্রচণ্ড ভিড়। বাস, রিকশা, গরুর গাড়ি, সাইকেলে, দূর গ্রাম থেকেও লোক এসেছে। মাঠটা টিন দিয়ে ঘেরা হয়েছে। প্রদীপ সংঘ উঠেছে মাঠের কাছেই এক ব্যবসায়ীর বাড়ি। সেখান থেকে হেঁটে আসবে। তারা যে গেট দিয়ে মাঠে ঢুকবে সেখানে অল্পবয়সীদের ভিড়। হঠাৎ চোখে পড়ল বিজন দত্ত সেই গেটের কিছুদূরে অধীরভাবে ঘোরাফেরা করছে। আমি কাছে গেলাম না। স্কুলের দুটি ছাত্র সিগারেট লুকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসতেই ভিড় থেকে দূরে সরে গেলাম।

প্রদীপ সঙ্ঘের খেলোয়াড়রা আসতেই হুড়োহুড়ি পড়ে গেল গেটের কাছে।

দূর থেকেই দেখলাম, বেঁটে, কালো, কুতকুতে ধূর্ত চোখ, মোটাসোটা একটি লোককে লক্ষ ক'রে বিজন দত্ত এগোচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি ওর কাছাকাছি হবার চেষ্টা করলাম। ওদের প্রাথমিক কথা শুনতে পেলাম না। শুধু দেখলাম বিজন দত্ত অচঞ্চল শান্ত ভঙ্গিতে কি বলতেই, লোকটার মুখে অস্বস্তি ফুটল, কাঁধ ঝাঁকিয়ে পাশকাটাবার চেষ্টা করছে। বিজন দত্ত পথরোধ ক'রে দাঁড়াল। লোকটি বিরক্ত ও বিস্মিত হয়েও ঘনিষ্ঠ স্বরে বলল, "তোর অসুখ হয়েছে শুনেছিলুম, এখন কেমন আছিস?"

"ভালই। তোকে দেখে আরো ভাল লাগছে।" বিজন দত্ত চারপাশের উদ্‌গ্রীব মুখগুলোর উপর মৃদু হেসে চোখ বোলাল। "তারপর রতন এবারও কি টাকা দিয়ে ম্যাচ কিনে ফাস ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ান হবার মতলব করেছিস নাকি?"

"তার মানে?" রতন সরকার তেরিয়া মেজাজে বললেও ওর চোখে ভীত ভাব দেখলাম।

"সেই কথাটা জিজ্ঞাসা করতেই তো এসেছি। খেলে তো সতেরোটা ম্যাচে সাত পয়েন্টও তোর টিম করতে পারত না। গড়ের মাঠে সবাই তোর কেরামতি জানে।"

"তুই এসব কি বলছিস, বিজন! পথ ছাড়।" রতন সরকার ব্যস্ততা দেখাল। ভিড়ের মধ্যে থেকে দু-একটা চাপা ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য ওর উদ্দেশে ছোঁড়া হয়েছে। বিজন দত্ত চাপা খুশিতে আরো গলা চড়িয়ে বলে উঠল, "এক মাঘে শীত পালায় না। সামনের বছরে আমরা ফাস ডিভিশানে যাবই আর— আর দেখব টেরিলিন প্যাণ্ট দোব, বেঙ্গল টিমে চান্স ক'রে দোব, বৌকে হাসপাতালে ভর্তি ক'রে দোব, এইসব ক'রে কটা ম্যাচ জিততে পারিস।"

"প্রত্যেকটা ম্যাচই আমরা খেলে জিতেছি, ক্লিন্‌লি অ্যাণ্ড অনেস্টলি" রতন সরকারও গলা চড়াল।

'হ্যাঁ, ঘুষ দিয়ে।"

"মুখ সামলে বিজন! তোর কোচিংয়ের কেরামতিতে দু-দুটো টিম ফার্স্ট ডিভিশান থেকে নেমেছে; কোথাও পাত্তা না পেয়ে তাই সেকেণ্ড ডিভিশানের টিম ধরেছিস। এখন নিজের মুখ রক্ষার জন্যে অন্যের গায়ে কাদা না ছিটোলে বাঁচবি কি ক'রে, বল!"

বিজন দত্তকে দেখে আমার মনে হল এইবার ও রতন সরকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। মুখ সাদা হয়ে গেছে। ঠকঠক ক'রে কাঁপছে। এই উত্তেজনা ওর অসুস্থতার পক্ষে ক্ষতিকর। এইবার আমি ওর হাত চেপে ধরলাম। ঝটকা দিয়ে আমার হাত ছাড়িয়ে নিল।

রতন সরকার তখন অতি দ্রুত গেট অতিক্রম ক'রে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে দেখে হাঁফ ছেড়ে বললাম, "চলুন, এইবার খেলা শুরু হবে।"

"না, দেখতে হয় আপনি যান। আমি ফিরে যাব এখন।" একটু আগের উত্তেজিত সেই উচ্চস্বর অবসাদে স্তিমিত। চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় হল। অদ্ভুত এক শূন্যতা ভেসে উঠেছে দুই চোখে। চতুর্দিকে জনতা ও কোলাহল ওকে যেন স্পর্শ করছে না।

ওকে সাইকেল রিকশায় তুলে স্যানাটোরিয়ামে ফেরার পথে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ডাক্তারকে বলে এসেছেন তো ?"

শিথিলভাবে পিছনে হেলান দিয়ে বিজন দত্ত মাথা নেড়ে মৃদু স্বরে বলল, "ডাক্তারবাবু রাজি হয়নি। বলেছিল, যদি প্লুরিসি বাধাতে চান তাহলে যেতে পারেন। আমি লুকিয়ে এসেছি। অনেকটা হাঁটতে হয়েছে।"

বলতে বলতে বিজন দত্ত কাশতে শুরু করল। কাশি থামার পর লক্ষ করলাম শ্বাস-প্রশ্বাস ভারি হয়ে উঠেছে শরীরটা কুঁকড়ে, রিকশার হাতল চেপে ধরে ক্রমশ ওর মাথাটা বুকের কাছে নেমে আসতেই প্রাণপণে তুলে ফ্যাকাসে মুখে বললে, "বয়সটা যদি আপনার মতো হতো।" তারপর সারাপথে আর একটিও কথা বলেনি।

পর দিন গিয়ে শুনলাম, রাত্রি থেকেই ওর দেহতাপ একশোয়। কাশির ধমকে ঘরের বাকি তিনজনের ঘুম কয়েকবার ভেঙে গেছিল। ডাক্তারবাবু ক্রুদ্ধস্বরে জানিয়েছেন, প্লুরিসি হলে তিনি মোটেই অবাক হবেন না।

"ডাক্তারবাবুর কথা শুনলে ভালই করতুম। এইসব রোগ নিয়ে খেলা করাটা উচিত হয়নি। রতনটাই হয়তো শেষপর্যন্ত জিতে যাবে, আমার বোকামির জন্য। এই রকম মাথা গরম করবার জন্যই আমার কিছু হল না।" বিজন দত্ত মাথাটা কাত ক'রে বাইরে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর বলল, "দুটি টিম আমার জন্যই নেমে গেল এ কথাটা কিন্তু পুরো সত্যি নয়। একটা ছেলেও খেলতে জানে না, একজনেরও ফুটবল সেন্স নেই। আমি একা আর কতটা সামাল দিতে পারি।"

ডাঃ বসুরায়ের কাছে খোঁজ নিলাম। স্পুটাম পরীক্ষা ক'রে পজিটিভ হয়েছে। বিজন দত্তর খিধে কমে গেছে, চোখ দুটি ক্রমশ বসে যাচ্ছে, ওজন দ্রুত কমছে। ওর স্ত্রী এখন রোজই আসছে। বিষণ্ণ মুখে বসে থাকে আর চাপাস্বরে মাঝেমাঝে বলে, "তোমার সে দিন যাওয়া উচিত হয়নি। তুমি জানতে এতে তোমার ক্ষতি হবে!" ইতিপূর্বে বিজন দত্তর মুখে 'এ. পি', পি. পি', 'রিফিল', পি. এ. এস', 'থোরা' প্রভৃতি শব্দগুলি কখনো শুনিনি। এগুলির উল্লেখ না ক'রে সে যেন তার রোগের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করত। কিন্তু এখন তার মুখে মাঝেমাঝে অসুখের কথা শুনতে পাই। কথা কম বলে। একদিন স্কুল যাবার পথে সকালে, বিধবা মহিলাটিকে দেখলাম, শুকনো মুখে হেঁটে

চলেছে স্যানাটোরিয়ামের দিকে। সেদিন বিকেলে হাসতে হাসতে বিজন দত্তকে বললাম, "ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচের রেজাল্ট কি হল ?" শুনেই ওর মুখে চাপা হাসি খেলে গেল। চোখ মেরে বলল, "ম্যাচ পোস্‌পন। ওরা এ মাঠে খেলতে রাজি নয়।"

নানান দাবিতে তখন বাংলাদেশে শিক্ষক আন্দোলনের প্রস্তুতি চলেছে। আমিও সংগঠনের কাজে জড়িত। অবস্থান ধর্মঘট হবে রাজ্যপাল ভবনের সামনে। পরপর কয়দিন বিজন দত্তকে দেখতে যেতে পারিনি। একদিন গিয়ে দেখি ওকে অন্য একটি ঘরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেখা করা নিষেধ। ডাঃ বসুরায় বললেন, "উই আর গোয়িং টু কোল্যাপ্‌স দ্য আদার লাং।"

দিন চারেক পর আবার গেলাম দুপুরে। এক মিনিটের জন্য দেখা করার অনুমতি পেলাম, কথা বলা বারণ। বিজন দত্ত চিৎ হয়ে একদৃষ্টে সিলিংয়ে তাকিয়ে। গাল দুটি বসে গেছে। একদা যে বিপুল শক্তি এই দেহ ধারণ করত তার ধ্বংসাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট।

"কি খবর ?" ফ্যাসফ্যাসে স্বরে বিজন দত্ত বলল।

"কথা বলবেন না।" নার্স ছোট্ট ক'রে ধমক দিল। হাত তুলে ওকে ব্যস্ত না হবার ইঙ্গিত ক'রে বিজন দত্ত আমাকে বলল, "পুকুরধারে ওরা রোজ খেলে ?"

জানি না খেলে কি না, তবু ওকে খুশি করার জন্য বললাম, "রোজই খেলে।"

"ওদের মধ্যে একটা ছেলে আছে দেখবেন, দারুণ ফুটবল সেন্স।"

নার্স এবার বলল, "আপনি বাইরে যান, নয়তো উনি কথা বলে যাবেন।"

আমি যাবার জন্য ঘুরেছি, শুনলাম টেনে টেনে বলছে, "ভেবেছি ওই ছেলেটাকে তৈরি করব।"

স্টেশনের পথে হেঁটে যেতে, ওর কথাই ভাবলাম। চোখে বারবার ভেসে উঠল, একা ঘরে প্রাচীন ভগ্নস্তূপের মতো পড়ে থাকা দেহটিকে, শীর্ণ হাতটির ধীরগতি উত্তোলনভঙ্গি, নিশ্বাস নিতে নিতে দমবন্ধ ক'রে কথা বলা। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না ওর সেই বন্য প্রাণশক্তি, যার ফলে ওকে দুর্ভেদ্য মনে হতো, মৃত্যু সেখানে ফাটল ধরিয়েছে কিনা।

দিন পাঁচেক পর, বিকেলে, স্যানাটোরিয়ামের দিকে যাচ্ছি। শরতের বিকেলের আকাশ ঘন নীল, বহুদূর পর্যন্ত তার উজ্জ্বলতা ব্যাপ্ত। নিকটের একটি বাড়ি থেকে কোমল নারীকণ্ঠের সংগীতের সুর ভেসে এল। মন্থর গতিতে মোড় ফিরলাম। এবার সোজা রাস্তা। স্যানাটোরিয়ামের গেট দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ চোখে পড়ল গেট থেকে সেই বিধবা মহিলা বেরোচ্ছেন বিজন দত্তর ছেলের হাত ধরে, তাঁর পিছনে দত্তর স্ত্রী ক্লান্ত পায়ে আসছে।

তখন আমি জানলাম, ও এবার মারা যাবে।

প্রত্যাবর্তন

লোকটা আজও এসেছে। এই নিয়ে পরপর পাঁচদিন।

"কি জন্য আসে বল্‌তো এই ভোরবেলায় ?" পল্টুকে বললাম। "কাল দেখছিলাম আমাদের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে আবার হাসছিলও।"

ফুটবলটা মাটিতে ধাপাতে ধাপাতে পল্টু নিমগাছতলাটার দিকে তাকাল। লোকটা ওইখানে বসে রয়েছে। ওইখানেই আমরা পোশাক বদলাই, বুট পরি ও খুলি, প্র্যাকটিসের পর বিশ্রাম নিই, সঙ্গে নিয়ে আসা খাবার খাই। এত ভোরে কারখানার এই মাঠটায় আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ আসে না। অবশ্য আসার উপায়ও নেই। সারামাঠ পাঁচিলে ঘেরা। শুধু এক জায়গায় পাঁচিলটা ভাঙা। শ্রম ও সময় বাঁচাবার জন্য আমরা সেই ভাঙা জায়গা দিয়েই মাঠে ঢুকি। মাঠ থেকে লোকালয় প্রায় সিকি মাইল দূরে। এ তল্লাটে চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে ফুটবল খেলার এতবড় মাঠ আর নেই। আমার দূরসম্পর্কের এক আত্মীয় এই লোহা-কারখানার ফোরম্যান। তার সুপারিশে ম্যানেজারের কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছি, সকালে প্র্যাকটিসের। এ বছর থেকে আমরা দুজনেই ফার্স্ট ডিভিশনে খেলব তাই উৎসাহটা বেশিই। গরম পড়তে না পড়তেই প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছি।

"পাগল-টাগল হবে বোধহয়।" পল্টু এর বেশি কিছু বলল না।

গাছতলায় দুজনের ব্যাগ আর বলটা রেখে লোকটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে আমরা প্রায় নগ্ন হয়েই খাটো প্যান্ট পরলাম। বুট পরতে পরতে একবার তাকালাম খোঁচা খোঁচা আধপাকা দাড়িওয়ালা, অপরিচ্ছন্ন শীর্ণকায় আধবুড়ো লোকটির দিকে। দুজনেই ঘড়ি খুলে ব্যাগে রেখেছি। আমরা মাঠের মধ্যে থাকব আর এই লোকটা থাকবে ব্যাগ দুটোর কাছে, মনে হওয়া মাত্র অস্বস্তি বোধ করলাম। ঘড়ি পরেই থাকব কি না ভাবলাম। পল্টুর পক্ষে অবশ্য সম্ভব নয় কেননা সে গোলকীপার খেলে। ওকে প্রায়ই মাটিতে ঝাঁপ দিতে হয়। লোকটাকে যে অন্য কোথাও বসতে বলব, তাতেও বাধো বাধো ঠেকল। ওর সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের তকমা আঁটা থাকলেও, বসার ঋজু ভঙ্গিতে ঝকঝকে চাহনিতে বা গ্রীবার উদ্ধত বঙ্কিমতায় এমন একটা সহজ

জমকালো ভাব রয়েছে, যেটা ছিঁচকে চোর সম্পর্কে আমার ধারণার সঙ্গে একদমই মেলাতে পারলাম না।

লোকটি শিশুর কৌতূহল নিয়ে আমাদের বুটপরা দেখছে। এই ক'দিন খয়েরি লুঙ্গি আর সাদা হাওয়াই শার্ট পরে আসছিল, আজ দেখি একটি পরনে ঢলঢলে কিন্তু ঝুলে খাটো, মোটা জিনের নীল পাজামা। বয়লার ও মেসিন-ঘরের শ্রমিকরা যে রকমটি পরে। চকোলেট রঙের কলার দেওয়া ফ্যাকাসে হলুদ রঙের সিল্কের যে গেঞ্জিটা পরেছে সেটাও ঢলঢলে। মনে হয় অন্য কারুর পাজামা ও গেঞ্জি পরে এসেছে।

"আপনারা অ্যাংক্লেট পরলেন না যে?" লোকটির হঠাৎ প্রশ্নে আমরা দুজনেই মুখ ফেরালাম। পল্টু গম্ভীর স্বরে বলল, "পরার কোন দরকার নেই তাই। ওতে সুবিধের থেকে অসুবিধেই বেশি হয়।"

লোকটির চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। আমাদের পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "কে বলল সুবিধে হয় না, পরে কখনো খেলেছেন?" কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার বলল, "বড় বড় প্লেয়াররা সবাই অ্যাংক্লেট পরেই খেলেছে—সামাদ, ছোনে, জুম্মা করুণা—কই ওদের তো অসুবিধে হয়নি! ওদের মতো প্লেয়ারও তো আর হল না।"

"আর হবেও না কেননা খেলার ধরনই বদলে গেছে।" এবার আমিই জবাব দিলাম।

"গেলেই বা! শুটিং, হেডিং, ড্রিবলিং ট্যাকলিং, পাসিং, এসব তো আর বদলায়নি!" লোকটি মিটমিট করে হেসে আবার বলল, "আজকাল হয়েছে শুধু রকমারি গালভরা নামওলা সব আইডিয়া। সেদিন এক ছোকরা আমায় ফোর-টু-ফোর বোঝাচ্ছিল। আরে এতো দেখি সেই আমাদের আমলের টু-ব্যাকেরই খেলা! হ্যাফ-ব্যাক দুটো নেমে এলেই তো ফোর ব্যাক—"

ওর কথা শেষ হবার আগেই আমি আর পল্টু নিজেদের মধ্যে চাওয়া-চাওয়ি করে মাঠে নেমে পড়েছি। রোজই প্রথমে আমরা মাঠটাকে চক্কর দিয়ে কয়েক প্পাক দৌড়ই। শুরু করার আগে পল্টু চাপা স্বরে বলল, "গুলিখাওয়া বাঘ। অ্যানাদার ফ্রাসট্রেটেড ওল্ড ফুটবলার।"

পাশাপাশি ছুটতে ছুটতে ঘাড় ফিরিয়ে দুজনেই লক্ষ্য করছিলাম লোকটাকে। এক সময়ে দুজনেই থেমে পড়লাম। বলটা গাছতলাতে রেখে আমরা দৌড়তে নেমেছি। ইতিমধ্যে সেটিকে নিয়ে লোকটা কাল্পনিক প্রতিপক্ষদের কাটাতে ব্যস্ত। প্রায় ছ'ফুট লগবগে শরীরটাকে একবার ডাইনে আবার বাঁয়ে হেলাচ্ছে, পায়ের চেটো দিয়ে বলটাকে টানল, বলটাকে লাফিয়ে ডিঙিয়ে গেল, ঘুরে গিয়ে প্রচণ্ড শট করার ভান করে পা তুলে আলতো শটে বলটা ডান দিকে ঠেলে দিয়ে ঝুঁকে যেন সামনে দাঁড়ান কাউকে এড়িয়ে উৎকণ্ঠিত

হয়ে দেখতে লাগল বলটা গোলে ঢুকছে কিনা। বলটা গড়াতে গড়াতে থেমে যেতেই দু'হাত তুলে হাসতে শুরু করল। মনে হল প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের ভ্যাবাচ্যাক মুখগুলো দেখে হাসি সামলাতে পারেনি।

পল্টুকে বললাম, "বোধহয় এককালে খেলত।"

নকল আতঙ্ক গলায় ফুটিয়ে পল্টু বলল, "সেরেছে। মিলিটারিদের সঙ্গে খেলার গপ্পো শুরু করবে না তো!"

"তোর এইসব বাজে ধারণাগুলো মাথা থেকে তাড়া।" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললাম, "সে আমলে সত্যিই অনেক ভাল ভাল প্লেয়ার ছিল।"

"হ্যাঁ ছিল। গোরারা তাদের ভয়ে ঠকঠক কাঁপত। তারা তিরিশ-চল্লিশ গজ দূর থেকে মেরে মেরে গোল দিত। রেকর্ডের খাতা খুলে দ্যাখ সেই সব শটের কোন পাত্তাই মিলবে না। বড়জোর একগোল কি দু'গোল, আর বাবুরা খেতেন পাঁচ-ছ গোল।" এই বলে পল্টু আমার জন্যে অপেক্ষা না করেই আবার ছুটতে শুরু করল।

আমি মাঠের বাইরে লোকটার দিকে তাকালাম। এক পায়ে দাঁড়িয়ে অন্য পায়ে বলটাকে মেরে মেরে শূন্যে রাখার চেষ্টা করছে। তিন চার সেকেণ্ডের বেশি পারছে না। অবশেষে বিরক্ত হয়ে বলটাকে লাথি মেরে মাঠের মাঝখানে পাঠিয়ে দিল। যখন শুটিং প্র্যাকটিস শুরু করলাম লোকটা মাঠে এসে দাঁড়াল। কারখানার মেল্টিং শপের দেয়ালটায় খড়ির দাগ টেনে পোস্ট এঁকে নিয়েছি। ক্রশবারটা কাল্পনিক। যে সব বল পল্টু ধরতে পারে না, দেয়ালে লেগে মাঠে ফিরে আসে। লোকটা তুমুল উৎসাহে ছোটাছুটি করে সেই বল ধরে, যেন ছাত্রদের সামনে শুটিং-এর টেকনিক বোঝাচ্ছে এমন কায়দায় পা দিয়ে মেরে আমায় ফিরিয়ে দিতে লাগল আর সমানে বকবক করে চলল।

"উঁহুহু, উপর দিয়ে নয়, মাটিতে, সবসময় মাটিতে রাখতে হবে·· উপর তোলা মানেই গেল, নষ্ট হয়ে গেল!" ঊর্ধ্বশ্বাসে বল ধরতে ছুটে গেল। "আজকাল তো এইসব ক্ল্যাসিক থ্রু পাস দেখতেই পাই না, কুমারবাবু দিতেন।" আবার ছুটে গেল। সেদিন ছোকরাটাকে বলছিলুম, যে ফোর-টু-ফোর বোঝাচ্ছিল···আরে বাবা ছক কষে কি আর ফুটবল খেলা হয় মাটিতে মাটিতে, তুলে নয়· হ্যাঁ এখন অনেক বেশি খেলতে হয় বটে, সে কথা আমি মানি, খাটুনি বেড়েছে···হল না হল না থ্রু দেবার সময় পায়ের চেটোটা ঠিক এইভাবে, দিন বলটা আমায় দিন দেখিয়ে দিচ্ছি।"

বলটা ওকে দিলাম। দূর থেকে পল্টু খিঁচিয়ে উঠল, "আমি কি হাঁ করে ভ্যারেণ্ডা ভাজব? শট কর শট কর।"

লোকটি অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি বলটা আমার দিকে ঠেলে দিল। "দমাদম গোলে বল মারলেই কি ফুটবল খেলা হয়, স্কিলও প্র্যাকটিস করতে

হয়।" এই বলে লোকটি ক্ষোভ প্রকাশ করল বটে কিন্তু বল ধরে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ বন্ধ করল না। পা ফাঁক করে কুঁজো হয়ে দৌড়ে, বলটাকে ধরেই কাউকে যেন কাটাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে পায়ে খেলিয়ে নিয়ে যেন মহার্ঘ একটি পাস দিচ্ছে, আমার সামনে বলটা বাড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করল, "শ্যুট শ্যুট।" গড়ানে বলেই শট করলাম, ঝাঁপিয়ে পড়া পল্টুর বগলের তলা দিয়ে একটা প্রচণ্ড গতিতে দেয়ালে লেগে মাঠে ফিরে এল। "গো-ও-ল…ল।" বলে লোকটি হাত তুলে লাফিয়ে উঠল। শট্‌টির নিখুঁতত্বে আমিও চমৎকৃত। লোকটি উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে বলল, "কাকে থ্রু বলে দেখলেন তো। আর এই জিনিস আপনারা খেলা থেকে কিনা তুলে দিয়েছেন! আজকাল কি যে ম্যান-টু ম্যান খেলা হয়েছে, বিউটিই যদি না থাকে তাহলে—"

আমি দেখলাম পল্টু মুখ লাল করে ছুটে আসছে। শিউরে উঠলাম। পল্টুর মাথা অল্পেই গরম হয়। সামান্য উস্কানিতেই ঘুষোঘুষি শুরু করে।

"আমরা এখানে এসেছি প্র্যাকটিস করতে," ভারী গলায় পল্টু বলল। "আপনাকে তো আমরা ডাকিনি তবে কেন গায়ে পড়ে ঝামেলা করছেন। খেলা যদি শেখাতে চান, তবে অন্য কাউকে ধরে শেখান। প্লিজ আমাদের বিরক্ত করবেন না।

পল্টু গটগট করে ফিরে গেল নিজের জায়গায়। লোকটি অবাক হয়ে পল্টুর দিকে তাকিয়েছিল। দেখলাম ক্রমশ মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে এল। মাথা নামিয়ে গাছতলার দিকে যখন ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ওর ঢলঢলে নীল পাজামা আর কুঁজো পিঠটার দিকে তাকিয়ে ক্ষয়ে যাওয়া শ্যাওলাধরা একটা পাথরের কথাই মনে এল। আমরা যখন নিমগাছতলায় বসে খাচ্ছিলাম, লোকটি তখন উঠে গেল। খেতে খেতে পল্টু শুরু করল আমাদের নতুন ক্লাবের ফুটবল সেক্রেটারীর মেয়ের গল্প। নিয়মিত খেলা দেখে। প্লেয়ারদের সঙ্গে এখানে-ওখানে ঘোরে এবং কার কার সঙ্গে তাকে কোথায় কখন দেখা গেছে, পল্টু যখন তার ফিরিস্তি দিচ্ছিল তখন হঠাৎ চোখে পড়ল লোকটি ধীরে ধীরে ছুটতে শুরু করেছে মাঠটাকে পাক দিয়ে। ঠিক আমরা যেভাবে ছুটি। আমার সঙ্গে পল্টুও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

একপাক শেষ করে যখন আমাদের সামনে দিয়ে ছুটে গেল, দেখি জ্বলজ্বলে চোখ দুটি কঠিন দৃষ্টিতে সামনে নিবদ্ধ। আমাদের দিকে বারেকের জন্যও তাকাল না। সরু বুকটা হাপরের মত উঠানামা করছে। নিশ্বাস নেবার জন্য মুখটা খোলা। পিছন থেকে শীর্ণ ঢ্যাঙা দেহের উপরে কলির পোঁচড়ার মত চুল ভর্তি মাথাটাকে নড়বড় করতে দেখে হাসিই পেল। কিন্তু পরক্ষণেই কষ্ট হল আধবুড়ো লোকটির ঐ ধরনের ছেলেমানুষি প্রয়াস দেখে। স্পষ্টই

বোঝা যাচ্ছে, ও নিজেকে আমাদের সমান প্রতিপন্ন করতে যেন চ্যালেঞ্জ দিয়েই ছুটছে বয়সের বাধা ঠেলে ঠেলে। মনে মনে চাইলাম ছেলেমানুষের মত এই অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ত্যাগ করে এখান থেকে ও চলে যাক।

"টেঁসে না যায়, তাহলে আবার হুজ্জুতে পড়তে হবে।" পল্টুর স্বরে সত্যিকারের উৎকণ্ঠা কিছুটা ফুটল। লোকটা দেড় পাক ছুটেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। মুখ তুলে হাঁ করে আছে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। মনে হল আমাদের দিকে বারকয়েক আড়চোখে তাকালও। হয়তো কোলাপ্স করে পড়ে যেতে পারে ভেবে আমি উঠে দাঁড়ালাম। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক হাঁটার ভঙ্গিতে পাঁচিলের ভাঙা জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেল। তাই দেখে আবার কষ্ট পেলাম। পল্টু হোহো করে হেসে উঠল।

দিন ছয়-সাত লোকটি এল না। আশ্বস্ত হয়ে ভাবলাম আর বোধহয় আসবে না। কিন্তু লোকটি এল, সঙ্গে তিন-চারটি তালিমারা ঢ্যাবঢেবে একটি ফুটবল নিয়ে। আমরা যথারীতি প্র্যাকটিস করতে লাগলাম আর তখন সে মাঠের অপরদিকে নিজের বলটি নিয়ে কাল্পনিক প্রতিপক্ষদের নাজেহাল করায় ব্যস্ত রইল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই দেখলাম, বলটিকে পায়ের কাছে রেখে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। একবার বলটা ওর দিকে গড়িয়ে যেতেই চোখদুটো চকচক করে উঠল। সামনে ঝুঁকে এগোতে গিয়েও প্রাণপণে নিজেকে যেন ধরে রাখল।

"ক'দিন দেখিনি যে আপনাকে?" বললাম নিছকই সৌজন্যবশত।

"শরীরটা খুব খারাপ হয়েছিল।" গম্ভীর হয়ে বলার চেষ্টা করল।

ওকে খুশি করার জন্য বললাম, "দেখুন তো থ্রুগুলো ঠিক মত হচ্ছে কিনা?"

একটু পরেই ও চেঁচিয়ে উঠল, "ওকি ওকি! হচ্ছে না।" আমি ফিরে তাকাতেই আবার বলল, "চটপট করতে হবে, কিন্তু কম স্পীডে। কিক্ করার সময়ও তাই। পায়ের পাতার ওপর দিক দিয়ে। বুটের ডগা মাটির দিকে—এইরকম ভাবে। তারপর ফলো-থ্রুটা হবে—এই রকম! করুন তো একবার।"

ফার্স্ট ডিভিশনে খেলতে যাচ্ছি আর এখন কিনা শ্যুট করার প্রাথমিক নিয়ম এইরকম একটা লোকের কাছ থেকে শিখতে হবে ভাবতেই বিরক্তিতে মন ভরে উঠল। ওকে অগ্রাহ্য করে আগের মতনই শ্যুট করতে লাগলাম। বার দুয়েক চেঁচিয়ে ও চুপ করে গেল। বুঝতে পারছি লোকটির একজন চেলা দরকার, যে ওর উপদেশ শুনবে, মান্য করবে, আমরা যে ওর কথা অনুযায়ী কাজ করব না সেটা নিশ্চয় বুঝে গেছে।

পরদিন সকালে বৃষ্টি পড়ছিল। আমরা মাঠে এসে দেখি চেলা জুটে

গেছে। থপথপে বোকা চেহারার একটা ছেলে বৃষ্টির মধ্যে কাঠের মত দাঁড়িয়ে, বল নিয়ে লোকটার লম্ফঝম্ফ মনোযোগ করে দেখছে। ওর পাগলামি আর উৎসাহ দেখে অবাক হলাম। কিন্তু বৃষ্টির জল গায়ে বসবার স্বাস্থ্য বা বয়স ওর নয়। পল্টুকে বললাম, "নির্ঘাৎ নিউমোনিয়া হবে লোকটার।"

"হোক্। কিন্তু এটাকে কোত্থেকে ধরে আনল, একটা হাঁদা গোবর-গণেশ। সারা জীবনেও তো খেলা শিখতে পারবে না।"

দূরে থেকেই আমরা শুনতে পেলাম লোকটির নির্দেশ দেওয়া। যেন ক্লাসে লেকচার দিচ্ছে। "বলের উপর দিয়ে যদি এইভাবে যাও"—ছোট্ট একটা লাফ— "তাহলে কিস্সু হবে না। তোমায় করতে হবে কি এইভাবে · তারপর এইভাবে নিয়ে যাবে। তাহলে দোনামনায় পড়বে তোমার অপোনেণ্ট।"

ছেলেটি একাগ্র হয়ে দেখছে আর প্রত্যেক কথায় ঘাড় নেড়ে যাচ্ছে কিন্তু লোকটি ওকে বল নিয়ে চেষ্টা করতে বলছে না। "এইবার দেখাচ্ছি কিভাবে পায়ের চেটো দিয়ে পাস দিতে হয়।" ঢ্যাপঢ্যাপে বলটা কাদায় আটকে গেল। লোকটি ছুটে গিয়ে ড্রিবল করতে করতে বলটাকে আনল। ছেলেটি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। বৃষ্টির ফোঁটা থুতনী দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। চুল কপালে লেপটে। শার্টের ভিতর থেকে গায়ের সাদা চামড়া ফুটে উঠেছে। "এইবার দেখো ডগা দিয়ে কি করে বল তুলতে হয়।" তুলতে গিয়ে পা পিছলে লোকটি পড়ে গেল। ছেলেটি কিন্তু হাসল না। বরং লোকটিই হেসে উঠল। এই সময় হঠাৎ বৃষ্টির বেগ বাড়তে আমরা প্র্যাকটিস বন্ধ করে ফিরে গেলাম। যাবার সময় দেখি লোকটি ছেলেটির চারপাশে বল নিয়ে ঘুরছে আর নাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছে।

পরদিন পল্টু প্র্যাক্‌টিসে এল না। চোট পেয়ে ওর হাঁটু ফুলে উঠেছে। একাই হাজির হলাম মাঠে। নিমগাছতলায় লোকটি বসে। চেলাটি তখনো আসেনি। আমায় দেখে হেসে বলল "আর একজন কই ?"

কারণটা বললাম। তারপর কথায় কথায় ওর কাছে জানতে চাইলাম, কি করেন কোথায় থাকেন এবং ফুটবল খেলতেন কোন ক্লাবে। উত্তর দিতে ওর খুব আগ্রহ দেখলাম না। শুধু জানলাম মাইলদুয়েক দূরে ভট্‌চায পাড়ায় ভাইয়ের বাড়িতে থাকেন। অবিবাহিত। যুদ্ধে গেছলেন। ফিরে এসে কারখানায় ওয়েল্ডারের কাজ করেন। প্লুরিসি হওয়ায় কাজ ছেড়ে দেশের বাড়িতে গিয়ে যৎসামান্য জমিজমা নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। এখন আর ভাল লাগছে না তাই ছোটভাইয়ের কাছে এসেছেন, কিন্তু এখানেও নানান অসুবিধা— অশান্তি। ভাবছেন, আবার দেশেই ফিরে যাবেন।

"হাঁ খেলতুম।" কাশতে শুরু করল। পিঠটা বেঁকে গেল কাশির ধমকে। বারকয়েক থুথু ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। "বরাবর বুট পরেই

খেলেছি। একবছর কালীঘাটেও ছিলুম, জোসেফ খেলত তখন। নাম শুনেছেন ওর?"

আমি মাথা নাড়লাম। কি একটা বলতে যাচ্ছিল আবার কাশি শুরু হতেই থেমে গেল। গতকাল বৃষ্টিতে ভেজার মাশুল। এই দুর্বল শরীরে আজ যদি খেলা দেখাতে মাঠে নামে তাহলে নির্ঘাৎ মারা পড়বে, এই ভেবে ওকে বললাম, "আজ বোধহয় আপনার শিষ্যটি আসবে না। বরং আপনি বাড়িই ফিরে যান।"

"না, না, আসবে, ঠিক আসবে। বলেছি ওকে ফুটবলার তৈরি করে দেবই, তাতে যদি জীবন যায় তো যাবে। আমি যে পদ্ধতি নিয়েছি তার আর মার নেই। বুঝলেন, যে কোন বস্তুর উপরে যদি ইচ্ছার প্রভাব ছড়ান যায় তাহলে সফল হবেই।" দুবার কেশে নিয়ে আবার বলল, "বস্তুটি যদি কাঁচা হয়, তার মানে যদি অল্পবয়সী হয় তাহলে যে কাউকেই দুর্দান্ত প্লেয়ার করা যাবে। আমার এখন বয়স হয়ে গেছে, নয়তো নিজের উপরই পদ্ধতিটা পরখ করতাম।"

ছেলেটিকে ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে আসতে দেখলাম। লোকটি তখন মাঠের অন্যধারে প্রায় পত্রহীন একটা শিমুল গাছের দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, গাছ তো তার পাতার মধ্য দিয়ে যা শুষে নেয় তাই দিয়েই খাদ্য তৈরী করে বেঁচে থাকে। তাই যদি হবে তাহলে ওই গাছটা কি করে বেঁচে রয়েছে?" ওর কণ্ঠস্বরে যেন ব্যক্তিগত সমস্যার দায় ধ্বনিত হল—"পাতাই নেই তাহলে বেঁচে আছে কি করে?"

হঠাৎ লোকটিকে আমার ভাল লাগতে শুরু করল এবং দুঃখও বোধ করলাম। যে পদ্ধতিতেই খেলা শেখাক এই গাবদা চেহারার ছেলেটি যে কোনদিনই ফুটবলার হতে পারবে না, তাতে আমি নিঃসন্দিগ্ধ। ছেলেটাকে একবারও বলে লাথি মারতে না দিয়ে লোকটি নিজেই লাফালাফি করে যাচ্ছে। ছেলেটি সামান্য চনমনে হলে নিশ্চয় এভাবে কাঠের মত দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। বস্তুত, এরকম হাঁদা ছেলে না পেলে লোকটি তাকে শিষ্যও বানাত না।

প্রায় আধঘণ্টা বসে থেকে লোকটির কর্মকাণ্ড দেখলাম। ছেলেটি চলে যেতেই আমার খাবারটা ওর দিকে এগিয়ে ধরে বললাম, "আমি তো আজ প্র্যাকটিস করলাম না, তাছাড়া খিদেও নেই।"

ভ্রূ কুঁচকে বলল, "করুন না, আমি গোলে দাঁড়াচ্ছি।"

"না থাক, আজ মন লাগছে না।"

লোকটি আর কথা বাড়াল না। খাবারের প্যাকেটটা নিয়ে পকেটে রাখল। কোন কুণ্ঠা দেখলাম না। বিনয় দেখিয়ে ধন্যবাদও জানাল না। আমরা একসঙ্গেই মাঠ থেকে বেরোলাম, হাঁটতে হাঁটতে লোকটি একসময় বলল, "আমার কি মনে হয় জানেন, ফুটবলের তুল্য আর কোন খেলা পৃথিবীতে নেই। ক্রিকেট

হকি ব্যাডমিণ্টন টেনিস যাই বলুন, সবই একটা ডাণ্ডা নিয়ে খেলতে হয়। ডাণ্ডা, হাতে মানুষ! তার মানে প্রায় সেই বনমানুষের যুগের ব্যাপার। ফুটবল হচ্ছে সভ্যমানুষের খেলা, এর মধ্যে অনেক সায়েন্স আছে। সেটা রপ্ত করতে পারলে··· ভাল কথা আপনার কি কোন বাতিল ছেঁড়া বুট আছে? কাল দেখলেন তো কেমন পিছলে পড়ে গেলুম। বুট হলে আরও ভাল ক'রে ডিমনস্ট্রেট করতে পারি।"

মাথা নেড়ে জানালাম, দেবার মত বুট আমার নেই। শুনে আফসোসে টাগরায় জিভ লাগিয়ে শব্দ করল। ওর গাল দুটি লক্ষ করলাম, আগের থেকে পাণ্ডুর এবং বসে গেছে। ঢলঢলে নীল পাজামাটায় গতদিনের কাদা শুকিয়ে আটকে রয়েছে। তালিমারা বলটা দুহাতে বুকে চেপে ধরে মাথা ঝুঁকিয়ে ওর হাঁটা প্রায় বাচ্চাছেলের মত দেখাচ্ছে। কিন্তু চোখ দুটিতে দারুণ উত্তেজনা। মনের মধ্যে হয়তো প্রতিপক্ষকে একের পর এক ড্রিবল করে এখন কাটিয়ে চলেছে। আমাকে কোনরকম বিদায় না জানিয়েই মোড়ে পেঁৗছে আপন মনে সে নিজের বাড়ির পথ ধরল।

পরের সপ্তাহে ছেলেটিকে প্রথমবার বল নিয়ে নড়াচড়া করতে দেখলাম। দেখে মনে হল ওর থেকে এই আধবুড়ো লোকটি জোরে কিক্ করতে পারে, লাফাতে পারে। ছেলেটি কেন যে এত জিনিস থাকতে ফুটবল খেলা শিখতে এল ভেবে অবাক হলাম। আধঘণ্টা পরে, ছেলেটি চলে যাওয়ামাত্র বললাম, "কি রকম মনে হচ্ছে, হবে-টবে কিছু?"

"নিশ্চয়।" লোকটি প্রচণ্ড উৎসাহে বলল, "ঠিক করেছি এবার ওকে নামাব। যা কিছু শিখিয়েছি, সেগুলো খেলায় ব্যবহার করার মত উপযুক্ত হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। ওর স্কুলের একটা ট্রায়াল ম্যাচ আছে এই শনিবার, ও খেলবে। আমি টাচ লাইন থেকে দরকার মত বলে বলে দেব।"

"ওকে আগে কখনো কি খেলতে দেখেছেন?"

"না, তার দরকারই বা কী! এতদিন ধরে যা যা শিখিয়েছি সেটাই আমার দেখা দরকার। উন্নতি করেছে তাতে সন্দেহ নেই, নইলে ট্রায়াল ম্যাচে চান্স পাবে কেন!"

এবার আমি লোকটির জন্য হতাশা বোধ করলাম। নিজের কল্পনার জগৎকে আরোপ করার চেষ্টা করছে বাস্তব জগৎ-এর উপর। ফলাফল ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। মনশ্চক্ষে দেখলাম, কুঁজো হয়ে, পা ফাঁক করে লোকটি টাচ লাইন ধরে ছুটোছুটি করছে আর বিচ্ছু ছেলেরা ওর পিছনে ছুটছে, ভ্যাংচাচ্ছে, হাসছে, জামা ধরে টানছে। মাস্টার মশাইরা বলছেন, পাগলটাকে সরিয়ে দিতে। দেখতে পেলাম, অপমানে লজ্জায় ওর জ্বলজ্বলে চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। মাঠ থেকে চলে যাচ্ছে মাথা নামিয়ে আর একপাল ছেলে ওর পিছু নিয়েছে।

"এখনই ওকে ম্যাচে নামানোটা কি একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে না ?" যথাসম্ভব নম্রকণ্ঠে বললাম। "মাত্র ক'দিন তো শেখাচ্ছেন ?"

"আমি হিসেব রেখেছি, মোট পঁচিশ ঘণ্টা ওকে কোচ করেছি। ছেলেদের ফুটবলে ভাল স্ট্যাণ্ডার্ডে রিচ করতে পঁচিশ ঘণ্টার কোচিংই যথেষ্ট।"

"কিন্তু এ ছেলেটাকে তো পাঁচশো ঘণ্টা কোচ করলেও কোন স্ট্যাণ্ডার্ডে পৌঁছতে পারবে না।"

প্রথমে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। তারপর হেসে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "ইচ্ছেটা যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার আপনি বুঝবেন না। আপনি ইচ্ছে করুন সামাদ কি ছোনে কি গোষ্ঠ পালের মত খেলবেন···কিংবা আজকাল যাদের খুব নাম শুনি—পেলে, ইস্যুবিও···তাহলে ঠিক তৈরি হয়ে যাবেন।"

এই নিয়ে আর কথা বাড়ালাম না। ভাবলাম, যা খুশি করুক আমার তা নিয়ে মাথাব্যথার দরকার নেই। বরং শিক্ষা পেলে ওর জ্ঞানচক্ষু ফুটবে। লোকটি এরপর এক সপ্তাহ অনুপস্থিত রইল। রোজই পল্টুর সঙ্গে প্র্যাকটিসের সময় ভাঙা পাঁচিলটার দিকে তাকাতাম। এই বুঝি আসে। পরে মনে হত, ছেলেটা নিশ্চয় ওকে ডুবিয়েছে তাই আমাদের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা পাচ্ছে বলেই আসছে না।

একদিন লোকটিকে আবার দেখলাম। নিমগাছতলায় দাঁড়িয়ে আমাদের প্র্যাকটিস দেখছে। পরনে লুঙ্গি আর হাওয়াই শার্ট মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ওকে দেখতে পেয়েছি বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিল, দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "সেদিনকার ট্রায়াল ম্যাচের খবর কী ?"

লোকটি একবার থমকাল তারপর চলতে চলতেই বলল, "শুধু ইচ্ছাতেই হয় না, কিছুটা প্রতিভাও থাকা দরকার। আমারই ভুল হয়েছে।" এরপর ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে একবার তাকাল। আমি ওর চোখে গাঢ় প্রত্যাবর্তন কামনা দেখতে পেলাম। ওর চলে যাওয়া দেখে মনে হল, একটা আহত জন্তু গভীর অরণ্যের নির্জনে প্রাণ দেবার জন্য যেন হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে।

কিছুদিন পর বাজার যাবার পথে ছেলেটিকে দেখতে পেলাম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওর থেকেও কমবয়েসী ছেলেদের ডাংগুলি খেলা দেখছিল। লোকটির খবর জিজ্ঞাসা করতেই ও বিরক্ত স্বরে বলল, "কে জানে। বোধহয় আবার অসুখ-বিসুখ হয়েছে।"

"কোথায় থাকে জান ?"

"জানি, তবে আমি কিন্তু নিয়ে যেতে পারব না। আমায় দেখলেই এমন-ভাবে তাকায় যেন ভস্ম করে ফেলবে। আচ্ছা কি দোষ বলুন তো, মাঠে এমন কাণ্ড শুরু করল যে ছেলেরা ওর পেছনে লাগল। এজন্য কি আমি দায়ী ?"

"মোটেই না"

"তাহলে! আমি যদি খারাপ খেলি তাই বলে সকলের সামনে অমন হাউ-হাউ করে কাঁদবে একটা বুড়ো লোক?"

"তুমি বরং দূর থেকে বাড়িটা দেখিয়ে দাও। সেটা পারবে তো?" অধৈর্য হয়ে বললাম।

"তা পারব।" ছেলেটি দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলল।

কথামত দূর থেকে বাড়িটি দেখিয়ে দিয়েই ছেলেটি চলে গেল। জায়গাটা আধাবস্তি। তিনদিকে টালির চাল দেওয়া একতলা ঘর, মাঝখানে উঠোনের মত খোলা জায়গা। অনেকগুলো বাচ্চা হুটোপাটি চীৎকার করছে। তার পাশেই খোলা নর্দমা, থকথকে পাঁকে ভরা। একধারে লাউয়ের মাচা। চিটচিটে ছেঁড়া তোষক বাঁশে ঝুলছে। আঁস্তাকুড়ে একটা হাঁস ঠোঁট দিয়ে খুঁচিয়ে খাদ্য বার করছে। একজন স্ত্রীলোক এসে একটি বাচ্চার পিঠে কয়েকটি চড় মেরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল। আমার প্রশ্নে, ব্যাজার মুখে একটা ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে চলে গেল। একটু কৌতূহলও প্রকাশ করল না।

ঘরের দরজাটি পিছন দিকে। ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে তাকালাম। দেয়ালে অজস্র ক্যালেণ্ডার আর তোরঙ্গ, কৌটো, ঘড়া, বিছানা, মশারী প্রভৃতিতে বিশৃঙ্খল ঘরের কোণায় তক্তপোশে লোকটি দেয়ালে ঠেস দিয়ে খাড়া হয়ে বসে। তাকিয়ে রয়েছে সামনের দেয়ালে। পাশ থেকে দেখতে পেলাম থুতনিটা এমন ভঙ্গিতে তোলা যেন কিছুই ধর্তব্যের মধ্যে আনছে না। গালের হাড় উঁচু হয়ে চোখ দুটিকে আরো ঢুকিয়ে দিয়েছে। মৃত্যু ওর শরীরে কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে এবং লোকটি আরামে আচ্ছন্ন হয়ে আছে মনে হল।

হঠাৎ ও ঘাড় ফেরাল। চোখাচোখি হল আমার সঙ্গে। মাত্র কয়েক হাত দূরেই দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু ওর চোখে কোনরূপ ভাবান্তর প্রকাশ পেল না। রিক্ত কৌতূহলবর্জিত শূন্য চাহনি। মনে হল নিষ্পত্র প্রাচীন এক শিমুলের কাণ্ড, ক্ষয়প্রাপ্ত পাথরের মত যার বর্ণ, গতিহীন সঞ্চরণে প্রত্যাবর্তনরত। আমি পরিচিতের হাসি হাসলাম। ওর চোখে তা প্রতিফলিত হল না।

উৎসবের ছায়ায়

সানাই বসেছে আবার লাউড স্পিকারও। গোটা পাড়াটাই গমগম করছে। কাল দুপুরে যখন বর-বউ এল তখনই সানাই, বিকালে রেকর্ড। আজ সকালে সানাই, দুপুরে রেকর্ড। সারি সারি চেয়ার রাস্তার দুধারে। পথ-চলতি মানুষরা সসঙ্কোচে চেয়ার বাঁচিয়ে টুক করে জায়গাটা পার হয়ে যাচ্ছে। এঁটো পাতার বালতি নিয়ে দুটি ঝি বাড়ি থেকে বেরোতেই চেয়ারের মানুষরা নড়েচড়ে বসল। এক ব্যাচ শেষ হল। খুরি গেলাস ফেলার শব্দ পাশের নন্দী বাড়িতে পৌঁছতেই কতকগুলো মানুষ বেরিয়ে এসে চেয়ারে বসল।

ভূতের মতো মানুষগুলো উবু হয়ে এঁটো পাতা গেলাসের মধ্য থেকে খাবার বাছছে। উবু হয়ে ঘাড় নামিয়ে মঞ্জু তাই দেখছিল। ওদের জানলার নাকের তলাতেই আঁস্তাকুড়টা। দেখতে দেখতে মঞ্জু দাঁড়িয়ে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে খুব আস্তে ডাকল, মা।

কণিকা ঘরের ঠিক বাইরের রকটাতেই রাঁধছিল, ডাক শুনে সাড়া দিল মাত্র।

মা, আস্ত আস্ত ছ'টা সন্দেশ।

আচ্ছা আর গুণতে হবে না।

মঞ্জু আর বসল না। দাঁড়িয়েই সে গরাদের ফাঁকে ঠোঁট আর নাকটুকু বার করে দিল। আঁস্তাকুর থেকে বিয়ে বাড়ির গন্ধ আসছে। এ-পাড়ায় তারা নতুন এসেছে তাই নেমন্তন্ন হয়নি। সামনের বাড়ির মেয়েরা এখনো সাজছে। হাসিদি আজ সকালেও ফ্রক পরেছিল, শান্তিদি বিকেলের খোঁপাটা বদলেছে। ওদের সঙ্গে সান্যালদের খুব ভাব। বিয়ে বাড়ির ঝি আবার দু'বালতি এঁটো ফেলে গেল। ভূতগুলো মাথা নুইয়ে খাবার খুঁজছে।

মা, দেখে যাও কত ফেলে দিয়েছে।

ওদিক থেকে সাড়া এল না। তাতে কিছু এসে যায় না মঞ্জুর। নাক ফুলিয়ে খুব আস্তে আস্তে নিশ্বাস টানল।

বেড়িয়ে ফিরল কিরণ, অঞ্জু, আর রঞ্জু। আর জানলার কাছে মঞ্জুর বসে থাকার উপায় নেই। ওদের নিয়ে এখন খেলতে হবে, নয়তো রান্নার কাছে গিয়ে বিরক্ত করবে।

ঘরের আলো জ্বাললো কিরণ। স্কুল ফাইন্যাল পাস করে মামার কাছে এসেছে। মন্মথ চেষ্টা করছে একটা কাজ ওকে জুটিয়ে দিতে। ডিপো ম্যানেজারকে বলা আছে। সময় হলেই অ্যাপ্রেণ্টিশ করে ঢুকিয়ে দেবে।

ঘরের আলো নিবিয়ে কিরণ বেরিয়ে গেল। মঞ্জু, অঞ্জু, রঞ্জু অন্ধকারে বসে রইল। আলো জ্বালালে মিটার খরচ বেশি হয়। কণিকা লম্ফ জালিয়ে রান্না করে। জানলার কাছে গুটি গুটি ওরা তিন ভাই বোন দাঁড়াল। শুধু একটা লোক তখনো খাবার খুঁজছে। আর সবাই দূরে রাস্তার আলোয় নিজের নিজের পুঁটলি গোছাচ্ছে। রান্না হয়ে গেছে কণিকার। হেঁসেল ঘরে ঢুকলো। অন্যদিনের মতো বাচ্চারা হুটোপাটি করেনি তাই সে অবাক ছিল রান্নার সময়, আলো জেলেই দেখল তিনজন জানলায় ঠাসাঠাসি করে রয়েছে। ওদের ওপর দিয়ে উঁকি দিল কণিকা।

কি করছো এই নোংরার সামনে বসে?

দেখছি তো।

দেখার কি আছে। আঁস্তাকুড় কখনো দেখনি।

মা, দিদি বলছিল অনেক সন্দেশ ফেলে দিয়েছে। ওখানে আছে। দোষটা আসলে তার নয়, অঞ্জু এই কথাটাই বোঝাতে চাইল। মা বুঝেছে কিনা এই কথাটা জানতে তিন জোড়া চোখ কণিকার মুখে বিঁধে রইল। কি বুঝল কণিকা, আলোটা নিবিয়ে জানলার ধারে দাঁড়াল, মাথাটা হেলিয়ে কোনো রকমে এক চোখ দিয়ে সান্যাল বাড়ির দরজা পর্যন্ত দেখা যায়। কণিকা দেখতে লাগল।

ঘাঁটতে ঘাঁটতে লোকটা খাবার মুখে পুরছিল। হঠাৎ হেঁচকি তুলতে শুরু করল।

কণিকা সেই একভাবে এক চোখ দিয়ে দেখছে। হঠাৎ সে বলল, হ্যাঁরে মঞ্জু, ওই মেয়েটা বাসে করে ইস্কুল যায়?

মঞ্জু ঘাড় কাত করে কণিকার মতো একচোখ দিয়ে দেখল।

হ্যাঁ, ও টিনাদি।

আর ওর পাশেরটা?

দেখতে পাচ্ছি না।

কণিকা মঞ্জুকে আর একটু জায়গা ছেড়ে দিল।

ওতো বাসু, হেঁটে ইস্কুল যায়।

দ্যাখ দ্যাখ ওই কোলের ছেলেটাকে।

নিমন্ত্রিত কয়েকজন মহিলাদের একজনের কোলে বাচ্চা। মাস ছয়েক বয়স।

ঠিক ওই রকম একটা ফ্রক বড়মামী তোকে দিয়েছিল, ঠিক ওই রকম রঙ।

কবে মা ?

তোর ভাতের সময়।

রঞ্জু কি একটা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ সানাই বেজে উঠল, ওরা চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ পরেই রঞ্জু বলল, লোকটাকে ঠিক বাবার মতো দেখতে।

কোনটা ?

ওই যে সিগারেট খাচ্ছে।

দূর, ওতো মোটা আর পাঞ্জাবি পরেছে।

মঞ্জুর কথা শেষ হতেই কণিকা বলল, তোদের শম্ভুকাকার বিয়েতে তোর বাবা বরযাত্রী গেছল। পাঁচ-ছটা সিগারেট এনেছিল।

তুমি গেছলে ?

ওরা তিনজনে মুখ তুলে তাকাল।

মা তুমি নেমন্তন্ন খেয়েছ ?

তিনজোড়া চোখ বিঁধে আছে।

কণিকা জবাব দিল না। ওরা এক সময় চোখ সরিয়ে নিল।

মঞ্জুর ভাতে অনেকে আমাদের বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে গেছে।

আবার তিনটে মাথা ঘুরে গেল। গরাদে নাক চেপে কণিকা হাসল ওরা তা দেখতে পেল না।

দুটো রসুই বামুন ভাড়া করা হয়েছিল। রাসবিহারীবাবুদের ছাতে লোক খেয়েছিল। এমনি রাস্তার দুধারে চেয়ার পেতে লোক বসেছিল, কত যে খাবার ফেলা গেছল।

রেখে দিলে না কেন ? পরের দিন খেতে।

অনেক বেঁচেছিল। বিষ্টুদের বাড়ি, হরিঠাকুরঝিদের বাড়ি, তোর বাবার বন্ধুদের বাড়ি খাবার পাঠানো হয়েছিল।

সান্যাল বাড়ি থেকে একসঙ্গে অনেকে বেরোচ্ছে, কণিকা তাড়াতাড়ি গরাদের ফাঁকে চোখ রাখল। বোধহয় মেয়ের বাড়ির লোক, বর নিজে এগিয়ে দিতে এসেছে।

মা, আর ভাত হবে না আমাদের বাড়ি ?

মা, মঞ্জুটা কি বোকা দেখ. বড় হয়ে গেলে আবার ভাত হয় নাকি ? হঠাৎ জানলা থেকে সরে গেল কণিকা। মন্মথ আসছে।

•

কলঘর বাড়িওয়ালার এক্তিয়ারে। বাড়িওয়ালার বৌ ছুঁচিবেয়ে, পাইখানা যেতে গিয়ে মন্মথ এক ফোঁটাও জল পেল না। অশ্রাব্য দু একটা গাল শুরু করেছিল মন্মথ। কণিকা তাড়াতাড়ি খাবার জলের কলসি থেকে ঢেলে দিল। মন্মথ এলেই ভাত বেড়ে দেবে। ছেলে-মেয়েরাও বসবে ওর সঙ্গে। যাওয়ার

সময়কার বিরক্তিটুকু সঙ্গে নিয়ে মন্মথ ফিরে এল। চানের জল নেই। গামছা ভিজিয়ে বুকে পিঠে জোরে জোরে ঘষল।

টিউকলে যাওনা।

কল টিপবে কে? কিরণ কোথা?

ওতো বেরিয়েছে, সেই খাওয়ার সময় আসবে। ভালো কথা, ও শোবে কোথা? ওকে তো আজ শুতে পারবে না।

শোবে আমার মাথায়।

ঝড়াৎ করে বালতিটা তুলে নিল মন্মথ। মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বলল, আয়। বলেই মন্মথ হন-হনিয়ে বেরিয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে আছিস যে?

যেন ঘুম ভাঙল মঞ্জুর। দরজা পর্যন্ত ছুটে গিয়েই ফিরে এল। লাল টুকটুকে রবারের চটিটা পরে সান্যাল বাড়ির সামনে দিয়ে গুটি-গুটি করে ও টিউবওয়েলে পৌঁছল। মন্মথ বালতি হাতে দাঁড়িয়ে। ওর আগে এসেছে মিষ্টির দোকানের অমূল্যচরণ। কলে বাসন মাজছে টিনের বাড়ির এক বৌ। মন্মথকে দেখে বগল চুলকে অমূল্য হাসল।

এয়েচেন।

হুঁ।

ঠক করে বালতি রাখল মন্মথ। বৌটি ঘাড় ফিরিয়ে দেখে আবার মাজতে লাগল।

একটু তাড়াতাড়ি কর গো। তারপর মন্মথবাবু খবর কি?

খবর আর কি, পাপের ভোগ বয়ে যাচ্ছি। চালের কণ্ট্রোল তুলে কই দাম তো কমল না। আজ তো বারো আনা দে কিনলুম। দেশে চালের মণ সাঁইত্রিশে, তাল খাচ্ছে মানুষে। তোমার আর কি ছোট সংসার, দোকানও চলছে ভালো, ছেলে-পুলের ঝামেলা নেই।

ভালো আর চলছে কই।

কলে পাম্প করছে বৌটি। অমূল্য অন্যমনস্ক হল আবার। মন্মথও দেখছে। কতভাবে কতবারই তো কণিকার পিঠ বগল সে দেখেছে। কই মনের মধ্যে তো এমনটি হয় না।

চাল তুমি কোত্থেকে কেন?

শ'বাজারে, সুধীর সাহার দোকান থেকে। পাড়ার দোকান, ধারেও পাওয়া যায়।

আপনাদের এক সুবিধে, মাস গেলেই বাঁধা মাইনের টাকা। বাসেও টিকিট কাটতে হয় না। সুমুন্দিটাকে কণ্ডাক্টর-মণ্ডাক্টর করে ঢুকিয়ে দিন না। দু বছর ফেল করে বসে আছে।

বৌটি চলে গেল। কলে বালতি পাতল অমূল্য। মঞ্জু ওদের থেকে কিছুটা দূরে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। বিয়েবাড়ির আলো ওর মুখে পড়েছে। আর একদফা খাওয়া শেষ হয়েছে। ভরপেট মানুষগুলো মঞ্জুর পাশ দিয়েই চলে গেল। সিগারেট ধরাতে দাঁড়িয়ে একজন তার সঙ্গীকে বলল, তুই একটা নেলো। গুচ্ছের পোলাও বসে বসে গিললি। মাছ খাবি তো।

ছটা মাছ খেয়েছি।

আমি শালা তেরোটা।

মন্মথর কানেও কথাগুলো গেছে। অমূল্য জল নিয়ে চলে গেল। মঞ্জু ডাক শুনেই দৌড়ে এল। ঘাড় নুইয়ে বাবু হয়ে মন্মথ বসেছে। হেঁচাকি তোলার মত হ্যাণ্ডেলটা তুলে বুক দিয়ে সাপটে মঞ্জু ঝুলে পড়ল। সরু ধারায় জল পড়ছে। মন্মথ মাথা চাপড়াল, পিঠ, বুক রগড়াল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠল মঞ্জু।

সাবান ঘষতে শুরু করল মন্মথ। ডিপোয় গোলা সাবান দেয়। তাই দিয়ে তেল-কালি ওঠে। কিন্তু ডিজেলের গন্ধ চামড়ায় বসে থাকে। গন্ধ সাবান মেখে সেই গন্ধ মারতে হয়। চুলে সাবান ঘষল মন্মথ। গাড়ির তলায় শুলে কি বনেটের মধ্যে মাথা ঢোকালেই চুলে কালি লাগবে। সেই কালি বালিশের ওয়াড় ময়লা করবে।

নেমন্তন্ন খেয়ে আরো কয়েকজন ফিরছে। টিউবওয়েলের কাছটা অন্ধকার। রাস্তার ধারে একজন পেচ্ছাব করতে বসল। সঙ্গীরা তার জন্য দাঁড়িয়ে রইল।

বৌটা মাইরি বড্ড রোগা।

বিয়ের জল লেগে ঠিক হয়ে যাবে। আরে তুই কচ্ছিস কি? শেষকালে পাড়ার লোকেদের যে আর একটা ডি-ভি-সি তৈরি করতে হবে।

তাহলে তোকে চেয়ারম্যান করব।

এবার একটু মোটা হয়ে জল পড়ছে। মন্মথ খুশি হল। মাথা পেতে রাখল অনেকক্ষণ। মঞ্জু হাঁপাচ্ছে। ওকে কল টিপতে বারণ করে উঠে দাঁড়াল সে।

এবার বাড়ি চলে যা। দাঁড়া, সাবানটা নিয়ে যা।

সাবান হাতে গুটি গুটি মঞ্জু ফিরে এল। সান্যাল বাড়ির সামনে সে একটুখানি দাঁড়িয়েছিল। হাত থেকে সাবানটা পড়ে গিয়েছিল। সাবানে লাগা ধুলো ফ্রকে ঘষতে ঘষতে সে দেখতে পেয়েছিল, টিনাদি লাল, নীল কাগজ লোকেদের বিলোচ্ছে। ঠিক ওই রকম কাগজ দিয়েই মোড়া ছিল সাবানটা, যখন দোকান থেকে আসে।

রঞ্জু ঘুমিয়ে পড়েছে, অঞ্জুরও প্রায় সেই অবস্থা। কণিকা ওকে খাইয়ে দিচ্ছে। মন্মথর পাশে বসেছিল মঞ্জু। কিরণ ফিরবে ঠিক যখন কণিকা খেতে বসবে।

তুমি তেরোটা মাছ খেতে পার ?

চান করে তাজা বোধ করছে মন্মথ। মঞ্জুর পাত থেকে ফেলে দেওয়া কাঁচা লঙ্কাটা, নিজের থালায় ঘষতে ঘষতে বলল, তারও বেশি পারি।

কণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে মন্মথ হাসল, কণিকাও।

ব্যাপারটা মঞ্জুর চোখে পড়ল। বাবা-মার একসঙ্গে হাসি সে দেখেনি, আস্কারা পেয়ে বলল, যাঃ মিথ্যে কথা।

গ্রাসটা মুখের কাছাকাছি একটু থামিয়ে গিলে ফেলল মন্মথ। অঞ্জু ঢুলে পড়ছে। বাঁহাতে ওর ঘাড়টাকে সিধে করে ধরে কণিকা ভাত গুঁজে দিল।

বিশ্বাস না হয় তোর মাকে জিজ্ঞেস কর। তোর এক মেজদাদু ছিল। মণি মাসিমার বাবা। ভীষণ খাইয়ে। অ্যাত্তো ভাত খেত আর গামলা গামলা মাংস। তোর ভাতের সময়, নেমন্তন্ন খেয়ে যখন বাড়ি যাবে, তখন বলেছিলুম, কাকাবাবু,'আপনার আর আগের মতো খাওয়া নেই' শুনেই বললেন, তুমি যা খাবে, আমি এখুনি তার ডবল খেতে পারি। কেউ বিশ্বাস করে না তার কথা। কম করে অন্তত পাঁচশটা লেডিকিনি, এক হাঁড়ি দই আর পাঁচ ছ গণ্ডা মাছ খেয়েছে, এরপর আর কত খেতে পারবে। তাই দুম করে আমিও রাজি হয়ে গেলুম। বোধ হয় পনেরোটা মাছ খেয়েছিলুম, তাই না ?

আহা পনেরোটা কোথায় ? ছোট বৌদিই তো তোমার পাতে খান বারো দিয়েছিল, তারপর মেজকাকী এক খামচা।

কিরণ এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে। মন্মথর সঙ্গে চোখাচোখি হল। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সে ওর চাউনির বাইরে সরে যাবার চেষ্টা করতেই মন্মথ বলল, যাচ্ছিস কোথায়, খেয়ে নে।

তারপর কি হল বাবা ?

ও আজ শোবে কোথায় ?

ঘরেই শুক।

বাবা, তারপর ?

তারপর তো মেজদাদু খেতে বসল।

যেখানে যত লোক ছিল সবাই ছুটে এল। মেজদিদিমা খালি বললেন ওর শরীরটা কদিন ভালো যাচ্ছে না, একটু নজর রেখে পাতে দিও।

থালার কানায় হাতের চেটো ঘষল মন্মথ, কাদার মতো ভাতের চাঁছি জমল। আঙুল দিয়ে সেটুকু মুখে পুরে সে উঠে পড়ল।

কিরণ ভাতে হাত দিয়ে গল্প শুনছিল, এইবার সে তাকাল কণিকার দিকে। খেয়াল হল কণিকার। অঞ্জু এতক্ষণ কিছুই খায়নি। বাকি ভাতটুকু একগ্রাসে ওর মুখে গুঁজে দিল।

কলঘরটা অন্ধকার। মেঝেয় বসানো বালতিটায় ঠোক্কর লাগল। ঝনঝন শব্দের মধ্যেই মঞ্জু বলল, মেজদাদু তোমার ডবল খেল ?

হ্যাঁ খেল। পই পই বলি বালতি চৌবাচ্চার পাড়ে রাখবে। কে কথা শোনে !

মঞ্জু গা ঘেঁষে এল, কিরণের খাওয়া হয়ে গেছে। কণিকারও প্রায় শেষ। মন্মথর কথার পিঠে কেউ কথা বলল না, সেও চুপ করে রইল। বাইরে একটা লোক বোধ হয় কুকুর তাড়াচ্ছে। বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল মন্মথ। ঘরের মধ্যে ভীষণ গরম। রাস্তার হাওয়ায় শরীরটা জুড়োতে সে বেরিয়ে পড়ল।

দাঁয়েদের রকটায় মন্মথ বসবার জায়গা পেল। পুঁটলি নিয়ে একটা লোক ওর সামনেই পথে বসল। লোকটা সন্দেশ আর লেডিকেনির দুটো স্তূপ আলাদা করে বেছে রেখে লুচি আর অন্য কিসব দিয়ে খাওয়া শেষ করল, মিষ্টি খেল না। গলা খাঁকিয়ে মন্মথ জিজ্ঞেস করল, ওগুলো খেলি না যে।

ওগুলো বেচবো।

কোথায় ?

মিষ্টির দোকানে।

লোকটা আর কথা বাড়াল না। হাঁটা শুরু করল। তাড়াতাড়ি মন্মথ ওর পিছু নিল। ও যেদিকে চলেছে সেদিকেই তো অমূল্যর দোকান। ট্রাম রাস্তায় পৌঁছে মন্মথ হাঁপ ছাড়ল।

বন্ধ করবে কখন ?

বন্ধের অনেক দেরি, সেই সাড়ে এগারোটা বারোটা। খাটুনি কি কম, সেই সাড়ে পাঁচটা থেকে ভূতের মত চরকিবাজি শুরু হয়েছে।

একটু অন্যমনস্কের মতো মন্মথ বলল, তোমার তো তবু ছোট সংসার। চার পাঁচটার মুখে অন্ন দিতে হয় না।

কথাটা বোধহয় শুনতে পেল না অমূল্য। খদ্দের এসেছে। দই ওজন করা দেখল মন্মথ। ধারের খাতায় দাম টুকে রাখল অমূল্য। আবার খদ্দের এল মন্মথ উঠে পড়ল। আর বসে থাকা যায় না, বসলেই বিড়ি খেতে হবে। ঘরে গিয়ে বসলে আঁস্তাকুড়ে ফেলা বিয়ে বাড়ির খাবারের গন্ধ শুঁকতে হবে। গন্ধটা এমন যে গোগ্রাসে গলার ইচ্ছে জাগে। অমূল্যর দোকান থেকে এক হাঁড়ি রসগোল্লা যদি ধারে কেনা যায়। কত আর পড়বে ? পাঁচ সাত টাকা। পাঁচ সিকে কি দেড় টাকায় প্রায় অতগুলো মিষ্টিই পাওয়া যেত।

হঠাৎ মন্মথর ভীষণ খিদে পেল। প্রায় পাঁচশটা মাছের টুকরো একসঙ্গে খেতে পাবার মতো খিদে। ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর বুক। একটা লোক পুঁটলি হাতে আসছে। অবিকল সেই লোকটার মতো। লোকটা চলে গেল পাশ দিয়ে আর আশ্চর্য, খিদেটাও কমে গেল। বিয়েবাড়ির জলুস নিবু নিবু, হৈচৈ হচ্ছে ফুলশয্যার অনুষ্ঠানগুলো নিয়ে। এবার বর-বৌ ঘরে ঢুকবে।

গন্ধ পেল মন্মথ। শব্দ না করে নিশ্বাস টেনে ফিসফিস করে বলল, সাবান মেখেছ বুঝি?

আর একটু এগিয়ে এসে মন্মথর চিবুকে প্রায় গাল ঠেকাল কণিকা।

হ্যাঁ, কিরণকে দিয়ে এক বালতি আনালুম। গা থেকে বড্ড টক্ টক্ গন্ধ বেরোয়।

দুজনে মাখলে তাড়াতাড়ি ফুরোবো।

আমি কি আর রোজ মাখছি।

সান্যাল বাড়িতে কিছু একটা হল। অনেকে মিলে হেসে উঠেছে। অনেক বাড়ির দেয়াল টপকে হাসিটা কণিকার নিশ্বাসের মতো দ্রুত চাপা হয়ে ঘরে পেঁছল।

অঞ্জু আজ কি বলছিল জান?

কি?

বলছিল মা আমাদের বাড়ি আর ভাত হবে না।

অত কাছে আসছ কেন, কিরণ ঘরে রয়েছে না?

মন্মথ, কনুই দিয়ে ঠেলল কণিকাকে।

কণিকা আরো সরে আসতে চাইল।

কি হচ্ছে কি?

চাপা ধমক দিল মন্মথ, শিথিল হয়ে গেল কণিকা। একটু সরে গেল, আর একটু বাদে কাত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। ওর পিঠে আলতো হাত রাখল মন্মথ। টিউওয়েলের বাসন মাজা বউটিকে মনে পড়ল। কণিকার পাঁজর চেপে মন্মথ টেনে আনলো।

অঞ্জু কি বলছিল?

জানি না।

বল না?

বললুম তো।

মন্মথর বুকে হাত বুলোতে শুরু করে কণিকা। হাতে ঠেকল ঘামাচি। নখ দিয়ে মেরে দিল।

পুট করে উঠল।

বেশ শব্দটা, না?

হ্যাঁ।

মেরে দাও না।

থাক এখন।

কণিকা হিঁচড়ে নিজকে মন্মথর বুকের উপর তুলল। মন্মথর ঘাড়ে মুখ ঘষে বলল, সাবানের গন্ধটা বেশ না?

হ্যাঁ, কিন্তু কিরণ ঘরে রয়েছে।

ফিসফিস করে ঠিক একই সুরে কণিকা বলল, বাইরের রকে চল না।

রকে নর্দমার গন্ধ।

না, গন্ধ নেই। বিকেলে বাড়িউলি পরিষ্কার করেছে।

রাতে বাড়িউলি কলঘরে নামবে।

এখন নামবে না।

না, না, না।

বিরক্ত, ভয় আর উত্তেজনা মন্মথর কথাগুলোকে সারা ঘরে ছড়িয়ে দিল। আর ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল কিরণ।

কি হল তোর?

দরজা বন্ধ আছে?

হ্যাঁ আছে, তুই ঘুমো।

কিরণ শুয়ে পড়ল। নিঃশব্দে সাপের মতো শরীরটাকে আঁকিয়ে বাঁকিয়ে কণিকা সরে গেল। আর একটু পরেই চটাস করে রঞ্জুর পিঠে চড়ে মেরে উঠে বসল কাঁথা বদলাবার জন্য।

মারলে কেন?

না মারবে না, খেটেখুটে একটু শোব তারও উপায় নেই শত্তুর এসে জুটেছে।

আঃ গাল দিচ্ছ কেন।

চুপ করে রইল কণিকা। মন্মথও। সারা ঘরে শুধু নিশ্বাস আর মঞ্জুর বিনিয়ে কান্নার শব্দ, তাও একটু পরে থেমে গেল। খিলখিল করে মজুমদার বাড়ির মেয়েরা ফিরল। দরজা খুলতে দেরি হচ্ছে। চাকরটা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই ওরা লুটোপুটি খেয়ে গল্প জুড়ল। খড়খড়ির পাখির ফুটো দিয়ে হাশি কি যেন দেখেছে।

কণিকা জলের মতো মেঝের উপর দিয়ে গড়িয়ে জানলার কাছে সরে এল। ওদের হাসির জন্য কিছু কিছু কথা অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কনুই দুটো পিলসুজের মতো করে দুহাতের চেটোয় সে মুখটাকে রাখল।

মন্মথ বলল, জানলাটা বন্ধ করে দাও নয়তো আঁস্তাকুড়ের গন্ধ আসবে।

থাক, রোজেই তো খোলা থাকে।

আজ জঞ্জাল বেশি।

কণিকা শুধু চাউনিটা নামিয়ে আঁস্তাকুড়টা দেখল। আর দেখতে দেখতেই বলল, জঞ্জাল আর কোথায়, খাবারই তো।

একটু বুঝি হাওয়া দিল। শরীরটা ঠাণ্ডা লাগছে। মন্মথ চোখ খুলল। এক ভাবেই কণিকা জানলার দিকে তাকিয়ে। শান্ত, নিথর মন্মথর মনে পড়ল

বাসনমাজা বউটিকে। তার শরীরের নড়া-চড়াকে। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে একটা ম্যাজম্যাজে অস্বস্তির চলাফেরা বোধ করল। উপুড় হয়ে দুহাতে নিজের মাথা জড়িয়ে ধরল সে। সাবানের গন্ধ সরে গেছে শরীর থেকে, শরীরে এখন অস্বস্তি। কণিকার দিকে আড়ে তাকাল। শান্ত, নিথর। আবার একটু হাওয়া এল। হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্মথ টের পেল উৎসব বাড়ির গন্ধ। বুঝে গেল কেন এখনো কণিকা জানলার দিকে মুখ করে জেগে আছে। কণিকার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মন্মথ ভাবলো, এইবার ওকে টেনে হিঁচড়ে বাইরের রকে নিয়ে গেলে কেমন হয়। ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই মন্মথ হাত বাড়াল, আর চমকে হাতটা সরিয়ে নিল। মঞ্জু অঞ্জু কারোর গায়ে হাতটা পড়েছে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সারা শরীরের ম্যাজম্যাজে অস্বস্তিটা গুটিয়ে দলা পাকাল পাকস্থলীর মধ্যে। সারা শরীরটা গুলিয়ে উঠে প্রচণ্ড ক্ষিধেয় আচ্ছন্ন হল। ক্রমশ সে ঝিমিয়ে পড়ল। ঘুম আসবার আগের মুহূর্তে সে দেখতে পেল পুঁটলি হাতে লোকটা ট্রাম লাইন পেরিয়ে চলে যাচ্ছে।

অমিয়া বলল, পয়সা কি কামড়াচ্ছিল। কয়লাওলার কাছে এখনো দুমণের দাম বাকি। তাছাড়া, ওই কটা আলুতে কি হবে, ঘরে যা আছে তাও দিতে হবে দেখছি। এরপর সে বললে, টাটকা খুব, চর্বিও কম দিয়েছে। পুতুল বলল, রোববার কোর্মা রেঁধেছিল তৃপ্তির নতুন বৌদি। খুব বেশি ঘি দিয়েছিল, তাই ক্যাটক্যাটনি শুরু করেছিল শাশুড়ী। এই নিয়ে সে কি ঝগড়া মায়েতে ছেলেতে। তারপর সে বলল, আমি কিন্তু রাঁধব বলে দিলুম। বাবুদা বলছিল পাঞ্জাবির হোটেলে নাকি দারুণ রাঁধে, আজ আসুক না একবার দেখিয়ে দোবো'খন।

চাঁদু বলল, আগে জানলে জোলাপ নিয়ে পেটটাকে রবারের করে রাখতুম। খানিকটা কাল সকালের জন্যে তুলে রেখো, চায়ে বাসি রুটি ভিজিয়ে খেতে খেতে তো জিভে চড়া পড়ে গেল। শেষকালে সে বলল, যেই রাঁধো বাবা, জবাফুলের রঙের মতো রঙ হওয়া চাই কিন্তু।

রাধু এখন বাড়ি নেই। পাঁচ বছরের খোকন শুনে শুনে কথা শেখে, সেও প্রমথর হাঁটু জড়িয়ে বলল, বাবা আমি খাব মাংস।

ওরা যাই বলুক প্রমথ লক্ষ্য করছিল চোখগুলো। ঝিকোচ্ছে বরফ-কুচির মতো। ওরা খুশি হয়েছে। ব্যস, এইটুকুই তো সে চেয়েছিল, তা না হলে মাসের শেষ শনিবারে একদম পকেট খালি করে ফেলার মতো বোকামি সে করতে যাবে কেন।

অফিস থেকে বাড়ির ফেরার পথটা আরো ছোট হয়ে যায় শোভাবাজারের মধ্যে দিয়ে গেলে। বিয়ের পর কয়েকটা বছর বাজারের মধ্যে দিয়েই অফিস থেকে ফিরত, সেও প্রায় বাইশ বছর আগের কথা। তারপর বাবা মারা গেলেন, দাদারা আলাদা হলেন, প্রমথও এখনকার বাড়িটায় উঠে এল। উঠে আসার তারিখটা পাওয়া যাবে ভব শ্রীমানির খাতায়। সেই মাস থেকেই অমিয়া মাসকাবারি সওদা বন্ধ করল, ওতে বেশি বেশি খরচ হয়। তারপর কালেভদ্রে দরকার পড়েছে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার। আজ গরমটা যেন অন্যদিনের থেকে বেশি চড়ে উঠেছে, জুতোর তলায় পিচ আটকে যাচ্ছে, কোনোরকমে বাড়ি ফিরলে বাঁচা যায়।

ডাব বোঝাই একটা ঠেলাগাড়ি পথ জুড়ে মাল খালাস করছে, চারধারে যেন কাটামুণ্ডুর ছড়াছড়ি। তার ওপর বাজারেরর আঁস্তাকুড়াটাও জিনিসপত্রের দামের মতো বেড়ে এসেছে গেট পর্যন্ত। পুব দিকের গেট দিয়েই বেরোনো ঠিক করল প্রমথ। দুটো রকের মাঝখানের পথটায় থৈ-থৈ করছে জল। চাপা-কল থেকে জল এনে ধোয়াধুয়ি শুরু করেছে দুটো লোক। ঝাঁটার জল যেন কাপড়ে না লাগে সেই দিকে নজর ছিল।

আর দু পা গেলেই মাছের বাজারটা শেষ হয়, তখুনি আচমকা জল ছুঁড়ল লোকটা। কাপড়ে লাগে নি, কিন্তু লাগতে তো পারত। বিরক্ত হয়েই সে পিছন ফিরেছিল, আর অবাক হল পিছন ফিরে।

বাজারের শেষ মাথায় দাঁড়িয়েছিল প্রমথ, যতদূর দেখা যায় প্রায় শেষ পর্যন্ত এখন চোখ চলে। ফাঁকা, খাঁ-খাঁ করছে ; অদ্ভুত লাগল তার কাছে।

সকালে মাছির মতো বিজবিজ করে, তখন বাজারটা হয়ে যায় কাঁঠালের ভুতি। ঘিনঘিন করে চলতে ফিরতে। আর এখন, চোখটা শুধু যা টক্কর খেল কচ্ছপের মতো চটমোড়া আনাজের ঢিপিতে। নয় তো সিধে মাছের বাজার থেকে ফলের দোকানগুলো, দোকানে ঝোলানো আপেলগুলো পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আপেল না হয়ে ন্যাসপাতিও হতে পারে কিন্তু লক্ষ্মীপুজোর দিনটায় একবার ওদিক মাড়াতে হয়। ফুল, পাতা ওই দিকটাতেই পাওয়া যায়, আর তখনই চোখে পড়ে ঝোলানো আপেল, সবরি কলার ছড়া, আনারস আর শীতের সময় চুড়োকরা কমলা লেবু। শীতের কথা মনে পড়লেই কপির কথা মনে আসে, আগেকার দিনে সের দরে কপি বিক্রি হত না। নাকের সামনে বাঁধাকপি লোফালুফি করতে করতে সন্নেসীচরণ হাঁক ছাড়ত, খোকাবাবু এই চলল পাঁচ নম্বরী ফুটবল, ছোকা রেঁধে খাও গোস্টো পালের মতো সট্ হবে। সন্নেসীটা যেন কি করে জেনে ফেলেছিল স্কুল টিমে প্রমথ ব্যাকে খেলে, আর গোষ্ঠ পালকে তো সে পুজো করত মনে মনে। আজকাল অনেকেই নাম করেছে, চাঁদুর মুখে কত নতুন নতুন নাম শোনা যায়। ওই শোনা পর্যন্ত। মাঠে যেতে আর ইচ্ছে করে না। সন্নেসী একদিন ফুটপাথে মরে পড়ে রইল। আজেবাজে জায়গা থেকে রোগ বাধিয়ে শেষকালে বাজারের গেটে বসে ভিক্ষে করত। সন্নেসীর সঙ্গে সঙ্গে কুলদাকে মনে পড়ল প্রমথর, চেহারা কি! যাত্রাদলে বদমাইসের পার্ট করত। বাজারে, শিবরাত্তিরে যাত্রা শুনতে আসার আগে হিসেব করে আসতে হত বাবার কাছ থেকে কতগুলো চড় পাওনা হবে। কুলদার হাতে আড়াইসেরী রুইগুলোকে পুঁটি বলে মনে হত। ওর মতো ছড়া কাটতে এখন আর কেউ পারে না। আজকাল যেন কি হয়েছে, সেদিন আর নেই। গুইরাম মরে গেছে, ওর ছেলে বসে এখন। ছেলেটা বখা। অথচ গুইরামের পানে, পোকা হাজা কিংবা গোছের মধ্যে ছোট পান ঢোকানো থাকত,

কেউ বলতে পারত না সে কথা। গ্‌ইরামের দোকানের পাশে এখন একটা খোট্টানি বসে পাতি-লেব্‌ নিয়ে। অমিয়ার জন্য রোজ লেব্‌র দরকার, একদিন ওর কাছ থেকে লেব্‌ কিনেছিল প্রমথ। মাস ছয়েকের একটা বাচ্চা, বয়স দেখে মনে হয় ওইটেই প্রথম, কোলের ওপর হামলা-হামলি করছিল, ব্‌কের কাপড়ের দিকে নজর নেই। ওর কাছ থেকে আর কোনোদিন লেব্‌ কেনেনি সে। দ্‌নিয়াস্‌দ্ধ মান্‌ষের যেন হজমের গোলমাল শ্‌র্‌ হয়েছে আর লেব্‌ও যেন এতবড়ো বাজারটায় ওই একজায়গাতেই পাওয়া যায়। দিন দিন যেন কি হয়ে উঠেছে। ব্‌ড়োধাড়ীদের কথা নয় বাদ দেওয়া গেল, কিন্তু কাচকাঁচারাও তো বাজারে আসে, বাজার পাঁচটা লোকের জায়গা।

প্রমথর বেশ লাগছে এখন বাজারটার দিকে তাকিয়ে থাকতে। ছোটবেলার অনেক কথা টুকটাক মনে পড়ছে। পেচ্ছাপখানার সামনে চুনো মাছ নিয়ে বসে একটা ব্‌ড়ী. ওকে দেখলেই আবছা মনে পড়ে মাকে। বোকার মতো হাসে, আর পায়ের আঙ্‌লগ্‌লো বাঁকা। ওখানটায় এখন থৈ-থৈ করছে চাপা-কলের জল। মাকে প্‌ড়িয়ে গঙ্গায় চান করেছিল সে, সেই প্রথম গঙ্গায় চান করা। তখন কত ছোট্টই না ছিল, স্টীমারের ভোঁ শ্‌নে জলে নামতে ভয় করেছিল তার। মাসের শেষে বাজারের ওইদিকটায় আর যাওয়া হয় না। আল্‌, পান আর দ্‌-একটা আনাজ কিনেই বাজার সারতে হয়। চাঁদ্‌টাই শ্‌ধ্‌ গাঁইগ্‌ঁই করে, কেমন যেন বাঙালে স্বভাব ওর, মাছ না পেলেই পাতে ভাত পড়ে থাকে। খিটমিটি লাগে তখন অমিয়ার সঙ্গে। চালের সের দশ আনা, পাতে ভাত ফেলা কেই বা সহ্য করতে পারে, পয়সা রোজগার করতে না শিখলে চাঁদ্‌টা আর শোধরাবে না। রাধ্‌ একটা টিউশনি পেয়েছে। তবে আই-এ-টা পাস করলে অন্তত গোটাকুড়ি টাকা মাইনে হত। ওর কিংবা প্‌তুলের খাওয়ার কোনো ঝামেলা নেই, অমিয়ারও না। পাতে যা পড়ে থাকে. অমিয়া প্‌তুলকে তুলে দেয়, বাড়ের সময় মেয়েদের খিদেটাও বাড়ে। শিগগিরই আর একটা দায় আসবে। প্‌তুলের বিয়ে। ম্‌খটা মিষ্টি, রঙটা মাজা, খাটতে পারে, দেখেশ্‌নে একটা ভালো ছেলের হাতে দিতে হবে।

হটিয়ে বাব্‌জী.

এবার এইধারটা ধোয়া হবে, পিছিয়ে এল প্রমথ। সেই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে। একটা ব্‌ড়ো বসত ওখানে। পেয়ারা, আমড়া, কদবেল ছোট্ট ঝুড়িতে সাজিয়ে ব্‌ড়োটা দ্‌প্‌রে বসে বসে ঝিমোত। সে কি আজকের কথা! বাবা মারা যাবার অনেক আগে, বড়দার তখন থার্ড ক্লাস, য্‌দ্ধ তখন প্‌রোদমে চলছে। সর্‌ চালের দর এগারো টাকা, কাপড়ের জোড়া বোধহয় আট টাকায় উঠেছিল, সে আজ চল্লিশ বছর হয়ে গেল। স্কুলের টিফিনে একটা আধলা নিয়ে তিন-চারজন তারা আসত, পয়সায় আটটা কাঁচা আম। আর এ বছর দশ পয়সা

জোড়া দিয়ে একদিন মাত্র সে কাঁচা আম কিনেছে, তাও কুসিকুসি। আহা, সে কি দিন ছিল। প্রমথর ইচ্ছে করে বুড়ো যেখানটায় বসত সেখানে গিয়ে একবার দাঁড়ায়। ওখানে তখন রক ছিল না, দেয়ালের খানিকটা বালিখসা ছিল। দুটো ইঁটের ফাঁকে গর্তটায় দোক্তা রাখত বুড়োটা। গর্তটা এখনো আছে কিনা দেখতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছেটা খুব ছেলেমানুষের মতো। এত বছর পরেও কি আর গর্তটা থাকতে পারে, ইতিমধ্যে কতই তো ওলট-পালট হয়ে গেছে, ভেঙেছে, বেড়েছে, কমে নি কিছুই। তবু এই দুপুরের বাজারের চেহারাটা একরকমই আছে। ছেলেমানুষ হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে, বুকটা টনটন করছে, তবু ঝরঝরে লাগছে গা-হাত পা।

এই যে আসুন বাবু।

প্রমথ পিছন ফিরল ; গোড়ার দোকানটা লক্ষ্য করে সে এগিয়ে এল। সদ্য ছাল ছাড়িয়ে ঝুলিয়েছে। পাতলা সিল্কের শাড়িজড়ানো শরীরের মতো পেশীর ভাঁজগুলোকে রাক্ষুসে চোখে আঁকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

কত করে দর যাচ্ছে।

তিন টাকা।

ভাবলে অবাক লাগে। চাঁদুর মতো বয়সে ছ-আনা সের মাংস এই বাজার থেকেই সে কিনেছে। তখন প্রায় সবই ছিল মুসলমান কসাই। ছেচল্লিশ সালের পর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল।

একসের দি ?

উৎসুক হয়ে উঠেছে লোকটার চোখ আর ছুরি। এর মতো মুন্নাও হাসত, তার একটা দাঁত ছিল সোনার, তবে মুন্নাকে কিছু বলার দরকার হত না, গর্দান থেকে আড়াই সের ওজন করে দিত। সেই মুন্না বুড়ো হল, তার ছেলে দোকানে বসল। তখন সংসার আলাদা হয়ে গেছে। দেড় সের নিত তখন প্রমথ। ঘোলাটে চোখে তাকাত বুড়ো মুন্না, চোখাচোখি হলে হাসত, চোখ ঝিকিয়ে উঠত। রায়টের সময় মুন্নাকে কারা যেন মেরে ফেলল।

একসের দি বাবু ?

না তিন পো, গর্দান থেকে দাও।

ওজন দেখল প্রমথ, যেন সোনা ওজন করছে। পাসানটা একবার দেখে নেওয়া উচিত ছিল। থাকগে ওরা লোক চেনে। তিনটে টাকা পকেটে ছিল। বাকি বারো আনা থেকে আলু, পেঁয়াজ কিনতে হবে। মাইনে হতে এখনো ছ-সাত দিন বাকি। ট্রামভাড়ার পয়সাও রাখতে হবে। মাংসের ঠোঙাটা তুলে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল প্রমথ।

মেটুলি দিলে না যে, তিনটাকা দর নিচ্ছ, আমরা কি মাংস কিনি না ভেবেছ।

লোকটা একটুকরো মেটুলি কেটে দিল। অনেকখানি দিয়েছে, অমিয়া দেখে নিশ্চয় খুশি হবে।

রাস্তায় পড়েই প্রমথর আবার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। বাবার সঙ্গে ভবর জ্যাঠা হরি শ্রীমানির দোকানে এসেছিল এক সন্ধ্যায়। পাশেই ছিল মাটির খুরি-গেলাসের দোকান। তখন বিয়ের মরশুম, একহাজার খুরি-গেলাস কিনল কারা যেন। একহাজার লোক খাওয়ানোর কথা তো এখন ভাবাই যায় না। স্বদেশ কনফার্মড হবার পর বিয়ে করল। বরযাত্রী হয়েছিল আত্মীয়-স্বজন, অফিসের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন মিলিয়ে তিরিশ। কন্যাপক্ষ মাংস খাইয়েছিল। কায়দা করে রাঁধলে মাছের থেকে সস্তা হয়। স্বদেশের বিয়েও আজ সাতমাস হয়ে গেল। ছেলেও নাকি হবে। তবু তো সে সাতমাস আগে মাংস খেয়েছে। কিন্তু বাড়ির ওরা, অমিয়া, পুতুল! রাধু হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছে, একটা পয়সাও বাজে খরচ করে না। চাঁদু ভালো ফুটবল খেলে. হয়তো বন্ধুরা খাওয়ায়ও। ছেলেটা ভালোমন্দ খেতে ভালোবাসে, আর খেতেও পারে। এইটেই তো খাওয়ার বয়স। অমিয়ার খুড়তুতো বোনের মেয়ে শিলুর বিয়ের কথা শুনে কি লাফালাফিটাই জুড়েছিল। নেমন্তন্নে অবশ্য যাওয়া হয় নি। অন্তত একটা সিঁদুর-কৌটোও তো দিতে হত। চাঁদুটা আজ খুব খুশি হবে, ওরা সকলেই খুশি হবে।

বড় রাস্তার ঠিক মধ্যিখানেই কালীমন্দির। হাতে মাংসের ঠোঙা। চোখ বন্ধ করে মাথা ঝুঁকিয়ে দূর থেকেই প্রণাম জানিয়ে প্রমথ রাস্তা পার হল। পর্দা-ফেলা রিক্শা থেকে গলা বার করে দুটি বৌ প্রমথর পাশ দিয়ে চলে গেল।

সিনেমা হলগুলো আজকাল এয়ারকণ্ডিশন করা হয়েছে। প্রমথ ভাবতে শুরু করল, তা না হলে এই অসহ্য দুপুরে পারে কেউ বন্ধ ঘরে বসে থাকতে। তবু শখ যাদের আছে তারা ঠিক যাবেই. অমিয়ার কোনো কিছুতেই যেন শখ নেই আজকাল। অথচ মেজবৌদি, তার আপন মেজদা যিনি ডাক্তার হয়েই আলাদা হয়ে গেছেন, তার বৌ এখনো নাকি এমন সাজে যে ছেলের জন্যে পাত্রী দেখতে গেলে, মেয়ে-বাড়ির সকলে গা টেপাটেপি শুরু করেছিল। মেয়েকে ফিরে সাজতে হয়েছিল ওর পাশে মানাবার জন্যে। এ-খবর অমিয়াই তাকে দিয়েছিল। ওর শখ এখন এইসব খবর যোগাড় করাতে এসে ঠেকেছে। অথচ সাজলে এখনো হয়তো পুতুলকে হার মানাতে পারে।

গলিটা এবার দেখা যাচ্ছে, ওখানে ছায়া আছে। এইটুকু পথ জোরে পা চালাল প্রমথ।

ভাবনারও একটা মাথামুন্ডু আছে। অমিয়া যতই সাজগোজ করুক পুতুলের বয়সটা তো আর পাবে না। সতেরো বছরের একটা আলাদা জেল্লা আছে,

দেখতে ভালো লাগে। অমিয়ার বিয়ে হয়েছিল সতেরো বছরে, সেও পুতুলের মতো লাজুক আর ছটফটে ছিল।

হাড়গোড়সার ছেলের হাত-পায়ের মতোই ন্যাতানো গলিটা। হাল্কা বাতাস পর্যন্ত স্যাঁতসেঁতিয়ে যায়। এ গলিতে ঢুকলে গায়ে চিটচিটে ঘাম হয়। কোঁচাটা পকেটে থাকছে না আলু আর পেঁয়াজের জন্যে। পেটের কাপড়ে গুঁজে দিতে একটুক্ষণ দাঁড়াল প্রমথ। ওপর থেকে উকিলবাবুর বিধবা বোন দেখছে। প্রমথ ঠোঙার দিকে তাকাল। হ্যাঁ, ওপর থেকেও বোঝা যায় এর মধ্যে মাংস আছে। নন্দীবাড়ির সঙ্গে ওর খুব ভাব। ছোট মেয়ের শ্বশুর বুঝি কোন এক উপমন্ত্রীর বন্ধু। তাই নন্দীগিন্নি ধরাকে সরা দেখে, অমিয়া দুচক্ষে দেখতে পারে না এই মানুষগুলোকে। উকিলবাবুর বোনের দেখা মানেই পাড়ার সব বাড়ির দেখা। খবরটা শুনলে অমিয়া নিশ্চয় খুশি হবে।

বাড়ি ঢোকার মুখে দোতলার মিহিরবাবুর সঙ্গে দেখা হল প্রমথর। এ বাড়িতে অল্পদিন এসেছে। মুখচোরা, বৌয়ের মতোই মেশে না কারুর সঙ্গে। শুধু কবিতা আর রাজনীতির কথায় মুখে খই ফোটে।

দেখেছেন তো আবার স্ট্রাইক কল করেছে, বেস্পতিবার।

শুনেছি বটে, আপিসে বলছিল সবাই, যা মাগ্গীগণ্ডার বাজার, আগের বার এগারো সিকে ছিল, এখন তিনটাকা।

ঠোঙা-ধরা হাতটা দোলাল প্রমথ। কিন্তু মিহিরবাবুর নজর তাতে আটকালো না।

এখন তবু তিনটাকা। এক-একটা ফাইভ ইয়ার যাবে আর দেখবেন দামও পাঁচগুণ চড়বে।

অন্য সময় হলে মিহিরবাবুর সঙ্গে একমত হত প্রমথ। কিন্তু সে যা চাইছিল তার ধার দিয়েও গেল না কথাগুলো। রোববার মিহিরবাবুদের মাংস রান্না হয়েছিল। গরম মসলা গুঁড়োবার জন্যে হামানদিস্তেটা নিয়েছিল। এখনো ফেরত দেয় নি। বোধহয় ভেবেছে, ওদের আর কিসে দরকার লাগবে, যখন হোক ফিরিয়ে দিলেই হবে। মিহিরবাবু লোক ভালো। তবু প্রমথর মেজাজ তেতে উঠল ক্রমশ।

আরে মশাই স্ট্রাইক-ফ্রাইক করে হবেটা কি, তাতে পাঁচটাকার জিনিস একটাকায় বিকুবে?

কিছুটা তো কমবে।

আপনাদের ওই এক কথা।

প্রমথ উঠোনের কোণে রান্নাঘরের সামনের রকে ঠোঙাটা নামিয়ে রাখল। গলার আওয়াজে অমিয়া বেরিয়ে এল। তার পিছনে পুতুল আর চাঁদু। মিহিরবাবু ওপরে উঠে গেলেন। তারপর ওরা কথা বলল। ওদের চোখগুলো বরফ-কুচির মতো ঝিকিয়ে জুড়িয়ে দিল প্রমথকে।

এইটুকুই সে চেয়েছিল। খুশি হোক অন্তত আজকের দিনটায়। জিনিসের দাম বাড়ছে, স্ট্রাইক হবে, মিছিল বেরোবে, ঘেরাও হবে, পুলিশ আসবে, রক্তগঙ্গা বইবে, এ তো হামেশাই হচ্ছে। মানুষকে যেন একটা কামার তাতিয়ে তাতিয়ে ক্রমাগত পিটিয়ে চলেছে বিরাট একটা ভারী হাতুড়ি দিয়ে। সুখ নেই, স্বস্তি নেই, হাসি নেই।

ওসব ভাবনা আজ থাক। খোকনকে কোলে নিয়ে হাসতে শুরু করল প্রমথ ওদের দিকে তাকিয়ে।

রোদের কটকটে জ্বলুনি এখন আর নেই। বেলা গড়িয়ে এল। অমিয়া তাড়া দিচ্ছে দোকানে যাবার জন্যে। ঘরে আদা নেই। বঁটি সরিয়ে উঠল প্রমথ। এতক্ষণ তার মাংস কোটা দেখছিল খোকন। চাঁদু বিকেলের শুরুতেই বেরিয়েছে। কোথায় ওর ফুটবল ম্যাচ আছে। বাটনা বাটতে বাটতে পুতুল খোঁজ নিচ্ছে চৌবাচ্চার। দেরি হলে বালতিতে শ্যাওলা সুদ্ধু উঠে আসে।

পাড়ার মুদীর দোকানে আদা পাওয়া গেল না। তাই দূরে যেতে হল প্রমথকে। ফেরার সময় খোকনকে দেখল রাস্তায় খেলছে। ওর সঙ্গীদের মধ্যে ভুবন গয়লার নাতিকে দেখে ডেকে নেবার ইচ্ছে হল। তারপরেই ভাবল, থাক, এখন বাড়ি গিয়েই বা করবে কি। তাছাড়া, ঘুপচি ঘরের মধ্যে আটকা থাকতেই বা চাইবে কেন। খোকনকে ভালো জামা-প্যাণ্ট কিনে দিতে হবে, উকিলবাবুর ছেলেদের কাছাকাছি যাতে আসতে পারে। উকিলবাবুর ছেলেরা বাসে স্কুল যায়, বেশ ইংরিজিও বলতে পারে এই বাচ্চা বয়সে।

মাংসে বাটা-মসলা মাখাচ্ছিল অমিয়া। প্রমথকে দেখা মাত্রই ঝেঁঝে উঠল।

এত দেরি করে ফিরলে, এখন বাটবে কে।

কেন, পুতুল কোথায় ?

বিকেল হয়েছে, তার কি আর টিকি দেখার জো আছে। সেজেগুজে বিবিটি হয়ে আড্ডা দিতে গেছে।

আচ্ছা, আমিই নয় বাটছি।

বঁটি পাতল প্রমথ আদার খোসা ছাড়াবার জন্যে। অনেকখানি শাঁস উঠে এল খোসার সঙ্গে। সাবধানে বঁটির ধার পরীক্ষা করল, ভোঁতা। তাহলে অত পাতলা করে খোসা ছাড়ায় কি করে অমিয়া, অভ্যাসে! অভ্যাস থাকা ভালো, তাহলে সময় কেমন করে যেন কেটে যায়। অবশ্য আলু বা আদার খোসা ছাড়িয়ে কতক্ষণ সময়ই বা কাটে। তবু ঘর-সংসার, রান্নাবান্না, ছেলেপুলে মানুষ করা, এটাও তো একরকমের অভ্যাসেই করে যায় মেয়েরা, নাকি স্বভাবে করে। অমন স্বভাব যদি তার থাকত, প্রমথ ভাবল বাঁচা যায়। জীবনটা যেন ডালভাত হয়ে গেছে। ওঠানামা নেই, স্বাদগন্ধ নেই, কিছু নেই, কিছু নেই,

তবু কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। আশ্চর্য এই ভোঁতার মতো বেঁচে থাকাটাও একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। বদ অভ্যাস।

থাক, তোমার আর কাজ দেখাতে হবে না।

অমিয়ার হাতে মসলা লেগে, হাত ধুয়ে জলভরা বাটিটা রেখে দিল সে। শিলের ধারে আদাগুলো ঘষে নিয়ে বাটতে শুরু করল। কত সহজে কাজটা করে ফেলল ও, প্রমথ ভাবল, এটাও এসেছে ওই অভ্যাস থেকে। হাত-ধোয়া জলটুকু অমিয়া তো নর্দমাতেও ফেলতে পারত।

বাড়িতেই বসে থাকবে নাকি, বেরোবে না ?

কোনো কথা বলল না প্রমথ। অমিয়া মুখ ফিরিয়ে তাকাল তার দিকে।

খোকনের একটা ভালো নাম ঠিক করতে হবে।

করো না।

উকিলবাবুর ছেলেদের নামগুলো বেশ।

ওরা সাহেবি স্কুলে পড়ে শুনেছি, ছোটটা তো খোকনের বয়সী।

হ্যাঁ, বড়োটা শুনেছি ইংরিজিতে কথা বলতে পারে।

রামগতির পাঠশালায় খোকনকে ভর্তি করে দিও, দুপুরে বড্ডো জ্বালায়।

উঠে পড়ল প্রমথ। ভেবেছিল আজ আর বাড়ি থেকে বেরোবে না। মাংস ফুটবে, ছেলেমেয়েরা কাছাকাছি জড়ো হবে, গল্প হবে এটা সেটার, আসন পেতে থালা সাজিয়ে দেবে অমিয়া, একসঙ্গে সকলে খেতে বসবে গরম ভাত, গরম মাংস। অমিয়া তাকিয়ে আছে ; গলায় চটের মতো ঘামাচি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল প্রমথ।

উকিলবাবুর রকে বসে ছিলেন গৌর দত্ত। প্রমথকে দেখে কাছে ডেকে বললেন, দেখেছ কেমন গরম পড়েছে, এবার জোর কলেরা লাগবে।

নড়েচড়ে বসলেন গৌর দত্ত। প্রমথ ওঁর পাশে বসল।

শুধু কলেরা, আবার ইনফ্লুয়েঞ্জাও শুরু হয়েছে।

লক্ষ্য করে দেখলুম জানো—

গৌর দত্ত প্রমথর গা ঘেঁষে ফিসফিসিয়ে প্রায় যে-সুরে অনিল কুণ্ডুকে তার সংসার থেকে বিধবা ভাজকে আলাদা করে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেই সুরে বললেন, লক্ষ্য করে দেখলুম জানো বোমাটা ফাটার পরই এই ইনফ্লুয়েঞ্জা শুরু হয়েছে, গরমও পড়েছে, ঠিক কিনা।

হ্যাঁ, গরমটা এবারে তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না।

লক্ষ্য করেছ যত বোমা সব জাপানের কাছাকাছি ফাটাচ্ছে। তার মানে কি ? ইণ্ডাস্ট্রিতে খুব ফরোয়ার্ড বলেই তো ওদের এত রাগ! আমাদের পুলুর আপিসে একটা জাপানি আসে, ভালো ইংরিজি জানে না, কথা বলতে খুব অসুবিধে হয় পুলুর, ওতো ফার্স্ট ডিভিশনে বি, এ, পাস করা। তা জিজ্ঞেস

করেছিল নেতাজীর কথা। ওরা আবার আমাদের চেয়েও শ্রদ্ধাভক্তি করে। কি উত্তর দিলে জানো? বোসের মতো কেউ থাকলে তোমাদের ফাইভ ইয়ার প্ল্যানগুলোয় চুরি হত না। ব্যাপারটা বুঝতে পারলে!

হ্যাঁ, জিনিসপত্তর যা আক্রা হচ্ছে দিনকে দিন। মাংস তিন টাকায় উঠেছে।

এনেছ বুঝি আজ?

সামনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন গৌর দত্ত। অন্যমনস্কের মতো লাঠিটা ঘোরাতে ঘোরাতে আবার বললেন, কি গরম পড়েছে, টিকে নিয়েছ? খাওয়া-দাওয়া সাবধানে কোরো। ছেলেপুলের সংসার বলা যায় না কখন কি হয়।

হলে আর কি করা যাবে, সাবধানে থেকেও তো লোকে রোগে পড়ে।

ওই তো ভুল করো। আজ তোমার যদি, ভগবান না করুন, ভালো মন্দ কিছু একটা হয় তখন সংসারের অবস্থাটা কি হবে ভেবেছ?

অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠল প্রমথ। এসব কথা এখন ভালো লাগছে না। বোধহয় সংসারের গৌর দত্তর আর কিছু দেবার বা নেবার নেই। চাগিয়ে তোলা দরকার, আহা বুড়ো মানুষ।

একটু চাখবেন নাকি?

কি এনেছ, খাসি? রাঙ না সিনা?

গর্দানা

এ হে, খাসির রাঙ দারুণ জিনিস।

গৌর দত্তর গালে যেন পিঁপড়ে কামড়াল। চুলকোতো চুলকোতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

বুঝলে আগে খুব খেতুম। সামনে জ্যান্ত পাঁঠা বেঁধে রেখেই হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত উড়িয়ে দিতে পারতুম। এখন ছেলেরা লায়েক হয়েছে, রোজগার করছে, বৌদের হাতে সংসার। পুলুটাও হয়েছে বৌ-ন্যাওটা, বুড়ো বাপের যত্ন-আত্তির দিকে নজর নেই। তোমার বৌদি বেঁচে থাকলে এ অবস্থাটা হত না।

টিকিট কাটার সঙ্গে সঙ্গে বাস বিকল হলে যাত্রীদের মনের অবস্থার মতো আস্তে আস্তে থেমে গেলেন গৌর দত্ত।

দুঃখ হচ্ছে প্রমথর। বুড়ো মানুষটার নিজের বলতে আর কিছু নেই। এখন কোনোরকমে টেনেটুনে চিতায় ওঠার অপেক্ষা। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন জীবনটা ধুকপুক করবে, সাধ-ইচ্ছে তৈরি হবে, পূরণ করতে চাইবে, অথচ পারবে না। এমন বাঁচার থেকে মরা ভালো। আহা বুড়ো মানুষটা মরবেই বা কেন।

চলুন গৌরদা, আজ একটু বেড়িয়ে আসা যাক গঙ্গার ধার থেকে।

সে বড় দূর ভাই, তার চেয়ে পার্কে বরং গোটা কতক চক্কর দিয়ে আসি।

দুজনে উঠে দাঁড়াল। রাধু বাড়ি ফিরছে। প্রমথ তাকিয়ে থাকল তার দিকে। জড়োসড়ো ভঙ্গিতে ওদের পাশ দিয়ে রাধু চলে গেল।

তোমার বড় ছেলেটি ভালো।

হাসল প্রমথ।

হাঁটতে হাঁটতে গৌর দত্ত বললেন, ওরা আবার খুঁজবে হয়তো।

পার্কে ঢুকেও অনেক কথার জের টেনে তিনি বললেন, খুঁজলে আর কি হবে, নিজেরাই গপ্পোটপ্পো করবে। আশুর মেয়েকে নাকি মারধোর করেছে শাশুড়ি, আজ ওর যাবার কথা ছিল, কি ফয়সলা হল কে জানে। আমি তো বলেছিলুম হাতে-পায়ে ধরে মিটিয়ে আসতে। খাট বিছানা টাকা তো এজন্মে দেবার ক্ষমতা হবে না আশুর।

প্রমথর এসব কথায় কান নেই, সে তখন ভাবছে পুতুল এতক্ষণে ফিরেছে ওর বন্ধুর বাড়ি থেকে। উনুন ধরিয়েছে। অমিয়া ওকে দেখিয়ে দিচ্ছে কেমন করে খুন্তি ধরলে মাংস কষতে সুবিধে হয়। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে মেয়েটার কপালে, নাকের ডগায়। ঠোঁটদুটো শক্ত করে টিপে ধরেছে। চুড়িগুলো টেনে তুলেছে। দপদপে স্বাস্থ্য, বেশিদূর উঠবে না। পাতলা ভাপ উঠছে হাঁড়ি থেকে। না, এখনই কি উঠবে। এখনো তো জলই বেরোয় নি। আগে তো কখনো রাঁধে নি, নিশ্চয় বুক দুরদুর করছে আর আড়চোখে তাকাচ্ছে অমিয়ার দিকে। অমিয়া কি করছে? গালে হাত দিয়ে পিঁড়িতে বসে দেখছে। কি দেখছে, পুতুলকে? তাই হবে। হয়তো খুব মিষ্টি দেখাচ্ছে ওর কাঁচ মুখটা আর ভাবছে হয়তো যে-কটা গয়না আছে ভেঙে কি কি গড়াবে ওর বিয়ের জন্যে। এতক্ষণে গন্ধে ম-ম করছে বাড়িটা। খোকন নাক কুঁচকে শুঁকছে। ভালো লাগছে গন্ধটা তাই মিটিমিটি হাসছে আর হাঁড়ির কাছে আসার তাল খুঁজছে। পারবে না, অমিয়ার নজর বড় কড়া।

দুচার দিন হয়তো বলাবলি করবে, বলবে গপ্পে লোক ছিল, বেশ জমিয়ে রাখত সন্ধেটা। তারপর একসময় ভুলে যাবে। যেমন নির্মলদা কি নীলুকাকা মরে যাবার পর আর এখন কেউ নামই করে না। তোমরাও তেমনি ভুলে যাবে আমাকে।

দগদগে লাল হয়ে আছে কেষ্টচুড়ো গাছের চিমসে ডালগুলো। ওদের ফাঁক দিয়ে আকাশটাকে কেমন অন্য রকম লাগে যেন। লাগে চোখ নয় মনটা। রাধু টিউশনিতে যাবার আগে নিশ্চয় দেখেছে। দেখে কিছু বলেছে কি? বড় কম কথা বলে ছেলেটা। তেইশ বছরেই বুড়িয়ে গেছে ওর শরীর-মন। ওকে দেখলে অস্বস্তি হয়। মনে হয় হাসি-খুশি আনন্দ যেন কিছুই নয়। জীবনটা শুধু দুঃখ্য, দুঃখ্য আর দুঃখ্য কাটানোর চেষ্টাতেই ভরা। অথচ ওর বয়স তেইশ। ওর বয়সটা যেন চিমসে-কাঠি ডালে ফুল ফোটার মতো। বয়সের ফাঁকফোকর দিয়ে যৌবনটাকে কেমন বুড়োটে দেখায়।

রকে বসে থাকলে এতক্ষণে আরো পাঁচজন জুটে যেত। তখন শুধু আমাকে নয় চক্ষুলজ্জার খাতিরে ওদেরও বলতে হত। তার চেয়ে এই বরং ভালো হয়েছে, বেমালুম খিদেটাও বেশ চনচনে হল।

কি তখন থেকে ভ্যাজর ভ্যাজর করছে বুড়োটা। বয়স বাড়লে হ্যাংলামোও বাড়ে। আঃ, কি হুড়োচাল্লি শুরু করেছে ছেলেগুলো, মানুষ দেখে ছুটবে তো। লাগল হয়তো বুড়ো মানুষটার। আহা ছেলেবৌরা যত্ন করে না। ফাঁসির আসামীও তো শেষ ইচ্ছা পূরণের সুযোগ পায়, অথচ মুখ ফুটে ওর ইচ্ছের কথা বলতে পারবে না কাউকে। গুমরে গুমরে মনের মধ্যে গুমোট তৈরি করবে। এবারের গরমটা অসহ্য, তবু নাকি বেতিয়াফেরত মানুষগুলো হাওড়া-ময়দানে ভাজাভাজা হচ্ছে। বাইরে-ভেতরে সবখানেই অসহ্য হয়ে উঠেছে মানুষ। এই যে সকলে পার্কে বেড়াতে এসেছে, সেও তো গুমোট কাটাতেই। অমিয়াও আসতে পারে। কি এমন কাজ তার, ওইটুকু তো সংসার। না, এখন সংসারের কথা থাক, তার চেয়ে বরং ওই গাছটার দিকে তাকানো যাক। রাধাচুড়ো। একটাও ফুল নেই গাছে। থাকা উচিত ছিল। কেননা কেষ্টচুড়োয় ফুল ধরেছে। এই হয়, একটা আছে তো আর একটা নেই, সুখে জোড় বাধে না কোনো কিছুই। এখন তার খুশি থাকতে ইচ্ছে করছে। অথচ অমিয়া, কি জানি এখন হয়তো পুতুলকে বকছে দু'পলা তেল বেশি দিয়ে ফেলেছে বলে।

চলুন গৌরদা, এবার ফেরা যাক।

এর মধ্যে ? রান্না হয়ে গেছে কি !

রান্নার দেরি আছে। আপনাকে নয় বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো চাঁদুকে দিয়ে।

তাই দিও, আমি বরং একটু ঘুরি, আর শোনো, চাঁদুকে বোলো আমার হাতে ছাড়া কাউকে যেন না দেয়. কেমন।

প্রমথ কাঁদুনে গ্যাসের শেল ফাটতে দেখেছে এই সেদিন, অনেকের সঙ্গে সেও রুদ্ধশ্বাসে ছুটেছে, ঘোড়সোয়ার পুলিশের নাগাল ছাড়িয়েও ছুটেছে। তাই সে বোঝে অমিয়ার অবস্থাটা যখন উনুনে আগুন পড়ে। কোথায় পালাবে সে ওইটুকু বাড়ির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে ? যেখানেই যাক না ধোঁয়া তাকে খেতে হবেই, ওই সময়টায় সকলেই উনুন ধরায়। ছাদে যে উঠবে তারও ফুরসত নেই। ঘরে বিকেলে কেউ থাকে না। ভাড়াটে বাড়ির একতলা সদর দরজা সব সময় হাট করা, মুহূর্তের জন্যেও ঘর ছাড়ার উপায় নেই।

আজও সেই রোজকার অবস্থা, তবু রক্ষে উনুন প্রায় ধরে গেছে। নিজের মনে গজগজ করছে অমিয়া আর হাওয়া দিচ্ছে। সাহায্য করতে গেল প্রমথ। তিড়বিড়িয়ে জ্বলে উঠল অমিয়া।

থাক, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না।

অমিয়া চুল বেঁধেছে, গা ধুয়েছে, শাড়িটাও পরিষ্কার। প্রমথ বলল, তুমি পুতুলকে ডেকে আনো, ততক্ষণ আমি হাওয়া দিচ্ছি।

পাখাটা নামিয়ে দম-কাটা স্প্রিঙের মতো উঠে দাঁড়াল অমিয়া।

দাঁড়াও, মেয়ের আড্ডা শেষ হোক তবে তো ঘরের কথা মনে পড়বে। আসুক আজ, ওর আড্ডা ঘোচাচ্ছি।

তরতর করে ছাদে উঠে গেল অমিয়া। সেখান থেকে একটু গলা তুলে ডাকলে তৃপ্তিদের বাড়ি থেকে শোনা যায়। ছাদ থেকে অমিয়া নামল আর সদর ঠেলে পুতুলও বাড়ি ঢুকল প্রায় একই সঙ্গে। একটুও আভাস না দিয়ে অমিয়া এলোপাথাড়ি কতগুলো চড় বসিয়ে দিল পুতুলের গালে, মাথায়, পিঠে।

পইপই করে বলি সন্ধে হলেই বাড়ি ফিরবি, সেকথা গ্রাহ্যই হয় না মেয়ের। কি এত কথা ফিসফিস, গুজগুজ, তৃপ্তির মাস্টারের সঙ্গে হাসাহাসি কেউ যেন আর দেখতে পায় না, না?

বারে, আমি হাসাহাসি করেছি নাকি?

যেই করুক, তুই ওখানে থাকিস কেন, ঘরে আমি একা, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে সে খেয়াল থাকে না কেন? হাঁড়িটা উনুনে বসা।

অমিয়া ঘরে চলে গেল। উঠোনে গোঁজ হয়ে আঁচলটা মুঠোয় পাকাতে থাকল পুতুল। খামোকা মার খেল মেয়েটা। এইটুকু তো বয়েস, খাঁচার মতো ঘরে কতক্ষণ আর আটকা থাকতে মন চায়। উঠে এল প্রমথ রান্নাঘর থেকে।

মা যা বলল তাই কর।

ওর পিঠে হাত রেখে আস্তে ঠেলে দিল প্রমথ। পিঠটা বেঁকিয়ে ঠেলাটা ফিরিয়ে দিল পুতুল। গঙ্গাজলের ছড়া দিতে দিতে ওদেব দেখে গেল অমিয়া।

রাগ করতে হবে না আর, কি এমন অন্যায় বলেছে? আজ বাদে কাল বিয়ে হবে, হাসাহাসি না করলেই তো হয়।

আমি মোটেই হাসাহাসি করি নি, তবু মিছিমিছি—

ওর পিঠে হাতটা রেখে দিয়েছিল প্রমথ, তাই আঙুল বেয়ে উঠে এল বাকি কথাগুলো। থরথরিয়ে পুতুল কাঁপছে।

বিয়ের পর যত পারিস হাসিস, কেউ বারণ করবে না। বড় হয়েছিস, বুদ্ধি হয়েছে তোর, তৃপ্তিদের যা মানায় আমাদের কি তা সাজে?

শাঁখ বাজাচ্ছে অমিয়া। পুতুলের কাঁপুনি যেন বেড়ে গেল। বিশ্রী শাঁখের আওয়াজটা। শুভকাজে শঙ্খধ্বনি দেওয়া হয়, অথচ এখন মনে হচ্ছে মাটি টলছে ভূমিকম্পে, তাই মেয়েটা কাঁপছে। মৃদু ঠেলা দিল প্রমথ। এক-পা এগিয়ে তারপর ঘরে ছুটে গেল পুতুল।

দাও আরো আদর। দিনদিন যেন বাঁদরী তৈরি হচ্ছে। অনেক দুঃখ্যু আছে ওর কপালে, বলে রাখলুম।

হাঁড়ি নিয়ে রান্নাঘরে যাচ্ছে অমিয়া প্রমথ নরম সুরে বলল, আজকে না বকলেই হত।

কেন, আজ রথ না দোল যে বকব না।

শোবার ঘরে এল প্রমথ। পুতুল ফোঁপাচ্ছে স্তূপ করা বিছানায় মুখ গুঁজে। শব্দটা সর্দি ঝাড়ার মতো শোনাচ্ছে। তার ওপর প্যাচপেচে গরম।

লক্ষ্মী মা আমার ওঠ, যা রান্নাটা শিখে নে। আরে বোকা শ্বশুরবাড়িতে যখন রাঁধতে বলবে তখন যে লজ্জায় পড়বি, আমাদেরও নিন্দে হবে।

পুতুলের ফোঁপানি থামল। একটা চোখ বার করে, স্বরটাকে নামিয়ে বলল, বিয়ে করলে তো।

হেসে উঠল প্রমথ, পুতুল মুখ লুকোল।

তোর মাও বিয়ের আগে ঠিক অমন কথা বলত।

পুতুল আবার মুখ তুলল। চোখের কাজল ধ্যাবড়া হয়ে গেছে। আহা, মেয়েটা কেঁদেছে।

তুমি কি করে জানলে, মা বুঝি বলেছিল ?

একই সঙ্গে দুজনে দরজার দিকে তাকাল। না অমিয়া নয়, খোকন এল।

চোখাচোখি হল পুতুল আর প্রমথর, হাসল দুজনেই। মেয়েটা দারুণ ভীতু হয়েছে। ওর মাও অমন ছিল, খালি দরজার দিকে তাকাত। রাত্রে ছাতে উঠত, তাও কত ভয়ে ভয়ে।

বলো না, মা বুঝি সেসব গপ্পো করেছিল ?

হেসে খোকনের চুলে বিলি কাটল প্রমথ। সেসব গল্প কবে করেছিল অমিয়া, তা কি এখনো মনে আছে। চেষ্টা করলে টুকরো টুকরো হয়তো মনে পড়বে। কিন্তু সেকথা কি মেয়েকে বলা যায়। একদিন গলি দিয়ে গিয়েছিল একটা বেলফুলওয়ালা, কত কাণ্ড করে মালা কেনা হয়েছিল। আর-একদিন, ছাদের উত্তর-পুব কোণায় তুলসীগাছের টবটার পাশে একটা ছোট্ট পৈঠে ছিল, একজন মাত্র বসতে পারে। পাছে বাবার ঘুম ভেঙে যায় তাই চুড়িগুলোকে হাতে চেপে বসিয়ে, পা টিপেটিপে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ছুট দিয়েছিল অমিয়া রকটা লক্ষ্য করে। আচারের শিশি বিকেলে তুলে রাখতে ভুলে গিয়েছিল, ছাদের মধ্যিখানেই পড়ে ছিল সেগুলো। তারপর সে কি কেলেঙ্কারি। বড়বৌদি ছাদে উঠে এসেছিল, আর অমিয়া পাঁচিল ঘেঁষে বসে পড়েছিল দুহাতে মুখ লুকিয়ে।

হাসছ কেন !

এমনি। একটা কথা মনে পড়ল তাই।

অমন করে হাসলে কিন্তু তোমায় কেমন কেমন যেন দেখায়। বেশ লাগে দেখতে।

চোখ নামিয়ে হাসল প্রমথ। খোকন চলে গেল রান্নাঘরে। খুন্তি নাড়ার শব্দ আসছে, গন্ধও আসছে কষা মাংসের, রান্নাঘরে অমিয়ার কাছে এখন কেউ নেই। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমছে গালে, কপালে, নাকের ডগায়। বার বার কাঁধে গাল ঘষার জন্যে ঘোমটা খুলে গেছে। দুহাত সকড়ি, ঘোমটা তুলে দেবার কেউ নেই কাছে।

বসেই থাকবি, নাকি রান্নাঘরে যাবি।

না, আমি শিখব না।

তোর মার কাছে শেখার জন্যে পাড়ার মেয়েরা আসত, বাটি বাটি মাংস যেত এবাড়ি-ওবাড়ি।

অবস্থা ভালো ছিল তাই মা শিখতে পেরেছিল, আমি তো কোনোদিন রাঁধলুমই না।

ওর বয়সেই মেয়েরা বিয়ের কথা ভাবে। অমিয়া বলেছিল, সেও ভাবত, আর ভাবে বলেই একতলার ঘুপচি ঘরে জীবনটা সহনীয় হতে পারে। সচ্ছল ঘরে পুতুলকে দেওয়া যাবে না, টাকা কোথায়। মেয়েটা সেকথা ভেবেও হয়তো ভয় পায়। আসলে ভয় তো সকলেই পাচ্ছে, পুরুষ মেয়ে সকলে। নতুন বৌ অমিয়ার সময় মাংসের সের ছিল ছ আনা আট আনা, পুতুলের সময় তিন টাকা। জিনিস-পত্তরের দাম বাড়ার জন্যে স্ট্রাইক হবে, হোক। মিহিরবাবু কবিতা লিখলেও বাজে কথা বলে না। খুন্তির শব্দ আসছে, কষা-মাংসের গন্ধ আসছে, মেয়েটার মুখ শুকনো। অসহ্য লাগছে এই ঘরটা।

পুতুল আর প্রমথকে দেখে গম্ভীর হয়ে মুখ ঘুরিয়ে বসল অমিয়া। আলুর খোলা নিয়ে খেলা করছিল খোকন। পুতুল তাড়াতাড়ি কেড়ে নিয়ে কুটনোর ঝুড়িতে রেখে দিল, খোসা-চচ্চড়ি হবে।

গন্ধ উঠছে। এমন গন্ধ অমিয়ার হাতেই খোলে। ফুসফুস ভরিয়ে ফেলল প্রমথ। অমিয়ার গা ঘেঁষে পুতুল বলল, দাও না আমাকে।

উত্তর না দিয়ে অমিয়া শুধু খুন্তিটা নাকের কাছে ধরল। গনগনে আঁচ। একটুক্ষণ খুন্তি-নাড়া থামলেই তলা ধরে যাবে। পুতুলের কথায় কান দেবার ফুরসত নেই। পুতুল করুণ চোখে তাকাল প্রমথর দিকে।

দাও না ওকে, যখন রাঁধতে চাইছেই।

সবই যখন করলুম তখন বাকিটুকুও করতে পারব। খোকনের ঘুম পেয়েছে শুইয়ে দে।

সত্যিই তো! এখন আর করার আছে কি। জলভরা কাঁসিটা হাঁড়ির মুখে চাপা দেওয়া ছাড়া। মাংসের জল বেরোলে, কাঁসির উষ্ণ জলটা ঢেলে

দেওয়া, সে তো একটা আনাড়িতেও পারে। তারপর সেদ্ধ হলে আলু, নুন আর ঘিয়ে রসুন ভেজে সাঁতলানো, ব্যস। হতাশ হয়ে তাকাল প্রমথ। হনুর গড়নের জন্যে এমনিতেই পুতুলের গালদুটো ফুলো দেখায়, এখন যেন আরো টেবো দেখাচ্ছে। ভাঙা ভাঙা স্বরে সে বলল, তৃপ্তিকে ওর বৌদি নিজে থেকে রান্না শিখিয়েছে, গোটা ইলিশ কাটা শিখিয়েছে, এবার ওদের মাংস এলে তৃপ্তি রাঁধবে সেদিন আমায় খাওয়াবে বলেছে।

তাহলে তো তোকেও একদিন খাওয়াতে হয়।

হয়ই তো, আজকেই তো ওকে বললুম আমাদের মাংস এসেছে, মা বলেছে আমি রাঁধব।

অমিয়ার দিকে চোখ রেখে এরপর পুতুল কিন্তু কিন্তু করে বলল, ওকে আমার রান্না খাওয়াব বলেছি।

গৌরদাও আজ বলল, দিওহে বৌমার হাতের রান্না। অনেক দিন খাই নি, কোত্থেকে শুনল কে জানে, বললুম দেব পাঠিয়ে। আহা বুড়ো মানুষটার যা কষ্ট, ছেলেবৌরা তো একটুও যত্ন করে না।

হ্যাঁ, পুলুদার বৌ কি ভীষণ চালবাজ, একদিন গেছলুম সে কি কথাবার্তা, যেন কত বি, এ-এম, এ পাস। কারুর আর জানতে যেন বাকি নেই দু-দুবার আই, এ-ফেল, তবু বলে বেড়ায় পাস করেছে। আর রাস্তা দিয়ে হাঁটে যখন, তুমি দেখেছ বাবা যেন, সুচিত্রা সেন চলেছে।

বোকার মতো হেসে প্রমথ বলল, কে বললে তোকে।

তৃপ্তি। ও তো ভীষণ বায়স্কোপ দ্যাখে, তবে হিন্দী বই দ্যাখে না, খুব অসভ্য নাকি, মাস্টারমশাইও দ্যাখে না।

এমনি শুনে শুনেই মেয়েটা বায়স্কোপের খবর নেয়। মনে পড়ছে না কোনো দিন বায়স্কোপে যাব বলে বায়না ধরেছে। বাপের অবস্থা বুঝে সাধ-আহ্লাদগুলো চেপে রাখে, বাবা-মাকে লজ্জায় ফেলে না। এ একমাত্র মেয়েরাই পারে, পুতুলের মতো মেয়েরা। চাঁদুটা সামান্য হুজুগ উঠলেই পয়সা পয়সা করে ছিঁড়ে খেত, এখন আর পয়সা চায় না। টাকা নিয়ে এখানে ওখানে খেলে খেলে বেড়ায়। ভাড়া খাটলে মান-ইজ্জত থাকে না, কিন্তু কি করবে, উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলে কখনো ফাঁকা পকেটে থাকতে পারে? রাধুর মতো ছেলে আর কটা হয়, পানটুকু পর্যন্ত খায় না। ভালো, ওরা সবাই ভালো, আহা বেঁচেবর্তে থেকে মানুষ হোক।

একদিন তোর মাকে নিয়ে যাস না বায়স্কোপে।

খোকনকে কোলে নিয়ে উঠোনে বেরিয়ে এসে গলা চেপে পুতুল বলল, হ্যাঁ, মা আবার যাবে। বলে, কতদিন সাধলুম চলো চলো, সকলেই তো যায়। তা নয়, মার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। একমিনিট বাড়ি না থাকলে সে কি ডাকাডাকি

যেন পালিয়ে গেছি, এমন বিচ্ছিরি লাগে, সবাই হাসাহাসি করে। বাবুদার সামনেও মা অমন করে।

ঘরে আইবুড়ো মেয়ে থাকলেও অমন ডাকাডাকি সবাই করে, তোর মেয়ে থাকলে তুইও করতিস।

প্রমথ হাসল। তিতকুটে গলায় পুতুল বলল, তা বলে দিনরাত ঘরে বসে থাকব? বেরোতে ইচ্ছে করে না আমার? ঘরকন্নার কাজ সব সময় ভালো লাগে? তুমি হলে পারতে?

শেষ দিকে সপসপ করে উঠল পুতুলের গলা। খোকনকে নিয়ে সে ঘরে চলে গেল। রকে পা ঝুলিয়ে বসল প্রমথ। একতলাটা শান্ত। দোতলায় সামান্য খুটখাট, তিনতলায় ছাদ, বলা যায় বাড়িটা চুপচাপ। শুধু গোলমাল করছে পাশের বাড়ির স্কুল ফাইনাল ফেলকরা ছেলেটা।

ঘরে থাকতে ভালো লাগে না মেয়ের, বাইরেই বা যাবে কোথায়, গিয়ে করবেই বা কি। এবাড়ি ওবাড়ি যাওয়া আর আজে-বাজে কথা বলা—এতে লাভ কি? দেয়ালে ঠেস দিয়ে প্রমথ ঘাড়ের জাড় ভাঙার জন্যে মাথা পিছনে হেলাল। ক্ষতিই বা কি, এমনি করেই তো বাকি জীবনটা কেটে যাবে। মেঘের নামগন্ধ নেই, শুধু ঝকঝক করছে গুচ্ছেরখানেক তারা। অসহ্য গরম, অসহ্য।

হঠাৎ একদমক হাওয়া পেরেকে ঝোলানো বাসনমোছা ন্যাতাটা ফেলে দিল। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে গা এলিয়ে দিল প্রমথ। ছটফটে গরমের মধ্যে একটুখানি হাওয়া বড় মিষ্টি লাগে। খোশবাই গন্ধ আসছে, হাঁড়ির ঢাকনাটা বোধহয় খুলল অমিয়া।

ঝিমুনি এসেছিল প্রমথর, ভেঙে গেল সদর দরজা খোলার শব্দে। চাঁদু এল। অমিয়ার সঙ্গে কথা হচ্ছে ওর, রাত্রে কিছু খাবে না বলছে। উঠে এল প্রমথ।

খাবি না কেন?

খাইয়ে দিল ওরা রেস্টুরেন্টে, সেমিফাইনালের দিনও খাওয়াবে। দুটো গোল হয়েছে, দুটোই আমার সেণ্টার থেকে!

ভালোই হল, কাল তো বাজার আসবে না।

অমিয়া কালকের জন্যে চাঁদুর ভাগটুকু সরিয়ে রাখল। আড্ডা দিতে বেরুচ্ছিল চাঁদু, ডেকে ফেরাল প্রমথ।

তোর গোঁর জ্যাঠাকে খানিকটা দিয়ে আয়।

কেন?

বিরক্তি, তাচ্ছিল্য আর প্রশ্ন, একসঙ্গে তিনটিকে অমিয়ার মুখে ফুটতে দেখে দমে গেল প্রমথ।

ওকে যে বলেছি, পাঠিয়ে দেব।

দেব বললেই কি দেওয়া যায়, অমন কথা মানুষ দিনে হাজারবার দেয়। এইটুকু তো মাংস। একে তাকে খয়রাত করলে থাকবে কি, কাল বাজার হবে না, খাবে কি কাল?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবার দরকার কি, বলে দিও নয় ভুলে গেছলুম।

অমিয়া আর চাঁদুর মুখের দিকে তাকাল প্রমথ। একরকমের হয়ে গেছে ওদের মুখদুটো। ওরা খুশি হয় নি।

কিন্তু বুড়ো মানুষটা যে আশা করে বসে থাকবে।

থাকে থাকবে।

কথাটা বলে চাঁদু দাঁড়াল না। অমিয়া চুপ করে আছে। তার মানে, ওইটে তারও জবাব। আবার পা ঝুলিয়ে বসল প্রমথ। আকাশে গুচ্ছেরখানেক তারা। আচমকা তখন হাওয়াটা এসে পড়েছিল, আর আসছে না। পুতুল চুপিচুপি পাশে এসে বলল, দিলে না তো! জানি, দেবে না। তখন মিথ্যে বলেছিলুম, তৃপ্তিকে মোটেই বলি নি যে মাংস খাওয়াব।

বেড়ালের মতো পুতুল ফিরে গেল। হয়তো তাই, বোকামি হয়ে গেছে। বুড়ো মানুষটা বসে থাকবে, বসেই থাকবে। ঝিমুনি আসছে আবার, দেয়ালে ঠেস দিয়ে গা এলিয়ে দিল প্রমথ।

সদর দরজায় আবার শব্দ হতে প্রমথর মনে হল গৌরদা বুঝি। ফিটফাট, ব্যস্ত ভঙ্গিতে বাবু সটান রান্নাঘরের দরজায় এসে চাঁদুর খোঁজ করল, তারপর নাক কুঁচকে গন্ধ টেনে বলল, ফাস্ ক্লাস গন্ধ বেরোচ্ছে কাকিমা।

আঁচল দিয়ে শরীরটাকে মুড়ে পুতুল যেন ভেসে এল!

চেখে যাবেন কিন্তু।

তারপরই তাকাল অমিয়ার দিকে ভয়ে ভয়ে।

বাবারে বাবা, মেয়ের যেন তর সইছে না। খালি বলছে, বাবুদা কখন আসবে, ওকে দিয়ে চাখাব। নিজে রেঁধেছে কিনা।

যে কেউ এখন দেখলে বলবে, অমিয়া হাসছে। কিন্তু প্রমথর মনে হচ্ছে ও হাসছে না। হাসলে অত কুচ্ছিত দেখায় কাউকে? নাকি তার নিজের দেখার ভুল। প্রমথ তাকাল বাবুর দিকে। চৌকো করে কামানো ঘাড়, চুড়ো করে সাজানো রুক্ষ চুল। বুক, কোমর, পাছা সমান। চোঙার মতো আঁটসাঁট প্যাণ্ট, উলটে দিলেই গুলতির বাঁট হয়ে যাবে চেহারাটা, ভাবলে হাসি পায়। কিন্তু হাসল না প্রমথ, ছেলেটা শ-দেড়েক টাকার মতো চাকরি করে।

মুখে আঁচল চেপে হাসছে পুতুল। অমিয়া জিজ্ঞাসা করল, কেমন হয়েছে।

ফুড়ুত করে হাড়ের মজ্জা টেনে বাবু বলল, গন্ধ শুঁকেই তো বলেছিলুম, ফাস ক্লাস!

অমিয়া ওর খাওয়া দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করল, চাঁদুর সেই কাজের কি হল?

বাবুর জিভ বাটিতে আটকে রইল কিছুক্ষণ, তারপরই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, সে আর মনে করিয়ে দিতে হবে না। তবে বুঝলেন তো, স্কুল ফাইনালটাও যদি পাস করত তাহলে ভাবনা ছিল না। আজকাল বেয়ারার চাকরির জন্যে আই, এ পাস ছেলেরাও লাইন লাগায়। তবে আমিও এঁটুলির মতো লেগে আছি সুপারভাইজারের সঙ্গে, রোজ ত্যালাচ্ছি।

চাঁদু না হয়, রাধুর জন্যে দ্যাখো।

না কাকিমা। রাধুটা আজকাল যেন কেমন হয়ে গেছে, চাকরিতে ঢুকে শেষকালে ইউনিয়নে ভিড়ুক আর আমায় নিয়ে টানাটানি শরু করবে তখন। এর ওপর আবার যা গরম বাজার চলছে।

হ্যাঁ, মিহিরকাকু বলছিলেন বেস্পতিবার নাকি স্ট্রাইক হবে।

আরে ও তো খুচরো স্ট্রাইক। বেশ বড়োসড়ো অল ইণ্ডিয়া স্ট্রাইকের কথাবার্তা হচ্ছে নাকি।

হলে হয় একবার, ব্যাটা সুপারভাইজারটাকে বাগে পেলে আচ্ছাসে ধোলাই দিয়ে দেব। মেজাজ কি ব্যাটার, যেন মাইনে বাড়ানোর কথা বললে ওকে গ্যাঁট থেকে টাকাটা দিতে হবে। পাবলিকের টাকা পাবলিক নেবে, তাতে ক্ষতিটা কি হয়?

খালি বাটিটা নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল বাবু, পুতুল টেনে নিল হাত বাড়িয়ে, জলের গ্লাসটাও এগিয়ে দিল সে। রুমালে ঠোঁট মুছে বাবু জিজ্ঞেস করল, চাঁদুটা গেল কোথায়, একটা কার্ড ছিল একস্ট্রা।

কার্ড কিসের, আপনাদের সেই অফিসের থিয়েটারের?

উহুঁ, যুব উৎসব। বলেছিলুম না আমার এক বন্ধু গল্প-টল্প লেখে, এর মধ্যে আছে, সে-ই জোগাড় করে দিল কার্ডটা। চাঁদু বলেছিল সতীনাথের গানের দিন যাবে, তা সেদিন আর জোগাড় হয়ে উঠল না।

কোন গানটা গাইল? 'সোনার হাতে'টা গেয়েছে?

ওটা, তারপর 'আকাশপ্রদীপ জ্বলে'টাও নাকি গেয়েছে।

আপনাকে তো সেধে-সেধে মুখ ব্যথা হয়ে গেল, তবু গানটা লিখে দিলেন না।

বেশ চলো, এখুনি লিখে দিচ্ছি।

কয়লা দিয়ে উনুনে হাওয়া করছে অমিয়া। পুতুল আর বাবু যেন ভাসতে ভাসতে ঘরে চলে গেল। প্রমথর গা ঘেঁষেই প্রায়।

চটপটে, চালাকচতুর ছেলে। ও কি বিয়ে করবে পুতুলকে? ছেলেমানুষ, বলার সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে যাবে। তার থেকে ওর বাবাকে গিয়ে ধরতে হবে। মুশকিল বাধবে জাত আর দেনা-পাওনা নিয়ে। বাপের মুখের ওপর ওর কথা বলার সাহস হবে না।

তুমি ওখানে বসে রইলে কেন, ঘরে ওরা একা রয়েছে না?

প্রমথ তাকিয়ে রইল অমিয়ার দিকে। কত সাবধানে আঙুলের ফাঁক দিয়ে চাল-ধোয়া জলটা ফেলছে। অমন করে মনের কুৎসিত সন্দেহগুলোকেও তো ছেঁকে ফেলে দিতে পারে। থাকলই বা ওরা একসঙ্গে একটুক্ষণ, ক্ষতিটা কি তাতে।

ঘরে নয়, ছাদে যাবে বলে উঠে দাঁড়াল প্রমথ। সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে থামল। ঘরে ওরা হাসাহাসি করছে, ছাদে গেলে অমিয়া রাগ করবে নিশ্চয়। আজ ওকে রাগাতে ইচ্ছে করছে না। রান্নাঘরে গিয়ে গল্প করলে কেমন হয়, আগড়ুম-বাগড়ুম যা খুশি। মেজবৌদিকে সেদিন দেখলুম ধর্মতলায় গাড়ি থেকে নামছে, এখনও পেটকাটা জামা পরে; কিংবা, দক্ষিণাবাবু কি সব ওষুধ খাইয়ে বৌকে প্রায় মেরে ফেলার জোগাড় করেছিল। তবে কাজ ঠিকই হাসিল হয়েছে। পেটেরটা বাঁচে নি। কিংবা, একটা দিন দেখে গুরুঠাকুরের কাছে গিয়ে মন্তর নেবার কথাটা পাড়লে হয়, ভাবছিল প্রমথ। পুতুল ঘর থেকে বেরিয়ে তার কাছে এল।

ছোড়দা তো নেই, কার্ডটা নষ্ট হবে, ওর বদলে আমি যাব? বাবুদা বলছে এমন উৎসব নাকি এর আগে হয় নি, না দেখলে জীবনে আর দেখা হবে না, নাচ, গান, সিনেমা, থিয়েটার সব নাকি দেখা যাবে, যাব?

গেলে ফিরবি কখন?

কত আর দেরি হবে, ঘণ্টাখানেক দেখেই চলে আসব।

কাঁচ শশার মতো কবজিটা যেন মুট করে ভেঙে ফেলবে পুতুল আঙুলের চাপে। এইটুকু কথা বলেই ও হাঁপিয়ে পড়েছে।

তোর মাকে একবার বলে যা।

রান্নাঘরের দরজা থেকে কোনোরকমে পুতুল বলল, ছোড়দা তো নেই। তাই আমিই যাচ্ছি তাড়াতাড়ি ফিরব'খন!

একটা কাঁচা কয়লা বিরক্ত করে মারছে। সেটাকে তুলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টাতে অমিয়া ব্যস্ত। প্রমথ কৈফিয়ত দেবার সুরে বলল, বাড়ি থেকে বেরোয়-টেরোয় না তো, যাক ঘুরে আসুক।

কে?

সাঁড়াশিতে চেপে ধরে কয়লাটাকে উনুন থেকে বার করে আনতে আনতে অমিয়া বলল, কে, পুতুল?

হ্যাঁ, কি যেন উৎসব হচ্ছে বলল।

চলে গেছে?

না, কেন।

রান্নাঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছিল অমিয়া। পথ আটকে দাঁড়াল প্রমথ।

কেন আবার, রাত্তিরে মেয়েকে ছেড়ে দেবে একটা ছেলের সঙ্গে!

দিলেই বা কি দোষ হবে। হাঁপিয়ে ওঠে না ঘরে বসে থাকতে? শুধু ছাদ আর গপ্প করা। এ ছাড়াও তো অনেক কিছু আছে। মারধোর করলেই কি মেয়ে ভালো হবে।

প্রমথ চুপ করল বুক ভরে বাতাস টেনে। দাঁত চেপে কথা বলতে বেশ কষ্ট হয় কিন্তু উপায়ই বা কি, ওঘরে পুতুল আর বাবু রয়েছে। থমথম করছে অমিয়ার মুখ। ঘাম নামছে থুতনি বেয়ে কিলবিলে পোকার মতো, ফরসা গালে সেঁটে বসা উড়ো চুলকে চীনে মাটির ফাটা দাগের মতো দেখাচ্ছে। সত্যিই ফেটে পড়ল অমিয়া।

আমি যখন পারি, ও পারবে না কেন, কেন পারবে না। শুধু ওর কথাই ভাবছ, কেন ভাবার আর কিছু নেই তোমার? বলে দিচ্ছি ওর যাওয়া হবে না।

চুপ, আস্তে, দোহাই আজ আর চেঁচিও না।

আঙুল বাঁকিয়ে দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল প্রমথ। দপদপ করছে তার রগের পেশী। পিছু হটে এল অমিয়া। প্রমথর নখের ডগাগুলো ভীষণ সরু।

চুপ করব কেন। আমি অন্যায় কথা বলেছি? মেয়েকে কেন তুমি ছেড়ে দিতে চাও একটা ছেলের সঙ্গে, তা কি বুঝি না ভেবেছ।

চোখে চোখ রেখে ওরা তাকাল। অমিয়ার চাউনি কসাইয়ের ছুরির মতো শান দিচ্ছে। মাংসের খোলা হাঁড়িতে চোখ পড়ল প্রমথর, থকথক করছে যেন রক্ত।

কি বুঝেছ তুমি, বলো কি বুঝেছ?

দুহাতে অমিয়ার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিল প্রমথ। খোঁপাটা খুলে পড়ল, চোখদুটো মরা পাঁঠার মতো ঘোলাটে হয়ে এল, ঠোঁট কাঁপিয়ে অমিয়া বলল, তুমি আমার গায়ে হাত তুললে!

অন্ধকার উঠোনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে পুতুল আর বাবু। কোনো সাড় নেই যেন ইন্দ্রিয়গুলোর। তবু ছাদে যাবার সময় প্রমথর নাকে চড়াভাবে লাগল পাউডারের গন্ধ। মেয়েটা সেজেগুজে অপেক্ষা করছে, করুক। মাথা নিচু করে করে প্রমথ ওদের পাশ দিয়েই ছাদে যাবার সিঁড়ি ধরল।

ছাদেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাধু ডেকে তুলল প্রমথকে। থালার সামনে বসে আছে অমিয়া। ঠাণ্ডা ভাত আর মাংস। ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়েছে।

পুতুল শুয়ে পড়ল যে এর মধ্যে।

শরীর খারাপ, কিছু খায় নি।

কথা দুটো শুকনো কড়কড়ে। খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত আর কেউ উচ্চবাচ্য করল না। মাংসের সবটুকুই খেল প্রমথ। শুধু মেটুলির টুকরোগুলো ছাড়া। মেটুলি ভীষণ ভালো বাসে অমিয়া, অথচ সবটুকুই সে প্রমথকে দিয়ে

দেবে। প্রমথও না খেয়ে বাটিতে রেখে দেবে। তখন মিষ্টি ঝগড়া ভালো লাগত আর মাংসও আসত নিয়মিত। আজকেও প্রমথ মেটুলি রেখে উঠে পড়ল। কলতলায় অনেকক্ষণ ধরে কষের দাঁত থেকে মাংসের আঁশ টেনে বার করল। ভিজে গামছা দিয়ে গা-মুছে যখন সে শুয়ে পড়ল তখনও অমিয়ার রান্নাঘর ধোয়া শেষ হয় নি।

অনেক রাতে উঠোনে বেরিয়ে এল প্রমথ। ঘরের মধ্যে যেন চিতা জ্বলছে। একটুও হাওয়া নেই, ঘুম নেই, মেঘও নেই। পায়চারি শুরু করল সে রকের এমাথা ওমাথা। একটা এরোপ্লেন উড়ে গেল। মুখ তুলে তাকাল প্রমথ। একটুখানি দেখা গেল, লাল আর সাদা আলোটা পালটা-পালটি করে জ্বলছে আর নিভছে। মাত্র কতকগুলো তারা দেখা যায় উঠোন থেকে। ছাদে উঠলে আরো দেখা যাবে। দেখেই বা কি হবে। ওরাও তো দেখল আজ মাংস এসেছে অনেকদিন পর, কিন্তু তাতে হল কি। পাতে মেটুলি রেখে সে উঠে পড়ল আর নির্বিকার হয়ে শুধু তাকিয়ে রইল অমিয়া। এখন মনে হচ্ছে অমিয়া যন্ত্রের মতো তাকিয়ে ছিল। কিন্তু সেও তো যন্ত্রের মতোই শুধু অভ্যাস মেনে মেটুলিগুলো পাতে রেখে দিয়েছিল। পায়চারি থামাল প্রমথ। অমিয়াও উঠে এসেছে।

ঘুম আসছে না বুঝি?

না, ভয়ানক গরম লাগছে।

পিঠের কতকগুলো ঘামাচি মারল অমিয়া। দু-একটা শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল প্রমথ।

ছাদে যাবে?

কেন, এই তো বেশ।

বরাবরই তোমার কিন্তু ঘামাচি হয়।

অমিয়া পিঠের উপর কাপড় টেনে দিল।

বসবে?

পাশাপাশি বসল দুজনায়।

পুতুলের জন্যে ছেলে দ্যাখো এবার।

হ্যাঁ, দেখব।

চাঁদুটাকেও একটা যা হোক কাজেকম্মে ঢুকিয়ে দাও, কদ্দিন আর টোটো করে কাটাবে।

হ্যাঁ, চেষ্টা করতে হবে।

রাধু বলছিল আই, এ পরীক্ষাটা দেবে সামনের বছর।

ভালোই তো।

শান্ত রাত্রির মাঝে ওদের আলাপটা, কল থেকে একটানা জল পড়ার মতো

শোনাল। ওরা অনেকক্ষণ বসে রইল চুপচাপ, পাশাপাশি। কেউ কারুর দিকে তাকাচ্ছে না। দুজনেরই চোখ সামনের শ্যাওলা-ধরা দেয়ালটাকে লক্ষ্য করছে।

কি দরকার ছিল মাংস আনার।

অমিয়ার স্বরে ক্ষোভ নেই, তাপ নেই, অনুমোদন নেই। শুধু যেন একটু কৌতূহল। তাও ঘামাচি মারার মতো নিস্পৃহ। মুখ না ফিরিয়ে প্রমথ বলল, কি জানি। তখন কেমন ভালো লাগল, অনেক কথা মনে পড়ল, মনটাও খুশি হল। ভাবলুম আজ সবাই মিলে একটু আনন্দ করব।

চুপ করে রইল প্রমথ। মুখ ফিরিয়ে একবার তাকাল। অমিয়াও তার দিকে তাকিয়ে।

আজ পুতুলকে দেখে বারবার তোমার কথা মনে পড়ছিল। কত মিষ্টি ছিলে, চঞ্চল ছিলে, ছটফটে ছিলে।' আর ওকে কাঁদিও না।

মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল প্রমথ, তারা জ্বলছে। একটা কামার মানুষকে তাতিয়ে বিরাট এক হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে চলেছে, তারই ফুলকিগুলো ছিটকে উঠেছে আকাশে। ছাদে উঠলে আরো অনেক দেখা যাবে। অমিয়ার পিঠে হাত রাখল প্রমথ। থরথর করে কাঁপছে ওর পিঠটা।

জানো অমি, মনে হচ্ছে আমি আর ভালোবাসি না, বোধহয় তুমিও বাস না। তা না হলে তোমার মনে হবে কেন আমি তোমার গায়ে হাত তুলতে পারি। অথচ সত্যি সত্যি তখন ইচ্ছে হয়েছিল তোমার গলা টিপে ধরি। অমি, এখন একটা মড়া আগলে বসে থাকা ছাড়া আর আমাদের কাজ নেই।

অমিয়ার পিঠে হাত বোলাল প্রমথ। খসখসে চামড়া, মাংসগুলো ঝুলে পড়েছে আলগা হয়ে, মেরুদণ্ডের গিঁটগুলো হাতে আটকাচ্ছে। মুখ তুলল প্রমথ, যে-কটা তারা দেখা যায়, সেদিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বলল, কেঁদো না, মরে গেলেই মানুষ কাঁদে, আমি কি মরে গেছি।

তারপর ওরা বসে রইল অন্ধকারে কথা না বলে।

শেষবিকেলের দুটি মুখ

হাওড়া স্টেশনের বিরাট টিনের চালার নিচে দাঁড়িয়ে দুইবোন বারবার চারধারে তাকাল। প্রতিটি মানুষের মুখ লক্ষ্য করার চেষ্টা করল। কেউই তেমন করে তাদের দেখে না, সবাই ব্যস্ত, সকলেরই কোন না কোন কাজ আছে। তাদেরও আছে।

ওরা স্টেশনের বিরাট চালার নিচে, গমগমে শব্দ ও ব্যস্ততার মধ্যে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছে। সারা স্টেশন জুড়ে কে কথা বলছে। দুইবোন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। হঠাৎ কথা বন্ধ হল। ছোটবোন আঙুল দেখিয়ে বলল, "ওই যে।" ওরা দুজনে তাকাল সসপ্যানের মত লাউডস্পিকারটার দিকে।

ছোটবোন গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, "এখন কি করব?"

বড়বোন এধার ওধার তাকাবার ভান করে দেখে নিল একবার। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাদা চুলের মধ্যে আঙুল চালাচ্ছে। এবার ফুঁ দিয়ে দিয়ে হাত থেকে চুল ঝেড়ে ফেলবে।

বড়বোন বলল, "চল ওই দিকটায়।"

ওরা গমগমে ভিড়ের মধ্য দিয়ে উত্তর দিকে এগোল। টিকিট ঘরের খুপরিতে মানুষের সারি, তার পাশ কাটিয়ে ঢালাও মেঝেতে ছড়ানো মানুষ শুয়ে আর বসে, তাদের পাশ কাটিয়ে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে মানুষ, তাদের পাশ কাটিয়ে, দুইবোন তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রাম ঘরে এল। একটা বেঞ্চের ধার ঘেঁষে দুজনে বসল। জানলা দিয়ে রাস্তা দেখা যায়। সার দিয়ে বাস দাঁড়িয়ে। ঘরের মধ্যে ফিকে আলো। ভ্যাপসা গন্ধ। জলের কল। টিকিটের জন্য মেয়েদের সারি। আর অপেক্ষারত দূরের যাত্রী।

"দিদি জল খাব।"

"খেয়ে আয়।"

ছোটবোনের দিকে নজর রাখল। ঝুঁকে কল টিপে জল খাচ্ছে। বড়বোন অস্বস্তি বোধ করল। ছোটবোনের জামাটা পাঁজরার কাছে ফেঁসে গেছে। ঘটি হাতে দাঁড়ান লোকটা একদৃষ্টে কি দেখছে?

"তুফান একসপ্রেস আজ লেট।"

মুখ ফেরাল বড়বোন। তার পাশের মহিলাটি কথা বললেন।

"কতক্ষণ যে বসে থাকতে হবে।"

"কেউ বুঝি আসবেন ?"

উনি হাসলেন। হাসতে হাসতে সারা ঘরে চোখ মেলে বললেন, "চিঠি পেলুম গতকাল পৌঁছবে। এসে ঘুরে গেছি, আসেনি।"

বড়বোন উঠে দাঁড়াল। ছোটবোনকে সে দেখতে পাচ্ছে না।

"যাবেন কোথাও, না কারুর জন্য এসেছেন ?"

"না, না, আমরা যাব বলে এসেছি।"

বড়বোন কথা বাড়াল না। স্টেশনের বিরাট চালার নিচে, মানুষ আর শব্দের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে ছোটবোনকে খুঁজল। পা-পা এগিয়ে স্টেশনের বহু সদর গেটগুলির একটিতে পৌঁছল। এখান থেকে হাওড়ার ব্রিজ দেখা যায়। ওই ব্রিজটা পার হলে কলকাতা। কলকাতার একটি গলিতে তাদের বাড়ি। সেই বাড়ির একতলায় একটা ঘরে মা, দাদা, ভাই বোনের সঙ্গে সে থাকে। শীতের দিনে শীত আর গ্রীষ্মের দিনে গরম তাদের ঘরে থেবড়ে বসে থাকে। যত দক্ষিণের হাওয়া সব ছাদের উপর দিয়ে চলে যায়। হাওয়া যায়, মেঘ যায়, রোদ যায়, আর বিকেল যায়। গা-ধুয়ে আর বিকেলে ছাদে ওঠা হবে না।

নাক কুঁচকে গন্ধ শুঁকল। কেমন যেন একটা গন্ধ। বাবাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় দাদা একশিশি এনেছিল, অনেকটা সেই রকম। খালি শিশিটা ছোটবোন রেখে দিয়েছিল। কোথায় গেল ছোটবোন ?

'দিল্লী দেখো, আগ্রা দেখো' বলত আর হাতল ঘোরাত। কুতবমিনার, তাজমহলের ছবি, একে একে ঘুরে চলে যেত। লোকটা একঘেয়ে সুরে চেঁচাত আর হাতলটা একটু আস্তে ঘোরাতে বললে সর্দিটানার মত মুখ করে হাসত। স্টেশনের থামে লটকানো ছবিগুলো দেখতে দেখতে ছোটবোনের সেই লোকটাকে মনে পড়ল। একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, দিল্লী-আগ্রা সে কখনো দেখেছে কিনা। লোকটা কথার জবাব না দিয়ে, বাক্সের ফোকরে চোখ লাগানো উটকো মাথাগুলোকে, হাত দিয়ে মাছির মত তাড়াতে লেগে যায়। সেই লোকটাকে ছোটবোনের এখন মনে পড়ল। অনেকদিন পরে পাড়ায় এক নতুন বাইসকোপওলা এল। সেই লোকটা কেন আসে না, এই কথা ছোটবোন অনেক দিন অনেক রাত ভেবেছে। ভাবলেই কুতুবমিনার, তাজমহল, হাওয়াই জাহাজ আর জটায়ুর যুদ্ধ চোখের সামনে দিয়ে সারি বেঁধে চলে যায়। বিজ্ঞাপনের ছবি দেখতে দেখতে সে একেবারে গা ঘেঁষে এসেছিল বউটির। নজর পড়তে বুঝল তার দিকেই তাকিয়ে। ছবিতে ইংরেজি অক্ষর লেখা। বিড়বিড় করে সে অক্ষর পড়ে। আড়চোখে বউটির দিকে তাকায়। ওর কাপড় থেকেই মিষ্টি

গন্ধটা আসছে। আস্তে আস্তে লম্বা শ্বাস টানল ছোটবোন। চকোলেট মোড়া কাগজে এমন গন্ধ থাকে।

"মোটেই অত সুন্দর নয়।"

ছোটবোন ঘাড় ফেরাল। বউটি ছবির দিকে তাকিয়ে।

"গেল পুজোয় আমরা গেছলুম। বাব্বাঃ যাতায়াতের কি কষ্ট আর হোটেলের কি চড়া রেট।"

ছোটবোনের ইচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে মিষ্টি গন্ধটা চুষে নিয়ে জমা করে রাখে বুকের মধ্যে। বলল, "সুন্দর নয় বললেন যে, ওখানে কি এমন—"

"মোটেই না। ওসব বন-বাদাড়ের ছবি, সেখানে যায় কে। তার চেয়ে বরং ওই ছবিটা, কোনারকের ছবিটা, ওখানে সত্যি দেখবার জিনিস আছে।"

"আপনি গেছেন?"

"আমার নন্দাই গেছল।"

"এখন কোথায় যাচ্ছেন?"

"রানীগঞ্জ।"

"কার কাছে যাচ্ছেন?"

এবার বউটি হাসল। ছবিতে মেয়েরা যেমন সুন্দর করে হাসে। তারপর কি একটা বলতে গিয়ে, না বলে আবার হাসল। তাই দেখে ছোটবোনও হাসল।

"সামনের বছর উনি ছুটি পেলে, কাশ্মীর বেড়াতে যাব আমরা।"

"দিদি ট্রেন সাত নম্বর থেকে ছাড়বে. তাড়াতাড়ি।"

ছুটতে ছুটতে এসে হাফপ্যান্ট-পরা ছেলেটি সুটকেশটা তুলে নিল। বেতের ঝুড়িটা হাতে ঝুলিয়ে বউটি বলল, "আচ্ছা চলি।"

ওরা চলে যাচ্ছে। ছোটবোন গুটিগুটি এগিয়ে, কোলাপসিবল রেলিংয়ে হাত রেখে সাতনম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে রইল।

এত শব্দ তবু কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। থামের গা ঘেঁষে লোহার মত সে দাঁড়িয়ে। মাথায় লাল টুপি, খাকি পোশাকের লোকটা এদিক-ওদিক তাকিয়ে তার দিকেই আসছে। বড়বোন এখন কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। লোকটা চলে গেল পাশ দিয়ে। যাবার সময় একবার তাকিয়েছিল। বড়বোন ভাবল, বিশ্রামঘরে গিয়ে অপেক্ষা করাই ভাল। হয়তো ছোটবোন এখন সেখানে বসে আছে।

বেঞ্চ ভর্তি। বড়বোন দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। সেই মহিলাটি কোথা থেকে ঘুরে এলেন। বসার জায়গা না পেয়ে তার কাছে এসে বলল, "নাঃ এখনো আসেনি।"

"আসছেন কে?"

নেহাত একটা কথা বলতে হয় তাই জিজ্ঞাসা করা, করে তাকিয়ে থাকল। আর থাকতে থাকতে সে দেখল, অতবড় চোখদুটো, যা দুটো মুখের আয়তনে মানায়, কেমন মানানসই হয়ে উঠল ; থুতনির নিচে বয়সের ভাঁজ কাঁপল।

"কে আবার, কেউ না।"

অন্যসুরে হুবহু সেই কথা। জ্বালা করে উঠল মাথার মধ্যেটা। ন'মাসিমা দুটো টাকা দিয়ে বলেছিল, 'অত ঘন ঘন এলে আমিই বা পারি কি করে।' ঘরে তখন পাশের বাড়ির কে যেন ছিল। ফিরে আসার সময় বড়বোন ন'মাসিমাকে বলতে শুনেছিল, 'কে আবার, কেউ না।'

"তিরিশ টাকা বেশি পাবে বলে দেড়শো মাইল দূরে ছুটল চাকরি করতে। কি যে দরকার ছিল বুঝিনা। স্কুল থেকে আমি যা পাই আর ও যদি কিছু একটা জুটিয়ে নিত, তাহলে সাতটা লোকের সংসার খুব চলে যেত।"

বড়বোন মাথা নাড়ল।

"আমার কথা তো কখনো শোনেনা। আজ আট বচ্ছর দেখে আসছি। অথচ আমার টাকা বিয়ের আগে ছোঁবে না।"

"উনি কোথায় চাকরি করেন ?"

"ডি. ভি. সি-তে।"

"আমার দাদা ওখানে চেষ্টা করেছিল, পায়নি।"

"সেকি, ও-ই তো কত লোককে চেষ্টা করে চাকরি করিয়ে দিয়েছে, আচ্ছা আমি জিজ্ঞেস করব। আছেন তো এখানে না ট্রেনের সময় হয়ে গেছে ?"

"না না আমার ট্রেনের সময় হয় নি, আমি থাকব।"

বড়বোন এখন আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না, শুধু তার বুকের মধ্যের কথাটা ছাড়া,—আমি থাকব। আমি যাব না।

"আমি আর একবার বরং দেখে আসি।"

মহিলাটি চলে যাচ্ছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সে। মহিলাটি অত মানুষের মধ্যে আড়াল হয়ে গেছে। বড়বোন পিছিয়ে এল। স্টেশনের ফটকে এসে দাঁড়াল। বিকেল শেষ হয়ে আসছে। স্ট্যান্ডে বাসের মধ্যে অফিস-ফেরত মানুষরা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। মরচেধরা কৌটোর মত তাদের মুখ। রোদ্দুরের আঁচ লেগেছে হাওড়া ব্রিজে। স্টীমার গম্ভীর ভোঁ বাজাল। পিঠ-কুঁজো ঠেলাওলা দুলতে দুলতে ব্রিজের চড়াইয়ে উঠছে। বাস থেকে নেমে ড্রাইভার আস্তে আস্তে আকাশে বিড়ির ধোঁয়া ছুঁড়তে লাগল। বিকেল শেষ হয়ে আসছে। লিলুয়ায় সরকারী আশ্রম আছে মেয়েদের। পালাতে গিয়ে যারা ধরা পড়ে পুলিশ প্রথমে ওখানে নিয়ে রাখে। 'বলবি আমরা এখানে থাকব, আমাদের বাড়ি নেই, কেউ নেই। পারবি বলতে ?' বলতে বলতে দাদার মুখটা এই বিকেলের মত হয়ে গেছল।

বড়বোন আবার স্টেশনের চালার নিচে ফিরে এল।

কোলাপসিবল রেলিং ধরে ছোটবোন দেখছে ট্রেনটা চলে যাচ্ছে। ট্রেনের জানলার মুখগুলো প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে হাসছে। হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছে। এমন করে তারও চলে যেতে ইচ্ছে করল। লাইনের উপর আড়াআড়ি একটা ব্রিজ। প্ল্যাটফর্মের পাশ দিয়ে রাস্তাটা উঁচু হয়ে ব্রিজে উঠেছে। থলি হাতে তিনটি মানুষ রাস্তা দিয়ে চলেছে। ওরা যেন পাহাড়ে উঠছে। তারপর সে ভাবল, বড়বোন অপেক্ষা করছে।

বিশ্রামঘরে বড়বোনকে দেখতে না পেয়ে সে চালার নিচে ফিরে এল। ওজন-যন্ত্রে এক বৃদ্ধ ওজন মাপল। তাই দেখল। বৃদ্ধ কার্ড পড়ে হন হন করে চলে গেল। তারপর বিজ্ঞাপন পড়ল। পড়তে পড়তে সে বইয়ের স্টলে পৌঁছে গেল।

"আর তিনমিনিট বাকি অথচ এখনো এসে পৌঁছল না, কি ইররেস্‌পন্সিবল্‌!"

ছোটবোন মুখ ফিরিয়ে দেখল। ছ-সাতটি ছেলেমেয়ের এক দল।

"ওর জন্য অপেক্ষা করলে, আমরাও ট্রেন মিস্‌ করব।"

"তাহলে?"

ওরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ব্যস্ত হয়ে চলে গেল। একটু পরেই, প্রায় ছুটে এল চশমা চোখে একটি মেয়ে। খুব রোগা, দেখে মনে হয় যেন ক্লাস সেভেনে পড়ে। ওকে দেখেই ছোটবোন বুঝল এর কথাই ওই দলটা বলছিল।

"ওরা এইমাত্র চলে গেল।"

"চলে গেল!"

মেয়েটি হাতের চামড়ার ব্যাগটা খুব জোরে চেপে ধরল। চশমাটা নাকের ওপর ঠিক করে চেপে বসাল। তারপর এমনভাবে তাকাল, যেন জিজ্ঞাসা করছে এবার আমি কি করব?

"একা যেতে পারবেন না?"

"পারব না কেন, তবে ওদের সঙ্গে থাকলে বাড়ি চিনতে অসুবিধে হত না।" এই বলেই মেয়েটি বলে উঠল, 'আরে!"

ছেলেটি ব্যস্ত হয়ে এল। সেই ছেলেমেয়েদের দলে ছোটবোন একেও দেখেছিল।

"আপনি কি এই আসছেন?" ছেলেটি বলল।

"হ্যাঁ, আপনি?"

"আমিও।"

"তাহলে!" ট্রেন তো ছেড়ে দিয়েছে। ইসস্, একটা মিছিলে ট্রামটা আটকে গিয়ে এই কাণ্ড হল।"

"এই প্রসেশন করে যে বন্ধ হবে। যাকগে, এখন কি করবেন? যাওয়া তো হলনা।"

"বাড়িতে বলে এসেছি ফিরতে রাত দশটা এগারোটা হতে পারে বিয়ে বাড়ির ব্যবস্থা তো। এখন ফিরে গেলে বাড়িতে হাসাহাসি করবে।"

"চলুন ট্রেনে চেপে ব্যাণ্ডেল থেকে ঘুরে আসি।"

"কিন্তু আগে একটু কিছু খেয়ে নেবে।"

ওরা দুজনে চলে গেল। সেই সময় অতবড় স্টেশনের সব আলোগুলো জ্বলে উঠল। একটা ট্রেন এসেছে। পিলপিল করে স্টেশনে মানুষ ঢুকছে। এত মানুষ দেখতে ছোটবোনের ভাল লাগল না। আবার সে বিশ্রামঘরে ফিরে এল।

• •

ছোটভাইকে মা চড় মেরে বলেছিল, 'মুখপোড়া আর একটু আগে যেতে পারিস নি?' কাদের বাড়ি বৌভাতে বিনা নিমন্ত্রণে খেতে গিয়ে মার খেয়ে এসেছে। দিদিদের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে হাউ হাউ করে উঠেছিল। তখন এমনি ভাবে ছোটভাইয়ের মুখটা চ্যাপ্টা দেখাচ্ছিল।

ছবিগুলোর আর একটু কাছে বড়বোন এগিয়ে এল। যারা রেলে কাটা পড়েছে তাদের ছবি। কাচের উপর তার নিজের মুখের ছায়া পড়েছে। নিজের মুখ দেখার জন্য একটু পিছিয়ে কোনাচে হয়ে তাকাতেই তার মনে হল, কি বিশ্রী, কি ভয়ঙ্কর। দাদা চীৎকার করে একদিন বলেছিল, 'আমি কি করব, কি করব। চেষ্টা তো করছি।' বড়বোন সারা কাচ জুড়ে দাদার মুখ দেখল। ওর মন মমতায় দুঃখে টলমলিয়ে উঠল। রেলে কাটা-পড়াদের জন্য দুঃখ পেল।

সেই মহিলাটিকে দেখতে পেল বড়বোন। পুরুষটির হাতে সুটকেশ বেডিং। ওরা কথা বলছে না। বড়বোন ছুটে গিয়ে মহিলাটির হাত ধরল।

"উনিই কি?"

মহিলা ঘাড় নাড়ল।

"ওর ঠিকানাটা দিন, দাদাকে পাঠাব।"

এই কথা বলে বড়বোন তাকিয়ে থাকল আর থাকতে থাকতে দেখল, দুটো মুখের আয়তনে মানায় এমন একজোড়া চোখ, ঝুলেপড়া চিবুক, আর উনুন ভাঙা মাটির মত ঠোঁট।

"ওখানে ছাঁটাই নোটিশ দেওয়া হয়েছে।"

মহিলাটির চলে যাওয়া দেখল বড়বোন। কাঁধে কেউ যেন বেডিং-সুটকেশ চাপিয়ে দিয়েছে। দেখতে দেখতে বড়বোনের ঝিমুনি এল। চোখের পাতা

ভার-ভার বোধ হল। কোন রকমে চারধারে চোখ ফেলে সে ভাবল, ছোটবোন বোধহয় অপেক্ষা করছে।

বিশ্রামঘরে ফিরে এসে বড়বোন দেখতে পেল, ছোটবোনকে।

ওরা দু-জন পাশাপাশি চুপ করে বসে রইল। একসময় বড়বোন বলল, "এখানে বসে কি লাভ, চল ওদিকে যাই।"

ওরা আস্তে হেঁটে স্টেশনের আরেক প্রান্তে এল। ছোটবোন বলল, "এবার আমরা কি করব?"

বড়বোন দাঁড়িয়ে ভাবল। ভেবে বলল, "এখানে একটু দাঁড়াই।"

রেস্টুরেণ্টের দরজা ঠেলে একজোড়া ছেলেমেয়ে বেরোল। ছোটবোন দেখে ভাবল, ওরা এবার বেড়াতে যাবে।

থুথু ফেলল, কাশল। পিঠ কুঁজো করে সে ওয়াক তুলল। বড়বোন পিঠে হাত রাখল। বুকের কাছে টেনে আনল।

বলল, "কিছু বলছিস?"

"না।"

"তোর খিদে পেয়েছে?"

"না।"

আবার রেস্টুরেণ্টের দরজা খুলল। শব্দটা শুনল, শুনে ঝিমোতে শুরু করল। ট্রেনের ভেঁপু বাজল। ছোটবোন বলল, "শাঁখের মত শব্দ, না?"

"হ্যাঁ।"

"দিদি মনে আছে তোর, বাবার সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে একটা ইঞ্জিনে উঠেছিলুম!"

"হ্যাঁ!"

"ড্রাইভারের একটা দাঁত সোনার ছিল। আমায় কোলে করেছিল।"

"সে যখন ইঞ্জিনের সিটি বাজাচ্ছিল, তুই ভয়ে ওর বুকে মুখ লুকিয়েছিলি।"

ছোটবোন হাসল।

বড়বোন বলল, "ওই দ্যাখ।"

বিয়ে করে বউকে নিয়ে বর বাড়ি চলেছে। নতুন ট্রাঙ্ক, নতুন শয্যা, নতুন গহনা, নতুন কাপড়। জড়োসড়ো হয়ে বউটি হাঁটছে। বর সিগারেটে ফুক ফুক করে টান দিচ্ছে।

"দিদি চুল দেখছিস, সামনেটা পাতলা।"

"হ্যাঁ।"

"বরটার কিন্তু অনেক বয়েস।"

"হ্যাঁ।"

"দাদার সেই বন্ধু আর এল-না কেন রে ?"

"কি জানি।"

"খুব সুন্দর করে কথা বলত।"

বড়বোন আর জবাব দিল না।

"একদিন চকলেট এনে দিয়েছিল, মনে আছে ?" জবাব না পেয়েও ছোটবোন থামল না, "মা বলেছিল তোকে বোধহয় পছন্দ হয়েছে।"

"চুপ কর এখন।"

ছোটবোনের চোখ ছলছল করে উঠল। কাশির ধমক চাপতে সে কুঁজো হল। মৃদু স্বরে বলল, "জল খাব।"

"খেয়ে আয়।"

ছোটবোন গেল না। বড়বোনের যেন ঝিমুনি লেগেছে। একদৃষ্টে সামনের দিকে তাকিয়ে। তাই লক্ষ্য করে ছোটবোন বলল, "এবার আমরা কি করব ?"

"জানি না।"

"দাদা কি বলে দিয়েছিল ?"

বড়বোন ভাবতে চেষ্টা করল।

"ওরা কি এবার আসবে ?"

"কেন ?"

"তাহলে আমরা এসেছি কি জন্য ?"

বড়বোন চোখ মেলে চারধারে তাকাল। মানুষ, আলো, শব্দ দেখেশুনে, আবার একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। তারপর ঝিমানো সুরে বলল, "আমরা অপেক্ষা করব। ওরা আসবে, জিজ্ঞেস করবে সঙ্গে কে আছে, কোথায় যাবে, কেন যাবে। আমরা বলব, আমরা দুবোন বেরিয়েছি বোম্বাই যাব, সঙ্গে কেউ নেই, ওখানে সিনেমায় নামব। তখন ওরা আমাদের ধরে নিয়ে যাবে। ঠিকানা জিজ্ঞাসা করবে। আমরা বলব না। তখন ওরা আশ্রমে পাঠিয়ে দেবে।"

"সেখানে কি করবে ?"

"জানি না।"

"দিদি চল পালিয়ে যাই।"

একটু একটু করে বড়বোনের ঝিমোন ভাবটা কেটে গেল। ঠাণ্ডা স্বরে বলল, "কোথায় পালাব ?"

"যেখানে হোক।"

"তারপর ?"

ছোটবোন শুধু তাকিয়েই রইল। বড়বোন হাত বাড়িয়ে ওকে বুকের কাছে টেনে আনল। মুখ নামিয়ে বলল, "ভয় পেয়েছিস?"

ছোটবোন বুকে মুখ গুঁজে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। ওর পিঠে হাত রেখে বড়বোন নিজেকে সিধে করে রাখল।

তখন একজন ভাবল, মানুষের মুখ মরচেধরা টিনের কৌটোর মতো।

আর একজন দেখল, হাসতে হাসতে ট্রেনের মুখ চলে যাচ্ছে।

শহরে আসা

দুলালের তিনকুলে কেউ না থাকায় এতদিন বিয়ে হয়নি। দর্জির দোকানে সেলাইয়ের কাজ করে পায় মাসে আশিটি টাকা। বায়ান্ন-তিপ্পান্ন বয়সে পাড়ার লোকেরাই উদ্যোগ করে কাছাকাছি এক গ্রামের একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিল। গিরিবালার বয়স সতেরো। তারও তিনকুলে কেউ নেই। ওকে যত্নে রাখতে দুলাল আপ্রাণ করে।

কথায় কথায় দুলাল একবার বলেছিল, তোমাকে কলকাতা দেখাব। একদিন সে পাঁচটা টাকা উপরি পেয়ে যেতে একবেলার ছুটি নিয়ে বেরল গিরিকে কলকাতা দেখাতে। পরনে ধোপা-বাড়ির কাচানো ধুতি-শার্ট, দাড়ি কামিয়ে জুতোয় কালি দিয়েছে। চুলে পাতা কেটে টাকের কিছুটা ঢেকেছে, দুপুরে সন্না দিয়ে গোটা কয়েক পাকা গোঁপও তুলেছে। মোক্তার গিন্নি পুরনো সিল্কের শাড়ি দিয়েছিল বিয়েতে, গিরি সেইটা আর দুলালের কিনে দেওয়া জরি লাগানো সবুজ চটি আর প্লাস্টিকের চুড়ি পরেছে। টেনে চুল বেঁধে মস্ত খোঁপা করে লাল রিবন দিয়েছে, পায়ে আলতা। গিরিবালা বেরোবার আগে অনেকক্ষণ মুখে সাবান ঘষেছে।

জুতো পরে হাঁটতে দুলালের কষ্ট হচ্ছে। পাড়ার ছেলেদের মুচকি হাসিতে সে লজ্জা পেল। তারভয় করল গিরিবালা কলকাতায় না হারিয়ে যায়। হেলথ সেণ্টারের নার্স মেয়েটি কোয়ার্টারের জানলায় দাঁড়িয়েছিল, গিরিকে ডেকে ভুরুতে লাগা পাউডার, মুছিয়ে, টিপ পরিয়ে, গাল টিপে দিয়ে বলল, "বউ খুব সুন্দর।" নার্স কলকাতার মেয়ে। এর পর বুক চিতিয়ে জুতোর খটখট শব্দ করে দুলাল গিরিবালার আগে আগে হাঁটতে লাগল।

ট্রেনে ভিড় নেই। কিন্তু জানলার ধারের জায়গাগুলো ভর্তি। গিরি জানলার ধারে বসতে পেয়ে খুশী হবে এই ভেবে দুলাল একজনকে বলল, "এনার শরীরটা খারাপ, যদি এ ধারটায় বসেন বড় উপগার হয়।"

লোকটি কাগজ পড়ছিল। গিরিকে এক পলক দেখে জায়গা ছেড়ে দিল। গিরির চোখের ভাষা পড়ে দুলালের মনে হল যেন বলছে, বাব্বাঃ কি চালাক তুমি! দুলাল ঠিক করল আজ সে বিড়ি খাবে না।

হাওড়া স্টেশনে নেমেই শক্ত মুঠোয় সে গিরির হাত চেপে ধরল। বড়

খারাপ জায়গা। গিরিকে প্রায় টানতে টানতে স্টেশনের বাইরে এল। হাওড়া ব্রীজ দেখেই গিরির চোখ আর সরে না। অস্ফুটে মুখে শব্দ করল, ইস্‌স। বিদেশীকে নিজের সাম্রাজ্য দেখাবার ভঙ্গিতে দুলাল আঙুল দিয়ে গঙ্গার ওপারে উঁচু একটা বাড়ি দেখিয়ে বলল, "ওটা বিশতলা। আমি একবার উপরতলায় উঠেছিলুম।"

দুলাল মিথ্যা বলল। সে ও বাড়িটার ধারে কাছেও যায়নি। কিন্তু উঁচু উঁচু জিনিস দেখে গিরির চোখে মুখে যে ভাব ফুটেছে, তাতে তার নিজেরও বড় হতে খুব সাধ হচ্ছে। কোন দিকে যে তাকাবে গিরি তা স্থির করতে না পেরে এধার ওধার দেখছিল। এখন সে দুলালের মুখের দিকেই তাকাল। তাতে দুলালের নিজেকে কয়েক গুণ উঁচু বলে বোধ হল। ভারিক্কী চালে সে বলল, "এই সব বাসগুলো দোতলা। আমরা উপর তলাতেই বসব। ফেরার সময় তখন আঁধার নেমে যাবে, পোলে আলো জ্বলবে, আমরা হেঁটে আসব পোলটার উপর দিয়ে। দেখবে কেমন অদ্ভুত লাগবে।"

ঘাটে নেমে গিরি গঙ্গাজল মাথায় স্পর্শ করে জোড় হাতে প্রণাম করল। দেখাদেখি দুলালও করল। গিরি বলল, "একটা ঘটি আনলে হোত।"

একথা শুনে দুলালের খুব মজা লাগল। বলল, "তুমি কি ঘটি হাতে কলকাতা ঘুরে বেড়াতে? আমি একদিন এসে একঘড়া গঙ্গাজল নিয়ে যাবখন।"

ওরা বাসের দোতলায় উঠে বসল। ব্রীজের উপর দিয়ে যাবার সময় বাতাসে গিরির ঘোমটা খসে যাচ্ছিল, হাত দিয়ে চেপে ধরে সে বাইরে তাকিয়ে হাসতে লাগল। দুলাল তাকে এটা-সেটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে শুরু করল। বাস অফিসপাড়া ডালহৌসিতে পৌঁছনমাত্রই ভীষণ ভিড় হয়ে গেল। ধর্মতলায় নামবার সময় দুলাল ফাঁপরে পড়ল। গিরিকে পিছনে রেখে নামতে তার ভরসা হল না, পাজি কেউ এই সুযোগে গায়ে হাত দেয় যদি! এগোবার জন্য দুলাল ঠেলা দিল। গিরি কোথাও কোন পথ না দেখে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে। পিছনের লোকেরা তাড়া দিচ্ছে। বিরক্ত হয়ে নানাকথা বলতে শুরু করেছে। কয়েকজন বেঁকেচুরে বেরোবার একটু জায়গা করে দিল। লজ্জায় প্রায় চোখ বন্ধ করে গিরি ঠেলে-ঠুলে সিঁড়ি দিয়ে নামল। নিচে আরও ঠাসাঠাসি। গিরি কোন দৃকপাত না করে সামনের লোকেদের ধাক্কা দিয়ে, একেবারে রাস্তায় নেমে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাসটা ছেড়ে দিল।

খিলের মত দুটো হাত দুলালের সামনে হঠাৎ পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। বাস ছেড়ে দিতেই সে "গিরি, গিরি" বলে চেঁচিয়ে উঠে, সামনের লোককে ঠেলে নামতে যাচ্ছে তখন একজন ওর কলার ধরে আটকে বলল, "অ্যাকসিডেণ্ট হবে

যে মশায়।” বাস জোরে চলতে শুরু করেছে। দুলাল শুধু, “ও যে একা রয়ে গেল।” বলে ঠকঠক করে কেঁপে উঠল।

বাসটা পরের স্টপে থামতেই দুলালকে ওরা ঠেলে নামিয়ে দিল। সে ছুটতে শুরু করল। কিছুটা গিয়ে থমকে দাঁড়াল। গিজগিজে ভিড়। কোথায় যে গিরি নেমেছে বুঝতে পারছে না। হাঁটতে হাঁটতে দূর থেকে দেখল গিরি এই দিকেই মুখ করে মুখে আঁচল চেপে দাঁড়িয়ে। দুলাল কাছে এসে দাঁড়াতেই সে প্রাণপণে ফোঁপানি চেপে শুধু তাকিয়ে রইল। দুলাল হাসবার চেষ্টা করে বলল, “ভয় কি। এখানে হারিয়ে যাওয়া সোজা ব্যাপার নাকি?”

হাঁটতে গিয়ে গিরি বলল, তার এক পাটি চটি বাসেই রয়ে গেছে। ফাঁপরে পড়ল দুলাল। শেষে ভাবল, আর এক পাটি কিনে নিলেই তো হবে। চটিটা যত্নে পকেটে রাখার সময় মনে হল গিরির পা কি ছোট্ট!

ওরা এ রাস্তা সে রাস্তা দিয়ে অনেক ঘুরল। গিরি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কোথাও একটু জিরোন দরকার। দুলালের মনে পড়ল, আর একটু এগিয়ে বাঁদিকের ট্রাম রাস্তার রাইমোহনদার চায়ের দোকান, সেখানে বসে জিরোন যায়। কিন্তু বছর পাঁচেক আগে রাইদার কাছ থেকে দুটো টাকা ধার নিয়ে সে আর এমুখো হয়নি। সেকথা যদি ওর মনে থাকে তা হলে বড় লজ্জায় পড়তে হবে। পকেটে করকরে পাঁচটাকার একটা নোট আর কিছু খুচরো রয়েছে, এখুনি শোধ করে দিতে পারে বটে, কিন্তু এই পাঁচবছর শোধ না করায় হয়তো চোর-জোচ্চোর ভেবে বসে আছে। তারপর দুলাল ভাবল, রাইদা দিলদরিয়া মানুষ, দু'টাকার কথা কি মনে করে রেখেছে। তাছাড়া গিরিকে সঙ্গে দেখলে এ কথা তুলবেই না বরং চপ-কাটলেট খাইয়ে দেবে।

“কখনো কাটলেট খেয়েছো?”

গিরিকে মাথা নাড়তে দেখে দুলাল খুশী হল। তাহলে কলকাতা আসা সার্থক হয়েছে।

“চলো, তোমাকে খাওয়াব।”

এই বলে সে গিরিকে নিয়ে কিছুটা হেঁটে একটা রেস্টুরেন্টের সামনে হাজির হল। দরজার পাশে ঘণ্টা আর মৌরীর প্লেট রাখা টেবিলটায় রাইদার জায়গায় এক ফিটফাট ছোকরা বসে। দেখে দুলাল দমে গেল। ব্যাপার কি, দোকান কি হাত-বদল হয়েছে? দুলাল জিজ্ঞাসা করবে কি না ইতস্তত করছিল, তখন দোকান থেকে তোয়ালে ঘাড়ে একটা লোক বেরিয়ে এসে বলল, “ভেতরে কেবিন খালি আছে, আসুন না।”

দুলাল তাকে বলল, “রাইদাকে দেখছি না! কোথায়?”

“বাবু তো অনেক দিন থেকেই আর বসেনা, ওনার ছেলে বসে। তবে রোজ সন্ধেবেলা একবার করে আসে।”

দুলাল বুঝল, রাইদা এখন ছেলেকে ব্যবসা শেখাচ্ছে। তবে ঘাগু লোক তো, ঠিক একবার করে এসে খোঁজ নিয়ে যায়।

ফিটফাট ছোকরাটির কাছে একগাল হেসে দুলাল দাঁড়াল। "তুমি রাইদার ছেলে? তা ভাল। এতটুকু তোমায় দেখেছি। আমায় চিনবেনা, আমি হলুম দুলাল মান্না, সিঙুরে থাকি। সেই যুদ্ধের আগে আমি আর রাইদা একসঙ্গে শ্যালদার মেসে কাজ কত্তুম।"

ছোকরাটি ভ্রূ কুঁচকে চশমার মধ্য দিয়ে দুলাল ও গিরিবালাকে আদ্যপান্ত দেখল। বেশ বিরক্ত ভাব। এক খদ্দেরের বিল নিয়ে ভাঙানি দিয়ে শুকনো গলায় বলল, "বাবা তো আজ আসবে না।"

দুলাল বিপন্ন বোধ করল। এখন চলে যাবে কি না ভাবল। ছোকরা বিরক্তস্বরে বলল, "বাবাকে কি দরকার?"

"না, এমনি। প্রত্যেকবার এলেই তো দেখা করে যাই। আজকের আলাপ-পরিচয় নয়তো। রাইদা আমায় ছোটভাইয়ের মত দেখে। এবার অনেক দিন পর এলুম তো।" দুলাল আরও অনেক কথা বলত, কিন্তু ছোকরাকে খাতা পেন্সিল নিয়ে হিসাব কষতে দেখে থেমে গেল। অপ্রতিভ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গুটিগুটি ফিরে এল গিরির কাছে। "রাইদা এখনো আসেনি। বরং রাস্তায় দাঁড়াই এলে ভেতরে যাব।"

ওরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। বহুক্ষণ পরে দুলালের মনে হল, ফতুয়াপরা লম্বামত যে লোকটা দোকানে ঢুকল সেই রাইদা। কয়েক পা এগিয়ে সে ঘাড় উঁচিয়ে তাকাল। ছোকরাটা গজগজ করে কি সব বলছে। দুলাল এবার চিনতে পারল। রাইদা মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। লম্বা কাঠামোটা সামনে ঝুঁকে পড়েছে, হাত-পাগুলো বাঁখারির মত শরীর থেকে ছিরকুটে বেরিয়ে। কার্ত্তিক ঠাকুরের মত চেহারার এ কি দশা! গোঁপটা পর্যন্ত নেই।

দুলালের ডাক শুনে রাইদা ফিরে দাঁড়াল। দুলাল এগিয়ে গিয়ে গলা ভারকরে, বলল, "সেই কখন থেকে তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে।"

"কেমন আছিস রে দুলে।" রাইদা হেসে দুলালের হাত ধরল।

"ভাল। কিন্তু তোমায় তো চেনাই যায় না।"

"আর কি, বয়স তো তিন কুড়ি হল। শরীর একেবারে গেছে। তুই তো দিব্যি রয়েছিস।"

লাজুক হেসে দুলাল বলল, "রাইদা আমি বে করেছি।" গিরিকে ইশারায় দেখাল।

রাইদা অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, "বড্ড কচি রে, এই বয়সে আবার কেন জড়িয়ে পড়লি। বেশ তো এতগুলো বছর কাটালি।"

দুলাল অপরাধীর মত মাথা নিচু করে বলল, "গিরিবালা বড় ভাল মেয়ে আমায় যত্ন করে খুব।" তারপর গিরিকে ডেকে বলল, "তোমার ভাসুর, পেন্নাম, করো।"

পথ চলতি লোকেরা গিরির প্রণাম করা দেখতে দেখতে গেল। রাইদা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করল। "তোদের কোথায় যে বসাই, দোকান তো আর এখন আমার নয়, ছেলের।"

"ভালই করেছ। এই বয়সে আর তোমার এসব ধকল না পোয়ানই ভাল। ছেলেকে মানুষ করেছ, এবার বিশ্রাম করো। কম পরিশ্রম তো করোনি!" দুলাল বিজ্ঞের মত মাথা দোলাল। বৌবাজারের রাস্তা ধরে যত লোক যাচ্ছে, রাইদা তাদের মাথার ওপর দিয়ে অনেক দূরে তাকিয়ে থেকে বলল, "জানিস দুলে, আঙুর মরে গেছে।"

"সেই বৈঠকখানার আঙুর?"

"কলেরায়। চেষ্টা করেছিলুম অনেক, শ' দুয়েক টাকা দেনাও হয়ে গেল। এই নিয়ে বাড়িতে অনেক অশান্তি হল। শেষে ছেলের নামে দোকান লেখাপড়া করে দিয়ে রেহাই পেলুম। তোর বৌদিকে তো আর জানিস না। এখন দুমুঠো খেতে দেয় আর শুতে দেয়। নেশাটাও ছাড়তে হয়েছে, ছেলের কাছে হাত পাততে লজ্জা করে।" রাইদা হাসবার চেষ্টা করল।

"বড় দুঃখে আছ রাইদা, তাই না।"

"ছেলের কাছে অপমান হলে বড় লাগে, তুই এসব বুঝবি না।"

"রাইদা তোমার কাছে দুটো টাকা একবার ধার নিয়েছিলুম, সেটা শোধ দিতেই এসেছি।"

রাইদার চোখে জল এসে পড়ল। ধরা গলায় বলল, "কোথায় তোদের জন্য আমি খরচ করব, তা না তোরাই আমায় দিতে এসেছিস।"

"এভাবে কুটুমের মত কথা বোলোনা।" দুলাল পকেট থেকে পাঁচ টাকার নোট বার করে ফাঁপরে পড়ল। এটা ভাঙাতে হবে। মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল।

"তুমি বরং একটু অপেক্ষা কর রাইদা, আমরা চট করে তোমার দোকান থেকে কিছু খেয়ে আসি। ওকে বলেছি কাটলেট খাওয়াব।"

গিরিকে নিয়ে দুলাল দোকানে ঢুকল। ভ্রূ কুঁচকে ছেলেটা এমনভাবে তাকাল যে, দুলালের হাড়পিত্তি জ্বলে গেল।

"বসার জায়গা আছে?"

গিরি পর্যন্ত চমকে উঠল দুলালের গলার আওয়াজে।

"কি দরকার?"

"খাবো।"

ছেলেটা ঘণ্টা বাজালো।

কেবিনে বসেই দুলাল বলল, "কাটলেট দাও, বাসিটাসি না হয়।"

একটা আধ-ন্যাংটো মেয়ের ছবি দেয়ালে। গিরি মাথা হেঁট করে বসে। দুলাল ফিসফিস করে বলল, "রাইদার ছেলের কথা শুনলে। আমাদের যেন মানুষ বলেই গ্রাহ্যি করল না। ঠিক আছে, চার আনা বখশিশ করে যাব।"

একটা বিড়াল টেবলের নিচে ঘুরঘুর করে পায়ে ল্যাজ বুলোচ্ছে দুলাল তাকে লাথি কষাল। ওর রগের শিরাটা ফুলে উঠেছে। গোগ্রাসে কাটলেট শেষ করে সে বলল, "এবার চপ খাওয়া যাক। বুড়ো বয়সে বাপ আরামে থাকবে, ছেলে তার সেবা করবে। তা নয় বাপ এসে হাত পাতছে আর ধমক খাচ্ছে। ভাবে সবাই বুঝি ওর বাপের মত হাত পাততে আসে।"

চপ আসতে দেরি হচ্ছে। দুলাল বিকট চীৎকার করল, "কই হে দেরি হচ্ছে কেন।"

"আঃ চেঁচাচ্ছ কেন।" পর্দা সরিয়ে ছেলেটা ভ্রূ কুঁচকে বলল, "ভেজে দেবে. দেরি হবে না?"

"দেরি করার আমার সময় নেই। অন্য কি তৈরি আছে?"

"তা হলে মটন কারি খান।"

"তাই দেখি, জলদি।"

চলে যাওয়া মাত্র দুলাল ফিসফিস করে বলল, "কি কষ্ট করে এ দোকান গড়ে তুলেছে, তা আমি জানি। আর তাকেই আজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। বখশিশ আটআনা দোব। দেখিয়ে দোব বাজে লোকদের সঙ্গে রাইদার পরিচয় নয়।"

খাওয়া শেষ করে দুলাল বলল, "কত হয়েছে?"

"চা খাবেন না?"

"না হে, অত সময় নেই।"

লোকটা বিল এনে দিল। তা দেখেই দুলালের বুকের মধ্যেটা ফাঁপা হয়ে গেল! গিরি জিভ দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে মাংসের কুচি বার করতে ব্যস্ত, যেন ভ্যাঙাচ্ছে মনে হয়। পাঁচ টাকার নোটটা সে মৌরীর প্লেটে রাখল। খুচরো আনতে লোকটা চলে গেল। দুলাল দ্রুত হিসাব শুরু করল। দুটাকা বারো আনা গেলে থাকে দুটাকা চার আনা। গাড়ি ভাড়ার জন্য ওটা লাগবে। তাহলে রাইদাকে দেবার জন্য কিছুই তো থাকে না!

লোকটা খুচরো পয়সা আর নোটগুলো প্লেটে করে দুলালের সামনে রাখল। মনে পড়ল আট আনা বখশিশ দেবে বলেছিল। তা দিলে ট্রেন ভাড়ার পয়সা থাকে না। কলকাতা থেকে সিঙ্গুর পর্যন্ত গিরিকে নিয়ে হেঁটে যেতে হবে।

নোট আর পয়সাগুলো দুলাল চটপট পকেটে পুরল। দোকান থেকে বেরোবার আগে উঁকি দিল রাস্তায়। কোথাও রাইদা নেই। উৎফুল্ল হয়ে গিরিকে নিয়ে সে পথে নামল। মিঠে পান কিনে এগিয়েছে আর তখনই রাইদার কণ্ঠস্বর শুনল। ঘুরে দেখে রাস্তার ওপার থেকে ছুটে আসছে। দুলালের ফাঁপা বুকের মধ্যে তাল তাল লোহা পুরে দেওয়া হয়েছে, সে আর নড়তে পারছে না।

রাইদার হাতে প্লাস্টিকের একটা সিঁদুর কৌটো। গিরির সামনে এগিয়ে ধরে বলল, "অদ্দুর থেকে আমার কাছে এলে, খালি হাতে আশীর্বাদ করলুম ভাবতে বড় লজ্জা হল। নাও বৌমা"

গিরি তাকাল রাইদার দিকে, যেন হাওড়া ব্রিজ বা সেই বিশতলা বাড়িটা দেখছে। রাইদা ওর হাতে কৌটোটা গুঁজে দিল। আপনা থেকেই দুলালের হাত পকেটে চলে গেল। নোট দুটো এগিয়ে দিয়ে বলল, "রাইদা এই নাও।"

দুলালের কানের কাছে মুখ এনে রাইদা বলল, "অনেক দিন পরে আজ গলাটা ভিজবে রে।" বলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে গেল।

"চলো।" দুলাল দু'পা গিয়েই থমকে দাঁড়াল, "আচ্ছা বখশিশ কি দিয়েছি?"

"দেখিনি তো।"

পকেট থেকে সব পয়সা বার করে দুলাল গুণল। আগের খুচরো মিলিয়ে মোট তিপ্পান্ন পয়সা। দুলাল ফিরে এল দোকানে।

"আচ্ছা, যে আমাদের খাবার দিল তাকে ডাকুন তো বখশিশ দেওয়া হয়নি।"

লোকটা আসতে দুলাল সব পয়সা তার হাতে তুলে দিল। সে অবাক হয়ে সেলাম জানাল। হাওড়া ব্রীজের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দুলালের মনে হল নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। রেলিং ধরে অন্ধকার গঙ্গার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। কি লাভ হল, এই কথা দুলাল ভাবল। গুম গুম শব্দ হচ্ছে ট্রাম চলার। পায়ের নিচে ব্রীজটা থরথরিয়ে কাঁপছে। দুলালের মনে হল এত বড় লোহার জিনিসটা যদি ভেঙে পড়ে তাহলে সে মরে যাবে। এখুনি মরতে তার ইচ্ছে নেই। সে বড় গরীব। আরও কয়েকটা বছর বাঁচতে তার বড় সাধ। গিরি ছাড়া তার আর কিছু নেই।

"গিরি কি করে ফিরব? পকেটে যে একটাও পয়সা নেই।"

একথা শুনে গিরিবালা যেন হাওড়া ব্রিজ বা বিশতলা বাড়ি দেখার বিস্ময় নিয়ে দুলালের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, "যখন সেলাম করল, তোমাকে দারোগাবাবুর মত লাগছিল।"

তারপর গিরিকে নিয়ে দুলাল রওনা হল।

রাস্তা

"দীপু, তোর বাবা এখনো আসছেনা যেরে। একবার গেটের কাছে গিয়ে দ্যাখনা।"

মেটারনিটি ওয়ার্ডের গাড়ি বারান্দার তলায় তখন একটাই মোটর দাঁড়িয়েছিল। দীপু তার বাম্পারে বসে দেখছিল, উত্তর-পুব কোণার লাল-বাড়িটার সিঁড়িতে দুটো ছেলেমেয়ে কথা বলছে। দুজনের হাতেই বুক দেখবার নল। মেয়েটা হেসেই কুটিকুটি। হাসি থামিয়ে সিঁড়িতে উঠছিল। আবার কি শুনে আবার কুটিকুটি। মেয়েটা আটকা পড়ে গেছে। দীপু ভাবল, ছেলেটা কি খুব হাসির গল্প জানে, নাকি এখনো খিদে পায়নি মেয়েটার!

"অ দীপু—"

"বলেছি তো, অফিস থেকে ছুটি করিয়ে তবে আসবে।"

"তোকে একলা পাঠাল কি বলে শুনি? ছেলেমেয়েগুলো বাড়িতে এতক্ষণ কি কাণ্ড করছে কে জানে।"

"শিকলি দিয়ে এসেছি।"

"তাতে কি হয়েছে, ঘরের জিনিস ভাঙবে। এত বেলা হল ওদের খিদেও তো পেয়েছে।"

মেয়েটা লালবাড়িতে ঢুকে গেল। সোজা পুবমুখো রাস্তা ধরে ছেলেটা চলে যাচ্ছে। হাতের নলটা দোলাচ্ছে। দীপু পুবদিকে তাকিয়ে রইল।

কমলা দেখছে সবুজ শাড়িপরাটিকে। গাড়িবারান্দার নিচে আরো তিনটি বৌ বসে। সবাই মাঝ-বয়সী। শুধু একে দেখেই মনে হচ্ছে প্রথম পোয়াতি। চোখে-মুখে ভয় এখনো কাটেনি। বাচ্চাটাকে পর্যন্ত ভরসা ক'রে কোলে নেয়নি। নাতি কিংবা নাতনিকে কোলে নিয়ে দোলাচ্ছে বুড়িটা।

ঘস্ করে ট্যাক্সিটা থামল। তর সইছে না ছেলেটার। নেমেই তাড়া দিল ওঠার জন্য। হাসপাতালের বুড়ো দারোয়ান ট্যাক্সির দরজা খুলে ধরেছে। বৌকে দু'হাতে ধরে তুলল। দু'পাশে তাকিয়ে বৌটা স্বামীর হাতদুটো সরিয়ে দিল।

বুড়ি ট্যাক্সিতে উঠতে পারছে না। হাতজোড়া বাচ্চা। মাথা নিচু করে ঝুঁকলে, খাড়া থাকার মত জোর আর কোমরে নেই।

"আপনি ছেলেকে ধরুন না। উনি উঠলে পর কোলে দেবেন।"

কমলার পরামর্শ শুনল ছেলেটা। দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল দারোয়ান। একটা টাকা বখশিশ পেল।

"জানলি দীপু, তোকে নিয়ে ওঠবার সময় ট্যাস্‌কির দরজায় মাথা ঠুকে গেছল। খিঁচিয়ে উঠেছিল তোর বাবা। এমন রাগ ধরেছিল তখন, মনে হয়েছিল দিই তোকে ফেলে, যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাই।"

"বাবার স্বভাবটা বড় বিচ্ছিরি।"

"তোর ঠাক্‌মা খুব বকেছিল তোর বাবাকে। হ্যাঁরে, মনে আছে ঠাক্‌মাকে? আমায় খুব ভালবাসতো।"

"তুমি ট্যাক্সি ক'রে গেছলে!"

"এর থেকে বড় ছিল ট্যাস্‌কিটা। তোর মেজমামা, সোনাপিসী সব্বাইকে ধরে গেছল।"

"নিতু, অপু, বাচ্চু ওরাও ট্যাক্সিতে গেছল?"

"শুধু নিতুটা গেছল, আর সব রিসকোয়।"

কমলা তার বাচ্চাকে কোল থেকে ছড়ানো পায়ের উপর শুইয়ে দিল। নাপিত নখ কাটছে ফর্সা বৌটার। ওর গায়ে জামা নেই, শরীরেও মাংস নেই। একলা বসে। স্বামী গাড়ি ডাকতে গেছে। নাপিতটা নতুন। মাথায় টিকি। টিকিওলা নাপিত কমলা কখনো দেখেনি। বাচ্চুর সময়ে ছিল বেঁটে গাঁট্টা-গোট্টা এক নাপিত। পোয়াতিরা খালাস হয়ে যাবার সময় এখানেই নখ কেটে যায়। সেবার ঝগড়া হয়েছিল। দু'আনার জন্য দীপুর বাপ হাতাহাতি করতে গেছল।

"হ্যাঁরে দীপু দ্যাখ্‌না ক'পয়সা নেয়।"

"কি হবে দেখে।"

"তাহলে এখানেই কেটে নোব।"

দীপু উঠে গেল। একটা রিক্সা নিয়ে এল বৌটার স্বামী। দারোয়ান গাড়িবারান্দার তলায় রিক্সাকে দাঁড়াতে দিল না। বৌকে ধরে নিয়ে গেল লোকটা। কোমর ভেঙে গেছে। ধুঁকতে ধুঁকতে হাঁটছে। হঠাৎ কাপড়টা আলগা হয়ে পড়ছিল, একহাতে বাচ্চাকে অন্যহাতে কাপড়টা ধরে সে অসহায় চোখে কমলার দিকে তাকাল।

"অ দীপু, ভাইকে একটু ধর্‌তো।"

বাচ্চাকে দীপুর কোলে দিয়ে কমলা গিয়ে বৌটাকে কাপড় পরিয়ে দিল। হাঁ-করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। কমলা ধরে নিয়ে গেল রিক্সা পর্যন্ত। উঠতে পারছে না। রিক্সাগুলো এমন গড়ানে হয় যে কমজোরি লোক উঠতে গেলেই টলে পড়ে। বাচ্চাকে চেয়ে নিল কমলা। হামাগুড়ি দিয়ে বৌটা রিক্সায় উঠল। ওর স্বামীও উঠল। কমলা বাচ্চাকে কোলে তুলে দিল।

"আসি দিদি।"

"নামবার সময় সাবধানে নেবো।"

রিক্সাটা চলে গেল। আবার একটা ট্যাক্সি এল। হাত আয়নাটা বাস্কেটে রেখে বাচ্চা কোলে বৌটা উঠে দাঁড়াল। বেশ শক্তসমর্থ গড়ন। কোন ফাঁকে বুকটাকে আঁট-সাট করে নিয়েছে। বাচ্চাকে স্বামীর কোলে দিয়ে গটগটিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল।

চলে গেল ট্যাক্সিটা। দরজা বন্ধ করে বখশিশ পেল দারোয়ান। এখন গাড়িবারান্দার তলায় বাড়ি যাবার জন্য রইল শুধু কমলা।

দীপুর কাছ থেকে ছেলেকে কোলে নিয়ে মোটরের ধার ঘেঁষে কমলা মেঝেয় বসল। দীপু বসল বাম্পারে। দারোয়ান বসেছে তার টুলে, আর নাপিত সিঁড়িতে। হাসপাতালের ভিতর থেকে টুকটুক করে একটা বেড়াল নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে এক মাঝবয়সী দাই এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে গেল।' খিলেনের কার্নিসে দু তিনটে কাক উড়ে এল। অনেক দূরে, গোলাপী বেল্টআঁটা সাদা কাপড়ের টুপি পরা পাঁচ-ছ'টি মেয়ে খাতা হাতে চলে গেল। উত্তরের ছাই রঙের বাড়িটার তিনতলার বারান্দায়, টেবিল ঘিরে তাস খেলছে ক'জনে।

"নাপিতটা কতো নিল রে?"

"আট আনা।"

"তোর বাবা ভোলাকে বলে রেখেছে তো?"

"কি জানি। ভোলাতো বারটা পর্যন্ত পাড়ায় থাকে। এখন গেলে হয়তো পাওয়া যাবে।"

"দ্যাখনা একটু, তোর বাবা আসছে কিনা।"

"দেখলেই কি বাবা তাড়াতাড়ি আসবে?"

দীপু ঝেঁঝে উঠল। বাতাসে হল্‌কা আসছে। বাচ্চাকে আঁচল দিয়ে কমলা ঢেকে দিল। উত্তর-পুবের লালবাড়িটা থেকে তরতরিয়ে দুটি মেয়ে নেমে গেল। দীপু ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে রইল। একটু গিয়েই ওরা বেঁকে গেল।

"মা তোমার কাছে পয়সা আছে?"

"বারোটা পয়সা আছে, কেন?"

"কতক্ষণ বসে থাকব?"

"উনি কখন আসেন, কে জানে।"

হেসে উঠল নাপিতটা। আর খদ্দের নেই তবু বসে গল্প করছে। দারোয়ানকে খুশি না রাখলে এখানকার পসার বন্ধ হয়ে যাবে। দীপু উঠে গিয়ে দরজার পাশে টাঙানো রুগী দেখবার নিয়ম পড়তে শুরু করল। কমলা তাকাল বাগানের দিকে। হাওয়া আসছে, তবু গলগলিয়ে ঘাম নামছে। চমকে উঠে হাত ছুঁড়ল বাচ্চাটা। স্বপ্ন দেখছে। বোধহয় গতজন্মের কথা

ভাবছে। ঠোঁট নড়ছে। হাসছে। নাকি খিদে পেয়েছে। মোটরটার দিকে পিছন ফিরে মুখে মাই গুঁজে দিল কমলা। চনমন করে মুখ সরিয়ে নিল। চোখ বুজেই আছে। বড্ড আলো, কাঁচ চোখে সইবে কেন। আঁচল দিয়ে বাচ্চাকে আবার ঢেকে দিল কমলা। আঁচলের নিচে নড়ছে। আঁচল ফাঁক করে দেখল। হাত পা কুঁকড়ে গুটিয়ে রয়েছে। কালো ঠোঁট দুটো নড়ছে। কি ছিল ও আগের জন্মে, রাজার ছেলে ?

"হ্যাঁরে দীপু ট্যাস্‌কির ভাড়া বুঝি কম ? সবাই যে গেল।"

দীপু সাড়া দিল না। ঘাড় তুলে সে নিয়ম পড়ছে।

"এখান থেকে আমাদের বাড়ি যেতে কত নেবে রে ?"

দীপু এবারও সাড়া দিল না। কমলা দীপুর থেকে চোখ সরিয়ে ফড়িংটার ওপর রাখল, ওটা এইমাত্র মোটরের টায়ারে এসে বসেছে, তারপর রাখল বাচ্চার উপর। বাচ্চাকে দুহাতে দোলাল। বড্ড হালকা। কালো বেল্টপরা নার্সটি হেসে হেসে বলেছিল, কি সুন্দর বেবী। আহা বড় ভাল মেয়েটি। বলেছিল দেখা করবে।

কমলা দূরের বারান্দায় তাকাল। একটাও মানুষ নেই। কে থাকবে এই গরমে। তাছাড়া ওর ডিউটিতো ওধারে দক্ষিণের বারান্দায়। কালকে এমন সময় দেখা হয়েছিল। কাঁদ কাঁদ মুখ করে ছুটে আসছিল। কে একজন নাকি বাড়ি যাবার সময় হাতে আট আনা পয়সা গুঁজে দিয়েছে।

"দীপু একটু নজর করিসতো, সেই কপালে কাটা দাগ আমাদের নার্সটিকে যদি দেখতে পাস। আমাকে খুব যত্ন করেছিল।"

"তাকে দেখব কি করে, সেতো ওয়ার্ডে এখন।"

"তবু যদি এদিকে এসেটেসে পড়ে। এক জায়গায় বসে তো আর কাজ কর্তে হয় না।"

দীপু আগের মত বাম্পারে বসে গাড়ির পিঠে মাথা রাখল।

"আর গোটাকতক পয়সা থাকলে বাসে চলে যেতুম।"

কমলা মুখ ফিরিয়ে নিল। পা ছড়িয়ে দিল রোদ্দুরে। সিমেণ্ট তেতে উঠেছে। উপুড় হয়ে শুয়ে থাকলে সেঁকের কাজ হয়ে যাবে। দেয়ালে ঠেশ দিয়ে সে চোখ বুজল।

"এই ওঠো, ওঠো।"

ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে দারোয়ান। যার মোটরগাড়ি সে এসে গেছে। উঠে দাঁড়াতে ভুলে গেল দীপু তার দিকে তাকিয়ে।

লেডি ডাক্তার দীপুকে নজর না করেই গাড়িতে উঠে বসল। শেল্‌ফ স্টার্টারের বোতাম টিপল। খর খর করে উঠল এঞ্জিন, স্টার্ট হল না।

গাড়ি ঘেঁষে কমলা বসেছিল। লেডি ডাক্তারের মুখটুকু শুধু দেখতে পাচ্ছিল সে। সুন্দর কপাল, সুন্দর রঙ, সুন্দর চুল।

আবার শব্দ হল স্টার্টারের। বিচ্ছিরি শব্দ। এত সুন্দর গাড়িটা যেন ক'কাচ্ছে। বারকয়েক এমন হবার পর লেডি ডাক্তার গাড়ি থেকে নামল। নিচু হয়ে গাড়ির তলা দিয়ে কমলা শুধু গোড়ালি আর সায়ার লেশ দেখতে পেল।

নাপিত আর দারোয়ান এমন মুখ করে দাঁড়িয়ে যেন গাড়ি স্টার্ট না হবার দোষটুকু তাদেরই। দীপু কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। হঠাৎ মনে হল, তার পা দুটো খুব সরু আর লোমগুলো বড্ড ঘন। থুতনিতে বড় বড় চুল মুখটাকে কুচ্ছিত করে রেখেছে। মোটরের আড়ালে সরে এসে সে গালে হাত বোলাল। আঙুলে একটা ব্রণ ঠেকল।

"গাড়িটা একটু ঠেলে দাওনা।"

বলার ভঙ্গিটা আবদেরে। স্বরটা ঠিনঠিনে। নাপিত আর দারোয়ান সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। গাড়িটা মস্ত। ওরা দুজনেই বুড়ো। জায়গাটা খাড়াই। ওদের পিঠ বেঁকে গেল, পায়ের ডিম শক্ত হল, তবু গাড়িটাকে নড়ানো গেল না।

"হ্যাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, গিয়ে ঠেল না?"

"আমি কেন ঠেলব?"

"আহা, মানুষ বিপদে পড়েছে সাহায্য করবি না! একটুখানি ঠেলে দিলেই বুঝি মান-ইজ্জত খোয়া যায়?"

দীপু গিয়ে হাত লাগাল। নড়ে উঠল গাড়িটা। মুগ্ধ কমলা তাকিয়ে রইল দীপুর কনুইয়ের কাছের গুড়ি গুড়ি পেশীর দিকে। উঁচু দিকটা কাবার হয়ে, ঢালুতে পড়েই গাড়ির গতি বাড়ল। ঝকাং করে ক্লাচ পড়ল। গরগরিয়ে উঠল এঞ্জিন। গাড়িটা কিছুটা ছুটে গিয়ে থামল। হাত নেড়ে লেডি ডাক্তার ডাকছে। দারোয়ান আর নাপিত ছুটে গেল। ওদের হাতে কি যেন দিল, বোধহয় বখশিশ।

দীপুর হাঁটুর কাছে নুনছাল উঠে গেছে। ক্লাচ দিতে থমকে যায় গাড়িটা, তখনই মাডগার্ডের ধারটা লেগেছিল।

সামনের বাগানটা চক্কর দিয়ে গাড়িটা পুবদিকে চলে গেল। কমলা তাকিয়ে রইল ওইদিকে। অল্প অল্প ধোঁয়ার গন্ধ আসছে। বেশ লাগে শুঁকতে।

"ওরা পয়সা নিল।"

"দিল বুঝি?"

"হুঁ।"

"ওরা তো নেবেই।"

"আমায় দিলে ছুঁড়ে ফেলে দিতুম।"

"তোকে দিতই না। শিক্ষিত তো, মানুষ চেনে। কাকে দিতে হয় না হয় বোঝে।"

"পয়সাটা দুজনে ভাগাভাগি করে নেবে।"

"তাতো নেবেই।"

"আমায় যদি দিতে আসে?"

"আসবে না।"

"আমি না ঠেললে গাড়ি চলত না।"

নাপিত আর দারোয়ান এতক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়েই কথা বলছিল। নাপিত চলে গেল। দারোয়ান ওদের কাছে এসে দাঁড়াল।

"আপনারা যাবেন কখন?"

"এই তো এক্ষুনি যাব।"

"দেরি করলে আরো গরম পড়বে, বাচ্চার কষ্ট হবে। কাল একশো পাঁচ ডিগ্রি হয়েছিল।"

ওরা দুজনেই মুখ ঘুরিয়ে রইল। দারোয়ান টুলে গিয়ে বসল।

"কি বলেছিল আসবে তো?"

"হ্যাঁ, ছুটি করিয়ে চলে আসবে বলেছিল, বোধহয় কাজের তাড়া পড়েছে।"

"জানি, তোকে আর বোঝাতে হবে না। যত কাজ ওর আজকেই।"

"বোধহয় ছুটি পায়নি। অফিসে খুব গোলমাল চলছে বলছিল। বারো-জনের চাকরি গেছে, সবাই ভয়ে ভয়ে রয়েছে।"

"একটা দিন ছুটি নিলে কি চাকরি যেত?"

উবু হয়ে বসল দীপু। মুখ ফিরিয়ে রয়েছে কমলা। রসালো লেবু চুষলে অমন হয় ঠোঁট দুটো। ছেলেমানুষের মত দেখতে হয়ে গেছে। দীপু বাচ্চাটার গালে আঙুল ছোঁয়াল। ওকে কনুই দিয়ে ঝট্‌কা দিল কমলা।

"মা, তোমাকে এখন বাচ্চুর মত লাগছে কিন্তু।"

উঠে পড়ল কমলা। কাপড়ের পুঁটলিটা এক হাতে নিয়ে গেটের দিকে চলতে শুরু করল। দীপু পিছু নিল।

"কোথায় যাচ্ছ?"

কথা বলল না কমলা। গেটের বাইরে এসে দাঁড়াল সে। এধার ওধার তাকিয়ে দিশা করতে পারল না কোন দিকে যেতে হবে।

"বাড়ি যাবে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"কি করে যাবে!"

"হেঁটে যাব। কোনদিকে যাব বল?"

থুতনি তুলে দীপু উত্তরদিক দেখাল। হাঁটতে শুরু করে দিল কমলা। পা ফেলছে আর আঙুলগুলো কুঁকড়ে যাচ্ছে। দীপু চটি থেকে পা বার করে ফুটপাথে রেখেই চমকে তুলে নিল।

"ওই বারান্দাটার তলায় দাঁড়াই!"

মাথা নামিয়ে চলছিল কমলা। চলতেই লাগল। ওর হাত ধরে দীপু ছায়ায় টেনে আনল।

"হেঁটে বাড়ি যাওয়া যাবে না।"

"এই তো যাচ্ছি।"

"রেগে গেছ বলে কষ্ট লাগছে না। সারা রাস্তাতো আর রাগতে রাগতে যাওয়া যায় না।"

"তবে কি করবো?"

"ফিরে যাই। হয়তো বাবা এসে পড়েছে। তাহলে ট্যাক্সিতে যাওয়া যাবে।"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কমলা। রাগ করে চলে আসাটা বোধ ঠিক হয়নি। এমন করে কি বাড়ি পোঁছন যায়। যেতে যেতেই পায়ের তলা ঝলসে যাবে। শরীরের ব্যথাও মরেনি, চলতে কষ্ট হয়। এত গরম বাচ্চাটাই বা সইবে কি করে।

ওদের দেখে দারেয়োন কাছে এল। দীপুকে লক্ষ করে জিগ্যেস করল, "গেলে না যে!"

চুপ করে রইল দীপু! এবার কমলাকে সে জিজ্ঞেস করল, "নিতে আসার কথা আছে বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

দারোয়ান চাবির তোড়া বাজাতে বাজাতে চলে গেল। কোথা থেকে কান্নার শব্দ আসছে। শব্দটা এগিয়ে আসছে। এসে পড়ল। দুই বুড়ি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। রাস্তা থেকে লরীর টায়ার ফাটার শব্দ এল। কাক ডাকছে।

"ব্যাটা দরদ দেখিয়ে গেল।"

"কে?"

"আমি না থাকলে ওর বখশিশ জুটত না।"

"লোক ডেকে গাড়ি ঠেলত।"

"তাদের তো পয়সা দিতে হত।"

হলকা আসছে। বাচ্চাটা আরও ছোট হয়ে গেছে যেন। বুকের আরো কাছে কমলা জড়িয়ে ধরল। দীপুর কানের পিছন দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। আঁচল তুলে মুছিয়ে দিতে গেল, মাথা সরিয়ে নিল দীপু। জামার হাতায় মুছে নিল।

"একটা রিক্সা করে চলে যাই চলো।"

"পয়সা?"

"তুমিতো জমিয়ে রাখ।"

"কে বললো?"

"সেদিন দুপুরে যে বাসনওয়ালাকে ডাকলে।"

"সে তো ওমনি ওমনি ডেকেছিলুম, কিনেছি নাকি?"

"তাহলে দোতলার বৌদির কাছে ধার নিলেই হবে।"

"ধার করতে হবে না।"

"তা বলে সারাদিন এখানে বসে থাকব নাকি?"

"তুই অত রেগে উঠছিস কেন? অধৈর্য হোস কেন? দ্যাখনা উনি হয়তো এসে পড়বেন।"

"আমার খিদে পেয়েছে।"

দীপু দ্রুত এসে ফুটপাথে দাঁড়াল। কমলা আসতেই চটিটা খুলে এগিয়ে দিল।

"কি হবে?"

"পরো, নইলে চলবে কি করে?"

"তুই?"

ততক্ষণে দীপুর পায়ের চেটো জ্বলতে শুরু করেছে। ছুটে সে গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল। রাস্তার গাছ। লিকলিকে তার ছায়া।

"দাঁড়িয়ে কেন, হাঁটতে আরম্ভ করো।"

অবাক হয়ে কমলা ওর কাণ্ড দেখছিল। চটি পরা অভ্যাস নেই। আঙুল দিয়ে ফিতেটাকে আঁকড়ে থপথপিয়ে একটু হেঁটেই থেমে গেল। দীপু পায়ে পা ঘষছে। হেসে ফেলল কমলা।

"ধ্যেৎ, আমি কি এমনভাবে চলতে পারি?"

"নইলে দেরি হয়ে যাবে। অপু, নিতুদের এখনও খাওয়া হয়নি।"

গাছেব ছায়ায় কমলা এসে পৌঁছতেই দীপু আবার ছুট লাগাল অনেক দূরে একটা হাইড্রেণ্ট লক্ষ করে। দুটো লোক স্নান করছে। জলে পা ভিজিয়ে দীপু দাঁড়াল। কমলা অনেক দূরে। ছেলে কোলে, পুঁটলী হাতে থপথপিয়ে আসছে। দুহাতে জল নিয়ে দীপু মাথায় থাপড়াল।

"অ দীপু, অমন করে তুই কত ছুটবি?"

"দাঁড়ালে কেন, হাঁটো।"

"নিতুটাকে বার্লি দিয়েছিস্ তো?"

"হ্যাঁ।"

"ওরা চৌবাচ্চায় নাববে না তো?"

"না না, না, তুমি হাঁটো।"

আবার ছুটল দীপু। এবার একটা রিক্সার আড়ালে। রিক্সাওয়ালা হুড ফেলে সিটের উপর বসেছিল। কমলাকে তার দিকে তাকিয়ে আসতে দেখে নেমে দাঁড়াল। দীপুও লক্ষ করছে, কমলা রিক্সাটার দিকে কেমন কেমন করে তাকাচ্ছে।

"মা রিক্সায় ওঠো।"

"ধার করলে তোর বাবা রাগ করবে।"

"জানবে কি করে?"

"তাহলে কার কাছ থেকে নিয়ে ধার শুধবি।"

"তবে বাবা এলনা কেন? কেন আমায় পয়সা না দিয়ে পাঠাল?"

চীৎকার করল দীপু। চোখে জল এসে গেছে। ঠোঁট কাঁপছে।

"অ দীপু, তুই চুপ কর।"

"কেন করব? তোমার জন্যই তো এই কষ্ট। দারোয়ানটার কাছ থেকে ঠিক ভাগ আদায় করে নিতুম।"

"দীপু, তুই রিস্কায় ওঠ্, আমি ধার শোধ করে দেব।"

দীপু রিক্সার ছায়া থেকে বেরিয়ে নর্দমায় পা রেখে দাঁড়াল।

"লক্ষ্মীছেলে আমার।"

"না।"

"রিস্কায় ওঠ্।"

"না।"

দীপু চোখ সরিয়ে নিল। কমলার চোখের থেকে দূরের রাস্তা অনেক ঠাণ্ডা। রিক্সাওয়ালা সিটে উঠে বসল। ঘাম গড়াচ্ছে কমলায় গাল বেয়ে। ভুরু ভিজে গেছে। চোখ জ্বলছে। ঘাড়ে চোখ ঘষল। চোখ দুটো গর্তে বসে গেছে। শুকনো বাতাসে চুল উড়ে পড়ল কপালে। ঠোঁট চাটল কমলা। গলার নলিটা তুলতুল করে কাঁপছে।

"এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে, চল ওখানটায় বসি।"

মনোহারি দোকানটার সিঁড়িতে ছায়া। দীপু সিঁড়িতে বসল। কমলা এলনা। উঠে এসে দীপু ওর হাত ধরে টানল।

"আমি যাবনা।"

মাকে দু'হাতে জড়িয়ে দীপু টেনে আনল। দোকানি খবরের কাগজ পড়ছিল। ওদের দেখে নিয়ে আবার পড়তে শুরু করল।

"মা তোমার খিদে পেয়েছে।"

"না"

"না কেন, এত বেলা হয়েছে!"

"বেলায় খাওয়া আমার অব্যেস।"

ঘাড় ফিরিয়ে কমলা দোকানের ভিতর তাকাল। সারি সারি বোয়েমে বিস্কুট আর টফি।

"তোর খিদে পেয়েছে?"

"না।"

"বললেই বিশ্বাস করবো! সাড়ে নটাতেই ভাত ভাত করে চীৎকার করিস না?"

"তোমারও তো পেয়েছে।"

"আমার গা গুলোচ্ছে। খেলে বমি হয়ে যাবে।"

আঁচল থেকে বারোটা পয়সা খুলে দিল। বিস্কুট কিনল দীপু। খেতে খেতে আড়চোখে দেখল কমলা তার খাওয়া দেখছে। দুর্গা প্রতিমার মত হাসিটা, মানে বোঝা যায়না। শেষ বিস্কুটটা এগিয়ে দিল দীপু।

"না, তুই খা।"

বাচ্চার বুকের ওপর বিস্কুটা রাখতেই গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কমলা ধরে ফেলল। দীপু মুখ ঘুরিয়ে সরে বসল। জিভ দিয়ে মাড়ি পরিষ্কার করে, টাকরায় শব্দ করল।

কমলা তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে একদৃষ্টে। ফুটপাথে বসন্তের ঘায়ের মত দাগ। অনেক দিনের অনেক লোকের হাঁটা চলায় জায়গায় জায়গায় দাগগুলো মিলিয়ে গেছে। দীপুর বাবার মুখের দাগগুলো এখনো মেলায়নি। তখন অনেকেই বলেছিল কচি ডাবের জলে মুখ ধুতে, ধোয়নি। এই ফুটপাথের মত হয়ে আছে ওর মুখটা। কত রোদ, বৃষ্টি, মানুষের পায়ের ধাক্কা খেয়েছে এই ফুটপাথ। মানুষটাও ক্ষ্যাপাটে হয়ে গেছে। ক্ষেপলে মুখটা বাটনা বাটা শিলের মত হয়ে যায়। একঘেয়ে, রোজকার অভ্যাস। আয় বাড়ছে না, ঘর বাড়ছে না, খাটুনিরও কামাই নেই।

"কেন যে এমন করে। এতে আমার কি দোষ, আমি কি করতে পারি, উঁ।"

ফুটপাথের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে নিজের মনেই কমলা বলল। বাচ্চার গলায় সুতোর মত ময়লা। সাবধানে তুলে ফেলে দিল। মাথায় হাত বোলাল। চুল নেই বললেই হয়। দীপুটারও ছিল না।

আস্তে আস্তে কমলার শূন্য চোখ ভরাট হয়ে উঠল। হাসল সে।

"তোর বেলায় ট্যাস্‌কি করে এসেছিলুম।"

"সে কথা তো বললে।"

"বলেছি নাকি! তুই এর থেকেই বড়সড় হয়েছিলি, বলেছি? হয়েই কি কান্না। এটা কিন্তু একদম কাঁদেনি।"

বাচ্চার ঠোঁট নড়ছে। বোধহয় খিদে পেয়েছে। কমলা মাই গুঁজে দিল ওর মুখে। দীপু আড়চোখে দোকানির দিকে তাকাল। এইদিকেই তাকিয়েছিল, চোখে চোখ পড়তেই কাগজটা তুলে ধরল।

"তোর ষষ্ঠী পুজোর দিন একটা ধনেখালি ডুরে পেয়েছিলুম। ঠাকুরঝির বিয়েতে খোঁচা লেগে ছিঁড়ে গেছল। পর্দা করেছিলুম।"

"আমাদের পর্দা ছিল!"

"জানলায়। ঘণ্টুদের বাড়িতে একটা লোক তখন ভাড়া ছিল, খালি তাকাতো।"

কমলার খেয়াল হল, চটিটা এখনো পরে আছে। খুলে ফেলল।

"থাক্ না।"

"না তুই পর। ওটা পরলে কেমন কেমন লাগে।" পায়ের পাতায় হাত বোলাল কমলা। আঙুলে হাজা, গোড়ালি ফাটা।

"আমার জন্যই এই কষ্ট, নারে?"

"তোমার জন্য কেন হবে।"

দীপু মাথা নামিয়ে পায়ের আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঘষতে শুরু করল। কমলা মুখ তুলে তাকাল আকাশে। গরমে চোখ পাতা যায় না। তাকাল ফুটপাথে। সেই বসন্তের ঘায়ের মত দাগ। বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, "কষ্ট কি আমি ইচ্ছে করে দি, সংসারে দুঃখ্যু বাড়ুক তা কি আমি চাই? কিন্তু তোর বাবার যে একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই। বারণ করলে রেগে ওঠে।"

"যার কাণ্ডজ্ঞান নেই তার রাগেরও কোন মানে নেই। আপিসে বসে মজা দেখছে হয়তো, আর আমরা এখানে—"

মুখ তুলল কমলা। ছেলের চোখে রাগ, ধমকানি, দুঃখ। ও এখন অন্যরকম হয়ে গেছে। ধ্বক্ করে উঠল কমলার বুক। ছেলেকে আর এখন চেনা যাচ্ছে না। মস্ত বড় হয়ে গেছে। বুঝতে শিখেছে, ধমকাতে শিখেছে। কিন্তু ও ধমকাচ্ছে কাকে! আমাকে? আমি কি দোষ করেছি! ইচ্ছে করে কি সংসারে অশান্তি এনেছি? ছেলেটা বাপের স্বভাব পেয়েছে, সব তাতেই রেগে ওঠে। এইটুকু ছেলে রাগে কেন? ও কি সংসারের হালচাল বুঝে ফেলেছে?

কমলা চুপ করে তাকিয়ে রইল। রাস্তার ওপারে ফুটপাথে ছায়া। খাটিয়ায় একটা লোক শুয়ে। কাঠ কাটছে একটা মেয়েমানুষ। হঠাৎ দমকলের ঘণ্টা বাজল: গাড়িগুলো রাস্তার কিনার ঘেঁষে এল। ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল একটা দমকলগাড়ি।

"আহারে, কাদের আবার কপাল পুড়ল।"

"যাদেরই পুড়ুক না, তোমার কি?"

"ক্ষতিতো হবে!"

"হোক্‌গে, তা ভেবে আমাদের কি হবে, বাড়ি পেঁৗছতে পারব কি?"

ছেলের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেছে। খিদে পেয়েছে। পিচ গলে যাওয়ায়

চড়বড় শব্দ হচ্ছে গাড়ির চাকায়। এখন অনেকখানি পথ হাঁটলে তবে বাড়ি পৌঁছন যাবে। ছেলেমেয়েগুলোকে শিকলি দিয়ে ঘরে আটকে রেখে এসেছে। তাদের খাওয়া হয়নি। গিয়ে উনুন ধরিয়ে রেঁধে খাওয়াতে হবে। ওরা এতক্ষণ কি করছে কে জানে। হুটোপাটি করে ঘরের জিনিস ভেঙেছে। বালিশ নিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলেছে। নিতুটার ভীষণ লোভ চিনিতে। দেয়ালে পা দিয়ে দিয়ে উঠে হয়তো শিশিটা সাবড়ে দিয়েছে। বাচ্চুর ঘরকন্নার কাজ খুব পছন্দ। কুঁজো থেকে জল ঢেলে, জামাটামা কিছু একটা দিয়ে ঘর মুছতে শুরু করেছে। কিন্তু কতক্ষণ ওরা খেলা করবে। খিদে পাবে, চীৎকার করবে, কাঁদবে। ওরাতো সব সময়ই চেঁচায়। পাশের বাড়ির লোকেরা শুনলে গ্রাহ্যই করবে না। হয়তো তারপর কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়বে। নিতুটা আগে ঘুমোবে। ওর স্বাস্থ্যটাই ভালো। অপুকে হয়তো বাচ্চুই ঘুম পাড়িয়ে দেবে। জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বাচ্চুটাও ঘুমিয়ে পড়বে এক সময়।

"আবার উঠছ কেন ?"

"আর বসে থাকতে পারছি না রে। আমার কষ্ট হচ্ছে।"

"হচ্ছেতো যাও, আমি উঠতে পারব না।"

"তুই অমন করে আর কথা বলিসনি।"

"কেন বলব না, কেন পয়সা পর্যন্ত চেয়ে রাখ না।"

"আমায় যদি না দেয়, কি করতে পারি !"

"তুমি একটা বোকা। মান ইজ্জতটাই তোমার কাছে বড়, নইলে দারোয়ানটা পর্যন্ত—"

ফ্যালফ্যাল্ করে কমলা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ও বলছে আমি বোকা। তাহলে একটু আগে কেন আমায় চটি পরতে দিয়েছিল ? ওর নিজের পা পুড়বে তা কি ও জানত না ?

মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে দীপু। কমলার চোখ টলটল্ করছে। দোকানি টেবিলে থুতনি রেখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। এতক্ষণে একটাও খদ্দের আসেনি।

রোগা জিরজিরে একটা গরুকে দুটো লোক টানতে টানতে নিয়ে এল। ইলেকট্রিক পোস্টে বেঁধে লোকদুটো এধার ওধার তাকাচ্ছে। মুচকি হেসে গেল এক পিওন। খাটিয়ার শোয়া লোকটা উঠে বসেছে। উরু থাবড়ে চা-ওলাকে ডাকল। সামনের বারান্দায় ঘোমটা দিয়ে এক বৌ এসে দাঁড়াল।

"শালা যা গরম পড়েছে। না যায় ঘরে বসে থাকা, না যায় বাইরে বেরোন !"

লুঙ্গির কষি আঁটতে আঁটতে দোকানী বেরিয়ে এল। গোরুটা চোখ বুজে জাবর কাটছে।

"উধার দেখো। গলিকা ভিতর একঠো হ্যায়।"

দোকানি হাত তুলে কাছের গলিটা দেখিয়ে দিল। দুটো লোকের একজন সেইদিকে গেল। একটা মাছি বসেছে গোরুটার পিঠে। থরথরিয়ে চামড়া কাঁপাল। উঠে দাঁড়াল দীপু। হনহন করে খানিকটা গিয়ে পিছু ফিরে তাকাল। কমলা সঙ্গে আসেনি।

"কিজন্য দাঁড়িয়ে আছ? চলে আসছ না কেন?"

কাছে এসে কমলা বলল, "তুই হঠাৎ এমনভাবে হাঁটতে শুরু করে দিলি যে—"

কথা না বলে দীপু হাঁটতে লাগল। ঘাড়টা নামান। হাত দুটো আড়ষ্ট। মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না।

পা জ্বলছে। জ্বলুক। ওকথা বললেই বিপদ। ছেলে হয়তো আবার বলবে, ছায়ায় দাঁড়াই। তাহলে বাড়ি পৌঁছন যাবেনা। কিংবা হয়তো চটিটা খুলে দেবে। তার চেয়ে এই ভাল। ওকে কষ্টের কথা জানতে না দিলেই হল। এখন অনেক রাস্তা হাঁটতে হবে।

"দীপু একটু আস্তে চ।"

দীপু দাঁড়াল। কমলা পাশে আসতেই বলল, "ওটাকে আমার কাছে দাও।"

"নারে বড্ড নরম, পারবি না।"

"খুব পারব।"

বাচ্চাকে দীপুর হাতে তুলে দিল কমলা। আস্তে আস্তে পা ফেলে চলতে লাগল দীপু।

"হ্যাঁরে, তোর মনে আছে বাচ্চুকে একবার ফেলে দিয়েছিলি?"

জবাব দিল না দীপু। কথা বলতে গেলে রাস্তা দেখে চলা যায় না ঠিক মত। ঠোক্কর খেয়ে পড়লে বাচ্চাটা বাঁচবে না।

"ঘ্যানঘ্যান করতিস বোনকে কোলে নেবো বলে। একদিন দিলুম কোলে তুলে, ওম্মা দেয়ামত্তরই যেই দাঁড়াতে গেলি আর টলে পড়ে একসা কাণ্ড।"

"শালা খচ্রা কোথাকার।"

ইঁটটাকে লাথি মেরে দীপু ফুটপাথ থেকে রাস্তায় পাঠাল। হাতের পুঁটলিটা দুলিয়ে কমলা একটা খুকির মত হাসল। পায়ের তলার জ্বলুনিটা সয়ে এসেছে। রাস্তার সবটাই তো আর তেতে নেই। মাঝে মাঝে ছায়া আছে, জল আছে, মাটিও আছে।

"আচ্ছা বল্‌তো, এখন যদি তোর বাবার সঙ্গে দেখা হয়, কিংবা দারোয়ানটা এসে যদি বখশিশের ভাগ দিয়ে যায়! তাহলে ট্যাস্‌কি করে বাড়ি যাওয়া যায়, নারে?"

দীপুর দিকে আড়ে তাকিয়ে কমলা কুট করে বিস্কুট কামড়াল। তারপর আবার খুকির মত হাসল।

রাজা

ট্রেন ছাড়ার কয়েক মুহূর্ত আগে ওরা ছুটে এসে কামরাটায় উঠল। হাঁপাতে হাঁপাতে কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তারা সাফল্যের বিস্ময় কাটিয়ে উঠেই ঝগড়া শুরু করল।

"জানি, তুমি এমন কাণ্ড করবে। ঠিক সময়ে কোনদিনই হাজির হতে পার না।" ছেলেটি উত্তেজিত হয়ে বলল।

"আচ্ছা আমি কি করতে পারি যদি বাবার হঠাৎ অসুখ করে. মা যদি রান্নাঘরে না যায় দাদা, যদি প্রশ্ন করে বসে আজ তো ছাত্র ধর্মঘট তাহলে কলেজ যাচ্ছিস কেন!" কৈফিয়ৎ দিল মেয়েটি।

ছেলেটি কামরার ভিতর চোখ বোলাতে বোলাতে আপন মনে বলল, "এক্সকিউজ একটা না একটা ঠিক তৈরিই থাকে। এক সেকেণ্ড দেরি হলেই আর ওঠা যেত না। তাওতো দশ মিনিট কমিয়ে দশটা চল্লিশের জায়গায় সাড়ে দশটায় ট্রেন ছাড়বে বলেছিলাম। তাও লেট। বড্ড নিড়বিড়ে তুমি।"

মেয়েটিও কামরার লোকগুলির উপর চোখ বোলাচ্ছিল, ফিসফিস করে বলল, "আমার চেনা কেউ নেই, তোমার?"

"দেখছি না কাউকে। টিকিট আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের, এখানেই থাকবে?"

"না না, এই ভিড়ই ভাল।"

ভিড়ের মধ্যে ছেলেটি মেয়েটির গা ঘেঁষে দাঁড়াল। মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে ধমকাল, চারপাশের লোকেদের ইশারায় দেখাল, ছেলেটি ঠোঁট মুচড়িয়ে বেপরোয়া ভাব প্রকাশ করল।

• "খেয়ে এসেছ?" ছেলেটি বলল।

"অল্প। ইচ্ছে করছিল না খেতে। তুমি?"

"না। বাবা টাকা যোগাড় করতে বরানগর গেছে ফিরে বাজার করবে তারপর রান্না হবে।"

"ওঁদের স্ট্রাইক আর কতদিন চলবে?"

"কি জানি।"

"তাহলে তুমি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটলে কেন, পয়সা পেলে কোথায়?"

"যেখান থেকেই পাই না।"

"আমার খারাপ লাগছে।"

"তাতো লাগবেই, আমার সঙ্গে থাকলেই তোমার খারাপ লাগে।"

"তাই বললাম! তুমি সব কথায় উল্টো মানে কর বিচ্ছিরি স্বভাব তোমার।"

"জানি। আমি দেখতেও বিচ্ছিরি, পড়াশুনোয়ও ভাল নয়, ফেল করেছি, গান জানি না, পদ্য লিখতে পারি না, গুণ্ডামি করে বেড়াই—"

"এই এই, এই শুরু হল পাগলামি। চুপ করে থাক তো এখন। ঝগড়ুটে, ভীষণ ঝগড়ুটে তুমি।" এই বলে মেয়েটি পিঠ দিয়ে ছেলেটির বুকে চাপ দিল। কাছের কয়েকজনেরই মুখ ভাবলেশহীন দেখে ছেলেটি বুঝল তারা মন দিয়ে ওদের কথা শুনছে এবং না শোনার ভান করছে। মনে মনে রেগে উঠে, কতকগুলো কড়া কথা বিড়বিড় করল।

"কি বলছ?"

"কিছু না। বসার চেষ্টা করতে হবে, তুমি বরং ওই দিকটায় গিয়ে দাঁড়াও।"

"জানলা না হলে ভাল লাগে না ট্রেনে।"

"ওই জানলাটার কাছে দুই বুড়োবুড়ি দেখছ? বোধ হয় বেশি দূর যাবে না, কাছে গিয়ে দাঁড়াও।"

"কি রকম দেখায় দেখেছ, পাকা চুলের মধ্যে টকটকে সিঁদুর! কত বয়স বলতো?"

"ষাট-পঁয়ষট্টি হবে। বুড়ো বেশ শক্ত সমর্থ রয়েছে।"

"পাশাপাশি কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। ওই দেখ আমাদের দেখছে।"

"তাকিও না।"

"ডাকছে আমায়, পাশে একটুখানি জায়গা আছে।"

"আমি একা ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকব!"

"ওরা বেশি দূর যাবে না বোধ হয়, মালপত্র তো দেখছি না। এখনই জায়গা রিজার্ভ করে রাখি।"

মেয়েটি সন্তর্পণে গিয়ে জানলায় বসা বৃদ্ধার পাশে কোনমতে বসল। বৃদ্ধা হেসে বললেন, "কতদূর যাবে?"

ইতস্তত করে মেয়েটি বলল, "কাছেই। আপনি?"

"আমরা আসানসোল যাব, বড় মেয়ের ছেলের পৈতে হচ্ছে।"

শুনে মেয়েটি মুষড়ে পড়ল। ঘণ্টা ছয়েকের আগে এরা তা হলে নামবে না। বসে লাভ কি!

"তুমি কি পড়ো?"

"বি-এ ফার্স্ট ইয়ার।"

"বাড়ি কোথায়?"

"বাগবাজারে।"

"এখন যাচ্ছ কোথায় ?"

মেয়েটি কয়েক মুহূর্ত ভেবে বলল, "পিসিমার বাড়ি। খুব অসুখ করেছে, বোধহয় ক্যানসার।"

"আহা, বড় শক্ত রোগ। আমার শ্বশুর ওতে মারা গেছলেন। বড় কষ্ট পেয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ, এর তো কোন চিকিৎসা নেই।" বলতে বলতে মেয়েটি দেখল ছেলেটি ব্যাজার মুখে তাকিয়ে। সে ভাবল আর বসে থেকে লাভ কি।

"সঙ্গে ও কে ? দাদা ?"

মেয়েটি বিমূঢ়ের মত বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নামিয়ে হাসি চাপল।

"মেজদা।" বলেই সে ছেলেটির দিকে তাকাল। সিগারেট ধরিয়ে মুখ উপরে তুলে ধোঁয়া ছাড়ছে আর বিরক্ত হয়ে পাশের লোকের দিকে ভ্রূ কোঁচকাচ্ছে।

"কি করে, পড়ে ?"

"চাকরি করে, এনজিনীয়ার।"

"আমার বড় জামাইও এনজিনীয়ার বার্নপুরে। তোমার দাদা কোথায় কাজ করে ?"

মেয়েটি থতমত হয়ে বলল, "একটা বিদেশী কোম্পানীতে, নামটা খটমটে মনে থাকে না।" বলেই সে উঠে দাঁড়াল।

"এসে গেছে বুঝি।"

"হ্যাঁ, এইবার নামব।"

ছেলেটির কাছে এসে বলল, "চলো এখানে নেমে অন্য কামরায় উঠি। বুড়ির বড্ড কৌতূহল।"

একটা স্টেশনে ট্রেন থামতেই ওরা নামল। তাড়াহুড়ো করে পরের কামরায় উঠে দেখল ভিড় কম। বসার জায়গা আছে। ঘেঁষাঘেঁসি করে দুজনে বসল।

"কতদূর পর্যন্ত আমরা যাচ্ছি ?" মেয়েটি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল।

"দু ঘণ্টা যাওয়া আর দু' ঘণ্টা আসা। ঠিক পাঁচটায় তুমি বাড়ি পেঁছে যাবে।"

"মোটে চার ঘণ্টা !" মেয়েটি বিষন্ন চোখে বাইরের সবুজ ধান খেতের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর জানলায় রাখা আঙুলে ছেলেটি আলতো করে তার করতল রাখল। মেয়েটি মুঠোয় চেপে ধরল।

"দেখেছ, কত ধান হবে এবার।"

"অনেক। দাম তো এখনই কমতে শুরু করেছে।"

মেয়েটি জানলায় মাথা রেখে ঘাড় কাত করে ছেলেটির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। হাওয়ায় চুলগুলো উড়ে কপালে চোখে পড়ছে। ছেলেটি আঙুল দিয়ে সেগুলি যথাস্থানে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা শুরু করল। মেয়েটির চোখের পাতা মুদে এল।

"এবার সবাই পেট ভরে খেতে পাবে।" মেয়েটি বলল।

ছেলেটি তার আঙুল গালের উপর আলতো বোলাল।

"এখন কি বলতে ইচ্ছে করছে জান?" ছেলেটি বলল।

"কি?" বন্ধ চোখে মেয়েটি জানতে চাইল। তার ঠোঁটদুটি ঈষৎ প্রস্ফুটিত ফুলের পাপড়ির মত খুলে রয়েছে।

"বলব?"

"বলো।"

"কে নীলিমা না?"

মেয়েটি চমকে সিধে হয়ে বসল। হাত দশেক দূর থেকে বছর চল্লিশের এক বিবাহিতা ওর দিকে তাকিয়ে, মেয়েটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

"চিনতে পার আমায়? গীতাদিকে মনে আছে? বানান ভুলের জন্য মার পর্যন্ত দিয়েছি তোমায়। এইবার মনে পড়ে?" বিবাহিতা তড়বড়িয়ে বলে গেলেন। মেয়েটি ঘাড় নাড়ল।

"আর বানান ভুল হয় না তো? বেশ চেঁচিয়েই দূর থেকে তিনি বললেন, "করছ কি এখন, "কলেজে পড়ছ? এ লাইনে কোথায় চলেছ?"

"পিসিমার বাড়ি যাচ্ছি, এই পরের স্টেশনেই নামব। কতদিন পর দেখা হল বলুন তো, তিন বছর প্রায়।" মেয়েটি খুব উৎসাহিত হওয়ার চেষ্টা করল।

"একা যাচ্ছ?"

"মেজদা রয়েছে। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"বর্ধমান। উনি তো ওখানেই চাকরি করেন। তোমাদের ক্লাসের আর সকলের খবর কি, এস না এদিকে।"

মেয়েটি একবার দেখল ছেলেটির কাঠের মত মুখ, তারপর উঠে গিয়ে বিবাহিতার পাশে বসল।

পরের স্টেশন আসতে দুজনে নেমে পড়ল।

"এবার ফার্স্ট ক্লাসে।" এই বলে ছেলেটি ছুটতে শুরু করল, মেয়েটিও। ওরা ফার্স্ট ক্লাসে ওঠামাত্র ট্রেন ছেড়ে দিল।

কামরাটি ফাঁকা, তবে চারটি শীর্ণ, রুক্ষ যুবক চারটি বেঞ্চে চিৎ হয়ে শোয়া। তাদের পরনে আঁটো ট্রাউজার্স ও রঙীন গেঞ্জি। সঙ্গে ছোট ছোট ব্যাগ। চারজন ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওদের দিকে। ছেলেটি এক যুবককে বলল, "উঠে বসুন।"

"কেন ?" মেয়েটির মুখের দিকে বিশ্রীভাবে তাকিয়ে থেকে যুবকটি জানতে চাইল ঔদ্ধত্য দেখিয়ে।

"কেন আবার, বসব।" বিরক্ত স্বরে ছেলেটি বলল।

"অ।" যুবকটি তাচ্ছিল্যভাবে উঠে বসল। বাকি তিনজন শিস্ দিয়ে উঠল, গান ধরল এবং নিজেদের মধ্যে গল্প জুড়ল।

"না উঠলেই হত।" মেয়েটি চুপিচুপি বলল।

"কেন! আমরা কি টিকিট কাটিনি ?" ছেলেটি একটু জোরে বলল। ওরা চারজন তা শুনতে পেল এবং ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

"আপনারা বুঝি টিকিট কেটে উঠেছেন ?" এক যুবক ব্যঙ্গ করে বলল।

এরা দুজন চুপ রইল। ওরা নিজেদের মধ্যে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে আলাপ করতে লাগল।

"আমার বিশ্রী লাগছে।" মেয়েটি ফিসফিস করে বলল।

ছেলেটি উত্তেজিত হয়ে যুবক চারজনকে উদ্দেশ্য করে বলল, "এখানে একজন মহিলা রয়েছেন তার সামনে আপনারা নোংরা কথা বলছেন কেন ?"

"কে মহিলা? উনি কি মহিলা?" একজন গম্ভীর হবার ভান করে বলল।

"তার মানে ?"

"মানে অন্য কিছুও তো হতে পারে।"

"কি হতে পারে ?"

মেয়েটি অস্ফুটে বলল, "চুপ করো, এদের সঙ্গে কথা বোল না।"

"আসুক পরের স্টেশন চেকারকে ডাকব, যত্তোসব লোফার ফার্স্ট ক্লাসে ওঠে।" ছেলেটি রাগে গরগর করে বলল।

"কি বললেন, আমরা লোফার ?" একজন উঠে দাঁড়াল।

"আমরা লোফার? রোয়াব দেখান হচ্ছে।" আর একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল এবং তৃতীয় জন হঠাৎ ছেলেটির গালে চড় কষিয়ে দিল। বজ্রাহতের অনুরূপ অবস্থা কাটিয়ে ওঠার পরই ছেলেটি ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং এক মিনিটের মধ্যেই কামরার কোণে ছিটকে তলপেট চেপে বসে পড়ল। চার যুবক হাত ঝেড়ে হাসতে শুরু করল। ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে ঘুষি ছুঁড়ল।

"লোফার, লোফার।" চীৎকার করে ছেলেটি থুথু ছিটোল একজনের মুখে। এইবার যুবক চারজন ওকে ঘিরে ধরল। মেয়েটি এতক্ষণ বুঝতে পারছিল না কি করবে। এইবার সে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।

"ছেড়ে দিন, ওকে ছেড়ে দিন আমরা নেমে যাব এখুনি। ওকে মারবেন না আর।"

তাই শুনে যুবক চারজন হাত ঝেড়ে হাসতে হাসতে আসনে বসল। শূন্য

প্রান্তরে মৃত একটি তাল গাছের মত ছেলেটি দাঁড়িয়ে রইল। তার দুটি চোখ মেয়েটির চোখে নিবদ্ধ। তার দৃষ্টিতে স্ফটিকের ভাবলেশহীনতা।

স্টেশনে ট্রেন থামতেই মেয়েটির সঙ্গে ছেলেটি মাথা নিচু করে নামল। ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার সময় ওরা চাপা হাসি শুনল। দুপুরের নির্জন স্টেশনে ওরা একটি বেঞ্চে বসল। কলের জলে রুমাল ভিজিয়ে ছেলেটির মুখের রক্ত মুছিয়ে দিল মেয়েটি। একটি চোখ ফুলে উঠে প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। নিচের ঠোঁট থেঁতলে ঝুলে পড়েছে। জামায় গাঢ় রক্তের ছিটে। মেয়েটি হাত ধরল ছেলেটির। এবং কেউ কোন কথা না বলে বসে থাকল।

সবুজ ধান খেতের ওপাশে বহুদূরে গ্রাম দেখা যায়। গ্রামের মাথার কিনার ঘেঁষে সূর্য নেমে এসেছে। দুটি মেল ট্রেন ইতিমধ্যে চলে গেছে। মেয়েটি মুঠো শক্ত করে ধরে বলল, "তখন তুমি যেন কি বলবে বলছিলে।"

ছেলেটি ওর মুখের দিকে তাকাল। হাসবার জন্য ঠোঁট দুটি মেলে ধরতে গিয়ে যন্ত্রণায় পারল না। একটি চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। কোনরকমে একটি হাত তুলে মেয়েটির গালে আঙুল বুলিয়ে সে বলল, "ইচ্ছে করেছিল বলি, এখন আমি সারা পৃথিবীর রাজা।"

টুপু কখন আসবে

টুপু, টুপু, ওই শোনো লুলা আবার ডাকছে। তুমি জানো না, যে-রাতে তোমার ঠাকুমা মারা যায় সেদিনও অমন করে ডেকেছিল। টুপু, তোমার ভয় করছে না? পালিয়ে এসো, আমার কাছে এসো।

দোতলার পুবদিকের গোল বারান্দায় সকালের রোদ, চৌকো নকশার রেলিঙের ফাঁক দিয়ে লাল সিমেন্টে পড়েছে। কাঠের দোলনা ঘোড়ায় দুলতে দুলতে টুপু তাকাল দাদুর দিকে। আবার তাকাল নিজের ছায়াটার দিকে। ছায়াটা দুলছে। খুশিতে আরো জোরে টুপু নিজেকে দোলায়, ঢেউয়ের মতো ওঠানামা করে কাঠের ঘোড়া।

"দাদু, দ্যাখো দ্যাখো।"

টুপুর কুচকুচে তারা দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল।

আঙুল দিয়ে ছায়াটাকে সে দেখাল। দাদু আগের মতো চাকা-লাগানো চেয়ারটায় চুপ করে বসে। হাসে না, কথা বলে না, নড়াচড়া করে না। আস্তে আস্তে দুলুনি কমে এল টুপুর।

"এ্যাই দাদু, কথা বলো না কেন? শান্তা দিদি তো এখন চুল আঁচড়াচ্ছে, কেউ তো বকবে না।"

দাদু একভাবে বসে থাকে, কথা বলে না, নড়াচড়া করে না। টুপু আবার ঘোড়াটাকে দোল দিতে শুরু করল।

"দাদু ঘোড়ায় চাপবে?"

কথাগুলো ঢেউয়ে-ভাসা ব্লটিং কাগজের মতো ওঠানামা করতে করতে ডুবে গেল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে টুপু নেমে বারান্দার অন্যধারে ছুটে গেল। সেখানে এইমাত্র একটা বোলতা উড়ছিল।

টুপু উঠো না রেলিঙয়ে। বোলতা উড়ে গেছে। হয়তো এখন বুগেনভিলার থোকায় বসেছে। আছে কি গাছটা এখনো গেটের ওপর। তুমি যেখানে দাঁড়িয়েছ ওখান থেকে তো গেটটা দেখা যায়। তোমার ঠাকুমা পুঁতেছিল, সে কি আর এখনো আছে! গাছ, ফুল, পাখি, রঙীন মাছ আর খোকাখুকুদের সে বড়ো ভালোবাসতো। না না, টুপু ওদিকটায় যেও না, আমার চোখের আড়ালে

যেও না। আমি কিছু দেখতে পাই না তুমি কাছে না থাকলে। টুপু আকাশ এখন কি তোমার সোয়েটারের রঙের মতো নীল হয়েছে? একবার দেখে আসবে লনের শিশিরে রোদ্দুর কি তোমার চোখের থেকেও ঝিকমিকে? মাটি খুঁড়ে ছোট্ট ছোট্ট ঢিপি করেছে কি কেঁচোরা? যদি করে থাকে তাহলে বুড়ো আঙুল দিয়ে ওগুলো ভেঙে দিয়ে এসো, দেখবে কি মজা লাগে। মাটিগুলো ঝুরঝুরে হয়ে যায়। খানিকটা ওই মাটি এনে আমার চোখের সামনে উড়িয়ে দাও, আমি দেখব তোমার চুল না মাটি কোনটা বেশি ঝুরো। না থাক, টুপু তুমি যেও না। তাহলে ওরা তোমায় বকবে। ওরা তোমায় কেন যে আমার কাছে আসতে দেয় না! আমি কি তোমার কিছু ক্ষতি করতে পারি! টুপু এখন কেউ নেই এই হচ্ছে সময়। তুমি এস আমার কাছে। আর আসার সময় দেখে নিও ফুরুস গাছে বুলবুলি এসেছে কি না। ওরা বছরে বছরে আসে।

খোঁজাখুঁজি করে বোলতাটাকে না পেয়ে টুপু ফিরে এল। ঘোড়ায় উঠতে যাবে —কি ভেবে উঠল না। গুটিগুটি দাদুর কাছে এসে দাঁড়াল।

"তুমি কথা বলনা কেন? বলতে পারো না জিভ নেই বলে? কই হাঁ করোতো, করোনা।"

মুখের কাছে মুখ আনে টুপু, দাদুর চোখের পাতা ঘনঘন পড়ে।

"তুমি হাঁ করতে পারোনা তবে খাও কী করে?"

টুপুর জিজ্ঞাসার উত্তরে চোখের পাতা ফেলা ছাড়া আর কিছু করে না দাদু। টুপু রেগে ওঠে। দাদুর হাত ধরে জোরে নাড়া দেয়। চেয়ারের হাতল থেকে ঝুলে পড়ে হাতটা।

"খাও কি করে বলোনা? আমি কিন্তু চাইবনা। সত্যি বলছি, আমি কি অসভ্য? না বলবে তো বয়ে গেল, যখন তুমি খাবে তখন ঠিক লুকিয়ে লুকিয়ে দেখব। সত্যি সত্যি দেখব কিন্তু।"

খসখস চটির শব্দ আসে। টুপু দাদুর কাছ থেকে সরে দাঁড়ায়। শান্তা এল। মাজা গায়ের রঙ। পেকে-ওঠা ফোড়ার মতো টসটসে শরীর। পিঠের শাদা আঁচলটাকে মনে হয় একটা কঙ্কাল যেন শ্রান্ত হাত ঝুলিয়ে দিয়েছে। কমলা রঙের অর্গান্ডির ব্লাউজটা ক্ষতের ওপর নতুন গজানো চামড়ার থেকেও টানটান, তাই ব্রেসিয়ারটাকে দেখায় একখণ্ড হাড়। শান্তার বয়স বোঝা যায়না। ওর গলার স্বর খসখসে ঠাণ্ডা। ওর হাতের নখ সরু আর রঙীন।

"টুপু, এখানে কি?"

দাদুর চেয়ারের পিছনে সরে এল টুপু। তালুর উল্টোপিঠ কামড়ায় আর তাকিয়ে থাকে সে শান্তার চোখে।

"এখন যাও, দাদু চান করবে।"

টুপ্‌ন চেয়ারের পিছন থেকে সরে দাঁড়াল। এইবার শান্তা চাকা-লাগানো চেয়ারটাকে ঠেলে নিয়ে যাবে বাথরুমে।

"আমি দেখব।"

"না দেখতে নেই।"

শান্তা চলতে শুরু করল সামনে চেয়ার রেখে। কাচের মতো মসৃণ মেঝে, দরজায় চৌকাঠ নেই। তবু দুলে উঠল দাদুর শরীর। শান্তার গা ঘেঁষে চলতে চলতে টুপ্‌নু দাদুর ঝুলন্ত হাতটাকে কোলের ওপর তুলে দিয়ে বলল, "কেন দেখতে নেই?"

"ছোটদের দেখতে নেই।"

"দাদু বুঝি ন্যাংটো হবে?"

হেসে উঠল শান্তা। ঘাড় নামিয়ে দাদুর কানের কাছে মুখ আনল সে।

"হ্যাঁগো বুড়ো, শুনলে কথাটা?"

শান্তাকে হাসতে দেখে টুপ্‌নু যেন বোঝে কথাটা খুব মজার বলেছে সে। বাথরুমের দরজাটা যখন শান্তা খুলছে তখন টুপ্‌নু আবার বলল:

"আমি দাদুকে ন্যাংটো দেখব।"

"না, দাদু রাগ করবে।"

"রাগ করবে, কেন?"

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল শান্তা। টুপ্‌নুর মুখে জিজ্ঞাসা আর অবাকের চিহ্নগুলো ভয়ে সমান হয়ে গেল। নিজ থেকেই সে পায়ে পায়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল। দরজা বন্ধ করে শান্তা তাকাল। দাদুও এতক্ষণ তাকিয়ে ছিল ওর দিকে। তারপর চোখ নামিয়ে নিল, পাহাড়ী পথে সমতলের মানুষ যেমন সাবধানে থেমে থেমে নামে। দাঁতে দাঁত ঘষে শান্তা প্রায় ছুটে এসে চড় মারল দাদুর গালে।

"পাজি বুড়ো কোথাকার। অমন প্যাট প্যাট করে এখনও কি দেখিস? দেখে কি করবি, মারবি? হাত তুলতে পারিস?"

দাদুর হাতটা তুলে আবার ছেড়ে দেয় শান্তা। হাতটা চেয়ারের হাতলে খট্‌ করে পড়ল।

"দেখলি, যা খুশি তাই করতে পারি এখন, যা খুশি।"

দাদুর চোখের দিকে তাকিয়ে শান্তা চুপ করে গেল। ধকধক করে জ্বলছে। আস্তে আস্তে সরে এল চেয়ারের পিছনে।

টুপ্‌নু, টুপ্‌নু, দরজা ভেঙে তুমি আমার চোখের সামনে দাঁড়াও। তোমায় আমি সব কথা বলব। ক'বছর আগেও শুধু আমার জুতোর শব্দে এই বাড়িটা ভয় পেত। আজ দেখে যাও আমি মার খাচ্ছি। বাড়ির সবাই—তোমার বাবা, মা, কাকা, কাকী, এমন কি মালীটা পর্যন্ত জানে শান্তা আমায় অপমান করে,

তবু কেউ ওকে বারণ করেনা। আমি যখন চলাফেরা করতে পারতুম তখন ওদের ভয় পাওয়া দেখে কি খুশিই না হয়েছি। আমি কি জানতুম এমন একটা দুর্ঘটনা ওৎ পেতে বসে থাকবে? অসহ্য, অসহ্য, টুপু, আবার আগের জীবন চাই। তুমি দরজা ভেঙে আমার সামনে দাঁড়াও। তোমায় আমি বলব, অনেক কথা বলব। এবাড়িতে একটাই সুন্দর মানুষ ছিল, তোমার ঠাকুমা।

জানো টুপু, শান্তা যখন মারে, আমার লাগে না। সত্যি বলছি একটুও লাগে না। ব্যথা পাওয়া ভুলে গেছি। অনেক দিন কাঁদি না, অনেক দিন। তাই কি হয়! না টুপু, মিথ্যা বলছি। তোমার কাছে আমি কিছু লুকোবো না, রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, তুমি যখন ফুলের মতো ছোট্টটি হয়ে মায়ের বুকঘেঁষে আস, যখন লুলা তার নখের আওয়াজ অন্ধকারে দগদগে ঘায়ের মতো ফুটিয়ে আমার জানলা দিয়ে তাকায়, তখন কাঁদি। জল পড়ে আমার গাল বেয়ে বিছানায়, তারপর ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমোলে সবকিছু ভুলে যাই। ঘুম তাই আমার ভালো লাগে। তারপর সকালে যখন উঠি তখন আবার এই যন্ত্রণার শুরু। এমনি করে দিনের পর দিন বাঁচা-মরার মধ্য দিয়ে চলেছি। তবু শেষবারের মতো একবার চলাফেরা করতে চাই। আমার এই হাতটা দিয়ে শান্তার টুঁটি চেপে ধরতে চাই। আমি ঘুম চাই না।

"এ্যাই বুড়ো চোখ বুজে কি ভাবছিস?"

চোখ খুলে দাদু সামনের আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল। ওর জামাটা খুলে নিল শান্তা। ট্রাউজার্সের বোতাম খুলতে খুলতে নাক সিঁটকে বলে উঠল:

"আজও আবার—! কেনা বাঁদি পেয়েছে যেন। থাকবি নোংরা হয়ে আমার কি।"

বাঁ-হাতে জড়িয়ে দাদুকে তুলে ধরে ট্রাউজার্সটা খুলে নিল। বাথরুমের কোনায় সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দাদুকে ঠেলে দিল চেয়ার থেকে। মুখ থুবড়ে দাদু পড়ে গেল। তাকে জলের ঝারির নিচে হিঁচড়ে টেনে আনল শান্তা।

টুপু তুমি একবার শুধু দেখে যাও, কিন্তু কিছু বলোনা। ছুটে এসে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করো না। শান্তা জানে আমি কথা বলতে পারি না। লেখবার জন্যে আঙুলটুকু পর্যন্ত নাড়তে পারি না, ওর ভয় ঘোচে না। তাই ও আমায় মারে। অথচ আমিই ওকে এ-বাড়িতে আনি। তোমার ঠাকুমা পাগল হলে শান্তা নার্স হয়ে আসে। ওকে প্রথম থেকেই আমার ভালো লেগেছিল। তোমার ঠাকুমার অসুখের পর আমি মদ ছেড়েছিলুম। তুমি বড় হলে জানবে যে আমি খুব উচ্ছৃঙ্খল ছিলুম। হাতে প্রচুর টাকা ছিল আর খরচও করতুম।

ঠাকুমা আমার জন্যেই সুখী হয় নি। কেন যে পারি নি ওকে সুখী করতে জানি না, বোধহয় এইটেই ওর ভাগ্যে ছিল। কিংবা টুপু এমনও তো হতে পারে— উচ্ছৃঙ্খলতা আমার স্বভাবে ছিল, আমার পূর্বপুরুষদের নামে গেরস্থঘরের বৌ-ঝিরা কাঁপত, তাদের রক্ত তো আমার শরীরে আছে, আমি কেমন করে ভালো হবো বলো? কিন্তু আমার রক্ত তো তোমার শরীরেও আছে তবে তুমি কি করে সুন্দর হলে! এ ভীষণ হেঁয়ালি। তুমি বলবে ঠাকুমা অসুখী হয়েছিল তার নিজের দোষেই। কি জানি, তার মনের খবর আমি পাইনি সেও আমায় দেয়নি। ফুল আর খোকাখুকুদের নিয়েই তার দিন কাটত। নিজের ছেলেরা বড় হলে পর সে প্রতিবেশীর বাচ্চাদের এনে আদর করতো। টুপু, তুমি কাদের সঙ্গে এখন খেলা করো? তারা আজও আসে তো? ওদের নিয়ে এসো আমার কাছে। সুখী মুখ আমি দেখিনি টুপু।

শান্তা থাকত ঠাকুমার ঘরের লাগোয়া ছোট্ট ঘরটায় যেটায় সে এখনো আছে। একদিন রাতে দেখলুম শান্তা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। ভাবলুম বলি, রাতে যেন ঘর থেকে না বেরোয়, রাত্রে লুলাকে ছেড়ে রাখা হয়। সাবধান করার জন্যই ওর কাছে গেছলুম। ও কিন্তু আমায় দেখে হাসল মাত্র, কথা কানেই তুলল না। যেন আমার যাবার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়েছিল। অন্ধকার বারান্দায় ঘর থেকে এক চিলতে আলো এসে পড়েছে। তাতে ওর মুখের একদিকটা দেখতে পাচ্ছিলুম আর দূরে রাস্তার আলোয় আকাশটা পোড়া ইঁটের মতো দেখাচ্ছিল। শান্তা দাঁড়িয়ে ছিল আকাশের দিকে মুখ করে, ওকে আমি জড়িয়ে ধরলুম। অন্য কেউ হলে নিশ্চয় ভয় পেত, ও কিন্তু একটা শব্দও করল না। এ রকম ঘটবে যেন জানত। আর কি আশ্চর্যভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরে চলে গেল। একচিলতে আলোটা বন্ধ হয়ে গেল। বেশিক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকিনি কেননা লুলাকে তো জানি। সারাদিন অন্ধকার ঘরের মধ্যে থেকে আর মানুষ না দেখে, ও শেখেনি মানুষ আর ইঁদুরের তফাত।

এরপর থেকে রোজ রাতে অপেক্ষা করতুম শান্তার জন্য। কিন্তু ওকে আর বারান্দায় দাঁড়াতে দেখতুম না। দিনের বেলায় কাছে আসত, কথা বলত, হাসত, আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যেত তখন তাকিয়ে থাকতুম ওর শরীরের দিকে। ও বুঝত তাই বারবার আসত আমার কাছে। টুপু, আমি বিশ্বাস করি না পৃথিবীতে এমন কোনো পুরুষ তখন ছিল যে না চাইত শান্তার শরীরটাকে ছুঁতে। সাদাঘোড়ার উরুতে জড়ানো কালো শিরার মতো শান্তা আমাকে চাবুক মেরে খেপিয়ে তুলেছিল। যন্ত্রণায় ছটফট করেছি। রাত্রে ওর ঘরের বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে ভয়ে ফিরে এসেছি। ভয় তোমার ঠাকুমাকে নয়, লুলাকে। তছনছ করতে ইচ্ছে করতো শান্তাকে। কিন্তু পারতুম না লুলার জন্য।

"এ্যাই বুড়ো, এখন কেমন লাগে?"

শুকনো তোয়ালে দিয়ে দাদুর গলা ঘষতে ঘষতে শান্তা নাকে টোকা দিল।

"কেমন লাগে, এ্যা?"

আবার টোকা দিল যেন সে শাড়ি থেকে ছারপোকা ফেলে দিচ্ছে। কৌতূহলী চোখে শান্তা একটুক্ষণ তাকায়, সত্যিসত্যি নাকটা পড়েছে কিনা দেখার জন্য। পড়ল না, তাই বিরক্ত হয়ে সে দাদুর পা তুলে ধরে ট্রাউজার্স পরানোর জন্য।

টুপু, সেদিন রাতে যখন বারান্দায় চোখ পেতে অপেক্ষা করছিলুম তখন সারা বাড়ি নিঝুম, আকাশটায় ইঁটের রঙ আর তোমার ঠাকুমার ঘরে আলো জ্বলছিল। অপেক্ষা করতে করতে যখন ধৈর্যের সীমায় পৌঁছেছি তখন আলো নিভল। মনে হল, হঠাৎই মনে হল, শান্তা আজ বারান্দায় দাঁড়াবে। চুপিচুপি এগিয়ে গেলুম। আজও যদি পালিয়ে যায় তাহলে আমিও ঘরে ঢুকব।

দরজায় টোকা দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে ও দরজা খুলল। যেন শব্দটার প্রতীক্ষা করছিল। বলল, ভীষণ ক্লান্ত। কিন্তু আমি তাজা ছিলুম। ওর হাত ধরলুম। বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল কোনো আপত্তিই আমি শুনব না, হাত ছাড়িয়ে বলল, আসছি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলুম। নিচের বাগান থেকে গন্ধ আসছিল হাসনুহানার। গাছটা ঠিক আমার নিচেই ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করলুম। ঘুটঘুটে অন্ধকার, একহাত দূরের জিনিস দেখা যায় না। টুপু, তুমি জানো না, সে কী ভীষণ এক-একটা মুহূর্ত। ঠিক ঘুম আসার আগে, বন্ধ চোখের সামনে যেমন জমাট অন্ধকার গোল গোল হয়ে ফেটে পড়ে আর এক-একটা কালো স্তর আলতো হয়ে নেমে আসে চেতনায়, তার থেকেও ভয়ংকর আর সুখের ছিল অপেক্ষার সেই সময়টা।

ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করলুম ফুলগুলো কিংবা একটা পাতাও যদি দেখা যায়। দেখলুম মোমবাতির দুটো পোড়া সলতে যেন বাতাস পেয়ে জ্বলে জ্বলে উঠছে। বুঝলুম লুলা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। শুনেছ তো টুপু, লুলা একবার একটা চোরের টুঁটি ছিঁড়ে দিয়েছিল। ভয় করল আমার। ভুল হবে, মেরুদাঁড়া বেয়ে, সাপের ছোবলের থেকেও দ্রুত, একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। প্রথমেই মনে পড়ল—মৃত্যু। কী মৃত্যু, কেমন মৃত্যু তাও জানি না। মৃত্যু কথাটাই তো একটা গোটা কথা। তার ধরনধারণ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি। এই আমার অস্তিত্ব রয়েছে, মৃত্যু এলো, তারপর আর আমি নেই। এই না-থাকার চিন্তাই তো টুপু পৃথিবীর সব থেকে বড়ো ভয়। এই

ভয় যখন আমি পেলুম তখনই খসখস শব্দ উঠল পিছনে। লুলা সিমেণ্টের ওপর হাঁটলে অমন শব্দ হয়। নিচে থেকে উঠে আসতে লুলার পাঁচ সেকেণ্ডও লাগবে না আর আমার ঘরে ছুটে যেতে ওইটুকু সময় দরকার। ছুটতে গিয়ে পড়ে গেলুম। সেই পড়াতেই শরীরের ডান দিকটায় পক্ষাঘাত ধরল। পরে জেনেছিলুম ওটা ছিল শান্তার চটির শব্দ। সে আমার কাছেই আসছিল।

দাদুর থুতনি তুলে ধরল শান্তা। ঝুনো নারকোলের মতো মাথাটা, অল্প কয়েকগাছি চুল। চিরুনি বোলাবার সময় খসখস শব্দ উঠল। বাথরুমের দরজার কাছে চেয়ারটা টেনে শান্তা বলল, "এইবার বসে বসে ঝিমোওগে যাও।"

চেয়ারে-বসা দাদুকে জোরে ঠেলে দিল শান্তা। সিধে ঘরের মাঝখানে এসে হঠাৎ পুরো একটা পাক খেয়ে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল চেয়ারটা। ঘরের আর এক কোনায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল সুব্রত, দাদুর ছোট ছেলে। মুখ ঘুরিয়ে দাদুকে দেখে সিগারেটটা ফেলে গোড়ালি দিয়ে থেঁতলাল, তারপর তাকাল বাথরুমের বন্ধ দরজাটার দিকে। কি ভেবে এগিয়ে গেল, ইতস্তত করল, তারপর দরজায় টোকা দিল। ভিতর থেকে সাড়া এল না। সুব্রত দরজায় কান পাতল। এতক্ষণে একবারও সে তাকায় নি দাদুর দিকে। সে যে ঘরে আছে তাও বোধহয় মনে নেই।

টুপু, আমার চেয়ারের চাকাটা খুব আলগা। শান্তা যখন ঠেলে দিল, সিধে জানলার সার্শিতে ধাক্কা লাগার বদলে হঠাৎ ঘুরে গেল, ঠিক যেমন করে আমার জীবনটাও ঘুরে গেল। সিধে বেপোরোয়া উচ্ছৃঙ্খল ছিলুম হঠাৎ পক্ষাঘাতে ডানদিকটা যখন পড়ে গেল তখন এমনি করেই, হলদে দেয়ালটার দিকে এগিয়ে আসার মতো, ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলুম। কিন্তু একদিনেই এগোলুম না, তখনও জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলতুম, অর্ধেকটা শরীর নাড়াতে পারতুম, তখনও সবাই ভয় করত, মেনে চলত।

দেখাশুনো করার জন্য তোমার বাবা, সুপ্রিয়, লোক রাখতে চেয়েছিল, রাখতে দিইনি। শান্তাকেই আমার সেবার ভার দিয়েছিলুম। এর জন্য অবশ্য ওকে বেশি টাকা দিতে হত। তোমার ঠাকুমা বরাবরই শান্ত প্রকৃতির, তখন আরো শান্ত হয়ে গেছল, তার কাছে বেশিক্ষণ থাকার দরকার হত না শান্তার। আমরা কথা বলতুম। সাধারণ কথা, কিন্তু নিষ্ফল রাগে জ্বলে মরতুম। একদিন ওকে ধরার চেষ্টা করতে গিয়ে চেয়ার থেকে মুখ থুবড়ে পড়লাম। ব্যথায় কাতরে উঠব—কিন্তু থেমে গেলুম শান্তার দিকে তাকিয়ে। মেঝের ওপর পড়ে ছিল আমার মুখ, নিচু থেকে শান্তাকে অদ্ভুত দেখাল। মনে হল, শান্তার কাঁধ নেই, মুখটা নেমে এসেছে ওর পেটের মাঝখানে। আমি শিউরে

উঠলুম, অথচ আনন্দ পেলুম। শান্তা তাড়াতাড়ি আমায় চেয়ারে বসিয়ে দিল। ধন্যবাদ দিলুম, ও কথা না বলে বেরিয়ে গেল।

রোজ সকালে শান্তা আমায় বারান্দার রোদ্দুরে রেখে যেত। মাঝে মাঝে তোমার ঠাকুমা এসে দাঁড়াত। তাকিয়ে থাকত সে আকাশের দিকে, বাগানের দিকে। বিড়বিড় করে কি যেন বলত আর এধার-ওধার কাকে খুঁজত। একদিন শুনেছিলাম ওর কথা, লুলার খোঁজ করছে। কিন্তু ও একদম ভুলে গেছে যে দিনের বেলা লুলাকে অন্ধকার ঘরে বেঁধে রাখা হয়। টুপ্‌, এই সময়ে বিলেত থেকে ফিরে এল তোমার কাকা সুব্রত। তোমার বাবার মতো অত হিসেবী মানুষ ও নয়। ওর ছোটবেলা কেটেছে কার্শিয়াঙএ মিশনারি বোর্ডিংয়ে কিন্তু কলকাতার এ্যাংলো পাড়ায় বেশিদিন ওর যৌবন কাটাতে দিতে ভরসা পেলুম না। অনেক সুন্দরী বাছাই করে তোমার কাকীমার সঙ্গে ওর বিয়ে দিলুম। বিয়ের একমাস পরেই ওকে এঞ্জিনিয়ার হবার জন্য বিলেত পাঠিয়ে দিই।

সুব্রত ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে শান্তাকে বদলে যেতে দেখলুম। ছোটবৌমা কেঁদে পড়ল ওকে বাড়ি থেকে তাড়াবার নালিশ জানিয়ে। কিন্তু তাড়াতে পারিনি। ভালো করে কথা বলতে পারিনা, চলাফেরা করতে পারিনা, শরীরটা আমার মরে আসছিল। অথচ তলপেট থেকে লকলকে শিখা উঠে আসত অজস্র ছুঁচলো মাথা নিয়ে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঝাঁঝরা করে দিত। তাতে মনে হত আমি বেঁচে আছি আগের মতো। আর আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে শান্তা। ছোট-বৌমা তারপরেও নালিশ করেছিল, হিংসে করেছিলুম নিজের ছেলেকে। শান্তাকে তাড়াবার কথা ভাবিনি, সুব্রতকেই সরিয়ে দেবার জন্য ছোটবৌমাকে পরামর্শ দিলুম দিল্লীতে তার বাবাকে চিঠি দিতে। দেশে অনেক পাসকরা বেকার এঞ্জিনিয়ার আছে, কিন্তু কী জাদুমন্ত্রে জানি না সুব্রতর শ্বশুর বিলেতের ফেল-করা এঞ্জিনিয়ার জামাইয়ের জন্য তেরোশো টাকার চাকরি ঠিক করে দিল। সুব্রত পাঞ্জাব চলে গেল বৌকে নিয়ে।

খুট করে খুলে গেল বাথরুমের দরজা। সঙ্গে সঙ্গে নতুন-ধরানো সিগারেট-টাকে থেঁতলে সুব্রত জানলা থেকে ঘুরে দাঁড়াল। ওকে দেখেই শান্তা এক-পা পিছিয়ে মুখে অস্ফুট শব্দ করল। সুব্রত হাসল। ফর্সা চামড়া, লাল ঠোঁট, শাদা সারি দাঁত, ছিপছিপে ছ'ফুট শরীর, হাসলে ওকে সুন্দর দেখায়। এগিয়ে এসে দুহাত রাখল শান্তার কাঁধে। শান্তা তখনো অবাক, কথা বলতে পারছে না।

"কি, খুব আশ্চর্য তো?"

শান্তাকে ঝাঁকুনি দিল সুব্রত। শান্তা কাঁধ থেকে হাত ঠেলে নামাবার চেষ্টা করায় সুব্রত আরো জোরে আঁকড়ে ধরল।

"কখন এলে !"

"এইমাত্র, এখনো কারো সঙ্গে দেখা করি নি।"

"একা এলে ?"

"হ্যাঁ, অনুকে সঙ্গে আনলুম না। অবশ্য তুমি এখানে যখন, বুঝতেই পারছ একা ছেড়ে দিতে চায়নি।"

সুব্রত মুখ এগিয়ে আনল। শান্তা মাথা সরিয়ে নিল।

"শান্তা, চল আমার সঙ্গে।"

হঠাৎ বলল সুব্রত গলার স্বরটা সর্দি ধরার মতো ঘড়ঘড় করে। কথা না বলে শান্তা তাকিয়ে রইল সুব্রতর চোখের দিকে। চোখের মণিটা ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায় আর তাই বেঁধে রাখতে লাল শিরাগুলো হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। আবার বলল সুব্রত, "চল শান্তা আমার কাছে। বিশ্রী, বিশ্রী, লাগছে অনুকে। একতাল কাদা রোজ যেন আমায় নোংরা করে দেয়। ওকে আমি ডিভোর্স করব। যাবে ?"

হাসল শান্তা। চোখ বন্ধ করে কি যেন সে ভাবতে শুরু করল। অধৈর্য হয়ে সুব্রত ওর হাত মুচড়ে ধরল।

"লাগছে সুব্রত।"

"না, লাগছে না।"

"সুব্রত, তুমি এখন টায়ার্ড।"

"না, টায়ার্ড নই।

"তুমি কদিন থাকবে ?"

"কদিন থাকব সেটা কোনো কথা নয়। শুধু শুধুই হাজার মাইল পথ ভেঙে তোমার এই কথা শুনতে আসি নি। তাছাড়া তোমার কাছে এলে আমি কেন, আটলাণ্টিক সাঁতরে-আসা মানুষও নিজেকে তাজা মনে করবে।"

দপদপ করতে থাকে সুব্রতর কপালের দুপাশ। চোখের কোল ফুলে উঠেছে, গালের পেশী শক্ত। দূরে—দাদুর দিকে তাকিয়ে শান্তা বলল, 'আমার এখনো অনেক কাজ বাকি আছে।"

"ও-বুড়োর জন্য আবার কাজ কি ?"

"বাঃ, খাওয়াতে হবে না।"

"খুব দরদ দেখছি যে। খেতে একটু দেরি হলে মরে যাবে না, বুড়োর জান ভীষণ কড়া।"

"উনি তোমার বাবা।"

সুব্রত গোটা শরীরের এমন ভঙ্গি করল যেন বলতে চায়, সে আবার কি ! শান্তা মুখ টিপে হাসল। দাদুর কাছে যাবার জন্য সে এগিয়েছে, হ্যাঁচকা টানে তাকে থামিয়ে দিয়ে সুব্রত দাদুর সামনে এসে দাঁড়াল।

"নড়তে পারো না তাই, নইলে মেরেই ফেলতে। তাই না?"

সুব্রত দাদুর থুতনির নিচে দুটো আঙুল দিয়ে মুখটা তুলে ধরল।

দাদু চোখ বন্ধ করল। শান্তা হেসে উঠল। সুব্রত ওর দিকে তাকিয়ে রইল। ভ্রূকুটি করে শান্তা বলল, "অসভ্যের মতো দেখছ কি, দরজাটা খোলা রয়েছে না?"

টুপু টুপু, আজ সকাল থেকে লুলা ডাকছে। আজ তুমি বাগানে যেওনা। হয়তো লুলাকে বেঁধে রাখা হয়নি। হয়তো ওর ঘরের দরজাটা ভাল করে বন্ধ করা হয়নি। চন্দ্রমল্লিকার গাছগুলো তো ওই দিকেই। হলুদ পাপড়িগুলো যদি তোমায় লোভ দেখায় আর দরজা দিয়ে যদি সেই সময় লুলা বেরিয়ে আসে? টুপু, আজ তোমার খেলা বন্ধ রাখ, আজ তুমি লক্ষ্মীটি হয়ে থাক। বারান্দায় এসে দাঁড়াও, দেখ না আজ আকাশটা বোধ হয় নীল হয়ে রয়েছে। কি ভয়ংকর এই হলদে দেয়ালটা। আমি যদি মরে পড়ে থাকি তাহলে কেউ আমায় দেখতে আসবে না। মাংসগুলো গলে গলে খসে যাবে, দেওয়ালটার মতো হাড়গুলোয় রঙ ধরবে। তারপর সেগুলোও একদিন ঝুরঝুরে হয়ে ধুলোয় মিশে যাবে। পৃথিবীর অনেক ধুলোয় আমি নিশ্চিহ্ন হবো। কিন্তু আমি বাঁচতে চাই টুপু। তুমি পারো এই দেয়াল থেকে আমার চোখ সরিয়ে নিয়ে যেতে, পারো ওই বারান্দায় ঠেলে নিয়ে যেতে চেয়ারটা। কষ্ট হবে, কিন্তু খুব হালকা করে নোব আমি নিজেকে। যেমন করে চন্দ্রমল্লিকা হাতে রাখ, তার থেকেও সহজে পারবে আমাকে এ ঘর থেকে বার করে নিয়ে যেতে। আমি ফুলের মতো হব টুপু, আমি তোমার চোখের মতো হব। আমার মুখের কাছে মুখ আনবে? তোমার মুখে দুধের গন্ধ আছে। তুমি আবোলতাবোল অনেক কথা বলবে, আমি হাসব, আমি জুড়োব। কিন্তু তুমি তা জানতে পারবেনা ভেবে আমার দুঃখ্যু হবে। তুমি তো জানোনা, আমার মুখটা এখন জ্বলে যাচ্ছে। সুব্রত আমায় অপমান করেছে। লুলা আজ সকাল থেকে ডাকছে, আজ বাগানে যেওনা, ওখানে ভয় আছে, আমরা বারান্দায় থাকব। না বারান্দায় নয়, ওখান থেকে তোমার ঠাকুমা লাফিয়ে পড়েছিল।

জানলার ধারে দেশলাইয়ে সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে সুব্রত বলল, "কেমন যেন বদলে গেছে মনে হচ্ছে।"

"কি বদলেছে?"

"কলকাতাটা।"

'কি করে বুঝলে!' শান্তা সুব্রতর কনুই ধরে নাড়া দিল। পড়ে যাচ্ছিল সিগারেটটা, সামলে নিয়ে সুব্রত ওর দিকে তাকিয়ে হাসল।

"তোমায় দেখে আপাতত সবকিছুই সুন্দর লাগছে, কলকাতাটাও যেন ফুলে ফেঁপে টসটস করছে। ওহ্‌হো, মনে পড়ে গেল, একটা উপহার এনেছি।"

"তোষামোদ হচ্ছেনা তো?"

সুব্রতর পিঠে গাল ঘষল শান্তা। সিগারেটে আগুন দিল সুব্রত। গাল চুপসে ধোঁয়া টেনে ধক্‌ করে ছাড়ল। গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ধোঁয়ার ডেলাটা দেয়ালে ভেঙে গেল।

"কুকুরটা ডাকছে। বিশ্রি ওর ডাকটা, ভয় করে।"

সুব্রত জানলা দিয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে রইল।

"ভয় করে তো ওটাকে মেরে ফেললেই হয়।"

আদুরে গলায় শান্তা কথাটা বলে দাদুর দিকে তাকাল। সুব্রত অন্য-মনস্কের মতো বলল, "না থাক, চলো ঘুরে আসি মাঠ থেকে। আজ তো শনিবার অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।"

"ফিরবে কখন।"

"যদি না ফিরি।"

"তাহলে যাবনা।"

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য এগোল শান্তা। সুব্রত শুকনো স্বরে বলল, "বাড়ির মধ্যে কি আছে যে বাইরে বেরোতে চাওনা?"

শান্তা বারান্দায় বেরিয়ে ঘুরে জানলার কাছে দাঁড়াল। সুব্রত ঘর থেকেই বলল, "এই বুড়োটাকে তুমি ভালবাস, আমায় নয়।"

শান্তা সরে গেল জানলা থেকে। দাদুর দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে সুব্রত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

টুপু, এই ঘরের জানলা দিয়ে দেখছিলুম তোমার ঠাকুমা সেই ভয়ঙ্কর রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। আমি তখন ভাবছিলুম লুলার এগিয়ে আসা নখের শব্দ যেন না শুনতে হয়। শুনতে পাইনি বারান্দা থেকে ঠাকুমার পড়ে যাওয়ার শব্দ। আমার বুকের ওপর শান্তা তখন হাঁফাচ্ছে। ওর মুখ দিয়ে কেমন একটা শব্দ উঠছিল, ভীষণ ভালো লাগছিল শুনতে। পাথর হয়ে বসেছিলুম, কথা বলিনি। আমার ভালো হাতটা দিয়ে ওকে ছুঁইনি পর্যন্ত। ভিজে খড়ের মতো জ্বলছিল শরীরটা, জ্বালা করছিল চোখ। আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না বারান্দায় কি ঘটছে। শান্তা তখন চুপিচুপি আমায় বলল, ভালবাসি। আমার অর্ধেক স্থবির শরীরটাকে ও ভালবাসে! হাত বাড়ালুম ওকে ধরবার জন্য। শান্তা আমার নাগালের বাইরে সরে গেল। আধমরা ইঁদুরের মতো বারবার বেঁচে উঠতে চাইলাম কিন্তু শান্তা বেড়ালের থাবার থেকেও নিরাসক্ত, নিষ্ঠুর। আমার তেষ্টা পেল, ঢোক গিলতে পারলুম না, সে

জোরটুকুও আমার ছিল না। শুধু নড়ে উঠল গলার নালিটা—আর শান্তা আস্তে আস্তে মুখটা এগিয়ে এনে তার ঠোঁট রাখল আমার গলায়। ও যদি তখন দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলত টুঁটিটা, বেঁচে যেতুম। তিল তিল করে এই পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতুম। কিন্তু শান্তা তা করল না। শুধু বলল, ভালবাসি। সেই সময়ই লুলা চিৎকার করে উঠল, ঠিক আজকের মতো। মনে পড়ল তোমার ঠাকুমা দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়। জানলার দিকে তাকালুম। উঁচু জানলা, লুলা দাঁড়িয়ে উঠেছে গরাদের ফাঁকে থাবা রেখে। জিভ বার করে ও হাঁফাচ্ছে, মনে হল ঠাকুমার শাড়ির লালপাড় থরথর করে কাঁপছে। লুলা ঠোঁট চাটল। নোনতা গন্ধ যেন পেলুম। জানি না কেন পেলুম। কনকনে শীতের দিনে ঠাণ্ডাজলে কাউকে চান করতে দেখলে শীত লাগে, জানিনা কেন লাগে। দুহাতে আমার মুখটাকে ধরে শান্তা আবার বলল, ভালবাসি। শিউরে উঠলুম ওর চোখ দেখে। শান্তা হাসছিল, মনে হল লুলাও বোধহয় হাসছে। দেখবার জন্য ঘাড় ফেরাতে গেলুম, পারলুম না। শান্তার টুঁটি চেপে ধরার জন্য হাত তোলার চেষ্টা করলুম, হাত উঠল না।… আমার শরীরের সুস্থ অংশটুকুকেও পঙ্গুতা গ্রাস করল। চিৎকার করে উঠতে চাইলুম, গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। আমার শরীর মরে গেল টুপু।

সকালে বাগানে যখন খুঁজে পেল তোমার ঠাকুমাকে তখন সবাই খোঁজ করল মৃত্যুর কারণ। অনুমান করল নানাজনে নানারকম। পুলিশ তার কর্তব্য করে গেল। শুনলুম ওরা রিপোর্টে লিখেছে—আত্মহত্যা। কিন্তু আমি জানি, এটা হত্যা। রাতে শান্তা ইচ্ছে করে দরজা খুলে রেখেছিল। বারান্দা থেকে এবাড়ির বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায় তাই তোমার ঠাকুমা ফাঁক পেলেই বারান্দায় এসে দাঁড়াত। সে রাতেও ঘরের দরজা খোলা পেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। লুলার কথা ওর মনে ছিল না। ওকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছিল লুলা। তোমার ঠাকুমার সুস্থবুদ্ধি বোধহয় কয়েক মুহূর্তের জন্যই ফিরে এসেছিল। তাই সে বাঁচার চেষ্টা করে। কিন্তু বুঝিনা আজও—ঘরে গিয়ে নিজেকে না বাঁচিয়ে কেন বাগানে লাফিয়ে পড়ল। তোমার ঠাকুমা ভুল করেছিল টুপু। মৃত্যু বড় ভয়ঙ্কর, একবার যে এর মুখোমুখি হয়েছে, বেঁচে থাকলেও সে কোনদিন এই ভয়ঙ্করের ভয় থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে না। তোমার ঠাকুমা মরে গিয়ে হয়তো বেঁচে গেছে। আমিও ভয়কে দেখেছি। সেকথা আমি বলতে পারিনি। টুপু, মানুষ যেন কথা বলার ক্ষমতা না হারায়। লুলাকে তোমার বাবা মেরে ফেলতে চেয়েছিল, আমি ঘাড়টুকু নেড়েও সম্মতি জানাতে পারিনি। টুপু, মানুষ যেন পঙ্গু না হয়। ভেবেছিলুম শান্তা এরপর বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু গেল না। এর একমাত্র কারণ সুপ্রিয়। হ্যাঁ টুপু, তোমার বাবা শান্তাকে চেয়েছিল বাড়িতে রাখতে।

"এই দাদু।"

চেয়ারের পেছন থেকে টুপু ঝুঁকে পড়ল। দুহাতে চিবুক ধরে দাদুর মুখটা ঘুরিয়ে আনল। জ্বলজ্বল করে উঠল দাদুর চোখ।

"ঘুমোচ্ছিলে? আমি তো ঘুমোচ্ছিলুম, হ্যাঁ সত্যি সত্যি ঘুম! মা বলল, টুপু দুপুরবেলা ঘর থেকে বেরিও না, বাগানে রোদ্দুরে যেও না, দাদুর ঘরে যেও না। তখন জানো আমি চুপটি করে জেগে, তখনো ঘুমোইনি। তারপর কি হল জানো?"

টুপু মুহূর্তখানেক অপেক্ষা করে আবার বলল, "মা বাবার সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া করে কাঁদছিল। তুমি বক্‌বে বাবাকে, বুঝলে। মা খুব ভালো, না দাদু? মা বকেনা, তুমি বকনা, আমিও কাউকে বকিনা, আমি ভালো?"

টুপু প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল দাদুর কোলে। দুচোখ বন্ধ করল দাদু।

•

টুপু এমনি করে সারাজীবন তুমি থাক। উঠো না, সরে যেও না। সকাল থেকে এখনো কিছু খাইনি। সুব্রত শান্তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে, শান্তা ভুলে গেছে আমার খাওয়ার কথা। আর তো কেউ আসে না, খোঁজ করে না। টুপু তোমার মুখটা আরও কাছে আন। দুধের গন্ধে আমার ছেলেবেলাকে মনে পড়ে, আমার মাকে মনে পড়ে, প্রথম ছেলে-কোলে তোমার ঠাকুমাকে মনে পড়ে। ছোটবেলায় তোমার বাবাও এমনি করে আমার কোলে এসে পড়ত। সে হাসত, এখন সুপ্রিয় হাসে না। তাকে চুমু খেলেই মুখে দুধের গন্ধ লেগে থাকত। তখন মদ খেতুম, তবু মনে হত মুখ থেকে দুধের গন্ধটা উঠছে না। বিশ্রি লাগত, তাই আর কোনদিন ছেলেদের কাছে আসতে দিইনি। কতদিন পরে পাচ্ছি সেই গন্ধ। সুপ্রিয়-সুব্রতকে সেই ছোট্টটি করে দেখতে পাচ্ছি। ওরা ছোট, ওরা অপরিণত, বোঝে না কোন সর্বনাশকে আঁকড়ে ধরছে।

"এমনি করে বসে আছ কেন, বারান্দায় নিয়ে যাব?"

দাদুর কোল থেকে উঠে পড়ল টুপু। দাদুর চোখের পাতা ঘনঘন পড়ে। চেয়ারটাকে যখন ঘরের মাঝ পর্যন্ত টেনে আনল তখনই ঘরে ঢুকল টুপুর মা। তাকে দেখামাত্র চেয়ার ছেড়ে জড়োসড়ো হয়ে গেল টুপু। গড়াতে গড়াতে চেয়ারটা আবার দেয়ালের সামনে এসে থেমে গেল। কথা না বলে শুধু তাকিয়ে রইল টুপুর মা, গুটিগুটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল টুপু। ওর পিছনে বড়বৌও বেরিয়ে যাচ্ছিল কি ভেবে ফিরে এল।

"মা'র নেকলেশ, যেটা ছোটবৌকে দিয়েছিলেন আজ দেখলুম শান্তার গলায়। ঠাকুরপোর সঙ্গে কোথায় যেন বেরোল। যখন আমি চেয়েছিলুম দিলেন না। একটা পাজি মেয়েমানুষের গলায় মা'র গয়না দেখলে কেড়ে নেওয়া উচিত নয়?"

দশাসই বড়বৌয়ের নাকের ফুটো বড় হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত চেপে সে আবার বলল, "আপনার ছেলে আমায় শাসিয়েছে, জানেন, সে আমায় চাবকাবে বলেছে যদি শান্তার গায়ে হাত দি। জানি ছেনালটার জন্য ওর খুব দরদ, কিন্তু সতীসাধ্বীর গয়না আমি ওর গায়ে উঠতে দোব না, এই বলে রাখলুম। আপনি তো ভালো করেই জানেন, ও গয়নায় আমার দাবি সকলের আগে। ঠিক কিনা বলুন?"

চোখের জল মুছল বড়বৌ। আঁচলে নাক ঝেড়ে, এধারওধার তাকাল, তারপর চুপিচুপি বলল, "ঠাকুরপো ছোটবৌয়ের সব গয়না ওকে দিয়ে দেবে, দেখবেন এই আমি বলে রাখলুম। মা'র সেকেলে ভারি ভারি গয়না—তার দাম কত আজকের দিনে। ওগুলো যদি আমায় দিতেন তাহলে নষ্ট হতনা। ঠাকুরপো যদি ওনার মতো হিসেবি হত তাহলে ছোটবৌয়ের এই সব্বোনাশ ঘটত না।"

সদ্য ডিমপাড়া মুরগির মতো বড়বৌ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টুপু বিকেল হয়ে এল। বাগানে এখন ঠাণ্ডা ছায়া পড়েছে। তুমি কি সেই বোলতাটাকে এখনো খুঁজছ। তোমার খেলার সাথীদের নিয়ে এস আমার কাছে। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমার ঘুম পাচ্ছে, টুপু। কখন আসবে, কখন আমায় বারান্দায় নিয়ে যাবে। বেলা পড়ে আসছে, অন্ধকার নেমে আসছে। আর যে কিছু দেখতে পাব না।

বারান্দায় সুপ্রিয় যখন পায়চারি শুরু করেছিল তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। যখন আকাশে অর্ধেক তারা দেখা গেল, সে দাদুর ঘরে ঢুকল। আলো জ্বালল না, একেবারে চেয়ারের পাশে চলে এল সে।

"আমি ওকে তাড়াব। শুনছ, আমি ওকে তাড়াব। আর সহ্য করব না। আমার বৌ-মেয়ে আছে, আমার বয়স হয়েছে। যতটা ভীতু ভাবে ততটা আমি নই একথা আজ বুঝিয়ে দোব। কি বল, পারব না? তাই করা উচিত নয় কি?"

সুপ্রিয় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শান্তার ঘরের সামনে ইতস্তত করে দাঁড়িয়ে পড়ল। দরজাটা বন্ধ, পর্দা ঝুলছে দরজার সামনে। সুপ্রিয় হাত বাড়িয়ে পর্দাটা ছোঁয়। হঠাৎ দাঁত দিয়ে পর্দাটাকে ছিঁড়তে শুরু করে।

টুপু, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ? এখন রাত কত? লুলা বাগানে ডেকে উঠল, ওকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। লুলা আজ সকাল থেকে ডাকছে। শান্তা এখনো

ফেরেনি। ও আজ ফিরবে না। টুপ্‌নু, তোমার বাবাকে দেখে সত্যি দুঃখ্যু পাই। হয়তো সুপ্রিয় একদিন আত্মহত্যা করবে তবু শান্তাকে পাবে না, তাকে আমিও পাইনি। সুপ্রিয় স্বেচ্ছায় মরতে চায় কিসের জ্বালায় ? এটা কি ওর স্বভাব। সুব্রত জানে সে একদিন মরবেই, তাই ভয়ে মরীয়া হয়ে উঠেছে সেই দিনটার কথা ভেবে।

টুপ্‌নু, শান্তা যদি আর না ফেরে, তাহলে আমি সেরে উঠব কি ? যদি তাই হয় খুব আশ্চর্যের ব্যাপার হবে, তাই না ? শান্তা যেন আর না ফেরে। তুমি আর আমি শুধু থাকব, থাকবে বাগানটা, আকাশটা, আর মাঝে মাঝে বোলতা কিংবা ফড়িঙ।

সিঁড়ি দিয়ে কে যেন উঠছে টুপ্‌নু। শান্তা কি চটি পরে বেরিয়েছিল ? কিন্তু শান্তা হবে কেন, সে তো আজ রাতে ফিরবে না। তাহলে কি লুলা ? রাত্রে ও সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। বারান্দায় এসে মাথা নিচু করে কি যেন শোঁকে, জানলায় পা রেখে ঘরের মধ্যে তাকায়, চলে যাবার আগে দরজা আঁচড়ায়। টুপ্‌নু, আমার ঘরের দরজাটা বোধহয় খোলা। এ ঘরে শেষ এসেছিল সুপ্রিয়। সে চলে গেল শান্তার কথা ভাবতে ভাবতে। বন্ধ করে গেছে কি দরজাটা ? কিন্তু বন্ধ করবে কেন, ওর কি তখন মনে ছিল লুলার কথা, তার মার কথা ?

টুপ্‌নু শব্দটা সিঁড়ি থেকে বারান্দায় উঠে এল যে ! ওখান থেকে এ ঘরের দরজায় আসতে কতক্ষণ লাগবে ? না, তার আগে জানলা দিয়ে দেখবে। অন্ধকার ঘরে চোখ সইয়ে নিতে দেরি হবে ওর। কত দেরি হবে ? দরজাটা ঠেলে আমার টুঁটির কাছে দাঁত আনতে ওর কত দেরি হবে ? লুলা আসছে। শীতে-ফাটা চামড়া চুলকোনোর মতো ওর নখের শব্দটা এগিয়ে আসছে। জানলায় শব্দ হল কেন ? তোমার ঠাকুমার ঘোমটার লালপাড়ে চুলের তেল লেগে বাসি রক্তের রঙ ধরত, লুলার জিভে কি লালপাড় জড়িয়ে আছে ? কেউ এসে বন্ধ করে দেবেনা এখন দরজাটা। আমাকেই বন্ধ করতে হবে, আমায় উঠতে হবে, আমায় বাঁচতে হবে। ওই ঝকঝকে বাঁকানো দাঁত, ফাঁকে ফাঁকে পচা মাংসের গন্ধ, ঠোঁট আর মাড়ির ভাঁজে জমে উঠছে লালা আর তাই চেটে নেবার শব্দ। আমায় উঠতে হবে, দরজা বন্ধ করতে হবে। কিন্তু আমার ক্ষমতা কই টুপ্‌নু !

কিন্তু আমার রক্ত কেমন ছুটতে শুরু করেছে ! আগুনের স্রোত যেন পুরনো শিরার ময়লাগুলোকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে ঠেলে নামছে। হালকা হয়ে যাচ্ছি। টুপ্‌নু, আমি ভোরের অন্ধকারের মতো হালকা হয়ে যাচ্ছি। আমার হাত কাঁপছে, শরীর কাঁপছে। হঠাৎ একি হল আমার ! তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছি কেন ! টুপ্‌নু, মনে হচ্ছে আমি বাঁচব, সুস্থ হয়ে বাঁচব। আমি মরতে চাই না। ইচ্ছে করছে এখন তোমার ঠাকুমাকে দেখতে, তার গায়ে হাত রেখে

কথা বলতে, হাসাতে, রাগাতে। আমার দুই ছেলেকে কোলে নিয়ে এখন বাগানে বেড়াতে চাই টুপু। দরজার কাছে খসখস শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আর-একদিন শুনেছিলুম, সেদিন লুলা ভেবে ভুল করেছিলুম। আঃ, এখন ওই শব্দটা যদি শান্তার চটির হয়! আমি বেঁচে যাব টুপু, আমি বেঁচে যাব!

হঠাৎ খুলে গেল দরজাটা। জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে লুলা গুঁড়ি মেরে ঘরের মধ্যে ঢুকল। থমকে পিছিয়ে এল। চাপা স্বরে গরগর করে উঠল। সে এবার ঝাঁপিয়ে পড়বে। চেয়ারে বসা জমাট মূর্তিটা দুলে উঠেছে। লুলা আরো এগিয়ে এল। ওর পিঠের রোঁয়া খাড়া হয়ে উঠেছে। কাঁপতে কাঁপতে দুটো হাত সামনে এগোল। ওদের ব্যবধান কমে আসছে।

হঠাৎ বিকট স্বরে দুবার ডেকে উঠল লুলা। কুড়ুলের প্রচণ্ড এক ঘায়ে যেন জমাট মূর্তিটা ভেঙে পড়ল চেয়ারে। লুলা এগিয়ে এসে শুঁকল ঝুলেপড়া নিস্পন্দ হাতটা। শুঁকতে শুঁকতে হাত বেয়ে উঠে এল তার মুখ। গলার কাছে থমকে গেল তার দাঁত আর টুঁটির উপর কেঁপে উঠল নাক। লালা গড়িয়ে পড়ল কষ বেয়ে। আর টুঁটির ওপর থেকে চোখ বুঁজে তাই চাটতে চাটতে সুখে গরগর করে উঠল লুলা।

কদিন খটাং খটাং করে অবশেষে পাখাটা মাঝরাতে বন্ধ হয়ে গেল। ঘুম ভেঙে যাওয়ার কারণটা বুঝে সুধীন খিঁচিয়ে উঠল। "মনে করে একটা পাখা মিস্ত্রিও ডাকতে পারনি ? সারারাত এখন ছটফট করি !"

"মিস্ত্রি কি আমি গিয়ে ডেকে আনব ? পাঁচদিন আগে বলেছি পাখাটা কিরকম বিদঘুটে শব্দ করছে, একবার দেখ।" যতটা চাপা স্বরে নিঝুম রাতে ঝাঁঝ দেখানো যায়, সুধা দেখালি।

"খোকাকে দিয়েও তো ডাকাতে পারতে, না সেটাও আমার জন্য তুলে রেখেছ।" বিড়বিড় করতে করতে সুধীন মেঝেয় নেমে শুল। হুল ফুটিয়ে পাশের ঘরের টেবল পাখাটা বোলতার মত শব্দ করে যাচ্ছে। ওটাকে নিয়ে এলে খোকার কষ্ট হবে এই ভেবে সুধা রান্নাঘর থেকে হাতপাখা এনে সুধীনকে বাতাস শুরু করল। বাইরে ফটফটে জ্যোৎস্না, সুধার মনে হল, এর বদলে হুহু হাওয়া দিলে দুর্ভোগ কত কমে যেত।

সকালে বাজার থেকে ফিরে সুধীন বলল, "ইলেকট্রিক দোকানটা এখনো খোলেনি, কলেজ যাবার আগে খোকা যেন অবশ্যই মিস্ত্রিকে খবর দিয়ে আসে।" ওরা দুজন বেরিয়ে গেলে সুধার আর কিছু করার থাকেনা। খাওয়া সেরে দিনরাতের ঝি বঙ্কুরমা দুপুরটা মেয়ের বাড়ি কাটাতে যায়। সুধা দরজা-জানলা বন্ধ করে পাখা চালিয়ে মেঝেয় শুয়ে থাকে, আজ শুয়েছে খোকার ঘরে। ঘুমটা সবে জমে উঠছে, তখনই কড়া নাড়ার শব্দ হল।

দরজা খুলে দেখল শীর্ণ দেহ, আধবুড়ো একটা লোক, পরনে খাঁকি ট্রাউজার্স আর নীল হাওয়াই শার্ট, দুটোই ময়লা ; কানের পিছন দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। কাঁধ তুলে জামায় ঘাম মুছে বলল, "পাখা খারাপ হয়েছে বলে কি দোকানে খবর দিয়েছিলেন ?"

"আমার ছেলে দিয়ে এসেছে, আসুন।" মিস্ত্রিকে ঘরে নিয়ে এল সুধা। গায়ে ব্লাউজ না থাকায় খুব অস্বস্তি হচ্ছে, তবে লোকটা মিস্ত্রি আর ছেলে-ছোকরা নয় সুতরাং আঁচলটা শুধু এধার ওধার টেনে দিল।

মিস্ত্রি সুইচ টিপল, পাখা ঘুরল না। সেলাই কলের টুলটা টেনে নিয়ে বলল, "একটা চেয়ারও লাগবে।"

খোকার ঘর থেকে নিজেই চেয়ার আনবে কিনা ভেবে সুধা ইতস্তত করল। এ সব কাজ তো মিস্ত্রিদেরই করার কথা।

"পাশের ঘরে আছে।"

সুধা সঙ্গে করে মিস্ত্রিকে নিয়ে এল। খোকা কলমটলম ফেলে যায় টেবলে। চেয়ার এনে তার উপর টুলটা রাখল। রাখার জায়গা নেই বললেই হয়। একচুল সরে গেলেই টুলটা পড়ে যাবে। সুধা অবাক হয়ে গেল, অদ্ভুত কায়দায় মিস্ত্রিকে উপরে উঠতে দেখে। তাড়াতাড়ি সে টুলটা দু হাতে আঁকড়ে ধরল। মিস্ত্রি পাখার ব্লেড খুলতে খুলতে বলল, "আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে। আপনি ছেড়ে দিন।"

"তবু যদি অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যায়।"

সুধার ভয় হল, তাহলেই তো পুলিশ টানাহ্যাঁচড়া করবে। অবশ্য অ্যাকসিডেন্ট মানেই অনিচ্ছাকৃত, তাতে দোষ নেই। মিস্ত্রি পাখার ব্লেডগুলো খোলে আর সুধা সেগুলো নিয়ে মেঝেয় রাখে, তারপর সিলিংএর আংটা থেকে হাঁড়িটা চাড় দিয়ে তুলে খুলল! কাঁধে রাখল, সিধে অবস্থায় উবু হয়ে বসল, একটা পা সাবধানে টুলের নিচে চেয়ারে রাখল, তারপর অন্য পা। মেঝেয় নামল টুক করে লাফিয়ে। সুধা সারাক্ষণ টুল আঁকড়ে রইল।

পাখার হাঁড়িটা দেখে সুধার মনে হল, ব্লেড সমেত যখন ঘোরে তখন বোঝা যায় না, কিন্তু এখন দেখাচ্ছে ঠিক সুধীনের মুণ্ডু। দুটো চোখ একটু গোঁফ, টাক মাথা। শুধু যা টিকিটাই সুধীনের নেই। এটা ওরই কেনা, খোকা হবার দু'মাস পর। মিস্ত্রি স্ক্রুগুলো খুলে মুণ্ডুর খুলিটা ফাঁক করল। বাসি রক্তের মত চিটচিটে কালো তেল, ভুষি ইত্যাদি। সুধীনের মাথার মধ্যেটাও এরকম কিনা—এই ধরনের একটা সন্দেহ সুধার মনে দেখা দেওয়ার উপক্রম করতে না করতেই মিস্ত্রি বলল, "এখানে সারানো যাবে না, নিয়ে যেতে হবে।"

"কেন!"

"কমুটেটারের মাইকা গেছে।" বলে মিস্ত্রি একটা জায়গা দেখাল সুধার যেটাকে দাঁতের পাটি মনে হল।

"কদিন লাগবে?"

"চার পাঁচ দিন।" মিস্ত্রি খুলিটাতে স্ক্রু আঁটতে আঁটতে বলল।

"এই গরমে অদ্দিন পাখা ছাড়া! তাহলেতো মরেই যাব।"

মিস্ত্রি হাসল, খুব গূঢ় ধরনের। শিশুরা আপন মনে যে ভাবে হাসে বা শিশুদের হাসি দেখে বয়স্করা। "হাতে এখন প্রচুর কাজ। পাঁচ দিনে হয় কিনা কে জানে।"

"কত লাগবে?"

"আঠারো টাকা।" বলল যেন হিসেব কষে, কিন্তু সুধার মনে হল, আগেই

যেন ঠিক করে রেখেছিল। তবে পাখা হাতছাড়া করা চলবে না। লোকটা চোর-ছ্যাঁচড় কি না কে জানে। মিস্ত্রি সেজে এ-রকম তো অনেকেই আসে। তাছাড়া আঠারো টাকার মত ব্যাপার, সুধীনকে না জানিয়ে কি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

"উনি বরং আসুন, পরে জানাব।"

দু-দিক রেখে সুধা বলল। পাখার মুণ্ডুটা ঘরের একধারে সরিয়ে চেয়ারটা পাশের ঘরে রেখে মিস্ত্রি বেরিয়ে যাচ্ছে। সুধা সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। দরজাটা পার হয়েই মিস্ত্রি হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনাকে প্রথমে চিনতেই পারিনি। বেশ মোটা হয়ে গেছেন। গলার জড়ুলটা দেখে চিনলাম, আপনি প্রফুল্লর বৌ।"

সুধার একটু সময় লাগল মাথাটা ঘুরে উঠতে। ঝাপসা হয়ে গেল দেয়াল, সিঁড়ি, এবং সামনের লোকটি। অস্ফুটে বলল, "আপনি কার কথা বলছেন? আপনি কে?"

"আমার নাম হরিশঙ্কর দাঁ। আপনার বিয়েতে আমি একজন সাক্ষী ছিলুম। এত দিন হয়ে গেল আমাকে অবশ্য চিনতে না পারারই কথা। কতক্ষণই বা দেখেছেন। আমি আর বলাই চন্দ সাক্ষী ছিলুম। আপনি ট্যাক্সি করে এলেন, চটপট সই করলুম আমরা। বাড়ি থেকে লুকিয়ে এসেছিলেন তাই তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিতেই চলে গেলেন। আমার বৌ কাগজে মুড়ে সিঁদুর দিয়েছিল। মনে আছে, আপনার সিঁথিতে একটুখানি লাগিয়ে দিয়েছিলুম তাইতে আপনি খুব ভয় পেলেন!"

সুধা একদৃষ্টে হরিশঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে। চোখে যে অবিশ্বাসটুকু ছিল তা ঘুচে গেছে। কিন্তু এতদিন পর কিভাবে কোথা থেকে লোকটা হাজির হল! এটা যদি অ্যাকসিডেণ্ট হয়, তাছাড়া আর কি, তাহলে ওর আসাটা ইচ্ছাকৃত নয়। সুতরাং ওর কোনো দোষ নেই। এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী সুধীনের মুণ্ডুর মত পাঁখাটা। কেন যে খারাপ হয়, কোম্পানীটাই জোচ্চোর। কিন্তু কি আশ্চর্য—দড়াম করে সুধা দরজাটা বন্ধ করে দিল—এতদিন পর ও চিনতে পারল আর আমি পারলাম না। লোকটা তাহলে মনে করে রেখে দিয়েছে, তার মানে মতলব আছে।

অস্থির হয়ে খুব পায়চারি করল সুধা ঘর, বারান্দা, দালান ঘুরে। শেষে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। বুকটা ভার হয়ে আসছে। কপালে হাত রেখে চোখ বন্ধ করল। খুলতেই সিলিং পাখার আংটা দেখল। জায়গাটা খালি-খালি লাগল। তাইতে ওর মনে পড়ল এই রকম খালি কিংবা আর একটু বেশিই হবে, লেগেছিল প্রফুল্লর মৃত্যুর খবর পেয়ে। তার আগে অবশ্য বিয়ের ব্যাপারটা বাড়িতে জানাজানি হয়ে যাওয়ায়, দোতলা থেকে একতলায় নামা বন্ধ হয়ে গেছল। খুব খুশী হয়েছিল বাড়ির সবাই। একে বেজাত, তায়

চটকলের সামান্য কেরানী, ইউনিয়ন করে, আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, মেসে থাকে, এমন ছেলের সঙ্গে বিয়েতে কে অখুশী নাহয় ! খোকা যদি মেয়ে হত, আর অমন একটা ছেলেকে যদি ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করে বসত ! এই পৃথিবীতে, ব্যাপার-টাকে বিরাট এবং জোরালো করার জন্য সুধা ভাবল,—কোন বাপ-মা রাজী হবে ? ধানবাদের কাছে জি টি রোডে প্রফুল্ল লরী চাপায় মারা গেল বিয়ের পনেরো কি ষোল দিন পরই। প্রফুল্ল ঢে'কুর তুলত, অম্বল ছিল। মাকুন্দও ছিল। বেশ কাঁচ-কাঁচ একটা ভাব ছিল ওর মুখে। ছোট কাকা বলল, যে গেছে তার জন্য দুঃখ করতে হয় কর, আমরা বুঝতেই পারছি। পাঁচমাস ছ'মাস যত সময় চাস নে। কিন্তু কতবড় ভবিষ্যৎ তোর সামনে, বয়স তো মোটে বাইশ। একটা ভাল পাত্তর হাতে এসেছে। বিধবা হয়ে না থেকে বিয়ে করে ফেল। আমরা চারজন ছাড়া কেউ জানতেও পারবে না। চারজন মানে বাবা মা কাকা কাকী।

বাবা মারা গেছেন। তা হলে রইল তিনজন। হঠাৎ এই সাক্ষীটা এসে আবার চারজন হয়ে গেল। তাই বা কি করে হয় ! সুধা বিরক্ত হয়ে উঠল, বলাই চন্দ নামে একটা লোকের নাম করল। সেও তো জানে ! তা হলে পাঁচজন। কোনদিন দরজি কিংবা ছাতাসারাইওলা কিংবা বাস-কণ্ডাক্টার বলবে, আপনি মোটা হলেও রঙটা ময়লা হলেও গলার জড়ুলটা দেখে ঠিকই চিনেছি। আপনার বিয়েতে আমি সাক্ষী ছিলুম, চিনতে পারছেন না, আমি বলাই চন্দ ! এই যে একটা চিহ্ন—শরীরের এত জায়গা থাকতে ভগবান কেন যে গলায় দেগে দিল।

সুধা গলায় হাত বুলোতে লাগল। জীবনের প্রথম চুমুটা এখানেই। প্রফুল্লই দিয়েছিল বেলুড়ে গঙ্গার ধারে বসে। এর কোনো সাক্ষী-টাক্ষি নিশ্চয় হাজির হয়ে বলবে না, আপনিও তো চুমু দিয়েছিলেন। বলা যায় না ! কে ভেবেছিল এতদিন পর এই লোকটা হাজির হবে ?

এটাও অ্যাকসিডেণ্ট, অতএব - সুধা একটু অসুবিধা বোধ করল—কাউকেই তো দোষ দেওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এই হরিশঙ্কর যদি সুধীনকে বলে দেয়, মশাই আপনার বৌয়ের আগে একটা বিয়ে হয়েছিল, তা জানেন কি ? শোনামাত্রই রগচটা সুধীন হাতের কাছে যা পাবে দমাস করে কষিয়ে দেবে। যদি হরিশঙ্করকে কষায় তা হলে ও মরে যাবে।

সুধা মৃত হরিশঙ্করকে দেখে ভয় পেল। এর জন্য সুধীনের নিশ্চয় ফাঁসি হবে। তবে সুধীন এম এ পাস, একটা ব্যাঙ্কের সাড়ে ন'শো টাকার দায়িত্ববান কর্মচারী। বি এস-সি পড়া ছেলের বাবা, বৌয়ের নামে সল্ট লোকে তিন কাঠা জমি কিনেছে, সে কি এমন হঠকারিতা করবে ! নিশ্চয় প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে যাবে। কাতর হয়ে পড়বে। একটা আঘাত তো বটে ! শয্যাশায়ীও হতে

পারে। সুধার মনে পড়ল, পাঁচ দিন কি চার দিন সে শুয়েছিল। চোখ দিয়ে খালি জল ঝরত। সুধীন যদি ওইভাবে কাঁদতে শুধু করে। আর একটা সম্ভাবনার কথাও ভাবা যায়। তখন মরতে ইচ্ছে করেছিল। এক্ষেত্রে সুধীনের কাছে এই খবরটা স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ তুল্যই। সুতরাং সে আত্মহত্যা করলেও করতে পারে। তবে যতদূর মনে হয়, সুধা আশা করল, তা করবে না। তা হলে কি করতে পারে? অর্থাৎ এই কথাটা শোনার পর?

ভেবে ভেবে সুধা গোটা দুপুরটাই নাজেহাল হয়ে গেল।

শোনামাত্র সুধীন চীৎকার করে উঠল।

"পাঁচ দিন গরমে পচতে হবে? আঠারো টাকা গচ্চা দিতে হবে যখন, দিয়ে দিলেই পারতে। কালকে দেওয়া মানে দু' দিন গরমে পচা! সাধে কি আর বলি—" পাশের ঘরে খোকা আছে তাই থেমে গেল।

"লোকটা খাঁটি কি না জেনেই দিয়ে দোব? যদি ঠগ-জোচ্চোর হয়!" এই বলেই সুধার মনে হল, সাক্ষী ছিলুম বললেই তো হয় না, প্রমাণ দিতে হবে। সুধীন যখন বলবে, মুখের কথায় এত বড় একটা ব্যাপার কি মেনে নেওয়া যায়— হরিশঙ্কর তখন কিভাবে প্রমাণ করবে? সেই বলাই চন্দকে ডেকে আনবে? ও রকম সাক্ষী তো ভাড়া করেও আনা যায়। আসলে অকাট্য প্রমাণ চাই।

"খোকাকে বলে দিও মিস্ত্রিকে বলে আসে পাখাটা নিয়ে যাবার জন্য। আর, একটা পাখা যেন ভাড়া করে আনে।" এই বলে সুধীন বাসি খবরের কাগজ পড়তে শুরু করল। এই তো কত সহজেই ভাড়া করা যায়, সুধা ভাবল। মানুষ ভাড়া করা কি এর থেকেও শক্ত!

রাত্রে ঘুম এল না। সুধা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। কাল পূর্ণিমা গেছে। খুব জ্যোৎস্না হয়েছে। হাতটা সে বাড়িয়ে দিল। বেলুড় থেকে নৌকোয় পার হওয়ার সময় এই রকম জ্যোৎস্না ছিল। হাতটা এগিয়ে ধরে প্রফুল্ল বলেছিল, ঠিক যেন বৃষ্টির মত হাতে পড়ছে।

. কিছুক্ষণ হাতের দিকে তাকিয়ে থেকে বিরক্ত হয়ে সুধা টেনে নিল। বৃষ্টি না আর কিছু, হলে তো বেঁচে যাই। তারপর ঘরে এসে গা আদুড় করে সুধীনের পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন দুপুরে হরিশঙ্কর একটা পুরনো কালো পাখা নিয়ে এল। হাঁড়িটা মস্ত বড়। তাতে গোটা দশ-বারো গর্ত। সুধা মিষ্টি গলায় ওকে ভেতরে আসতে বলল। খুব ঘেমে গেছে দেখে আরো মিষ্টি করে বলল, "এত ভারী একটা জিনিস বয়ে এনেছেন, আগে জিরিয়ে নিন।"

তাইতে নিরাসক্ত পেশাদারী গলায় হরিশঙ্কর বলল, "এ সব অভ্যেস আছে।" এবং তাইতে সুধার মনে হল, লোকটা সুবিধের নয়।

হরিশঙ্কর পাশের ঘর থেকে চেয়ার আনল। টুলটা তার উপর রেখে কালো পাখাটা কাঁধে নিয়ে উঠতেই কালকের মত সুধা আঁকড়ে রইল টুল।

"আপনি খুব এক্সপার্ট, কতদিন এ কাজ করছেন?" সুধা আলাপ জমাবার চেষ্টা শুরু করল।

"অনেক দিন।"

"আগে তো কারখানায় কাজ করতেন।"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে!"

ঘাড় নিচু করে হরিশঙ্কর তাকাল। গায়ে ব্লাউজ আছে, তবুও কেমন যেন করে উঠল সুধার সর্বাঙ্গ।

"আপনি জানেন না?" হরিশঙ্কর নিথর গলায় প্রশ্ন করল।

"কি?"

"প্রফুল্লের জন্য আমরা ছাঁটাই হই।"

"না তো, কেন?"

ব্লেডগুলোর দিকে আঙুল দেখাল হরিশঙ্কর। সুধা এক-এক করে সেগুলো ওর হাতে তুলে দেবার সময় আবার বলল, "কেন?"

"আমাদের স্ট্রাইকটা ভেঙে গেল ওর জন্যই। কোম্পানী ওকে ভাল চাকরি দিয়ে বদলী করে দেবে বলেছিল। ও টোপ গিলল। আমি, বলাই আরও দুজন ছাঁটাই হয়ে গেলুম।" হরিশঙ্করের ভঙ্গি বা স্বরে রাগ নেই। কাজ করতে করতেই বলল, "তখনকার দিনে এত কল-কারখানা তো ছিল না। ভগ্নিপতির ইলেকট্রিকের দোকান ছিল, ঢুকলুম। তারপর নিজে এক মুসলমানের সঙ্গে দোকান করলুম। আড়াই বছর আগে যে দাঙ্গা হল তাতে দোকানটা লুট হয়ে গেল। সেই থেকে এই দোকানে কাজ করছি।"

"আর সেই ভদ্রলোক!" সুধা বলতে যাচ্ছিল 'সেই সাক্ষী'। শেষ মুহূর্তে 'ভদ্রলোক' বেরিয়ে এল।

"বলাই? সে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।"

"অ্যাঁ।" সুধা বজ্রাহত হল পলকে, "মরে গেছে?"

টুল থেকে নেমে এল হরিশঙ্কর। সুইচ টিপল। পাখা ঘুরতে লাগল।

"কে চাকরি দেবে বলুন। বড় সংসার ছিল। বহু চেষ্টা করেও কিছু পারল না। একদিন বলল 'হরিদা, কারুর উপর আর আমার বিশ্বাস নেই। সবাইকে ঘেন্না করতে ইচ্ছে করে। আমি তবে বাঁচব কি করে।' দু দিন পর শুনলুম ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে।"

সুধা ধীরে ধীরে খাটে বসল। তা হলে পাঁচ নয়, চারজনই রয়েছে। একটা দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেয়েই তার মনে হল বলাই লোকটা বোধহয়

সৎ। বিশ্বাস, ঘেন্না এ সব নিয়ে মাথা ঘামানো কি আর বাজে লোকের কর্ম! এই লোকটা বাজে তাই গলায় দড়ি দেয়নি। দিলে চার নয় তিনজন হয়ে যেত। মা, কাকা, কাকী। মা বুড়ি হয়েছে শিগগীরই মারা যাবে, তাহলে থাকবে দুই। ওরা দুজনই তো বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল। সুতরাং জীবনে মুখ খুলবে না। কাজেই এ ক্ষেত্রে ওরাও মৃত। শুধু জ্যান্ত রয়েছে এই হরিশঙ্করটা।

"প্রফুল্ল ছেলে খারাপ ছিল না।" হরিশঙ্কর সান্ত্বনা দিচ্ছে কিনা সুধা বুঝে উঠতে পারল না। লোকটার হাবভাব এখন মোটেই মিস্ত্রির মত নয়। এটা তার পছন্দ হচ্ছে না।

"ওর পতন ঘটে আপনার সঙ্গে মেলামেশা হয়ে। অন্তত আমাদের তো তাই ধারণা। বিয়ে করে বৌকে সুখে রাখবে বোধহয় সেই জন্যই—"

"না না, আমি তো ও রকম কিছু চাইনি। আমি তো বলেছিলাম তুমি যেভাবে রাখবে সেই ভাবেই থাকব। সুখে রাখবে এমন ছেলে কি তখন আমি পেতাম না? এই তো নিজের চোখেই এখন দেখুন না। তবুও তো প্রফুল্লকে বিয়ে করেছিলাম।" সুধা কিছুটা ব্যস্ত হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করল। লোকটা যেন তাকেই দায়ী করতে চাইছে। এটা খুবই অন্যায়। আসলে প্রফুল্লকে তো আর পাচ্ছে না তাই দোষটা এখন আমার ঘাড়ে চাপাতে চায়। সুধা দুঃখও বোধ করল। কতখানি ত্যাগ সে করেছিল, লোকটা তা নিয়ে একটা কথাও বলল না! সুধা রেগেও উঠল। কৃতকর্মের জন্য প্রফুল্লর নিশ্চয়ই অনুশোচনা হয়েছিল। নয়তো আত্মহত্যা করবে কেন। অথচ প্রফুল্লর এই মহৎ দিকটা একদমই দেখছে না লোকটা। দেখিয়ে দেওয়া উচিত বিবেচনায় সুধা বলল, "কত অন্যায় কাজ করে কত লোক বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রফুল্লও তো আত্মহত্যা না করে থাকতে পারত।"

"আত্মহত্যা?" অদ্ভুতভাবে হরিশঙ্কর তাকাল ওর দিকে। স্বরে চিড় ধরিয়ে বলল, "কে বলল আপনাকে?"

"কে আবার বলবে। শুধু প্রফুল্লরই পতন হয়েছিল আর আপনাদের কারুর হয়নি কতটা সত্যি যে। অকাট্য কোনো প্রমাণ তো আর এখন পাওয়া যাবে না।"

"পাখাটা তাহলে নিয়ে যাচ্ছি।"

হঠাৎ হরিশঙ্কর আলোচনায় ছেদ টেনে পেশাদারী গলায় বলে উঠল, "দিন পাঁচেক পরে পাবেন।"

দরজার কাছে এসে আগের দিনের মত ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনার বিয়ের অকাট্য প্রমাণ ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা কিন্তু আমার কাছে রয়ে গেছে। প্রফুল্ল আমার কাছে রেখেছিল আর ফেরত দেওয়া হয়নি।"

সুধা দাঁড়িয়ে রইল আর পাখাটাকে মেরামত করার জন্য নিয়ে চলে গেল হরিশঙ্কর। অন্যের বিয়ের অকাট্য প্রমাণটা আজও রেখে দিয়েছে। কেন? নিশ্চয়ই মতলব আছে। সুধা এই চিন্তায় সারা দুপুর-বিকেল তোলপাড় হয়ে গেল।

খুশী হল সুধীন। এই পাখাটায় হাওয়া যেন বেশিই লাগছে। চটপট সে ঘুমিয়ে পড়ল। সুধার ঘুম এল না। না আসারই কথা, কেননা বুকে পাষাণভার চেপে বসেছে। সার্টিফিকেটটা খুবই সর্বনেশে হয়ে উঠতে পারে। এই বয়সে যদি ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যায় তাহলে—সুধার মনে হল, পাখাটা সুধীনের ঠিক পেটের উপর পড়বে। বেশ দুলছে মুণ্ডু নাড়িয়ে। গর্তগুলো দিয়ে বিদ্যুৎ চিড়িক দিচ্ছে। যদি খুলে পড়ে! নির্ঘাত মৃত্যু ঘটবে। অ্যাকসিডেন্টই বলা হবে, কিন্তু হরিশঙ্করকে কি পুলিশে ধরবে না? যদি ধরে তাহলে বাঁচা যায়। তাহলে অবশ্য টেনে সংসার চালাতে হবে। একশো তিরিশ টাকা বাড়িভাড়া আর দেওয়া চলবে না। অফিস-ইনসিওরেন্স মিলিয়ে হাজার পঞ্চাশেক, সেদিনই তো হিসেব করে সুধীন কত যেন বলল, পাওয়া যাবে। খোকা না দাঁড়ানো পর্যন্ত, ওইতেই চলে যাবে। তা ছাড়া জমিটাও আছে। খোকা চাকরি হলে মেয়ে দেখতে হবে। ভাল মেয়ে পাওয়াও মুশকিল।

এই সময় বিড়বিড় করে সুধীন পাশ ফিরল। সুধা আন্দাজে হিসেব করে দেখল পাখাটা যদি পড়ে ঠিক পেটে নয়, পিঠ ঘেঁষে পড়বে। তাতে মারাত্মক কিছু নাও ঘটতে পারে। এতে সে খুব আশ্বস্ত বোধ করল। গ্লানিও হল। সুধীন একটু রগচটা, খিটখিটে, কিন্তু মানুষ ভাল। এত বছর বিয়ে হলে কোন স্বামী-স্ত্রীর না ঝগড়াঝাটি হয়! সুধা হাত বাড়িয়ে সুধীনের পিঠে বোলাতে লাগল। একটা-দুটো ঘামাচিও মেরে দিল। এখন তার মায়া হচ্ছে।

দুপুরে দরজায় তালা দিয়ে সুধা বেরোল। বাস স্টপের কাছেই ইলেকট্রিকের দোকান। রাস্তা থেকে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কাউন্টারের পিছনে বসে লাটাইয়ের মত একটা জিনিসে হরিশঙ্কর তার জড়াচ্ছিল। সুধা বলল, "পাখাটা একটু তাড়াতাড়ি করে দিন।"

"বলেছি তো দিন পাঁচেক লাগবে।" রুক্ষ স্বরে হরিশঙ্কর বলল। হঠাৎ পিছন থেকে সুধার গলা শুনে চমকে উঠেছিল। সেই অপ্রতিভতার জন্যই যে রেগেছে সুধা তা বুঝতে পেরে, কাকুতি করে বলল, "ইচ্ছে করলেই আপনি তাড়াতাড়ি পারেন। যেটা লাগিয়ে দিয়েছেন," স্বরটা আদুরি করে, "এমন বিচ্ছিরি দেখতে আর এমন দুলছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে যে ভয় হয় বুঝি খুলে পড়বে। উনি আবার ঠিক পাখার নিচেই শোন।"

"ও সব পাখা একটু দোলেই।" হরিশংকরের নিস্পৃহ ভঙ্গি লক্ষ্য করে সুধা আহত হল। ভাবল, একটু পাষাণভার চাপিয়ে দিই।

"ধরুন, যদি খুলেই পড়ে, তাহলে কাজে অবহেলার জন্য তো আপনাকেই পুলিশে ধরবে।"

"আমাকে?" হরিশংকর ঘাড় বেঁকিয়ে তীব্র চোখে তাকাল। "পুলিশ আমার কি করবে? তা ছাড়া—" সিনেমার খল চরিত্রাভিনেতার মত ঠোঁট মুচড়ে, চোখ সরু করে, "পাখাটা যে আপনিই আলগা করে রাখেননি তার প্রমাণ কি?"

যৎপরোনাস্তি চমকে উঠে সুধা বলল, "কেন?"

"তাতে তো আপনারই লাভ।"

কিছুক্ষণ দুজনে তাকিয়ে রইল।

"প্রমাণ?"

"সার্টিফিকেট।"

"ওটা আপনার কাছে কেন? যার জিনিস তাকে ফেরত দেননি কেন?"

"সে তো মরে গেছে।"

"আমি তো বেঁচে আছি।"

"আপনি তো এখন আর প্রফুল্লর বৌ নন।"

"হ্যাঁ, আমি ওর বৌ, আমিই।"

"প্রমাণ?"

"সার্টিফিকেট।"

"ওটা কি আপনি ফেরত চান?"

"নিশ্চয়। আমার জিনিস আমি রাখব না? আপনি কেন রেখেছেন? নিশ্চয় কোনো মতলব আছে।"

ওরা দুজন চাপা হিংস্রস্বরে কথা বলে যাচ্ছে যেহেতু দোকানটা রাস্তার উপর পথচারীরা কয়েক হাত দূরেই। হরিশংকর মুঠ-করা হাতটা কাউন্টারে আঘাত করে বলল, "কি মতলব? যদি তাই-ই থাকত তাহলে ওটা ভাঙিয়ে আপনার কাছ থেকে টাকা কি আদায় করতে পারতাম না?"

হরিশংকর অতঃপর অট্টহাসি করল না অর্থাৎ সে অভিনয় করছে না। সুধার ক্রোধ ভেস্তে গেল এই শুনে। এ রকম হয় বলেই সে শুনেছে। যদি টাকা চেয়ে বসে, তাহলে? সোজা পা জড়িয়ে ধরব। নিশ্চয় দয়া হবে। বলব আমি অবুঝ, না ভেবেই বিয়েটা করেছিলাম। আসলে প্রফুল্লই ফুসলেছিল। খবরের কাগজে মামলার খবরে দেখেন না?

"তা ছাড়া আর যে মতলব থাকতে পারে তা আপনার মত থলথলে মুটকি আধবুড়িকে দেখে মোটেই ইচ্ছে হয় না।"

সুধা হাঁফ ছাড়ল। বয়স হওয়ার এই এক সুবিধা। কিন্তু সুধীনকে যদি প্রমাণটা দেখায়! এখনো তো অনেক দিন বাঁচব। সুধার মনে হল, অনেক দিন বাঁচার লোভ আগে হয়নি, এখন হচ্ছে। ওই সার্টিফিকেটটা পেলেই আয়ু বেড়ে যাবে। কিন্তু পাওয়া যায় কি করে! হরিশঙ্কর একদৃষ্টে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। কিছু একটা গভীর হয়ে ভাবছে। সুধা গলা খাঁকারি দিল। হরিশঙ্কর নিথরভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, "আমি জানি আপনি এখন কি ভাবছেন। ভাবছেন, লোকটা মরে গেলেই আপদ চোকে।"

"সে কি, মোটেই তা ভাবিনি!" সুধা ক্ষুব্ধ তো বটেই, বিস্ময়ও বোধ করল।

"ভাবছেন, যদি না মরে তাহলে খুন করব। এই রকমই মনে হয়। আপনি অস্বীকার করবেন করুন। কিন্তু প্রফুল্লর জন্য আমাদের অনেকের সর্বনাশ হয়েছে, তাদের পরিবার ছারখার হয়েছে, এক-আধজন তো নয়। ওই কাগজটা চাইছেন, প্রফুল্লর বৌ এই দাবিতে, তাই না?"

"না, না, আমার স্বামী প্রফুল্ল নয়। এই দেখুন, আপনি খোকার বাবার কথাটা ভুলেই যাচ্ছেন। আসলে ওটা রেখে আপনার কি লাভ। দিয়ে দিলে একটি মেয়ের—" শুধরে নিয়ে সুধা একই স্বরে, "একটি মায়ের যদি উপকার হয়, তাহলে দিয়ে দেওয়াই উচিত।"

কথাগুলো হরিশঙ্কর শুনল কিনা কে জানে, তবে অন্যমনস্কের মত বলল, "আপনি এখন যান। পাখাটা সারানো হলেই দিয়ে আসব।"

সুধা দু-চারবার কথা বলে জবাব না পেয়ে বাড়ি ফিরে এল রাগ নিয়ে। লোকটা কিভাবে বলতে পারল ওকে খুন করব ভাবছি! তাই কি সম্ভব?

বিছানায় শুয়ে অনেক রকম করে ভাবল তার পক্ষে হরিশঙ্করকে খুন করা আদৌ সম্ভব কি না। যেদিন পাখা লাগাতে আসবে এক কাপ চা দেবো বিষ মিশিয়ে। গন্ধ পাবে না এমন বিষ। তবে বিষটা যোগাড় করতে হবে। ছোটকাকার বন্ধুর এক ডাক্তার ছেলে আছে। ভাল ভাল বিষ নিশ্চয় তার কাছে থাকে। কিন্তু চাইলেই তো সন্দেহ করবে। আর হয় গলা টিপে মারা। তা পারা যাবে না, ওর গায়ের জোর বেশীই হবে। গঙ্গার ধারে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যদি ঠেলে দেওয়া যায়? সাঁতার জানে কিনা কে জানে। আর এক হয় দরজা খুলে পাশে দাঁড়াব। যেই ঢুকবে কয়লা ভাঙা লোহাটা দিয়ে মাথায় কষাব। তিন চার ঘা দিলেই মরবে। কিন্তু লাশটা কিভাবে পাচার করা যায়!

সারা দুপুর সুধা ভাবল। রাতে এবং পরদিন দুপুরেও ভাবল। প্রায় বারো-তেরোটি উপায় পেল খুন করার। গুণ্ডা দিয়ে বোমা মারার কথাও ভেবেছিল। কিন্তু কোনোটিই তার পক্ষে করা সম্ভব হবে না। বুঝে খুব

বিমর্ষ হয়ে বিকেলেও বিছানা থেকে উঠল না। বঙ্কুর মাকে বলল, শরীর খারাপ। শুনে বঙ্কুর মা মুচকি হাসল।

সন্ধ্যার পর সুধীন বাড়ি ফিরল মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায়। জামায় রক্তের ছিটে। দেখামাত্রই সুধা হাউমাউ করে উঠল, "ও মা কে মারল, কি করেছিলে ?"

"বাস থেকে পড়ে গেছি।" সুধীন পাত্তা দিল না সুধার উদ্বেগকে।

"কি করে পড়লে, নামতে গিয়ে না ওঠার সময় ? যদি বাসের তলায় যেতে !" বলেই সুধার মনে হল, তাহলে হরিশঙ্করের জারিজুরি আর চলত না।

"ওই এক কথা। পড়ে গেলেই যেন বাসের তলায় যেতে হবে। কেন, গেলে কি তোমার সুবিধে হয় ?"

এই শুনে সুধা বিনিয়ে কাঁদতে শুরু করল। বিরক্ত হয়ে সুধীন একটু পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। রাতে বিছানায় সুধা অভিযুক্ত করল সুধীনকে, "তখন ওকথা বললে কেন। তুমি মরলে আমার কি সুবিধে হবে শুনি ?"

সুধীন নিরুত্তর রইল। নাড়া দিয়ে সুধা পুনরাবৃত্তি করতেই সুধীন উত্তেজিত হয়ে বলল, "সব আগে ওই কথাটাই বা তোমার মনে এল কেন যে আমি বাসের তলায় যেতুম। নিশ্চয় মনে মনে তাই ভাবছিলে।"

শুনে সুধার মাথাটা গরম হতে শুরু করল। আমি কি ভাবছি তাই নিয়ে সকলেই ভাবছে দেখছি। কেন, এ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি, তা কি হরিশঙ্কর বা সুধীন মনে করে না ? এতই কি আমি খারপ।

"আমার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ?"

"কি আবার, কিছুই না।"

"ভাল-মন্দ কিছুই না ?"

"না।"

"আমি মরে গেলে তোমার দুঃখ হবে না ?"

সুধীন মিনিট খানেক চুপ থেকে বলল, "কি জানি।"

সুধার মনে হল, সুধীন সত্যি কথাই বলছে। তবে খুব কম সময় নিল এতবড় একটা কথার জবাব দিতে।

"তোমার কি মনে হয়, আমাকে বিয়ে করে জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে ? ভেবে উত্তর দাও।"

"ভাবাভাবির আর কি আছে।" সুধীন ক্লান্ত স্বরে বলল, "যেমন বরাবর ছিলুম তেমনই আছি।"

"যদি বলি তোমাকে ভালবাসি না, শুনে কষ্ট হবে না ?"

জবাব না দিয়ে সুধীন পাশ ফিরল।

"যদি বলি, কোনদিনই বাসিনি।"

জবাব পেল না।

"যদি বলি, অন্য একজনকে ভালবাসতুম।"

"তাকেই বিয়ে করলে না কেন, তাহলে একটু ঘুমোতে পারতুম এখন।" সুধীন পাশ বালিশটাকে আরো জোরে আঁকড়ে ঘুমের মহড়া দিল। অপ্রতিভ হয়ে সুধা সরে এল নিজের জায়গায়। আজ দেরিতে চাঁদ উঠেছে। মেঝের অল্প একটু জ্যোৎস্না পড়ে। সুধার ইচ্ছা হল হাত বাড়াতে, বাড়িয়ে দিল। তারপর অনেক কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে যতবার মনে পড়ল রাতের কথাবার্তা, সুধার মন ভার হয়ে উঠল, অভিমান হল। ভাল করে কথা বলল না কারুর সঙ্গে। অবশ্য তার জন্য কেউই ব্যস্ত হল না বা কারণও জিজ্ঞাসা করল না। শেষে সুধা ভাবল, কি দরকার ছিল এই বয়সে ওইসব কথা তোলার। দিব্যি তো চলে যাচ্ছে। তারপর মনে পড়ল, চলার উপায় নেই হরিশঙ্করের জন্য। অকাট্য প্রমাণ নিয়ে ও হাজির হয়েছে।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুধা উপায় ভাবতে ভাবতে ঠিক করল একবার হরিশঙ্করের বাড়িতে যাবে। দরকার হলে কেঁদে ওর বৌয়ের পা জড়িয়ে ধরবে। সিঁদুর পাঠিয়েছিল যখন, নিশ্চয় ভাল লোক। চাপ দিয়ে সার্টিফিকেটটা আদায় করিয়ে দেবে, মেয়েমানুষ হয়ে কি সে আর একজনের বিপদে, সুধা সংশোধন করে ভাবল, দুঃখ শব্দটা ব্যবহার করতে হবে, ওতে মনটা অনেক গলিয়ে দেয়। একটি মেয়ের দুঃখে বা একটি মায়ের দুঃখে কি আর এক মা পাশে এসে দাঁড়াবে না!

দুপুরে সে ইলেকট্রিকের দোকানে গেল। হরিশঙ্কর জরুরী ডাক পেয়ে বেরিয়েছে, এখুনি আসবে। একটা অল্পবয়সী ছেলে দোকান আগলাচ্ছে। তার কাছ থেকে জানল হরিশঙ্করের বাড়ি কাছেই মিনিট পাঁচেকের পথ।

ঠিকানা এবং নির্দেশ নিয়ে সুধা রওনা হল। মিনিট দুয়েক পর পৌঁছল খাল ধারে। এইবার ডানদিক। একটুখানি গিয়েই কাঠের ব্রিজ। এ পারে এসে দুধারে শুধু কাঠের গোলা আর কাঁচা কাঠের চড়া গন্ধ। তাতে মাথা ঝিমঝিম করে, নেশার মত লাগে। দুটো গোলার ফাঁকে একটা সরু রাস্তা আছে, তাই দিয়ে কিছুটা এগোলেই দোতলা মাঠকোঠা। কিন্তু সরু রাস্তাটাই সুধা বার করতে পারছে না। ওকে খোঁজাখুঁজি করতে দেখে অনেকেই তাকাচ্ছে, তাতে অস্বস্তি হতে লাগল। শেষে ঠিক করল একজনকে জিজ্ঞাসা করা যাক। জীবনের এতবড় একটা ব্যাপার লজ্জা করলে চলে না।

ছুতোর শ্রেণীর তিনজনকে সে জিজ্ঞাসা করল। কেউ বলতে পারল না, কারণ তারা এই অঞ্চলের লোক নয়। তখন ভাবল, বিড়ির দোকানদার নিশ্চয়

জানে। মাঝবয়সী লোকটা বিড়ি বাঁধছিল দুলে দুলে। লুঙ্গিটা তাড়াতাড়ি হাঁটুর নিচে নামিয়ে বলল, "কালো, রোগাপানা, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি তো!"

"হ্যাঁ, ওপারে দোকানে কাজ করে।"

"বুঝেছি, এই গলিটা দিয়েই ওর বাড়ি। কিন্তু ওকে কি দরকার আপনার?"

সুধা বিরক্ত হল, তা দিয়ে তোমার কি দরকার! এই লোকগুলোর কৌতূহল বড় বেশিই হয়।

"ওর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব।"

বিড়িওলা তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে থাকল। সুধা বলল, সম্ভ্রান্ত কেউ যে এমন জায়গায় আসতে পারে তা ওর বিশ্বাস হচ্ছে না

"কিন্তু ওর বৌতো বেরিয়ে গেছে।"

"অ কখন আসবে?"

"বেরিয়ে গেছে মানে বছর খানেক আগে এখানকারই এক ছোকরার সঙ্গে পালিয়ে গেছে।"

সুধা বিমূঢ় হয়ে বলল, "মিস্ত্রির বৌয়ের বয়স তো কমপক্ষে পঞ্চাশ হবেই।"

"কি যে বলেন ওর তো দ্বিতীয়পক্ষের বৌ। জোর পঁচিশ বয়স।"

"প্রথম বৌ কি মারা গেছল?"

"হ্যাঁ, শুনেছি গলায় দড়ি দিয়ে।"

ফিরে চলল সুধা। কাঠের ব্রিজে উঠেই দেখল হন্তদন্ত হয়ে হরিশঙ্কর আসছে।

"আমার বাড়িতে গেছলেন, কেন কি দরকার?"

উত্তেজিত তো বটেই চোখে ভয়ের ছাপও।

"আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব। বাড়িটা ঠিক চিনতে পারছি না।"

"কি দরকার অ্যাঁ, তার খুব অসুখ, দেখাটেখা হবে না। আর তার কাছে গিয়েও খুব সুবিধে হবে না বলে রাখছি।" হরিশঙ্কর রীতিমতো শাসালো।

"কেন সুবিধে হবে না কেন? আপনি ভেবেছেন আমায় খুব জাঁতাকলে ফেলেছেন, আর আমি বুঝি আপনাকে ফেলতে পারিনা?" থেমে গেল সুধা, কারণ একটা লোক ওদের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। হরিশঙ্কর বিস্ময়াহত! লোকটা কণ্ঠস্বরের পাল্লা ছাড়াতেই সুধা শুরু করল, "আপনার বৌকে গিয়ে বলব আপনি নাম ভাঁড়িয়ে আমায় বিয়ে করেছিলেন। অল্প বয়স ছিল, অতশত বুঝতে পারিনি। এখন, এতদিন পরে সেই দাবিতে আপনি আমায় ফেরত চাইছেন।"

সুধা তীক্ষ্ম চোখে তাকিয়ে রইল, লোকটা নিশ্চয় বলবে যান বলুন গিয়ে। আমার বৌ নেই তো কাকে বলবেন!

খুবই আশ্বস্ত দেখাল হরিশঙ্করকে।

"মিথো কথা, কেউ বিশ্বাসই করবে না।"

"প্রমাণ আছে, অকাট্য প্রমাণ। আপনার কাছেই সেই বিয়ের সার্টিফিকেট রয়েছে। নিজের না হলে কেউ কি ওটা রেখে দেয়?"

"কিন্তু ওতে প্রফুল্লর নাম লেখা!"

"আপনি তো নাম ভাঁড়িয়েছিলেন, প্রমাণ করতে পারবেন আপনি নাম ভাঁড়াননি? আমি ছোট কাকাকে সাক্ষী মানব।"

ফ্যাকাসে হয়ে গেল হরিশঙ্কর। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সুধা ভাবল, এইবার নিশ্চয় বুক চিতিয়ে বলবে, কাকে ভয় দেখাচ্ছেন? আমার বৌ মরে গেছে, আবার বিয়ে করেছিলুম সে বৌ পালিয়ে গেছে। কাকে বলবেন ওসব কথা?

কিন্তু ক্রমশ কুঁজো হয়ে গেল হরিশঙ্কর। অবশেষে ব্রিজের রেলিং ধরে দাঁড়াতে হল। "এসব কথা মিথ্যে হলেও, ওকে বলবেন না, খুব আঘাত পাবে। বড় ভাল মানুষ। হয়তো গলায় দড়ি দিয়ে বসবে। আমার তো আর কেউ নেই ও ছাড়া।"

সুধা আর কথা বলার দরকার বোধ করল না। বাড়ি ফেরার সময় খুব হাল্কা লাগল নিজেকে। মানুষ যে কতরকম মনের বাতিক পুষে রাখে আর তাইতেই কিভাবে আটকা পড়ে। সুখী হতে হলে এসব বাতিক থাকা উচিত নয়—সুধা মনে মনে পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল। অতঃপর, পাখি হয়ে এখন আকাশে উড়তে পারি, এমন কথাও সে ভেবে ফেলল।